সমাজ-প্রসঙ্গ

ভট্টাচার্য ও দাশ

Text-Book on **Social Studies (Compulsory)** *for* **Classes IX & X** *of Higher Secondary Schools (with Diversified Courses), written according to the approved New Syllabus prescribed by the West Bengal Board of Secondary Education*
[*Vide Notification No. SYL. 1/62, dated 30. 3. 62, Circular No. 27/62, dated 5. 12. 62 and Circular No. 34/63, dated 2. 12. 63*]

সমাজ-প্রসঙ্গ

[উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য]

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য

এম. এ. (লণ্ডন), পি-এইচ্. ডি. (লণ্ডন)

মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানেন্দ্রমোহন রিসার্চ স্কলার, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও আগ্রা বি. আর. ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ শিক্ষা-প্রসার বিভাগের সহ-সম্পাদক ; "আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালী", "শিশুর শিক্ষা ও জীবন", "আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষা-নীতি" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

ও

শ্রীঅনিলকুমার দাশ, এম. এ., বি. টি.

অ শো ক পু স্ত কা ল য়

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

64, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

নূতন সংস্করণ : 1966
(সংশোধিত ও পরিবর্ধিত)
দ্বিতীয় সংস্করণ : 1967

মূল্য 7 টাকা 40 পয়সা মাত্র।

8/

64, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9, অশোক পুস্তকালয় হইতে শ্রীঅশোককুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং 209-A, বিধান সরণী, কলিকাতা-6, দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপার্বতীচরণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	v—xvi

সমাজ-বিদ্যা ও শিক্ষা—সমাজ-বিদ্যা প্রবর্তনের লক্ষ্য—সমাজ-বিদ্যার পাঠ্য-তালিকা—সমাজ-বিদ্যার লক্ষ্য।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : মানুষের জীবন ও স্থানীয় সমাজ ... 1—8

সমাজ ও মানুষ—কালভেদে সমাজের রূপভেদ—স্থানভেদে সমাজের রূপভেদ—ব্যক্তিগত জীবনে স্থানীয় সমাজের প্রভাব—মানব-সমাজের মৌলিক গঠন—স্থানীয় সমাজ এবং আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান—আধুনিক স্থানীয় লোকসমাজের অসম্পূর্ণতা ; প্রশ্নাবলী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খাদ্য-আহরণকারী অর্থনীতি—আন্দামানী লোকসমাজ ... ... 9—23

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—আন্দামানের অধিবাসী—আন্দামানী আদিবাসীদের সমাজের গঠন—খাদ্য—পরিচ্ছদ—বাসস্থান—হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র—পাত্রাদি—ধর্ম—আন্দামানীদের দৈনন্দিন জীবন—আদিম সাম্যবাদ ; প্রশ্নাবলী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পশুপালক অর্থনীতি—আলমোড়ার পশুপালক ও কৃষিকর লোকসমাজ ... 23—36

উৎপাদনী অর্থনীতি ও সামাজিক পরিবর্তন—আলমোড়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ—ভোটদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি—আলমোড়ার পশুপালক সমাজ ও তাহাদের বিচিত্র জীবন—নিম্নাঞ্চলে যাত্রা—উর্ধ্বাঞ্চলে যাত্রা—আলমোড়ার হাটবাজার ও মেলা ; প্রশ্নাবলী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কৃষি ও লোকসমাজ—পশ্চিমবঙ্গ ... 37—59

কৃষির প্রাধান্য ও ভারত—বাংলার কৃষিপ্রাধান্য ও সমাজ-ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষ—পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ—পরিবহণ-ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গে চায়ের চাষ—বন-সম্পদ্—পার্বত্য অরণ্যে কাষ্ঠ স্থানান্তরণ-ব্যবস্থা—সমতল বঙ্গের গ্রামীণ জীবন—পার্বত্য গ্রাম ও নগর ; প্রশ্নাবলী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্প ... ... 60—83

ভূমিকা—আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খনি—কয়লা-খনির দৃশ্য—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—চিত্তরঞ্জন—রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা—কলিকাতা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চল—রেলপথ ও স্থলপথ—জলপথ ও কলিকাতা বন্দর—বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র কারখানা—দামোদর উপত্যকা

বিষয় পৃষ্ঠা

পরিকল্পনা—হাওড়ার মতো পুরাতন শহর ও চিত্তরঞ্জনের মতো নূতন শহরের তুলনা ; প্রশ্নাবলী। ... ...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আমাদের দেশের গ্রাম ও শহর ... 84—99

গ্রাম ও ভারতের গ্রামপ্রাধান্য—গ্রামের আকারগত শ্রেণী-বিভাগ—দক্ষিণবঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রাম—কেরালার অসংবদ্ধ গ্রাম—উত্তর প্রদেশের সুসংবদ্ধ গ্রাম—পাঞ্জাবের সুসংবদ্ধ গ্রাম—বিভিন্ন ধরনের শহর—আমাদের বাসস্থান ও গৃহ—গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যাদি বিক্রয়-ব্যবস্থা—শিল্পসমৃদ্ধ গ্রাম—গ্রামাঞ্চলে মেলা—গ্রাম হইতে নগর ও মহানগর—কলিকাতার কাহিনী ; প্রশ্নাবলী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিদেশের বিভিন্ন স্থানীয় লোকসমাজের জীবন-যাত্রা ... ... 99—120

উত্তর সাইবেরিয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে বল্গা-হরিণ পালন : ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—আদিবাসীদের জীবনযাত্রা—বিপ্লবের পূর্বের ও পরের অবস্থা ; **মালয়ের একটি লোকসমাজ :** ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—অরণ্যবাসী লোকসমাজ—মালয়ের আধুনিক লোকসমাজ ; **সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী একটি লোকসমাজ :** ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—অধিবাসী—মৎস্যজীবী লোকসমাজ ; **জুইডার জী-র নিকটবর্তী লোক-সমাজ :** ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—জুইডার জী পরিকল্পনা—এই লোকসমাজের প্রধান জীবিকা ; **উত্তর চীনের একটি লোকসমাজ :** ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থা ; **আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের পশুপালন ও গম-উৎপাদন :** ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—আদিম অধিবাসী—প্রেইরি অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা ; **পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার খনি অঞ্চলের লোকসমাজ :** ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—অধিবাসী—খনি আবিষ্কার ; **রাইন নদীর তীরবর্তী একটি শিল্পপ্রধান লোকসমাজ ;** প্রশ্নাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড

[ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ]

প্রথম অধ্যায় : ইতিহাসের উপাদান—ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—অধিবাসী—বৈচিত্র্য ও ঐক্য 1—12

ইতিহাসের মূল উপাদান—মানুষ ও পরিবেশ—ইতিহাসে পরিবেশের প্রভাব—ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—ইতিহাসে

বিষয় পৃষ্ঠা

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব—ভারতের অধিবাসী ও বিভিন্ন জাতি—বিভিন্ন ভাষা—বিভিন্ন ধর্ম—জীবনযাত্রা-পদ্ধতি—বিভিন্নতার মধ্যে একতা—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ; প্রশ্নাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান ... 12—18

প্রধান যুগ-বিভাগ—প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান ও উপায়—প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান—মধ্য যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান—আধুনিক যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান ; প্রশ্নাবলী।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আমাদের প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ—সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা-সংস্কৃতি ... 19—29

প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ—প্রত্নতত্ত্বের রোমান্স—সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার—সিন্ধু সভ্যতার কাল—অপরাপর সুপ্রাচীন সভ্যতার সহিত সম্পর্ক ও তুলনা ; প্রশ্নাবলী।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বৈদিক আর্য সভ্যতা ... ... 29—40

আর্য যুগের সূচনা—ভারতে আর্যদের আগমন ও প্রভুত্ব স্থাপন—বৈদিক সাহিত্য—আর্যদের ধর্ম—বৈদিক আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থা—অর্থনৈতিক অবস্থা—রাজনৈতিক অবস্থা—আর্য সভ্যতায় অনার্য প্রভাব—মহাকাব্য রচনা ও পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুত্থান ; প্রশ্নাবলী।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ দুই মহান্ নবধর্ম—বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম 40—51

নবধর্মের অভ্যুত্থানের কারণ—এই যুগে রাজনৈতিক অবস্থা—জৈন ধর্ম—বৌদ্ধ ধর্ম—ভারতের ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব—বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন ও বিদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারলাভ ; প্রশ্নাবলী।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মৌর্য যুগ ... ... 52—63

মগধের অভ্যুত্থান—মৌর্য সাম্রাজ্য : চন্দ্রগুপ্ত—মহারাজ অশোক—ইতিহাসে অশোকের স্থান—মৌর্য যুগে শাসন-ব্যবস্থা—মৌর্য যুগে সমাজ-ব্যবস্থা—মৌর্য যুগে শিল্পকলা ; প্রশ্নাবলী।

সপ্তম অধ্যায়ঃ ভারতে পারসীক ও গ্রীক প্রভাব-বিস্তার 63—71

ভারতে পারসীক অভিযান—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল—মৌর্য আমলে গ্রীক-ভারতীয় সম্পর্ক—মৌর্যোত্তর যুগে গ্রীক-ভারতীয় সম্পর্ক—ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রীক প্রভাব—রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যোগাযোগ—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জগতে ভারতীয় প্রভাব ; প্রশ্নাবলী।

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায় : যুগ-সন্ধি—মৌর্যোত্তর ভারত ... 72—81

মৌর্যোত্তর খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত—বাহ্লীক গ্রীকগণ—শকগণ—পহ্লবগণ—কুষাণগণ—মৌর্যোত্তর যুগে শিল্পকলা—মৌর্যোত্তর যুগে সাহিত্য—মৌর্যোত্তর যুগে সমাজ—মৌর্যোত্তর যুগে ধর্ম—মৌর্যোত্তর যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য ; প্রশ্নাবলী।

নবম অধ্যায় : গুপ্ত যুগ ও গুপ্তোত্তর ভারত ... 82—98

গুপ্ত রাজগণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্য—গুপ্ত যুগে শাসন-ব্যবস্থা—গুপ্ত যুগে সামাজিক অবস্থা ও ধর্ম—গুপ্ত যুগে অর্থ নৈতিক অবস্থা—গুপ্ত যুগে শিল্প-সাহিত্য—হূণ আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন—গুপ্তোত্তর ভারত—হর্ষবর্ধন—চীনা পরিব্রাজকগণ—ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং ; প্রশ্নাবলী।

দশম অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার ইতিহাস—সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ... ... 98—105

প্রাচীন বাংলা—গৌড়ের অভ্যুত্থান ও শশাঙ্ক—পালবংশ—সেনবংশ—প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন—বৈদেশিক যোগাযোগ ; প্রশ্নাবলী।

একাদশ অধ্যায় : দক্ষিণ ভারত ... ... 105—115

গুপ্তপূর্ব দক্ষিণ ভারত—গুপ্ত যুগে দক্ষিণ ভারত—গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত—দক্ষিণ ভারতের শিল্প-সাহিত্য—অর্থ নৈতিক অবস্থা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য—হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণে দক্ষিণ ভারত ; প্রশ্নাবলী।

দ্বাদশ অধ্যায় : বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতি ... 115—122

সূচনা—সমুদ্র-অভিযান ও বাণিজ্য-বিস্তার—ধর্ম-প্রচার—উপনিবেশ স্থাপন—সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তার ; প্রশ্নাবলী।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : রাজপুত জাতি ও মুসলিম আক্রমণ 122—128

রাজপুত জাতি—ইসলামের অভ্যুত্থান—ভারতে মুসলমান অভিযান—আলবেরুনী ; প্রশ্নাবলী।

চতুর্দশ অধ্যায় : সুলতানী আমলে সমাজ-সংস্কৃতি ... 128—142

দিল্লী-সুলতানি—স্বাধীন বাংলার সুলতানগণ—বাহমনী রাজ্য—বিজয়নগর—ভারতীয় ও ইসলামীয় সভ্যতার সংঘাত ও সমন্বয়—সাহিত্য—স্থাপত্য—সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা—সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা ; প্রশ্নাবলী।

পঞ্চদশ অধ্যায় : মুঘল সাম্রাজ্য—মুঘল যুগে সমাজ-সংস্কৃতি 143—162

মুঘল সাম্রাজ্য—বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান, ঔরংজেব—মুঘল শাসন-ব্যবস্থা—মুঘল যুগে কলাশিল্প—সাহিত্য—বিদেশী পর্যটক—মুঘল যুগে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ; প্রশ্নাবলী।

বিষয় পৃষ্ঠা

ষোড়শ অধ্যায় : মুঘল সাম্রাজ্যের পতন—ইউরোপীয়দের আগমন —কতিপয় ভারতীয় রাজ্যের অভ্যুত্থান 162—169

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন—ইউরোপীয়গণের ভারত আগমন—মারাঠাগণের উত্থান ও পতন—মহীশূর রাজ্যের উত্থান ও পতন—শিখ শক্তির উত্থান ও পতন—অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ-জীবন ; প্রশ্নাবলী।

সপ্তদশ অধ্যায় : ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তার—সিপাহী বিদ্রোহ ... ... 170—180

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি-সাধন—শাসন-ব্যবস্থার ক্রম-বিকাশ—বৃটিশ সরকারের সহিত কোম্পানি সরকারের সম্পর্ক—সিপাহী বিদ্রোহ—বিদ্রোহের কারণ, বিদ্রোহের সূত্রপাত, বিদ্রোহের গতি, বিদ্রোহের অবসান, বিদ্রোহের ফলাফল ; প্রশ্নাবলী।

অষ্টাদশ অধ্যায় : ভারতীয় অর্থনীতিতে বৃটিশ প্রভাব 181—185

প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান—ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন—ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন—অর্থনৈতিক জীবনের আধুনিকীকরণ ; প্রশ্নাবলী।

উনবিংশ অধ্যায় : পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার ও ভারতীয় সমাজ ও চিন্তাধারায় তাহার প্রভাব 185—193

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার—সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়ন—ধর্ম-সংস্কার—সৃজনধর্মী সাহিত্য ও শিল্প ; প্রশ্নাবলী।

বিংশ অধ্যায় : স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতালাভ 194—211

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ—বিভিন্ন কারণ, আন্দোলনের সূত্রপাত, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ, সুরাট কংগ্রেস, সন্ত্রাসবাদ, বঙ্গভঙ্গ রদ, কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতা, যুদ্ধকালে ভারতীয়গণের মনোভাব, 1919-এর শাসন-ব্যবস্থা, রাউলাট আইন, দেশব্যাপী ধর্মঘট, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য দল, সাইমন কমিশন, আইন অমান্য আন্দোলন, গোল টেবিল বৈঠক, আন্দোলন প্রত্যাহার—1935 সালের ভারত শাসন আইন—কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও ত্যাগ—সংগ্রামের শেষ পর্যায়—ভারত ছাড় আন্দোলন, আগস্ট বিপ্লব, মন্ত্রী মিশন, মুসলিম লীগের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি, ভারতবর্ষ-বিভাগ ও স্বাধীনতালাভ—উন্নতির পথে ভারত ; প্রশ্নাবলী।

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

[নাগরিকতা ও সরকার]

প্রথম অধ্যায় : পরিবারে ও স্থানীয় সমাজে জীবনযাত্রা 212—217

মানুষের পরনির্ভরশীলতা—পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন—পল্লী ও স্থানীয় অঞ্চল—সামাজিক সংঘবদ্ধতার বিভিন্ন সূত্র—সৎ ও সুন্দর জীবনের উপাদানসমূহ ; প্রশ্নাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জনস্বাস্থ্য ... ... 218—228

ভূমিকা—নাগরিক গুণ ও কর্তব্য—জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা—জনস্বাস্থ্যের অবস্থা—চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থা—শিক্ষা ; প্রশ্নাবলী।

তৃতীয় অধ্যায় : জনসাধারণ ও সরকার ... ... 228—239

শাসন ব্যবস্থা বা সরকার—গণতান্ত্রিক নির্বাচন-পদ্ধতি—নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার—আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক জীবন—রাজনৈতিক দল ও তাহার গুরুত্ব—গণতান্ত্রিক আদর্শ—দৈনন্দিন জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ ; প্রশ্নাবলী।

চতুর্থ অধ্যায় : স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংগঠন ... 240—250

সূচনা—কলিকাতা কর্পোরেশন—সাধারণ শহরের পৌরসভা—গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন—গ্রাম সভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত—অঞ্চল পঞ্চায়েত—ন্যায় পঞ্চায়েত—আঞ্চলিক পরিষদ্—জেলা পরিষদ্—সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা ; প্রশ্নাবলী।

পঞ্চম অধ্যায় : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা ... 250—264

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীন বিষয়সমূহ—কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা—সংসদ—রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা—রাজ্য সরকার—রাজ্য আইনসভা—রাজ্যপাল—রাজ্য মন্ত্রিসভা—মহাকরণ—ভারতের বিচার-ব্যবস্থা—দৈনন্দিন প্রশাসন-ব্যবস্থা ; প্রশ্নাবলী।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভারতের সহিত বহির্বিশ্বের সম্পর্ক ... 265—272

ভূমিকা—রাজনৈতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ—অর্থনৈতিক সম্পর্ক—সাংস্কৃতিক সম্পর্ক—রাষ্ট্রসংঘ ; প্রশ্নাবলী।

ইতিহাস
পৌরনীতি
সমাজ
বিদ্যা
ভূগোল
অর্থনীতি
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

সমাজ কি?
শহর ← গ্রাম ← পাড়া ← পরিবার

পার্ব্বত্য অঞ্চল
কৃষি-প্রধান অঞ্চল
বিচিত্র
সমাজ-জীবন
শিল্পাঞ্চল
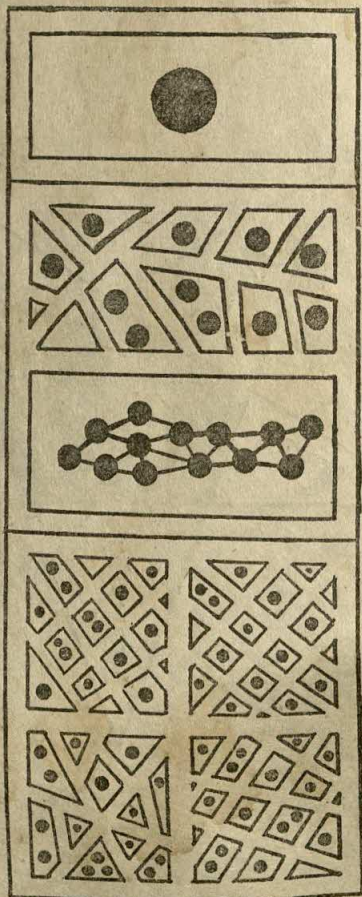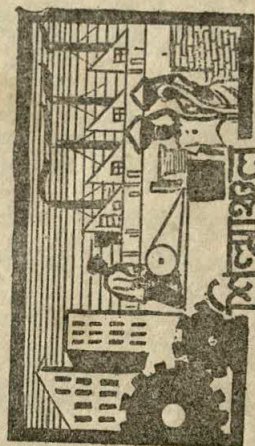
বনাঞ্চল
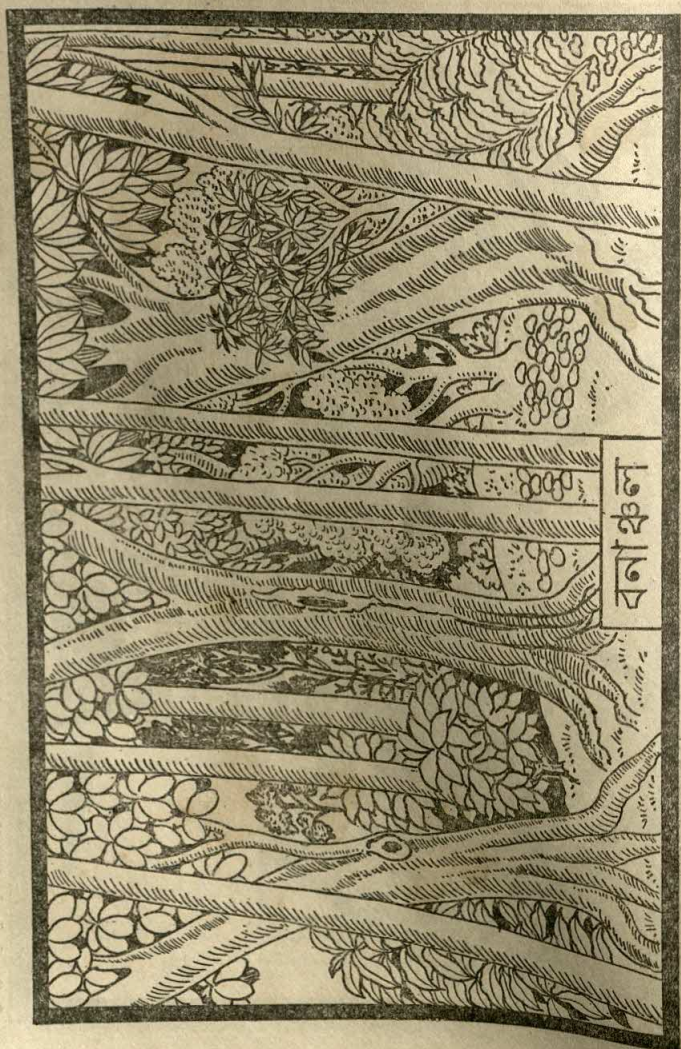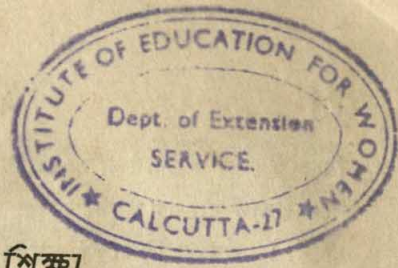
প্রস্তাবনা

সমাজ-বিদ্যা ও শিক্ষা

এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, পৌরনীতি ও এমনই সব বিষয়-বস্তু আমাদের বিদ্যালয়ে পৃথকভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক বিষয়েরই একটি স্বতন্ত্র গণ্ডি ছিল। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি থাকিলে, বোধ হয় শিক্ষা বেশী সার্থক হইয়া উঠে। অতএব, সমাজ-বিদ্যা বা সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies) নামে এইরূপ একটি বিষয়ের প্রবর্তন করা হইয়াছে, যাহাতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিবে, বিচার-বুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞান পরিমার্জিত হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংহতির ফলে সামগ্রিক দৃষ্টি গড়িয়া তোলাই হইল ইহার লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-চেতনা বা মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কবোধকে জাগ্রত করা এই বিষয়ের অন্যতম দায়িত্ব। এতদ্ব্যতীত যাহাতে প্রথম হইতেই বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজ-বিদ্যার সঙ্গে কোন শিক্ষার্থী নিজেকে মানাইয়া চলিতে শিখে, যাহাতে সে রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হইয়া উঠিতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াও এই বিষয়ের প্রবর্তন করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া ইহার বিস্তৃতি। শৈশব হইতেই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশই ইহার চরম লক্ষ্য। জীবনের সঙ্গে সমাজ-বিদ্যার নিবিড় যোগাযোগ এবং জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি ও সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার আলোচনা।

সমাজ-বিদ্যা কেবল ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞানের সমন্বয় নয়। প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়া মানুষ কিভাবে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইল এবং পারস্পরিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পর্যালোচনা সমাজ-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ের ব্যাপকতার জন্য ইহাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া শিক্ষাদান করা বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়টিকে উপযুক্তভাবে পরিবেশন করিতে গেলে শুধু বক্তৃতা-পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে যাহাতে শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা আহরণ করিতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। শ্রেণী-কক্ষের বাহিরে পরিবেশ, প্রকৃতি ও স্থানীয় সমাজ হইবে শিক্ষার ক্ষেত্র। ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ রাখিয়া সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব-প্রকাশ, বিচার-বুদ্ধি, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, মানুষের প্রতি বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির বিকাশ এই সমাজ-বিদ্যার উদ্দেশ্য। গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তন সত্যই আবশ্যক। প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনকে বিষয়াভিমুখী করিয়া তোলা ও পরে এক-একটি নির্দিষ্ট

বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে সহায়তা করিতে হইবে। সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সাহায্য করা শিক্ষকের কর্তব্য। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আঞ্চলিক পরিবেশ, স্থানীয় সমাজ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে তাঁহার কাজ। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে সমাজ-বিদ্যা পাঠন-পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—

পাঠ্য-বিষয়—স্থানীয় লোকসমাজের জীবন; **নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তু**—খাদ্য, আশ্রয়, পোশাক ইত্যাদি। এই নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তুকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, খাদ্য লইয়াই বিভিন্নমুখী আলোচনার অবকাশ আছে। যথা—খাদ্য-প্রসঙ্গে খাদ্যের সরবরাহ, খাদ্যের বণ্টন, খাদ্যের উৎপাদন, আঞ্চলিক খাদ্যাভাব ও তাহার কারণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য কখনও ইতিহাসে, কখনও ভূগোলে, কখনও অর্থনীতিতে, আবার কখনও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার প্রয়োজন। এই তথ্য-আহরণ শুধু শিক্ষকই করিবেন এমন নয়, শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে আগ্রহ জন্মাইয়া দিয়া যথাযথ নির্দেশ দিলে তাহারাই প্রকৃত ক্ষেত্র হইতে তথ্য আহরণ করিবে। যেমন—খাদ্য বিষয়ে কয়েকটি প্রাথমিক প্রশ্ন করা যাইতে পারে:—

(1) নির্দিষ্ট অঞ্চলে কি কি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়?

(2) ঐ অঞ্চলে সাধারণ লোক কোন্ কোন্ খাদ্যে বেশী অভ্যস্ত এবং কেন?

(3) ঐ খাদ্য উৎপাদন করে কাহারা এবং কিভাবে?

(4) যাহারা এই উৎপাদন-কাজে রত, তাহাদের শতকরা অনুপাত কত?

(5) এইসব খাদ্যের বণ্টন-ব্যবস্থা কিরূপ?

(6) নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঐ খাদ্যদ্রব্য কিভাবে উৎপন্ন হয়?

(7) উৎপন্ন দ্রব্য আঞ্চলিক চাহিদা মিটাইতে পারে কি না?

(8) খাদ্যদ্রব্য ছাড়া আর কোন্ কোন্ কৃষিজাত দ্রব্য এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়—কিভাবে মানুষের উপকারে আসে?

(9) কুটীরশিল্পে ইহাদের উপযোগিতা কতদূর?

(10) এইসব দ্রব্যের উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

এইরূপ নানা প্রশ্নের অবতারণা করিয়া শিক্ষার্থীর কৌতূহল জাগাইতে হইবে এবং প্রয়োজনমতো যথাযথ নির্দেশ দিতে হইবে। যেমন—একদল ছাত্র খাদ্য কিভাবে উৎপন্ন হয় সেই সম্পর্কে তথ্য আহরণ করিতে গিয়া শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় ব্যবসায়ী, মজুতদার ও কৃষকদের সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটখাটো শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। স্থানীয় হাট-বাজার

হইতে এই অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে। অন্যদিকে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এবং তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া আর একদল ছাত্র ছবি ও নক্সার মাধ্যমে যাহাতে সেগুলি উপস্থাপিত করিতে পারে, সে-বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশ দিবেন। পরে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সব তথ্য সংগৃহীত হইলে, সেইগুলি শ্রেণী-কাজে দেখাইবার পর বিতর্ক ও আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে শিক্ষক কেবল নির্দেশক মাত্র, বক্তা নন।

পাঠ্য-তালিকায় সমাজ-বিদ্যার স্থান।—পাঠ্য-তালিকার মধ্যে এই নূতন বিষয়-বস্তুর বিশেষ স্থান আজ আমাদের দেশেও স্বীকৃতি পাইয়াছে। তবে কি কি বিষয় লইয়া ইহার পাঠ্য-সূচী প্রণীত হইবে, এই বিষয়ে নানা মত আছে। আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল দেশে এই বিষয় বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাদের পাঠ্য-তালিকার মধ্যে এমন বিষয়-বস্তুও স্থান পাইয়াছে যাহাকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের শাখা হইতে তথ্য আহরণ করিয়া মানুষের প্রয়োজন অনুসারে বিন্যাস করাই এ-বিষয়ের লক্ষ্য। সুতরাং ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌর-বিজ্ঞানের সমস্ত গণ্ডিকে সরাইয়া দিয়া সমাজ-বিদ্যা মূলতঃ সমস্যা ও মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়কে ভিত্তি করিয়াই প্রণীত হইবে।

সমাজ-বিদ্যা প্রবর্তনের লক্ষ্য

সমাজ-বিদ্যা পাঠনের লক্ষ্য আজ কেবল শিক্ষার্থীর তথ্য-আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলাই হইল সমাজ-বিদ্যার চরম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, কমনীয় সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তির উন্মেষসাধন করাই হইল ইহার অন্যতম লক্ষ্য। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে সহায়তা করিতে হইলে সামাজিক চেতনারও উন্মেষসাধন করিতে হইবে। তাহা না হইলে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা আজ দেশের বিশেষ কোন কাজে লাগিতেছে না।

দেশের চারিদিকে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা-সমাকীর্ণ পথে চলিতে হইলে, শৈশব হইতে শিক্ষার্থীকে সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে সজাগ হইতে হইবে। সেইজন্য শিক্ষার্থীর মনে প্রথম হইতেই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি জাগ্রত করা এবং জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষা দেওয়া সমাজ-বিদ্যার বিশেষ উদ্দেশ্য।

তাহা ছাড়া, সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি, প্রতিবেশী, দেশবাসী ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যও বিষয়টি প্রবর্তনের সার্থকতা আছে। আজ

চারিদিকে হানাহানি, মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস। কাজেই কৈশোর হইতে শিক্ষার্থীর মন যদি মানবিক আদর্শে গঠন করা যায়, তবে তাহার উপযোগিতা যথেষ্ট।

এককথায় বলা যায় যে, যোগ্য নাগরিক গড়িয়া তোলাই হইল সমাজ-বিদ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আর এই উদ্দেশ্যে উপনীত হইবার সোপান হইল স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা, জগতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বিষয়ে জ্ঞান এবং বিশ্ব-মানবের মধ্যে সম্পর্কবোধকে উদ্দীপিত করা।

সমাজ-বিদ্যার পাঠ্য সূচী ও পাঠন-পদ্ধতি।—সমাজ-বিদ্যার পাঠ্য-সূচী নির্দিষ্ট হইলেও, তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন। পাঠ্য-বিষয়কে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটি পাঠ্যবস্তু লইয়া নানাভাবে দেখিবার ও আলোচনা করিবার অবকাশ দিতে হইবে। সেইজন্য পাঠ্যবস্তুকে কয়েকটি বস্তু-এককে ভাগ করিয়া লইলে বোধ হয় সুবিধা হয়। প্রত্যেকটি পাঠ্যবস্তু এক-একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে।

স্থানীয় পরিবেশ কিভাবে খাদ্য-আহরণের পথে সহায়তা করে? এই প্রসঙ্গে ভৌগোলিক প্রভাব, জলবায়ু, কৃষিজাত দ্রব্য, আঞ্চলিক বিধি-সংস্কার ও লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস ও তাহার উপযোগিতা, স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, খাদ্যের আমদানি-রপ্তানি, উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ-পদ্ধতি—সব-কিছুই আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও করা যাইতে পারে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজ—সকলের মধ্যেই একই রূপ সংহতি আনিতে হইলে কেবল শিক্ষার্থীকে তথ্য পরিবেশন করিলে চলিবে না। কখনও একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য-আহরণের কাজ শিক্ষার্থীর উপরেই ন্যস্ত করিতে হইবে, আবার কখনও দলগত কাজের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়, যাহাতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সমাজের বিভিন্ন লোক পরস্পর সহযোগিতা স্থাপন করিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারে। কাজেই কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি ও আলোচনা-পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষককে এইসব পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ও সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। বক্তৃতা, ছবির সাহায্যে ব্যাখ্যা, উদাহরণ দেওয়া, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ, আলোচনা ও পরিচালনা ইত্যাদি পাঠনের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি।

সমাজ-বিদ্যার ক্ষেত্রে মৌলিক আলোচনা, হাতে-কলমে কাজ, কার্য-সমস্যা, দলগত কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠন কার্যকরী হইতে পারে।

উদাহরণ 1.

(1) পাঠ্যবস্তু	(2) পদ্ধতি	(3) শিক্ষা-প্রণালী	(4) উপকরণ	(5) শ্রেণীর কার্যকলাপ
নদীমাতৃক সভ্যতা	1. বর্ণনা 2. গোষ্ঠীগত আলোচনা 3. শিক্ষার্থীদের তথ্য আহরণ	1. মৌখিক উদাহরণ 2. আলোচনা 3. শ্রেণী বা বাড়ীর কাজ	ছবি, মডেল, তালিকা, নক্সা, আলোক-চিত্র ইত্যাদি	1. জাদুঘর পরিদর্শন 2. মডেল প্রণয়ন 3. পুস্তিকা প্রণয়ন

উদাহরণ 2.

(1) পাঠ্যবস্তু	(2) পদ্ধতি	(3) শিক্ষা-প্রণালী	(4) উপকরণ	(5) শ্রেণীর কার্যকলাপ
খাদ্য	কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি বর্ণনা	ভ্রমণ সংবাদপত্র-পাঠ	চার্ট, ম্যাপ, ছবি, নক্সা, তথ্যাবলী	মডেল, চার্ট ইত্যাদি তৈয়ারি করা

উদাহরণ 3.

(1) পাঠ্যবস্তু	(2) পদ্ধতি	(3) শিক্ষা-প্রণালী	(4) উপকরণ	(5) শ্রেণীর কার্যকলাপ
স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা	কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি দলগত কাজ	পর্যবেক্ষণ	বই, ফিল্ম, চার্ট	চার্ট ও তালিকা প্রণয়ন করা

পাঠ্যবস্তুকে কয়েকটি এককে বিশ্লেষণ করিয়া লইয়া, উপযোগী পদ্ধতি, প্রণালী, শিক্ষার উপকরণ ও ক্রিয়াকলাপের কথা চিন্তা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে পূর্বপৃষ্ঠার ছক্‌টি অনুসরণ করা যাইতে পারে।

স্থানীয় সমাজ-জীবন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে চাই—

(ক) স্থানীয় পরিবার-জীবনের পরিচয় লাভ।

(খ) জলবায়ু, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও তাহার বিবরণী সংগ্রহ।

(গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৃত্তি ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ।

(ঘ) বাণিজ্য ও বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন।

(ঙ) প্রাদেশিক যানবাহন ও সংবাদকেন্দ্র পরিদর্শন।

(চ) লোকসংখ্যা ও ক্ষেত্রের অনুপাত নির্ণয়।

কার্যাবলী ঃ

স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে নানা তথ্য আহরণ করিতে বলা হইবে। গ্রামের মন্দির ও দেবালয়, হাট, ডাকঘর ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষার্থীরা ছবি ও নক্সা আঁকিবে এবং নানা তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখিবে। ইহা ছাড়া, স্থানীয় নৃত্য, উৎসব প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হইবে। নিকটে কোনও সরকারী দপ্তর থাকিলে তাহা দেখিয়াও তাহারা তথ্য আহরণ করিবে।

নানাভাবে কর্মকেন্দ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পল্লী বা নগরীকে কেন্দ্র করিয়াও তথ্য আহরণ করা যাইতে পারে। যেমন—

1. কোন নগরের ইতিহাস সংগ্রহ করা।

2. নগরের বিভিন্ন ও বিশিষ্ট অধিবাসী সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা।

3. নগরের বিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা।

4. নগর পরিচালনার ব্যবস্থা, নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা।

5. শহরের জল-সরবরাহ, যানবাহন, বৈদ্যুতিক সরবরাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা।

6. শহরের অধিবাসীদের বৃত্তি ও বর্ণ-বিভাগ—স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

তেমনই পল্লীতে শস্য-উৎপাদন ও কুটীরশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা সহজ। পল্লী-পরিবেশেও অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি ছোট ছোট এককে ভাগ করিয়াও সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বিষয়ঃ স্থানীয় পরিবেশে জীবনযাত্রা—

এই বিষয়-এককটিকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, খাদ্য—পরিধেয় —বাসস্থান প্রভৃতি।

পদ্ধতিঃ

(1) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া প্রসঙ্গটির উত্থাপন করিতে হইবে।

(2) নানাধরনের কার্যাবলীর প্রবর্তন করিতে হইবে।

(3) অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(4) বিষয়বোধকে স্পষ্ট করিতে হইবে।

এক-একটি এককে আবার নানা ভাবে সাজানো যায়। যেমন, খাদ্যকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রসঙ্গের বিন্যাস ও প্রশ্নের উত্থাপন করা যায়। যথা—খাদ্য-সরবরাহ, স্থানীয় পরিবেশে খাদ্যের উৎপাদন, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি।

শ্রেণীর জন্য প্রশ্নাবলী

(ক) প্রশ্নাবলীর নমুনাঃ

1. আমাদের খাদ্য-সরবরাহের উৎসগুলি কি কি ?
2. ধান্য উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা কি কি ?
3. ভারতের প্রধান প্রধান খাদ্য কি কি ?
4. এদেশের জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ কৃষিকার্যে লিপ্ত ?
5. আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ?
6. কিভাবে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে ?

(খ) কার্যাবলীঃ

জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষার্থীদের নানা কাজ করিতে বলা যায়। গৃহস্থালীর খাদ্য কোথা হইতে আসে, সে সম্পর্কে অভিভাবক ও ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়া বা বিজ্ঞাপন দেখিয়া শিক্ষার্থীরা তথ্য আহরণ করিতে পারে। তারপর তাহারা একটি সমিতি গঠন করিয়া আহৃত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে পারে।

সমাজ-বিদ্যার পাঠন-পদ্ধতির বৈচিত্র্যে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজ-বিদ্যা পড়াইবার সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিষয়-বস্তু ও পরিবেশের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বুঝিয়া এই পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনিতে হইবে। কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট নিয়মে এই বিষয়ের পাঠন সার্থক হইতে পারে না। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে,

গতানুগতিক শ্রেণী-পাঠনের মধ্যে সমাজ-বিদ্যাকে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের সহযোগিতা না হইলে, সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। কাজেই কখনও ভাষা ও বর্ণনা, আবার কখনও আলোচনা, উদ্দেশ্যমূলক কার্য ও নানা শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার প্রবর্তন এই বিষয়টিকে সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। যে যে পদ্ধতি এই প্রসঙ্গে অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। যেমন—

বর্ণনামূলক—এই পদ্ধতিটি চিরাচরিত হইলেও, তথ্য-পরিবেশনের পক্ষে ইহার উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না।

কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি—এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কোন কাজ করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করিতে হয়। যেমন—কোন গ্রামের হাট লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে আঞ্চলিক উৎপাদন বিষয়ে তথ্য আহরণ করা ; বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা।

সমাজ-বিদ্যার পাঠ্য-তালিকা

আমাদের দেশে সমাজ-বিদ্যার যে পাঠ্য-তালিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বৈচিত্র্যময় ও ব্যাপক। তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে—স্থানীয় পরিবেশ ও জনসমাজ, বিশ্বের নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজগোষ্ঠী ও তাহাদের জীবনযাত্রা। পাঠ্য-সূচীর বৈচিত্র্যের জন্য নানা বিদ্যালয়ে নানা ভাবে সমাজ-বিদ্যা পড়ানো হইতেছে। এক এক বিদ্যালয়ে এক এক বিষয়-বস্তু লইয়া পাঠন আরম্ভ হইয়াছে। কোন বিদ্যালয় স্থানীয় পরিবেশ, কোন বিদ্যালয় বা সামাজিক কর্তব্য ও আচরণ দিয়া পাঠন আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও বা খাদ্য ও খাদ্য-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া, আবার কোথাও বা বাসস্থানকে অবলম্বন করিয়া। মোট কথা, সমাজ-বিদ্যা পাঠনের আজও কোন সুনির্দিষ্ট ধারা উদ্ভাবিত হয় নাই ; কারণ পরীক্ষামূলকভাবে তাহা সবেমাত্র আরম্ভ করা হইয়াছে।

পাঠ্য-সূচীর নমুনা

স্থানীয় সমাজ-জীবন :

(ক) মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং তাহা মিটাইবার আয়োজন—ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ্ ইত্যাদির প্রভাব। আহার্য—বাসস্থান—বেশভূষা।

(খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য—জল-সরবরাহ—পরিচ্ছন্নতা ও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা। ব্যাধি ও ব্যাধির দূরীকরণ—আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন—নানা প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও রক্ষার উপায়—সমাজের নানা অপরাধ ও তাহা নিবারণের উপায়।

(গ) কিরূপে সমাজ তাহার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটায়—সমাজের কৃষি, শিল্প ও কৃষ্টিগত কার্যকলাপ।

বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ সংহতি।

পারিপার্শ্বিক অঞ্চল ও বহির্বিশ্ব। ব্যবসায়-বাণিজ্য—যানবাহন, কার্য-নিয়োগ ও তাহার ব্যবস্থা।

প্রাচীন জনগোষ্ঠী ও সভ্যতার কথা :

(ক) প্রাচীন জনসমাজের পত্তন—আদিম উপকরণ ও বৃত্তি—শাসন-ব্যবস্থা—পরিবারগোষ্ঠী ও আঞ্চলিক অধিবাসী।

(খ) নদীমাতৃক সভ্যতা—মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পা—সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও জনকল্যাণ।

(গ) গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—মানব-সমাজে তাহাদের অবদান।

(ঘ) আর্য সভ্যতার উত্থান-পতন।

(1) বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ—তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন—জাতিভেদ ও তাহার ফলাফল—শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম।

(2) জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, অশোকের রাজত্বকাল, মৌর্য সভ্যতা, গুপ্ত রাজত্ব, ভারতীয় সংস্কৃতি—ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার।

(3) সুলতান ও মুঘল শাসনকালে ভারতীয় জীবন, সাহিত্য ও কলা।

(4) ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও তাহার প্রভাব। মধ্যযুগের ধর্ম—ব্যক্তি ও সমাজ-সংস্কার। জাতীয় সংগঠনের পথে মুঘল সম্রাট ও তাঁহাদের অবদান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাঁহাদের প্রভাব। শিক্ষা—শাসন, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি।

বর্তমান জগতের বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠী :

(ক) মালয়ের সমাজগোষ্ঠী—সেখানকার উপজাতি অঞ্চল—তাহাদের জীবনযাত্রা—কৃষি, শিকার ও নানা বৃত্তি।

(খ) পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সমাজগোষ্ঠী—অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের জীবনযাত্রা। মরু অঞ্চল—খনিপ্রধান নগরের অভ্যুত্থান। যানবাহনের সমস্যা—পানীয় ও খাদ্য সরবরাহ।

(গ) চীনদেশের সমাজ—চতুর্দশ শতাব্দীর কৃষক—উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা—নয়া চীন ও তাহার বিবর্তন।

(ঘ) ইস্রায়েলের ইতিহাস—ইহুদিদের আগমনের পর কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি—সমবায়-প্রথার প্রবর্তন।

(ঙ) ইতালি ও স্পেনের তুলনামূলক আলোচনা—ডাচ বা ওলন্দাজ সমাজের ইতিহাস।

(চ) রাইনল্যাণ্ড ও জার্মানির কথা। খনিজ সম্পদ, শিল্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য—যুদ্ধের প্রভাব।

(ছ) আর্জেন্টিনা ও আমেরিকার তুলনামূলক আলোচনা।

(জ) সেণ্ট লরেন্স ও তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। ভারত ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য।

(ঝ) সাইবেরিয়ার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য—আধুনিক পরিস্থিতি।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা :

(ক) পশ্চিমের প্রভাব—মধ্য-প্রাচ্যের বিবর্তনের ইতিহাস।

(খ) গ্রেট বৃটেনে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান—ফরাসী বিপ্লব ও তাহার প্রভাব—শিল্প-বিপ্লব।

ভারতীয় সভ্যতার উপর পশ্চিমের প্রভাব :

(ক) বৃটিশ শাসনের ইতিহাস। বণিক ইংরাজদের আগমন ও ভারত শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ। মোগল, মারাঠা ও ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। 1857 খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা।

(খ) ভারতের ইতিহাসে জাতীয় চেতনার উন্মেষ। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন—ভারত-বিভাগ ও স্বাধীনতা—রাজ্যের পুনর্গঠন ইত্যাদি।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক ও তাহাদের দায়িত্ব :

(ক) পরিবার-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মূল্য—ভারত-সংগঠনে কিশোর-তরুণদের দায়িত্ব। পরিবার-জীবনে নাগরিক চেতনার উন্মেষ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবারের প্রভাব—পরিবার-জীবনের বিবর্তন ও পরিবর্তন। গৃহ-সমস্যা—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি।

(খ) শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ—বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক চেতনার উন্মেষ—বিদ্যালয় ও সমাজ—বৃত্তি-নিরূপণ।

(গ) স্থানীয় সরকার ও শাসন-ব্যবস্থা। শাসন-ব্যবস্থায় নাগরিকদের সহযোগিতা। কর নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচন। স্থানীয়, জেলা ও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ।

(ঘ) জাতীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা—জাতীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের কার্যকলাপ। বিচার-বিভাগের ক্রিয়া ও প্রভাব।

(ঙ) ভারতের জনসংখ্যা—খাদ্য-সংস্থান ও খাদ্য-বন্টন। কৃষি-ব্যবস্থার সংস্কার-পদ্ধতি—সেচ ও বিবিধার্থসাধক পরিকল্পনা। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন—ভূদান-যজ্ঞের প্রবর্তন। ঋণসালিশী বোর্ড—সমবায়-প্রথায় কৃষি-ব্যবস্থা।

(চ) জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন।

বস্ত্রশিল্প—আমাদের খনিজ সম্পদ্—ভারী শিল্পের উন্নতি—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আঞ্চলিকতা—ছোটখাটো কুটীরশিল্প—শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সামাজিক উন্নয়ন।

(ছ) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

বিশ্ব-সমাজগোষ্ঠী :

(ক) যানবাহনের ক্রমোন্নতি—বাণিজ্যিক যোগসূত্র—অন্ধকার পৃথিবী।

(খ) বিশ্ব-যুদ্ধ ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা—লীগ অব নেশন্স্—ইউ. এন. ও. (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান—বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবদান। পঞ্চশীল—মানুষের কাজে আণবিক শক্তির প্রয়োগ।

সমাজ-বিদ্যার লক্ষ্য

মানুষ সমাজ গঠন করে, আর সেই সমাজ ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠে। সামাজিক প্রাণী বলিয়াই সমাজকে বাদ দিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। যে পৃথিবীতে সে বাস করে, তাহার মধ্যে রহিয়াছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, আছে নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ। আবার, সেই পরিবেশের সঙ্গে মানুষ কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে, কিভাবে এই পরিবেশকে আপন কার্যে লাগাইয়াছে, তাহারও সুদীর্ঘ ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাবও সুস্পষ্ট। সেইজন্যই দেখা যায়, এক এক অঞ্চলে একএক রকম মানুষ, বিভিন্ন জীবনধারা ও বেশভূষা। নীল আকাশের নীচে যে যেখানেই থাকুক, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী বা সমাজ জীবনধারাকে সুষ্ঠু করিয়া তোলার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। অগ্রগতির পথে মানুষের অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ফলে সে গড়িয়া তুলিয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা—পৌরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি, রাজনীতি এবং আরও কত কী! সমাজ-বিদ্যা মানুষের

সমাজ-বিদ্যার লক্ষ্য ও পরিধি

অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র হইতে রসদ সংগ্রহ করে। মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার পরিক্রমা। ইহার পরিধি বিস্তীর্ণ, যেহেতু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত ; যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান। সব-কিছুকে আত্মসাৎ করিয়া সমাজ-বিদ্যা পুষ্ট। এইসব বিভিন্ন বিষয়-বস্তু এক সংহত রূপ লইয়া সমাজ-বিদ্যার উপাদান হইয়া উঠিয়াছে।

আজ পৃথিবীর বুকে হানাহানি চলিতেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষাকে সুগম করিবার পথে সমাজ-বিদ্যার দানকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ মানুষের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাকে বুঝিতে হইলে, মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে, সমাজ-বিদ্যার প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতি ও মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি গড়িয়া তোলা সমাজ-বিদ্যার লক্ষ্য।

সমাজ-বিদ্যার দায়িত্ব

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি বিন্যাসে সহায়তা করা এবং শিক্ষাকে বিস্তৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সমাজ-বিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য। ইহা ছাড়া, প্রতিটি শিক্ষার্থী যাহাতে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে এবং যাহাতে সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করিতে শিখে—তাহাও সমাজ-বিদ্যার লক্ষ্য।

সুসভ্য মানুষ আজ আকাশ জয় করিয়াছে, মহাসাগরের তলদেশও তাহার অগম্য নয় ; কিন্তু পৃথিবীতে পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বাস করিতে সে এখনও শিখে নাই। তাহার ফলে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব মানব-সমাজের শান্তির পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ-বিদ্যার একটি বড় দায়িত্ব—জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা, পরস্পরকে উদারভাবে বুঝিতে সাহায্য করা। চিন্তাধারার পরিমার্জন, সূক্ষ্মতর অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধির উন্মেষসাধন করাও সমাজ-বিদ্যার লক্ষ্য।

মোটের উপর, মানুষকে নিত্যনূতন সমস্যার সম্মুখীন হইবার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করিবার জন্য যে শিক্ষা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাহার অনেকখানি দায়িত্বই সমাজ-বিদ্যার।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের জীবন ও স্থানীয় সমাজ

সমাজ ও মানুষ।—মানুষ সামাজিক প্রাণী। এই কথার অর্থ এই যে, মানুষ আদিম কাল হইতে দলবদ্ধভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মানুষ যখন আদিম কালে ফলমূল আহরণ করিয়া বা শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত, তখনও তাহারা দলবদ্ধভাবে তাহা করিত। পরে যখন তাহারা কৃষিকার্য ও পশুপালন আরম্ভ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিত, তখনও তাহারা দলবদ্ধভাবেই করিত। তাহারা একত্র দলবদ্ধভাবেই থাকিত। এখনও মানুষ যাহা কিছু করে, তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দলবদ্ধ হইয়াই করে। অনেকক্ষেত্রে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, যে যাহার কাজ সে নিজেই করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ধরো, একজন কবি। আপাতঃদৃষ্টিতে কবি আপন মনে আপন কবিতা রচনা করিতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, অন্যান্য বহুলোকের সহযোগিতা ছাড়া তাঁহার কবিতা লেখা সম্ভব হইত না। তিনি যে কাগজে লিখিতেছেন, তাহা অন্যান্য লোকের পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি যে কলম ও কালি দিয়া লিখিতেছেন, তাহাও অন্য লোকেই উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার কবিতা অন্য লোকেই ছাপিবে, অন্য লোকে বিক্রয় করিবে। কেবল তাহাই নহে, অন্য লোকে তাঁহার কবিতা পাঠ না করিলে তাঁহার কবিতা লিখিয়া কাজ কি? কেবল কি তাহাই? কবিতা লিখিবার জন্য কবিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সেজন্য চাই কবির অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ। কৃষকরা তাঁহার অন্ন যোগাইতেছে, শ্রমিকেরা তাঁহার বস্ত্র ও বাসগৃহের ব্যবস্থা করিয়াছে। শিক্ষকগণ তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি অসুস্থ হইলে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সুস্থ রাখিয়াছেন, তাঁহার পাঠোপযোগী পুস্তকসমূহ অন্যান্য লোকেই যোগাইতেছে। এক কথায়, কবি আপন মনে আপন কবিতা লিখিলেও তিনি অপরের সহযোগিতা ছাড়া তাহা করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। তাই মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারাই সে জীবনধারণ করে। মানুষ শৈশবে ও বাল্যে সম্পূর্ণরূপে তাহার পিতামাতার উপর নির্ভর করে। অপরের সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই পিতামাতা তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি পালন করেন। সুতরাং কেহই নিঃসঙ্গভাবে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং অপরের সহযোগিতা ছাড়া বাঁচিতে পারে না। মানুষ

মানুষ সামাজিক প্রাণী বলিতে কি বুঝি?

সামাজিক জীব বলিলে পরস্পরের উপর মানুষের এই পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার কথাই বুঝায়।

কালভেদে সমাজের রূপভেদ।—মানুষের দলবদ্ধতার প্রবৃত্তি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করিয়াছে। যে বানর-জাতীয় প্রাণী হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে বলা হয়, সেই বানর-জাতীয় সকল প্রাণীই দলবদ্ধভাবে বাস করে। আদিম মানুষ যে সমাজবদ্ধভাবে বাস করিত, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা মানুষের সমাজবদ্ধতার যে রূপ দেখিতে পাই, তাহা চিরকাল একপ্রকার নাই। উহা কয়েক লক্ষ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বিকাশলাভ করিয়া বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে মানব-সভ্যতা বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও যে সকল পর্যায় বা স্তরের মধ্য দিয়া মানব-সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছে, সেই সকল অনুন্নত পর্যায় বা স্তরের কিছু কিছু চিহ্ন আজও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় অক্ষুন্ন অবস্থাতেই রহিয়াছে।

আদিম কালেও মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করিত। কিন্তু তাহাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ভিন্নতর ছিল। মানুষ পশুপালন ও কৃষিকার্য জানিত না। তাহারা ফলমূল, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এবং জীবজন্তু ও মৎস্য শিকার করিয়া তদ্দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করিত। সংগ্রহযোগ্য ফলমূল, মধু প্রভৃতি এবং শিকারযোগ্য জীবজন্তু ও মৎস্য প্রভৃতি একই স্থানে সর্বদা সুলভ না হওয়ায়, মানুষ সর্বদা একই স্থানে বাস করিতে পারিত না—তাহাদিগকে খাদ্যের সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সর্বদা বিচরণ করিতে হইত। ফলে তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান ও বাসগৃহ ছিল না। তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, তাহারা কাঠ, হাড় ও পাথরের হাতিয়ারই ব্যবহার করিত। তাহারা পাত্রের ব্যবহার জানিত না। তাহারা আগুনের ব্যবহার জানিত। এই আদিমতম সমাজ **খাদ্য-আহরণকারী** (food-gathering) **সমাজ** নামে পরিচিত। কারণ, ইহারা কেবল প্রকৃতিজাত খাদ্য নানা উপায়ে সংগ্রহ করিত। ইহারা পরবর্তী সমাজ-ব্যবস্থাসমূহের মতো খাদ্য উৎপাদন করিত না। এই সমাজের নিদর্শন আজও পৃথিবীর কিছু কিছু স্থানে রহিয়াছে। আমাদের দেশে আন্দামানের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের সমাজের কিছুটা নিদর্শন মিলে। তবে পরবর্তী সমাজ-ব্যবস্থাসমূহের কিছু কিছু প্রভাব ইহার মধ্যে এখন প্রবেশ করিয়াছে। যেমন—ইহারা স্থায়িভাবে বসবাস করে, ইহারা বর্তমানে পাত্রের ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে এবং ইহারা লৌহ প্রভৃতি ধাতুর কিছু কিছু ব্যবহার জানে। আন্দামানের খাদ্য-আহরণকারী সমাজের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

খাদ্য-আহরণকারী সমাজ

খাদ্য-আহরণকারী সমাজের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে প্রকৃতি-দত্ত খাদ্যের সরবরাহ যথেষ্ট ও সুনিশ্চিত ছিল না। মানুষ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ক্রমাগত খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু তাহাতেও খাদ্যের প্রয়োজনানুরূপ প্রাচুর্য ও নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব হইত না। ক্রমে মানুষ তাহাদের সমাজগত অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য আবিষ্কার করিল পশুপালন ও কৃষি। পশুপালন ও কৃষির ফলে মানুষ একই স্থানে বসবাস করিয়া খাদ্য-সংস্থানের সুযোগ লাভ করিল। মানুষ স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করিল, সভ্যতার উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হইল। এই সমাজ-ব্যবস্থাকে **পশুপালক ও কৃষিপ্রধান** (pastoral and agricultural) **সমাজ** বলা হইয়া থাকে। প্রথমদিকে সমাজের পুরুষরা পশুপালনে ব্যস্ত থাকিত এবং স্ত্রীলোকরা কৃষিকার্য করিত। এইভাবে সমাজে একই সঙ্গে পশুপালন ও কৃষিকার্য চলিত। কিন্তু পরে পুরুষরাই কৃষিকার্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিল। ফলে দেখা গেল, কোন কোন সমাজে পশুপালন, আবার কোন কোন সমাজে কৃষিকার্য প্রাধান্য লাভ করিল। এই পশুপালক ও কৃষিপ্রধান সমাজ খাদ্য-আহরণকারী সমাজ অপেক্ষা উন্নততর ছিল। এই সমাজে লোকরা বাসগৃহাদি নির্মাণ করিত, কৃষিকার্যের জন্য সেচ-ব্যবস্থাদি করিত। তবে তখনও তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না। তাহারাও কাঠ, হাড় ও পাথরের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত। তবে তাহারা মৃৎপাত্রাদি ব্যবহার করিতে জানিত। এককথায়, তাহারা সভ্যতার পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিল। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থার নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনও কিছু পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়। তবে পার্শ্ববর্তী উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শে ও প্রভাবে সেগুলির প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার বিশুদ্ধতা এখন আর নাই। আমাদের ভারতবর্ষে আলমোড়া অঞ্চলে পশুপালক সমাজ-ব্যবস্থার নিদর্শন আজও রাহিয়াছে। কিন্তু উন্নততর শিল্প-প্রধান সভ্যতার সংস্পর্শ তাহারা সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারে নাই, তাহারা নানাভাবে উন্নততর শিল্পপ্রধান সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। আলমোড়ার পশুপালক ও কৃষিপ্রধান সমাজ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করিব।

পশুপালক ও কৃষিপ্রধান সমাজ

মনুষ্য-সমাজ ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাই মানুষ তাহাদের সমাজগত অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমেই নিজেদের অর্থনীতিকে কেবল পশুপালন ও কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিল না। মানুষ তাম্র, ব্রোঞ্জ, লৌহ প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিল। ঐ সকল বস্তু দ্বারা হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিল। তাহারা নিত্যনূতন জ্ঞান ও নৈপুণ্য আয়ত্ত করিল। এইভাবে মানুষ পশুপালক ও কৃষিপ্রধান সমাজের গণ্ডি ছাড়াইয়া শিল্পপ্রধান সমাজ সৃষ্টি করিল। এই সমাজে পশুপালন ও কৃষি তো রহিলই,

সেই সঙ্গে রহিল শিল্প (industry)। গ্রামীণ সভ্যতা নাগরিক সভ্যতায় পরিণত হইল। মানব-সমাজ খাদ্য-আহরণকারী সমাজ হইতে পশুপালক ও কৃষিপ্রধান সমাজের মধ্য দিয়া শিল্পপ্রধান (industrial) সমাজে পরিণত হইল। এখন হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে শিল্পপ্রধান নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল—মিশরে, মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে, সিন্ধু অঞ্চলে ও ক্রীটে। মানুষ ঐসময় খাদ্য-সংস্থান করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল না, আপনাকে সভ্যতা-সংস্কৃতির নব নব উন্নততর স্তরে উন্নীত করিতেছিল। তাহার বাসস্থান, পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, বিলাসসামগ্রী—সকল দিকে দিনে দিনে ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হইতেছিল। মানুষ তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহ আবিষ্কার করিয়াছিল। পরে মানুষ বাষ্পীয় শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি—কত কিছুই না আবিষ্কার করিয়াছে, নিত্য নিত্য কত কিছুই না আবিষ্কার করিতেছে! মানুষ যেদিন গো-মহিষ, অশ্ব প্রভৃতিকে বশ করিয়া তাহার উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থায় নিয়োগ করিয়াছিল, সেদিন হইতে আজ যখন সে বাষ্প ও বিদ্যুৎকে নিত্য তাহার উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থায় নিয়োগ করিতেছে এবং পারমাণবিক শক্তিকে নিয়োগের চেষ্টা করিতেছে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মানব-সমাজের অগ্রগতির কী বিস্ময়কর ইতিহাসই না নিহিত রহিয়াছে!

শিল্পপ্রধান সমাজ

স্থানভেদে সমাজের রূপভেদ।—কালভেদে আমরা সমাজের রূপভেদ লক্ষ্য করিয়াছি। মানব-সমাজ এককালে খাদ্য-আহরণকারী সমাজ ছিল, পরবর্তী কালে তাহা উৎপাদনকারী পশুপালক ও কৃষিপ্রধান সমাজে এবং আরও পরবর্তী কালে তাহা শিল্পপ্রধান সমাজে পরিণত হইয়াছিল। তেমনি স্থানভেদেও সমাজের রূপভেদ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, তুষারাবৃত মেরু-প্রদেশের এস্‌কিমোদের সমাজ ও সাহারার মরুবাসীদের সমাজ একরূপ নহে। নদী-তীরবর্তী লোকদের সমাজ ও সমুদ্রের তীরবর্তী লোকদের সমাজও একরূপ হইতে পারে না। স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ স্থানীয় সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে—স্থানীয় পরিবেশ ও ভৌগোলিক প্রভাবে মানুষের বিভিন্ন সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিভিন্নতার উদ্ভব হয়। যে স্থানে যেরূপ খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতির উপকরণ সহজলভ্য, সেই স্থানের অধিবাসীদের খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং বাসগৃহ ও সচরাচর সেইরূপ হইয়া থাকে। যে স্থানের জলবায়ু যেরূপ, সেখানকার লোকদের খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতিও তদনুসারে সেইরূপ হয়। তাই মানুষের সমাজ-জীবনে স্থানীয় পরিবেশ ও ভৌগোলিক সংস্থান বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনে স্থানীয় সমাজের প্রভাব।—স্থানীয় পরিবেশ ও ভৌগোলিক সংস্থান যেমন স্থানীয় সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, তেমনি স্থানীয় সমাজ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অন্য স্থান হইতে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনেক পরিমাণে আনীত হইলেও, স্থানীয় সমাজ হইতেই উহার প্রধান অংশ আমরা সংগ্রহ করিয়া থাকি। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, আমোদ-প্রমোদেও স্থানীয় সমাজ ব্যক্তি-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দেশ বা বহির্বিশ্বের সহিত আমাদের যোগ যতই ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, আমাদের জীবনের মূল স্থানীয় সমাজের গভীরেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা স্থানীয় সমাজে জন্মগ্রহণ করি, স্থানীয় সমাজে লালিত-পালিত হই, স্থানীয় সমাজে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হই,—এককথায়, আমাদের জীবন ও চরিত্র স্থানীয় সমাজই গঠন করিয়া থাকে। তাই মানুষ যখন বিস্তৃততর কর্মজগতে প্রবেশ করে, তখনও সে তাহার স্থানীয় সমাজের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে না। আমরা সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এক জেলার লোকের সহিত অন্য জেলার লোকের ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকেই। কেবল তাহাই নহে, একই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের কথাবার্তায় এবং আচার-ব্যবহারেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মানুষের ব্যক্তি-জীবনের গঠনে স্থানীয় সমাজের প্রভাবই যে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয়, তাহা সহজেই স্বীকার করিতে হয়।

মানব-সমাজের মৌলিক গঠন।—কাল ও স্থান ভেদে আমরা সমাজের রূপভেদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু মানব-সমাজের একটি মৌলিক গঠন আছে, যাহা প্রায় আদিম কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বানর-জাতীয় জীব হইতে উদ্বর্তনের ফলে যখন মানুষের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন মানুষের পরিবার বলিয়া কিছুই ছিল না, সকলেই একত্র দলবদ্ধভাবে বাস করিত। এই অবস্থা সম্ভবতঃ সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়াছিল। পরে পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে পরিবারের (family) সৃষ্টি হইল। সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবারগুলির গঠনও হইল বিভিন্ন রূপ।

পরিবার

গোড়ার দিকে পশুপালন ও শিকারে পুরুষের এবং কৃষিকার্যে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য ছিল। তাই সমাজে যখন পশুপালনের ও শিকারের তুলনায় কৃষিকার্যের প্রাধান্য ছিল, তখন সেই সমাজে স্ত্রীলোকেরাই কর্তৃত্ব করিত, অর্থাৎ পরিবারে মাতাই ছিল প্রধান। এইরূপ সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) সমাজ বলা হয়। যে সমাজ-ব্যবস্থায় শিকার ও পশুপালনের প্রাধান্য ছিল, সেই সমাজে পুরুষই কর্তৃত্ব করিত, অর্থাৎ

পিতাই পরিবারের কর্তা ছিলেন। এইরূপ সমাজকে পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal) সমাজ বলা হয়। পরবর্তী কালে যখন কৃষি ও শিল্পে পুরুষই প্রাধান্যলাভ করিল, তখন কৃষিপ্রধান ও শিল্পপ্রধান সমাজগুলিও পিতৃতান্ত্রিক হইয়া উঠিল। সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবারের গঠনে ও আয়তনে তারতম্য ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রায়ই পরিবারগুলি বৃহৎ হইত। ইহাতে পিতামাতা, কাকা, জ্যেঠা, পিসা, কাকী, জ্যেঠী, পিসী এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা স্থান পাইত। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ যখন কর্ম-সংস্থানের চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমিগুলি যখন ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড হইয়া উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইতেছে, তখন সমাজে বৃহৎ পরিবারগুলিও লুপ্ত হইতেছে, পিতামাতা ও তাঁহাদের সন্তানদের লইয়াই পরিবারগুলি গঠিত হইতেছে।

আদিম সমাজে গোষ্ঠী, গোত্র বা ক্ল্যান (clan) কতিপয় পরিবারে বিভক্ত থাকিত। অন্যভাবে বলা চলে, কতকগুলি পরিবার লইয়া গোষ্ঠী, গোত্র বা ক্ল্যান গঠিত হইত। কতকগুলি ক্ল্যান লইয়া গঠিত হইত উপজাতি (tribe)। পরে এই সকল উপজাতির মিলনে ও মিশ্রণে গঠিত হইয়াছে জাতি (nation)। এইরূপ অসংখ্য জাতি লইয়াই মানব-সমাজ গঠিত হইয়াছে।

গোষ্ঠী, উপজাতি ও জাতি

আধুনিক সভ্য সমাজগুলিতে পরিবার (family) ও জাতির (nation) মধ্যবর্তী বিভাগগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। সমাজের গঠনটা রক্তগত না হইয়া হইয়াছে স্থানগত। তাই সমাজের গঠনটা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ :—(1) সমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম একক (unit) হইল পরিবার। পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি লইয়া ইহা সাধারণতঃ গঠিত। (2) কতকগুলি পরিবার লইয়া গঠিত হয় পল্লী বা পাড়া। (3) কতকগুলি পল্লী লইয়া গঠিত হয় গ্রাম বা শহর। (4) বহু গ্রাম ও কতিপয় শহর লইয়া গঠিত হয় এক-একটি অঞ্চল বা জেলা। (5) কতিপয় অঞ্চল বা জেলা লইয়া গঠিত হয় প্রদেশ। (6) কতিপয় প্রদেশ লইয়া গঠিত হয় দেশ বা রাষ্ট্র। কেবল পরিবারগুলির মধ্যে নহে, গ্রামাঞ্চলে কোন কোন পল্লীর মধ্যেও রক্তগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তবে গ্রাম, শহর, অঞ্চল, জেলা, প্রদেশ বা দেশ বহু ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও জাতির লোক লইয়া গঠিত। কিন্তু ইহাতে সমাজের সমগ্রতা বা অখণ্ডতা বিনষ্ট হয় নাই।

আধুনিক সমাজে স্থানগত বিভাগ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মানুষের জীবনে স্থানীয় সমাজের (local community) প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে বিদ্যমান। মানুষ শৈশবে তাহার পিতামাতার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকে ; কিন্তু একটু বড় হইলে তাহার জীবনের গণ্ডিও বর্ধিত

হয়। তখন পরিবার ও পল্লীই তাহার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে। তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পল্লী ছাড়িয়া গ্রাম, শহর ও অঞ্চলের সহিতও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। অধিকাংশ মানুষের সমগ্র জীবনই তাহার অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই, মানুষের জীবনে স্থানীয় সমাজের (local community) প্রাধান্য ও প্রভাব যে সর্বাধিক, তাহা সহজেই স্বীকার করিতে হয়।

স্থানীয় সমাজ এবং আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান।—মানুষ আদিম কাল হইতে সমাজবদ্ধভাবে যে বসবাস করিতেছে, তাহার প্রধান কারণ স্থানীয় সমাজই তাহার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান যোগাইয়া থাকে। মানুষ স্থায়িভাবে কোন-না-কোন অঞ্চলে বাস করে। সে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করিলেও, তাহাকে তাহার জীবিকার জন্য, সাময়িকভাবে হইলেও, কোন বিশেষ অঞ্চলের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্থানীয় লোকসমাজ হইতেই সংগ্রহ করে। ধরা যাউক, আমাদের প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য যে খাদ্য, স্থানীয় কৃষক, মৎস্যজীবী, কলু, কশাই, গোয়ালা প্রভৃতিই তাহা সরবরাহ করিয়া থাকে। আমাদের বাসস্থান স্থানীয় ঘরামী ও রাজমিস্ত্রীরাই নির্মাণ করিয়া থাকে। গৃহ-নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা স্থানীয় লোকসমাজ হইতেই সংগ্রহ করি। গৃহের জানালা, কপাট, আসবাবপত্র আমরা স্থানীয় ছুতার ও মিস্ত্রীদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করি। আমাদের ব্যবহার্য নানারূপ পাত্র কুমোর ও কাঁসারীরা আমাদের যোগায়। আমাদের বস্ত্র যোগায় তাঁতী। বাহির হইতে আনীত বস্ত্র আমরা স্থানীয় দোকান হইতেই সংগ্রহ করি। আমাদের জামা স্থানীয় দরজিরাই আমাদের সরবরাহ করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের বাসস্থান, খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির জন্য যে আমরা স্থানীয় লোকসমাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, তাহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষাও আমরা প্রধানতঃ স্থানীয় বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, সভাসমিতি হইতে পাইয়া থাকি।

আধুনিক স্থানীয় লোকসমাজের অসম্পূর্ণতা।—পূর্বে যে সমাজ-ব্যবস্থা চালু ছিল, তাহাতে স্থানীয় লোকসমাজগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। খাদ্য, বস্ত্র বা বাসগৃহের উপকরণ, সমস্ত আমরা স্থানীয় লোকসমাজ হইতে সংগ্রহ করিতাম। কিন্তু আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে, বাহিরের সহিত আমাদের বন্ধন ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে আমরা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য কেবল স্থানীয় লোকসমাজের উপর নির্ভর করি না। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের একটি মোটা অংশ আমরা বাহির হইতেই আমদানি করি, আবার আমাদের স্থানীয় লোকসমাজে

ভারতীয় ইউনিয়ন অঞ্চলের রাজধানী। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সর্বদক্ষিণে যে বড়

ক্ষুদ্র আন্দামান

দ্বীপটি রহিয়াছে, তাহাকে **ক্ষুদ্র আন্দামান** বলা হয়। ক্ষুদ্র আন্দামান দৈর্ঘ্যে প্রায় 26 মাইল এবং প্রস্থে প্রায় 16 মাইল। বৃহৎ আন্দামান ও
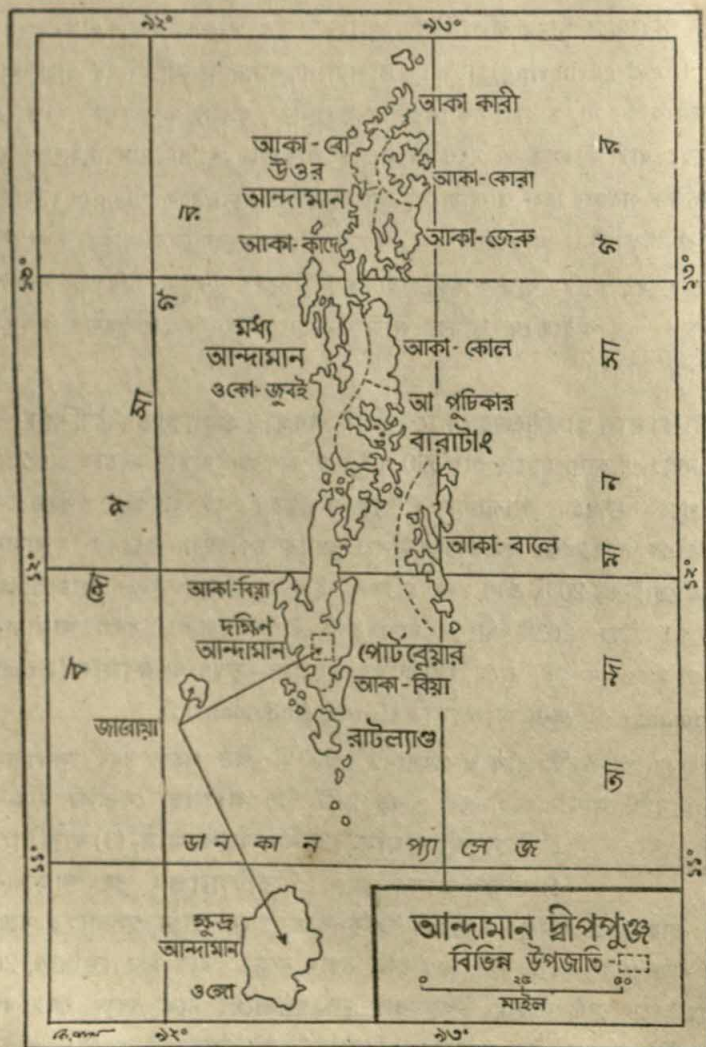
ক্ষুদ্র আন্দামানের মধ্যে প্রায় 30 মাইল প্রশস্ত একটি প্রণালী আছে। ইহার নাম **ডানকান প্যাসেজ।**

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী রহিয়াছে। এই অনুচ্চ পর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা মাত্র 2,402 ফুট। এই পর্বতশ্রেণীর গা বাহিয়া বহু জলধারা দুই দিকে নামিয়া গিয়াছে। এগুলিতে সারা বৎসর জলধারা প্রবাহিত হয়, এমন কি জোয়ার-ভাটাও খেলে। এইগুলির দৈর্ঘ্যও নিতান্ত অল্প নহে। আন্দামানবাসীরা প্রধানতঃ এই সকল পাহাড়ী জলধারা হইতেই তাহাদের পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। তবে নদ-নদী বলিতে যাহা বুঝায়, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তাহা নাই। এই সকল পাহাড়ী জলধারা ছাড়াও অজস্র খাল ও খাড়ি দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। এগুলি মাছ, কাঁকড়া, শামুক ও ঝিনুকে পরিপূর্ণ।

পর্বতশ্রেণী

জলধারা

পর্বতশ্রেণীর অধিকাংশই ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা। আন্দামানের সমতলভূমিতেও বন-জঙ্গলের অভাব নাই, উহার অধিকাংশ স্থানই চিরসবুজ ঘন বনে ঢাকা। বনে যেমন ঝোপঝাড় আছে, তেমনিই আছে সুউচ্চ বৃক্ষের শ্রেণী। বনে প্রচুর বন্য শূকর ও বন্য বিড়াল পাওয়া যায়। বনে মৌচাকও রহিয়াছে অসংখ্য। এইসব বনে নানারকম ফলকর বৃক্ষও আছে। আন্দামান দ্বীপে অসংখ্য প্রকার পাখী ও সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী দেখা যায়। সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর মধ্যে একপ্রকার গোসাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অরণ্য

বিভিন্ন প্রাণী

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ইহার চতুর্দিক সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এখানে কখনও দুঃসহ গ্রীষ্ম বা দুঃসহ শীত দেখা যায় না। ফলে, এখানকার আবহাওয়া সারা বৎসর প্রায় একই রূপ থাকে। মে-জুন হইতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বহিবার ফলে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলেও বৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলেই সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। এখানে বারিপাতের সর্বাধিক পরিমাণ প্রায় 123 ইঞ্চি। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইবার সময়ে অনেক সময় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে যখন কালবৈশাখী দেখা দেয়, সে সময়েও এখানে প্রচুর ঝড় হইয়া থাকে। অনেক সময় ঘূর্ণিবাত্যারও সৃষ্টি হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে সমুদ্র থাকায় ঘূর্ণিবাত্যায় অনেক সময় বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই আন্দামানবাসী ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যাকে অত্যন্ত আতঙ্কের চোখে দেখে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে এখানকার আবহাওয়া কিছুটা শুষ্ক থাকে।

জলবায়ু ও আবহাওয়া

আন্দামানের অধিবাসী।—পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, পুরাপ্রস্তর যুগে সর্বপ্রথম যে মানুষগোষ্ঠী ভারতে বসবাস করিত, তাহাদের ও তাহাদের বংশধরদের

নিদর্শন এই আন্দামানের আদিবাসীদের মধ্যেই মিলে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা ইহাদিগকে জাতিতত্ত্বের দিক হইতে নিগ্রিটো (Negrito) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের 'আয়েটা' (Aeta) এবং মালয়ের 'সামান' (Samans) জাতির সহিত ইহাদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের কাদির, কুরুম্বা, পনিয়ন, আঙ্গামী নাগা প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যেও ইহাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখন হইতে লক্ষাধিক বৎসর পূর্বে এই নিগ্রিটো শ্রেণীর লোকরা ভারতে বাস করিত। আন্দামানের বর্তমান আদিবাসীদের পূর্বপুরুষরা তৎকালে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত বা পরবর্তী কোন সময়ে ভারতের মূল ভূখণ্ড হইতে আন্দামানে গিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। যাহাই হউক, পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় "খাদ্য-আহরণকারী অর্থনীতি"ই (food-gathering economy) বর্তমান ছিল। আন্দামানের বর্তমান আদিবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রায় তাহাই বর্তমান রহিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, পুরাপ্রস্তর যুগ হইতেই আন্দামানবাসীদের পূর্বপুরুষরা এই দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করিতেছে। 1863 খ্রীষ্টাব্দের 13ই নভেম্বর বেথুন সোসাইটির পক্ষ হইতে এক সভায় কলিকাতার বিশপ হেনরি কটন আটজন আন্দামানীকে উপস্থিত করেন। সভায় করভিন নামে জনৈক ইউরোপীয় ইহাদের সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এইভাবে খাদ্য-আহরণকারী আদিম মানব-সমাজের একটি দৃষ্টান্তরূপে আন্দামানীরা সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষের নমুনা

এই লক্ষাধিক বৎসর ধরিয়া আন্দামানী আদিবাসীদের মধ্যে তাহাদের প্রাচীন ব্যবস্থা কেমন করিয়া টিকিয়া রহিল, এই প্রশ্নের প্রধান উত্তর হইল বহির্জগৎ হইতে ইহাদের পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই ছিল। সভ্য জাতির লোকেরা সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতেছে, তাহারা কত অজ্ঞাত দেশ ও দ্বীপ অধিকার করিয়াছে, স্থানীয় লোক-সমাজকে উৎখাত করিয়া নবাবিষ্কৃত স্থানে নিজেদের অধিকার ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তেমন কিছুই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ঘটে নাই। কেবল সাম্প্রতিক কালেই ইউরোপীয়দের দৃষ্টি এই দ্বীপপুঞ্জের উপর পতিত হইয়াছে। 1771 খ্রীষ্টাব্দে জন্ রিচি নামে জনৈক ইংরেজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যান। তিনি তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জাহাজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী হইলে কয়েকজন আন্দামানী শালতিতে করিয়া তাঁহার জাহাজে আসে। তিনি তাহাদিগকে লোহার কাঁটা, পেরেক ইত্যাদি উপহার দিলে তাহারা খুশী হইয়া ফিরিয়া যায়। রিচি

বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্নতা

বলিয়াছেন যে, আন্দামানীরা লোহার ব্যবহার জানিত। কিন্তু আন্দামানীরা সামাজিক বিকাশের ধারার যে স্তরে ছিল, তাহাতে তাহাদের পক্ষে লৌহের আবিষ্কার সম্ভব ছিল না। তাহারা সম্ভবতঃ জলমগ্ন জাহাজের ভাসিয়া-আসা টুক্‌রা হইতে লোহা প্রথম দেখিয়াছিল ও সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে তাহারা ঐ লোহার ব্যবহারও শিখিয়াছিল। যাহাই হউক, জন্ রিচির আন্দামান গমনের কয়েক বৎসর বাদে 1788 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিবরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কোলব্রুক ও ব্লেয়ার নামে দুইজন ইংরেজকে পাঠান। পর বৎসর আন্দামানে ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু আন্দামানবাসীরা সহজে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে না।

ইংরেজগণের অধিকার বিস্তার

বাহিরের সভ্যতার সংঘাত ও সংস্পর্শে আসায় নানাভাবে আন্দামানী উপজাতিগুলির লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। অনেক উপজাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। 1885 খ্রীষ্টাব্দে আন্দামানের আদিবাসী সংখ্যা দাঁড়ায় 4,809। দ্রুত উহাদের জনসংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। এখন প্রায় উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে।

আদিবাসীদের প্রায় বিলুপ্তি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আন্দামানে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইতে অপরাধীদের নির্বাসিত করিবার ব্যবস্থা হয়। নির্বাসিত ব্যক্তিদের অনেকেই এখানে বসবাস করিতে শুরু করে। ফলে আন্দামান বাঙ্গালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, মালয়ালী, মাদ্রাজী, বিহারী, বর্মী প্রভৃতি ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় লোকের উপনিবেশ হইয়া উঠে। সম্প্রতি এখানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বহু উদ্বাস্তুকেও পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হইয়াছে ও হইতেছে। এখন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয় রাষ্ট্রের ইউনিয়ন-শাসিত অঞ্চল (Union Territories)। এই দুই দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা এখন 63,548। এখানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের জন্য এখনও প্রেরিত হওয়ায় এখানকার লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আন্দামানের আধুনিক অধিবাসী

কিন্তু আন্দামানের এই সকল আধুনিক অধিবাসীরা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আন্দামানের বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসী ও তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থাই আমাদের আলোচ্য। ইহারা এক সুপ্রাচীন জাতির (race) বংশধর। ইহারা অতিশয় খর্বাকৃতি। ইহাদের পুরুষদের সর্বাধিক উচ্চতা 4 ফুট 10 ইঞ্চি। মেয়েদের উচ্চতা গড়ে প্রায় 4 ফুট। ইহাদের গায়ের রঙ মিশ্‌মিশে কালো। ইহাদের ঠোঁট পুরু, নাক চেপ্‌টা, চুল অত্যন্ত কালো ও কোঁকড়ানো। ইহাদের দেহ বেশ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। পুরাপ্রস্তর

আন্দামানী আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য

যুগের খাদ্য-আহরণকারী সমাজের বহু বৈশিষ্ট্যই ইহাদের মধ্যে বর্তমান। তবে ইহাদের সমাজে বাসগৃহ-নির্মাণ, পাত্রাদির ব্যবহার, তীর-ধনুকের ব্যবহার প্রভৃতি নবপ্রস্তর যুগের বহু প্রভাবও প্রবেশ করিয়াছে। আধুনিক অধিবাসীদের সহিত কি দৈহিক গঠনে, কি সমাজ-ব্যবস্থায়, ইহাদের কোনও মিল নাই।

আন্দামানী আদিবাসীদের সমাজের গঠন।—আন্দামানী আদিবাসীরা বহু ক্ষুদ্র উপজাতীতে বিভক্ত। উপজাতিগুলির প্রত্যেকের ভাষার মধ্যেও বেশ পার্থক্য রহিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে প্রচলিত কোন ভাষার সহিত আন্দামানী ভাষার সাদৃশ্য নাই। ভারতে প্রচলিত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য ভাষা-সমূহের সহিত আন্দামানী ভাষার কোন সাদৃশ্য না থাকায়, আন্দামানী আদিবাসীরা যে ভারতের আদি অস্ত্রালরূপ (Proto-Australoid), দ্রাবিড় ও আর্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহাও সহজেই প্রমাণিত হইয়াছে। আন্দামানী আদিবাসীদের উপজাতিসমূকে প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—**বৃহৎ আন্দামানী** ও **ক্ষুদ্র আন্দামানী**। বৃহৎ আন্দামানী দল বলিলে জারোয়া ব্যতীত বৃহৎ আন্দামানের অন্যান্য উপজাতি-গুলিকে বুঝায়। বৃহৎ আন্দমানী দলে রহিয়াছে দশটি উপজাতি—(1) **আকা-কারী**, (2) **আকা-কোরা**, (3) **আকা-বো**, (4) **আকা-জেরু**, (5) **আকা-কেদে**, (6) **আকা-কোলা**, (7) **ওকো-জুবোই**, (8) **আ পুচিকার**, (9) **আকা-বালে** ও (10) **আকা-বিয়া**। এই উপজাতিগুলি বৃহৎ আন্দামানের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র আন্দামানের অধিবাসীরা **ওঙ্গো** বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। **জারোয়া** উপজাতির লোকরা বৃহৎ আন্দামানের অধিবাসী হইলেও, বৃহৎ আন্দামানী ও ক্ষুদ্র আন্দামানী উপজাতিসমূহ হইতে নিজদিগকে পৃথক মনে করে। ইহারা অতিশয় নির্দয় ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির।

ভাষা

বিভিন্ন উপজাতি

প্রত্যেক উপজাতি কতিপয় স্থানীয় দলে (local group) বিভক্ত। আন্দামানী-দের দৈনন্দিন জীবনে এই স্থানীয় দলগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক স্থানীয় দল একত্র বাস করে। প্রত্যেক স্থানীয় দলে 40।50 জন স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা থাকে। আন্দামানীরা দলবদ্ধভাবেই সমস্ত কাজকর্ম করে। প্রত্যেক স্থানীয় দলের জন্য এক-একটি ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট থাকে। ঐ নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডেই স্থানীয় দলের লোকেরা দলবদ্ধভাবে খাদ্য-সংগ্রহ ও বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করে। ঐ নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড, সংগৃহীত সকল খাদ্য এবং বাসগৃহ দলেরই সম্পত্তি। ঐ সকল জিনিস দলের লোকরা সকলেই সমানভাবে ভোগ

স্থানীয় দল

করে। একটি স্থানীয় দলের সহিত অপর একটি স্থানীয় দলের সদ্ভাব বা শত্রুতা থাকে। একটি স্থানীয় দলের লোকে ইচ্ছা করিলে অপর একটি স্থানীয় দলে গিয়া আশ্রয় লইতে বা যোগ দিতে পারে। দুইটি স্থানীয় দলের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর বিবাহ হইলে, স্ত্রীর গোষ্ঠীতে স্বামী বা স্বামীর গোষ্ঠীতে স্ত্রী আসিয়া যোগ দেয়।

আন্দামানী সমাজের কাঠামো
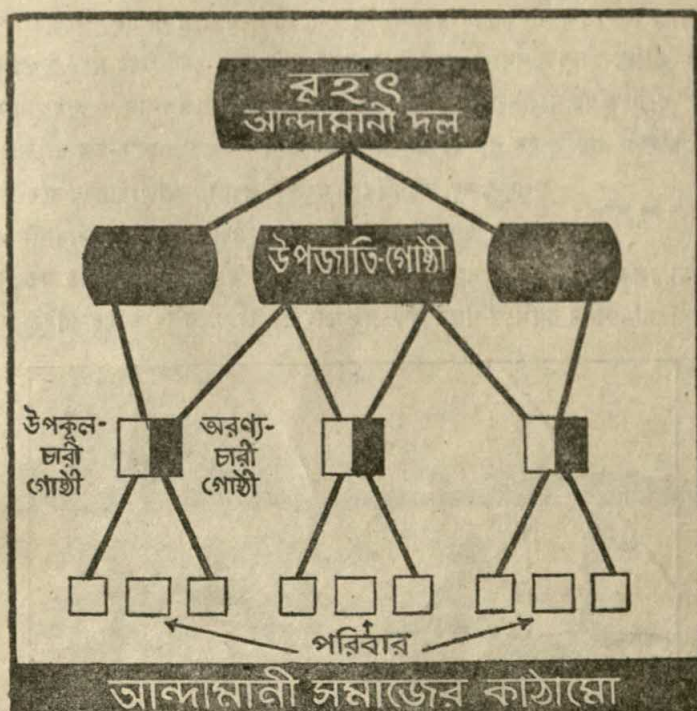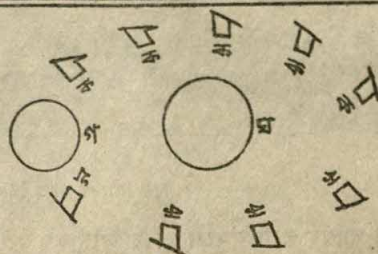
আন্দামানীদের বসতি-বিন্যাস

প্রত্যেক দল কতিপয় পরিবারে বিভক্ত থাকে। স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তান-দের লইয়া গঠিত হয় পরিবার। পরিবারগুলি সর্বতোভাবে দলের অধীন এবং

আমাদের সমাজের মতো পরিবারের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই। স্থানীয় দলই সর্বেসর্বা। কারণ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, তাহাতে নির্মিত বাসগৃহ এবং সংগৃহীত খাদ্যের মালিক হইল স্থানীয় দল। তাই আন্দামানী আদিবাসীদের মধ্যে স্থানীয় দলের গুরুত্ব এতই অধিক।

পরিবার

খাদ্য।—আন্দামানী স্থানীয় দলগুলি সমবেতভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাহারা সমাজ-ব্যবস্থার যে স্তরে রহিয়াছে, সেই স্তরে খাদ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই—অর্থাৎ আন্দামানী অদিবাসীরা পশুপালন ও কৃষিকার্য জানে না। তাহারা প্রকৃতি-দত্ত খাদ্যের উপরই নির্ভর করে। এই প্রকৃতি-দত্ত খাদ্যের মধ্যে ফলমূল, মধু, জীবজন্তু ও মৎস্যই প্রধান। আন্দামানের বনে-জঙ্গলে ফলমূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আন্দামানী আদি-বাসীরা দলবদ্ধভাবে ফলমূল সংগ্রহ করে। পুরুষরা গাছে উঠিয়া মধু সংগ্রহ করে। মধু তাহারা অধিকদিন রাখিতে পারে না, তাই তাহারা উহার বেশীর ভাগই খাইয়া ফেলে।

ফলমূল ও মধু আহরণ
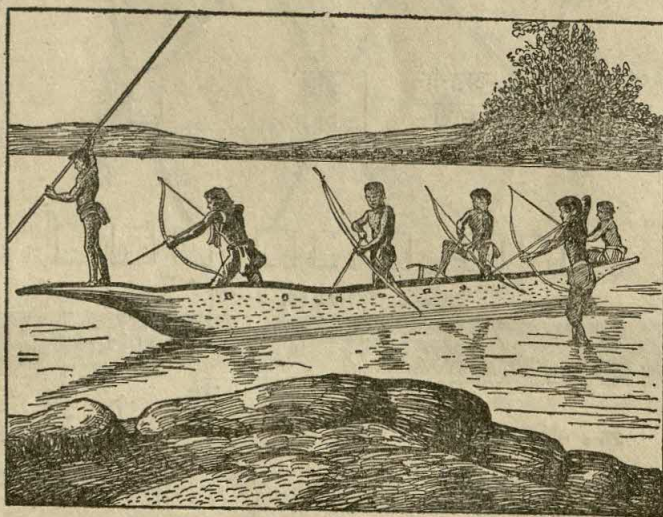
আন্দামানীদের মৎস্য শিকার

আন্দামানী পুরুষরা বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া নানারূপ বন্য জন্তু শিকার করে। তীর-ধনুকই ইহাদের শিকারের প্রধান অস্ত্র। তবে ইহারা বর্শা, কোচ প্রভৃতি জাতীয় অস্ত্রও ব্যবহার করে। শিকারের সময়ে স্থানীয় দলগুলির পুরুষরা কতিপয় দলে বিভক্ত হইয়া শিকারে যায়। এক-একটি শিকারী দলে দুই হইতে পাঁচজন লোক থাকে। অনেক সময় কুকুরও ইহাদের সঙ্গে থাকে।

বন্য জীবজন্তু শিকার

কুকুর গন্ধ শুঁকিয়া শিকারের সন্ধান করে এবং শিকারীদের পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। অনেক সময় জ্বলন্ত মশালও শিকারীদের সঙ্গে থাকে। বন্য শূকর ও বন্য বিড়াল ইহাদের প্রিয় শিকার। ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতিও ইহারা খায়। কিন্তু আন্দামানের বনে অসংখ্য পাখী থাকা সত্ত্বেও ইহারা পাখী শিকার করে না বা খায় না। সম্ভবতঃ বৃক্ষগুলি সুউচ্চ হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে তীর নষ্ট হইবার আশঙ্কায় আন্দামানীরা পক্ষি-শিকার হইতে বিরত থাকে। সমুদ্রের উপকূলবর্তী দলগুলির প্রধান জীবিকা মৎস্য শিকার। সমুদ্র, খাল ও খাড়িতে প্রচুর মৎস্য থাকে। তাই সারা বৎসর ইহারা মাছ ধরে। আন্দামানীরা ছোট ভেলা বা শালতিতে চড়িয়া বর্শা, কোচ ও তীর-ধনুকের সাহায্যে মাছ শিকার করে। কচ্ছপ, কচ্ছপের ডিম, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতিও ইহারা খাদ্যরূপে সংগ্রহ করে।

মৎস্য শিকার

দল বাঁধিয়া ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে এবং দলের সকলেই সমান ও সমবেতভাবে ঐ খাদ্য আহার করে।

পরিচ্ছদ।—আন্দামানীরা প্রায় নগ্নাবস্থাতেই থাকে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই লতাপাতা জড়াইয়া কোনরকমে লজ্জানিবারণ করে। পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও প্রকার আবরণ থাকে না। তবে আজকাল আন্দামানীদের মধ্যে কিছু কিছু কাপড়ের প্রচলন হইয়াছে। মেয়েরা সাজসজ্জা ভালবাসে। তাহারা ঝিনুকের মালা পরে, গায়ে রঙ মাখে, অনেকে উল্‌কিও পরে।

বাসস্থান।—আন্দামানীদের অনেকে বনে এবং অনেকে সমুদ্রের ধারে বাস করে। যাহারা বনে বাস করে, তাহারা স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করে। সকল সময়ে পানীয় জল
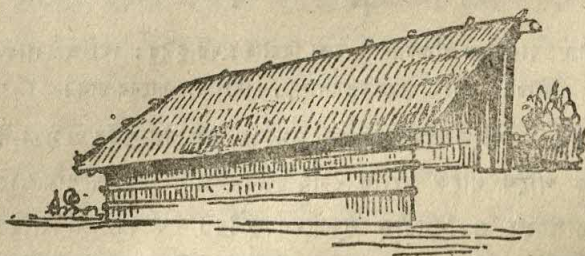
আন্দামানীদের বাসগৃহের একাংশ

পাওয়া যায় এমন স্থানেই গৃহগুলি নির্মাণ করা হয়। গৃহগুলি দলগুলির সমবেত চেষ্টাতেই নির্মিত হয়। দলের অন্তর্গত পরিবারগুলির জন্য বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার

একটি আঙিনার চারিদিকে সারি করিয়া পৃথক পৃথক কুটীর নির্মিত হইয়া থাকে। সকল কুটীরের মুখই আঙিনার দিকে থাকে। কুটীরগুলি সাধারণতঃ বাঁশ, গাছের গুঁড়ি, শাখা-প্রশাখা ও লতাপাতা দিয়া তৈয়ারী একচালা বা দোচালা। পুরুষরা খুঁটি পুঁতিয়া কুটীরগুলির কাঠামো তৈয়ার করে। মেয়েরা লতাপাতা দিয়া চাঁচ বা মাদুরের মতো একপ্রকার ছাউনি তৈয়ার করে। ঐ সকল ছাউনি দিয়াই ঘরগুলি ছাওয়া হয়। ঘরগুলিতে দেওয়াল বা জানালা-কপাট কিছুই থাকে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া কুটীরগুলির মধ্যে অন্য কিছুই থাকে না। ঘরের মধ্যে শুইবার জন্য বেতের মাচা থাকে। মাচার পাশে তীর-ধনুক, বর্শা, কোচ ইত্যাদি হাতিয়ার, ঝুড়ি এবং মৃত পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনের খুলি, চোয়াল ইত্যাদি থাকে। মৃত পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনের অস্থিকে তাহারা অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। কুটীর-শ্রেণীর মধ্যস্থলে যে বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার আঙিনা থাকে, তাহাই

স্থানীয় বাসগৃহ
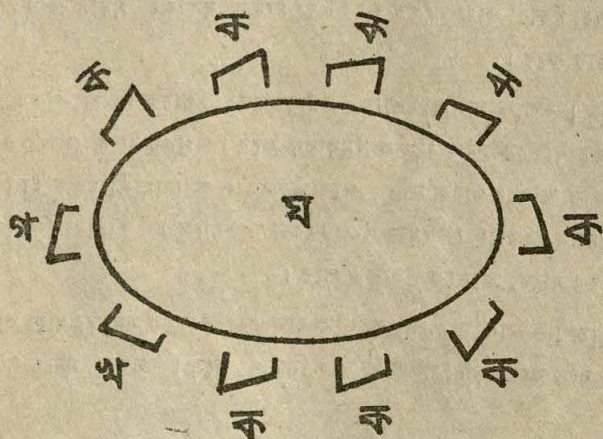
আন্দামানীদের বাসগৃহের পরিকল্পনা : (ক) বিবাহিতদের কুটীর ; (খ) অবিবাহিতদের কুটীর ; (গ) সাধারণ রন্ধনশালা ; (ঘ) নাচ-গানের স্থান।

দলের মিলনক্ষেত্র—এখানে দলের সকলে সমবেত হয়, গল্প-গুজব ও নৃত্য-গীত করে। আঙিনার এক পাশে থাকে দলের যৌথ রন্ধনশালা। রন্ধনশালার পাশেই থাকে অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক ও বিপত্নীক পুরুষদের কুটীর। কারণ, অবিবাহিত যুবক ও বিপত্নীক পুরুষরাই দলের রান্নাবান্না করে। দলের প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী ও বিধবাদের জন্যও পৃথক একটি কুটীর থাকে। অন্যান্য কুটীরে দলের বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষরা তাহাদের শিশু এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের লইয়া বাস করে। এই সকল স্থায়ী বাসগৃহ দশ-বারো বৎসর থাকে।

সমুদ্রের ধারে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ সমুদ্রে ও খাড়িতে মাছ ধরিবার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে হয়—তাহারা এক স্থানে দুই-এক মাসের বেশী বাস করিতে পারে না। তাই তাহারা স্থায়ী বাসগৃহও নির্মাণ করে না। যখন যেখানে তাহারা মাছ ধরে, তখন সেইখানেই তাহারা অস্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করে। এই অস্থায়ী বাসগৃহ বেশ লম্বা হয় এবং ঘরের ভিতর মাঝে মাঝে বেড়া বা প্রাচীর দিয়া পৃথক পৃথক পরিবারের বাসোপযোগী পৃথক পৃথক কক্ষ করা হয়। বাসগৃহটি বিভিন্ন অংশে প্রাচীর বা বেড়া দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় সম্মুখে একটি দীর্ঘ দাওয়া ও উঠান থাকে। ঐরূপ থাকায় দলের সমবেত আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ, গল্প-গুজব, নৃত্য-গীত প্রভৃতি দ্বারা যৌথ জীবনযাত্রার খুবই সুবিধা হয়। এই সকল অস্থায়ী গৃহের পাশে আন্দামানীরা আবর্জনা, জঞ্জাল ইত্যাদি ফেলে। সেগুলি পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে অস্থায়ী বাসগৃহ ত্যাগের প্রয়োজন হয়। তখন তাহারা অন্যত্র চলিয়া যায় এবং সেখানে নূতন অস্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করে। সমুদ্রের তীরবাসী দলগুলির ভেলা ও শালতি থাকে। তাই অস্থায়ী গৃহের জিনিসপত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

অস্থায়ী বাসগৃহ

হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র।—কাজকর্ম, শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য আন্দামানবাসীরা নানারূপ হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। তীর-ধনুক, বর্শা ও কোচই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। তাহারা তীর-ধনুকের সাহায্যে পশুশিকার ও মৎস্যশিকার করিয়া থাকে। তাহারা সাধারণতঃ পাথর ঘষিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া তাহাকেই তীর ও বর্শার ফলারূপে ব্যবহার করে। কাঠ বা হাড়কে সূক্ষ্মাগ্র করিয়াও সেগুলিকে তাহারা বর্শা বা কোচের মতো ব্যবহার করে। ধারালো পাথর দিয়া তাহারা দাড়ি কামায়। পাথর দিয়া তাহারা অন্যান্য নানারূপ হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈয়ার করে। ইদানীং তাহারা লোহার ব্যবহার শিখিলেও, লোহা তাহাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ নহে; তাই আন্দামানী আদিবাসীদের জীবনে এই বিংশ শতাব্দীতেও প্রস্তর যুগ চলিতেছে।

পাত্রাদি।—পাত্রাদির নির্মাণ ও ব্যবহারের দিক হইতেও আন্দামানীরা এখনও পুরাপ্রস্তর যুগেই রহিয়াছে। সমুদ্রের বৃহৎ ঝিনুক ও শামুকের খোলা, হাড়, কাঠ ও পাতা দিয়া তাহারা তাহাদের ব্যবহার্য পাত্রাদি নির্মাণ করে। তাহারা রাঁধিবার জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করে। কিন্তু যে নরম মাটিতে এই রন্ধনপাত্র তৈয়ার হয়, তাহা সর্বত্র পাওয়া যায় না। তাই আন্দামানীদের নিকট এইসব রন্ধনপাত্রের চাহিদা ও কদর খুবই বেশী। ইহারা মৃৎপাত্রকে পোড়াইয়া শক্ত করিবার পদ্ধতি কিছু পরিমাণে জানিলেও চাকের ব্যবহার জানে না। চাকের ব্যবহার না জানায় ইহারা সুগঠিত

মৃৎপাত্র তৈয়ার করিতে পারে না। বেতের ঝুড়ি এবং বাঁশ দিয়া তৈয়ারী পাত্রও ইহারা ব্যবহার করে।

ধর্ম।—আন্দামানীদের নিকট জন্ম-মৃত্যু ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় হওয়ায়, তাহারা আদিমকাল হইতে এসকল বিষয়ে নিজেদের সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়াছে এবং এক আদিম ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। কেন ঝড়ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণিবাত্যা হয়, কেন জোয়ার-ভাটা হয়, কেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বায়ু-প্রবাহ আসে ও বৃষ্টি নামে, কেন উত্তর-পূর্ব দিক হইতে বায়ু-প্রবাহ আসে ও ঝড়ঝঞ্ঝা হয়, কেন মানুষ ও জীবজন্তু জন্মে ও মরে, মরিয়া তাহারা কোথায় যায়, কেমন করিয়া ফলমূল জন্মে, আকাশের চন্দ্রসূর্য ও গ্রহনক্ষত্ররা কি—এইসব ভাবিয়া তাহারা কূলকিনারা পায় না। ফলে তাহারা নানা দেবদেবীর ও ভূতপ্রেতের কল্পনা করিয়াছে এবং সৃষ্টি করিয়াছে আপন সমাজের উপযোগী একটি ধর্মের। রহস্যময়তা ও আতঙ্ক হইতেই এই ধর্মের উদ্ভব। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বৃষ্টি হয়। তাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর এই প্রাকৃতিক শক্তিকে আন্দামানীরা দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছে। এই দেবতার নাম **টেরিয়া** বা **ডেরিয়া**। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে ঝড় হয়, ঘূর্ণিবাত্যা আসে। তাই উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর এই প্রাকৃতিক শক্তিকে তাহারা ভয়ঙ্করী দেবীরূপে কল্পনা করিয়াছে। এই দেবীর নাম **বিলিকা** বা **পূলুগা**। এই দুই দেবদেবী প্রসন্ন থাকিলে তাহাদের মঙ্গল এবং ইঁহারা অপ্রসন্ন হইলে তাহাদের সর্বনাশ—এই বিশ্বাস হইতে তাহারা নানাভাবে এই দুই দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টাই করে—তাহারা মৌচাকের মোম পোড়ায়, ঝিঁঝিঁ পোকা মারে, চেঁচামেচি হৈহল্লা করে, নানারূপ নিষিদ্ধ খাদ্য খায় এবং নানা লতাগুল্ম ব্যবহার করে। আকাশে চন্দ্রসূর্য দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হয়। তাহারা মনে করে সূর্য হইল চন্দ্রের স্ত্রী এবং নক্ষত্ররা চন্দ্রসূর্যের পুত্রকন্যা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আদিম সমাজে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোককেই অধিকতর দুর্জ্ঞেয় শক্তির অধিকারিণী মনে করা হইত। কারণ জন্মের সহিত স্ত্রীলোকরাই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। জন্মদানের বিষয়ে পুরুষের ভূমিকাকে গৌণ মনে করা হইত। তাই অধিকতর শক্তিশালী ও তেজোময় সূর্যকেই স্ত্রীরূপে তাহারা কল্পনা করিয়াছে। আন্দামানীদের নিকট মৃত্যুও রহস্যময় ছিল। মৃত্যুর পর মানুষ প্রেতরূপে তাহার গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। তাই তাহারা গৃহে আগুন জ্বালাইয়া রাখে, কেহ মারা গেলে তাহারা অনেক সময় তাহাদের অস্থায়ী গৃহগুলি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়াও যায়।

রহস্যময়তা ও আতঙ্ক

বৃষ্টি ও ঝড়ের দেবতা

চন্দ্রসূর্য ও নক্ষত্র

ভূতপ্রেত

আন্দামানীদের দৈনন্দিন জীবন।—আন্দামানীদের জীবনের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাও দলবদ্ধভাবেই হইয়া থাকে। সকাল হইলেই তাহাদের কাজকর্ম শুরু হয়। পূর্বদিনের খাদ্যদ্রব্য যাহা কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে, তাহা দিয়া রান্নার ব্যবস্থা হয়। খাদ্য প্রস্তুত হইলে তাহা খাইয়া পুরুষরা শিকারে বাহির হয়। পুরুষরা অনেক সময় মধু সংগ্রহ করে। শিকারের সময় বনে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ফলমূল, শাক-সব্‌জি প্রভৃতি সংগ্রহ করে। শিকারলব্ধ জীবজন্তুর মাংস, মৎস্য ও ফলমূল তাহারা ভাগাভাগি করিয়া খায়। মাংস ও মৎস্য তাহারা আগুনে ঝলসাইয়া লয়। খাদ্যের একাংশ তাহারা গৃহে লইয়া আসে। ঐ খাদ্য যৌথ রান্নাঘরে পাক করিয়া সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। খাদ্যের উপকরণ যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকে, তাহা পরদিনের প্রাতঃকালীন আহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

খাদ্য-সংগ্রহ

স্ত্রীলোকরা শিকারে যায় না। তাহারা ফলমূল, লতাপাতা, বীজ প্রভৃতি খাদ্য সংগ্রহ করিলেও তাহাদের আরও কতকগুলি কর্তব্য রহিয়াছে। তাহারা গৃহকর্ম সারে, শিশুদের দেখাশোনা করে, জল আনে, জ্বালানি সংগ্রহ করে। অবসরসময়ে ঝুড়ি, চুপড়ি প্রভৃতি বোনে। দুপুরে যুবক-যুবতীরা কেহই গৃহে থাকে না। সকলেই খাদ্য-সংগ্রহে বা অন্যান্য কাজে বাহির হইয়া যায়। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাই কেবল শিশুদের লইয়া গৃহে থাকে।

স্ত্রীলোকদের কাজ

সন্ধ্যায় সকলে গৃহে ফিরিয়া আসে। রন্ধনাদি শেষ হইলে তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন প্রধান আহার শেষ করে। আহারাদির শেষ হইলে তাহারা সকলে গৃহের আঙিনায় জড় হয়,—গল্প বলে, নৃত্য-গীতও হয়। শিকারের অভিজ্ঞতাই তাহাদের গল্পের প্রধান উপজীব্য। একজন শিকারী তাহার শিকারের অভিজ্ঞতা, কৌশল, বুদ্ধি, সাহস প্রভৃতির কথা বর্ণনা করে। বর্ণনাটি সে নানা রঙে-রসে-ভঙ্গিতে পূর্ণ করিয়া বিবৃত করে। কেহ বা তাহার শিকারের অভিজ্ঞতা অভিনয় করিয়া দেখায়। অন্যান্য সকলে এই বিবৃতি বা অভিনয় তন্ময় হইয়া দেখে বা শোনে। এই ধরনের গল্প বলা কেবল তাহাদের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার নহে, ইহা তাহাদের শিক্ষারও অঙ্গ। শিকারের অবকাশে যেন শিকারের শিক্ষা ও মহড়া চলিতে থাকে। নৃত্য-গীত আন্দামানীদের জীবনের একটি অতি প্রিয় বস্তু। আন্দামানীদের মধ্যে নানারূপ নৃত্য প্রচলিত আছে। অনেক সময় তাহারা একখণ্ড কাঠ বা বৃক্ষশাখা তালে তালে মাটিতে ঠুকিয়া নাচে, পুরুষদের কেহ একজন গান গায়, মেয়েরা সকলে সমবেতকণ্ঠে ধুয়া ধরে। অনেকে উবু হইয়া কচ্ছপের ভঙ্গিতে বসিয়া কচ্ছপ-নৃত্য করে। কোন কোন উপজাতির স্ত্রী-পুরুষরা

সান্ধ্য আহার ও আমোদ-প্রমোদ

আবার সাঁওতালদের মতো মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়াইয়া সামনে ঝুঁকিয়া ও পিছনে হটিয়া নৃত্য করিয়া থাকে।

গল্প ও নৃত্য-গীতে প্রতি সন্ধ্যা তাহাদের আনন্দে ভরিয়া উঠে। তারপর রাত্রি গভীর হইলে তাহারা নিজ নিজ কুটীরে বা কক্ষে ফিরিয়া শয়ন করে।

আন্দামানীদের নৃত্য

আদিম সাম্যবাদ।—মানব-সমাজে শ্রেণী-সমাজের উৎপত্তির পূর্বে যে এক প্রকার আদিম ও অনুন্নত সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল, আন্দামানী লোকসমাজ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সকলেই সমবেতভাবে কাজ করে, সকলেই খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতি সমানভারেই ভোগ করে। ভূমি, খাদ্য ও বাসস্থান স্থানীয় দলের যৌথ সম্পত্তি। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় যেমন কিছু কিছু জিনিসের ব্যক্তিগত মালিকানা রহিয়াছে, এই আদিম সাম্যবাদী (primitive communism) সমাজ-ব্যবস্থায়ও অস্থাবর সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হইতে দেখা যায়। তীর-ধনুক, বর্শা, কোচ প্রভৃতি হাতিয়ার, শালতি ও ভেলা প্রভৃতির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয়। কোন লোক যদি একটি গাছ প্রথম দেখে বা শালতি নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করে, তবে সেই গাছে ও সেই গাছ হইতে নির্মিত শালতিতে তাহারই অধিকার। অস্থাবর সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় আমন্দানী লোকসমাজে উপহাররূপে বস্তুর আদান-প্রদান বিশেষরূপে প্রচলিত। প্রতিবেশী স্থানীয় দলগুলির মধ্যে যখন কোনও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তখন এইরূপ উপহার আদান-প্রদান বিশেষ-ভাবে চলে।

প্রশ্নাবলী

1. Andamanese are a living instance of the primitive human society.—What do you mean by the statement ? [আন্দামানীরা আদিম মানব-সমাজের একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।—এই উক্তির অর্থ কি ?]

2. What do you mean by food-gathering economy ? Are the Andamanese a food-gathering people ? [খাদ্য-আহরণকারী অর্থনীতি বলিতে কি বুঝ ? আন্দামানীরা কি খাদ্য-আহরণকারী ?]

3. Describe the social structure of the Andamanese Community. [আন্দামানী লোকসমাজের সামাজিক গঠন বর্ণনা কর।]

4. Write what you know about the food, dress, shelter, utensils and weapons of the Andamanese. [আন্দামানীদের খাদ্য, পরিচ্ছদ, আশ্রয়, পাত্রাদি ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কি জান ?]

5. Describe the daily life of the Andamanese. [আন্দামানীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।]

6. What do you know about the religious belief of the Andamanese ? [আন্দামানীদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

7. Do you think that the Andamanese Community is an instance of primitive communism ? [আন্দামানী লোকসমাজকে আদিম সাম্যবাদের একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে কর কি ?]

8. Is there anywhere a palaeolithic society in modern India ? If so, what do you know about this palaeolithic people and its palaeolithic culture ? [আধুনিক ভারতে কি কোথাও একটি পুরাপ্রস্তরযুগীয় লোকসমাজ বর্তমান রহিয়াছে ? যদি থাকে, তবে এই পুরাপ্রস্তরযুগীয় লোকসমাজ ও উহার পুরাপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পশুপালক অর্থনীতি—আলমোড়ার পশুপালক ও কৃষিকর লোকসমাজ

উৎপাদনী অর্থনীতি ও সামাজিক পরিবর্তন।—মানব-সমাজের বিকাশের ধারার আদিমতম স্তরে মানুষ ছিল খাদ্য-আহরণকারী। পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা আন্দামানী আদিবাসীদের লোকসমাজে তাহার নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছি। উদ্‌বর্তনের ফলে বানর-জাতীয় প্রাণী হইতে মানুষের যখন উদ্ভব হইয়াছিল, তখন সেই নবজাত মানব-সম্প্রদায় বানর-জাতীয় প্রাণীর বহু গুণ বা বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রেই
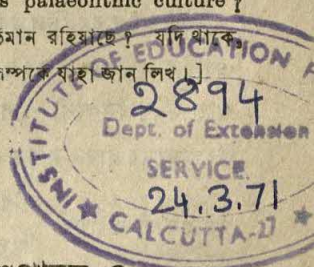
পাইয়াছিল। তখন মানুষের সমাজে পশু-সমাজের মতো খাদ্য-আহরণের অর্থনীতিই বর্তমান ছিল। কিন্তু মানুষের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ফলে প্রকৃতি-দত্ত খাদ্যই আর মানব-সমাজের প্রয়োজন মিটাইতে পারিল না। প্রকৃতি-দত্ত খাদ্যের যেমন পর্যাপ্তি ছিল না, তেমনই ছিল না নিশ্চয়তা। মানুষ শিকারে বাহির হইত, কিন্তু শিকার যে তাহার মিলিবেই এমন নিশ্চয়তা কোথায়? মানুষ শিকার ও ফলমূল, বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে বাহির হইত, কিন্তু পর্যাপ্ত শিকার ও ফলমূল ও বীজ যে সংগৃহীত হইবে, এমন ভরসা কি আছে? খাদ্য-আহরণকারী সমাজে দৈনন্দিন খাদ্যের এই অপ্রাচুর্য ও অনিশ্চয়তার সমস্যা দূর করিবার জন্য মানুষ বন্য পশুকে পোষ মানাইয়া গৃহপালিত করিল। এখন তাহারা গৃহপালিত পশুর নিকট হইতে ইচ্ছামতো ও প্রয়োজনমতো মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। পশুর লোম ও চামড়াও তাহারা ইচ্ছামতো পাইল এবং সেগুলি হইতে তাহাদের পরিচ্ছদের চাহিদা মিটল। কিন্তু কেবল মাংস ও দুগ্ধ দিয়াই মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব সম্পূর্ণ মিটল না। তাই অন্যদিকে তাহারা তখন প্রকৃতি-দত্ত ফলমূল ও বীজ সংগ্রহের রীতি ত্যাগ করিয়া নিজেরাই গাছপালার চাষ শুরু করিল—শুরু হইল কৃষিকার্য। কৃষিকার্যের দ্বারা তাহারা কেবল খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইল না, পরিচ্ছদের উপযোগী উদ্ভিদও তাহারা চাষ করিতে লাগিল। এইভাবে মানব-সমাজ পশুপালন ও কৃষিকার্যের উদ্ভাবনের দ্বারা খাদ্য ও পরিচ্ছদের একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিল।

উৎপাদনকারী সমাজের উদ্ভব

এই উদ্ভাবন ছিল যুগান্তকারী। মানুষ এতদিন ছিল খাদ্য-আহরণকারীমাত্র—এইদিক হইতে সে ছিল অন্যান্য জীবজন্তুর সগোত্র। কিন্তু মানুষ এখন হইল খাদ্য-উৎপাদনকারী—সে এখন অন্যান্য জীবজন্তু হইতে হইল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খাদ্য-উৎপাদনের দ্বারা মানুষ যে উৎপাদনী শক্তি অধিগত করিল, তাহাই সে তাহার জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ক্ষেত্রেও নিয়োগ করিল। সে উৎপাদন করিল শিল্প-সামগ্রী। মূলতঃ এই উৎপাদনের উন্নতির জন্যই মানুষ নব নব জ্ঞান আয়ত্ত করিল, বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিল, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইল। খাদ্য-আহরণকারী সমাজ অনড়-অচল অবস্থায় কয়েক লক্ষ বৎসর টিকিয়া ছিল। কিন্তু মানুষ যেদিন উৎপাদনী শক্তি আয়ত্ত করিল, সেদিন হইতে কয়েক হাজার বৎসরের মধ্যেই সে অধুনাতম সভ্যতার এক সমুন্নত স্তরে উন্নত হইল।

যুগান্তকারী রূপান্তর

মানব-সমাজের মৌলিক সংগঠনেও অনেক পরিবর্তন ঘটিল। খাদ্য-আহরণকারী সমাজে দলই ছিল সর্বপ্রধান, কিন্তু উৎপাদনকারী সমাজে পরিবারগুলি দলের প্রাধান্য

হইতে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্যলাভ করিল। পরিবারই হইল সমাজের প্রধান একক (unit)। কতকগুলি পরিবার লইয়া গোষ্ঠী, উপজাতি, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি গঠিত হইল। কেবল তাহাই নহে, পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিও স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। উৎপাদনের বিষয়ে কোনও ব্যক্তি অসামান্যতা বা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিলে, সে সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করিল। নব নব কৌশল উদ্ভাবনের ফলে অনেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিল। তাহারা অতিরিক্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিতে লাগিল এবং সঞ্চিত দ্রব্য বিনিময় করিয়া অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। সমাজে প্রথমে বিনিময় (barter) ব্যবস্থা এবং পরে ক্রয়-বিক্রয় শুরু হইল। বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করায় পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন পেশার সৃষ্টি হইল। উদ্বৃত্ত দ্রব্য সঞ্চয় এবং বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা কিছুসংখ্যক লোক সমাজের অন্যান্য লোকের তুলনায় অধিকতর ধনসম্পদের অধিকারী হইল। সমাজে ধনী-দরিদ্রের উৎপত্তি হইল, উদ্ভব হইল শ্রেণী-সমাজের (class society)। এইভাবে খাদ্য-আহরণকারী সমাজে যে সাম্য ও সমানাধিকারের ব্যবস্থা ছিল, তাহা লোপ পাইল—সমাজে শ্রেণী ও ব্যষ্টির (class and individual) প্রাধান্য দেখা দিল।

পরিবার ও ব্যক্তির প্রাধান্যলাভ

সাম্য ব্যবস্থার লোপ —শ্রেণী ও ব্যষ্টির প্রাধান্য

মানব-সমাজ যখন খাদ্য-আহরণকারী সমাজ হইতে পশুপালক ও কৃষিপ্রধান সমাজে উন্নীত হইয়াছে, অথচ শিল্পপ্রধান (industrial) হইয়া উঠে নাই, এমন একটি লোকসমাজের দৃষ্টান্ত আমরা আজও আমাদের দেশের আলমোড়ার পার্বত্য অঞ্চলে দেখিতে পাই। এখন আমরা আলমোড়ার পার্বত্য অঞ্চলের এই লোকসমাজ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

আলমোড়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।—ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। ইহা উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দেড় হাজার মাইল প্রসারিত রহিয়াছে। ইহার প্রস্থ দেড়শত হইতে তিনশত মাইল। এই পার্বতমালা প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত তিনটি পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত। সর্বোত্তরে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীটিই সর্বোচ্চ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট ইহাতেই অবস্থিত। এই পর্বতশ্রেণীকে "প্রধান হিমালয়" বলা হয়। ইহা বৎসরের সকল সময়েই তুষারাবৃত থাকে; ইহার দক্ষিণে যে পর্বতশ্রেণীটি রহিয়াছে, তাহাকে "মধ্য হিমালয়" বা "বহির্হিমালয়" বলা হয়। ইহার উচ্চতা প্রধান হিমালয় হইতে অপেক্ষাকৃত কম—ছয় হাজার হইতে বারো হাজার ফুট। কাশ্মীর এই মধ্য হিমালয়েই অবস্থিত। মধ্য হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীকে "অবহিমালয়" বলা হয়। ইহার উচ্চতা

সর্বাপেক্ষা কম। অবহিমালয়ের উত্তরাংশে রহিয়াছে গভীর অরণ্য এবং দক্ষিণাংশে জনবসতি। অরণ্য ওক, পাইন, রডোডেনড্রন প্রভৃতি বৃক্ষে পূর্ণ। প্রধান হিমালয়, মধ্য হিমালয় ও অবহিমালয়—হিমালয়ের এই তিন সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর উপরেই আলমোড়া জেলাটি অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিত। ফলে আলমোড়া জেলার উচ্চতা সর্বত্র সমান নহে—ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কোথাও এক হাজার ফুট, আবার কোথাও বা পঁচিশ হাজর ফুট উচ্চ।

তিনটি হিমালয়েই বিস্তৃত

সীমা

আলমোড়া জেলার উত্তরে রহিয়াছে তিব্বত, পূর্বে নেপাল, উত্তর-পশ্চিমে গাড়োয়াল জেলা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে সিমলা, মুসৌরি ও নৈনিতাল। আলমোড়া জেলাটি উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত।

নদ-নদী

এই জেলায় বহু হিমবাহ, প্রস্রবণ ও নদী অবস্থিত। হিমবাহগুলির মধ্যে মিলন-ই সর্ববৃহৎ। নদীগুলির মধ্যে কোশী, রামগঙ্গা, কালী ও গৌরীই প্রধান। কঠিন পাথরের বুক চিরিয়া নদীগুলি বহিয়া চলিয়াছে, তাই এগুলি তেমন গভীর ও প্রশস্ত নহে, কিন্তু অতিশয় খরস্রোতা। বরফ-গলা জলে নদীগুলি সকল সময়ই পূর্ণ থাকে। এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায় এবং এগুলি কৃষিকার্যে একান্তভাবে সাহায্য করে।

ভাবর ও তরাই

পর্বতের পাদদেশে অরণ্যাচ্ছাদিত অঞ্চল রহিয়াছে। এই অরণ্যাচ্ছাদিত অঞ্চলকে বলা হয় **ভাবর**। ভাবরে পশুচারণের উপযোগী ক্ষেত্রও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। উপরের লোকরা শীতের সময়ে দলে দলে এই ভাবর অঞ্চলে নামিয়া আসে। ভাবরের দক্ষিণেই **তরাই** অঞ্চল অবস্থিত।

জলবায়ু

আলমোড়া জেলার উচ্চতা সর্বত্র একরূপ নহে, তাই ইহার জলবায়ুও সর্বত্র একরূপ নহে। উত্তরাংশ উচ্চতম, তাই ইহা শীতপ্রধান। গ্রীষ্মকালের এখানকার তাপ কখনও পঞ্চাশ ডিগ্রির বেশী হয় না। এই অঞ্চল সংবৎসর ধবল তুষারে আবৃত থাকে এবং ইহাতে গাছপালা কিছুই জন্মায় না। মধ্যাঞ্চলের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। তাই উত্তরাঞ্চলের অপেক্ষা এখানে তাপ অধিক। তবে এখানেও শীতের প্রাবল্য কম নহে। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত এই অঞ্চল বরফাবৃত থাকে। তাই ঐ সময় এখানে জীবজন্তুর পক্ষে বাস করা সম্ভব হয় না। দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চতা আরও কম। তাই এখানকার তাপ উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের অপেক্ষা বেশী। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম সমানভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই অঞ্চলে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত—এই তিন ঋতুই দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আলমোড়া জেলার উত্তরাংশ চিরতুষারাবৃত এবং মধ্যাংশ বৎসরের অর্ধেক সময় তুষারাবৃত থাকে। তাই এই অঞ্চল অতিশয় দুর্গম। কিন্তু দক্ষিণাংশ বরফাবৃত থাকে না, এখানে লোকবসতি যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, তাই এখানে পথঘাটও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। দক্ষিণাংশে বা নিম্নাঞ্চলে উন্নতধরনের পথঘাট এবং আধুনিক যানবাহনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

পথঘাট

আলমোড়া জেলার প্রায় মধ্যভাগ দিয়া যদি পূর্ব-পশ্চিমে একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায়, তবে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। উত্তরভাগে ভোট-জাতীয় লোকের বাস। তাই ইহাকে **ভোট অঞ্চল** বলে। ভোট অঞ্চলের উচ্চতা দশ হইতে পনের হাজার ফুট। তাই এখানে শীতের প্রাবল্য অধিক। এখানে পাথর ও বরফের রাজত্ব। তবু কষ্টসহিষ্ণু ভোটরা এই পাথর ও বরফের রাজ্যেও কৃষিকার্য করে, ফসল ফলায়। তাহারা পশুপালনও করে।

ভোট অঞ্চল

কাল্পনিক রেখার দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলকে বলা হয় **আলমোড়া অঞ্চল।** এখানে শীতের প্রাবল্য কম। বরফের রাজত্বও নাই। জমিও অপেক্ষাকৃত উর্বর। আলমোড়া অঞ্চলের লোকরা কৃষি ও পশুপালন উভয় বিষয়েই পটু। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য ভোট অঞ্চলের সহিত আলমোড়া অঞ্চলের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির কিছুটা পার্থক্য আছে।

আলমোড়া অঞ্চল

সিঁড়ির আকারে নির্মিত কৃষিক্ষেত্র

ভোটদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি।—পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভোটরা আলমোড়া জেলার যে অঞ্চলে বাস করে, তাহা শীতপ্রধান। সেখানে পাথর ও বরফেরই রাজত্ব।

প্রকৃতির এই বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ভোটরা পুরুষানুক্রমে এই অঞ্চলে বাস করিতেছে। ফলে তাহারা স্বভাবের দিক হইতে যেমন কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি তাহাদের দেহগুলিও হইয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির এই বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রামের উপযোগী। ভোটদের দেহের গড়ন সাধারণতঃ বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বেঁটে।

ভোটদের দেহ ও স্বভাব

পাহাড়ের গায়ে পার্বত্য নদীর ধারে ধারে বৃত্তাকারে গঠিত এক-একটি গ্রামে ভোটরা বাস করে। গ্রামগুলি পর পর মালার আকারে বিন্যস্ত। নদার পার্শ্ববর্তী বিক্ষিপ্ত ভূমিখণ্ডগুলিকে ভোটরা কৃষির উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। জমিগুলি প্রায়ই নদীর ধার হইতে পাহাড়ের গায়ে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে।

ভোট গ্রাম

অনেক সময় পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির আকারে পর পর জমি কাটিয়া তাহাতেও ভোটরা চাষ-আবাদ করে। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির আকারে নানা থাক কাটিয়া এইরূপ জমি করিয়া চাষ করিবার পদ্ধতি অন্যান্য অনেক পার্বত্য অঞ্চলেও দেখা যায়। নদীর জলেই প্রধানতঃ চাষ-আবাদ হয়। কাটা খালও কিছু আছে। কাটা

কৃষি
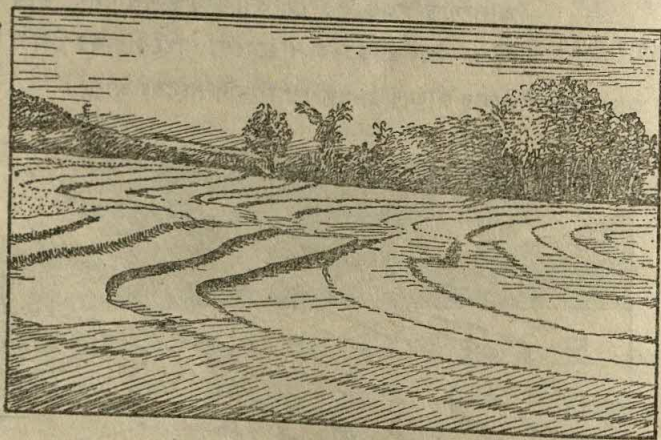
পাহাড়ের গায়ে থাক কাটিয়া চাষ-আবাদ

খালগুলিকে এই অঞ্চলে "গুল" বলে। তবে কাটা খালের সংখ্যা অতি অল্প। পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত এই সকল কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত অপরিসর। তাই এখানে গবাদি পশুর সাহায্যে জমিতে লাঙল করা যায় না। গবাদি পশুর পরিবর্তে ভোটরা নিজেরাই লাঙল টানে। সম্মুখে একজন বা দুইজন লোক লাঠিতে ভর দিয়া লাঙলটি সাধ্যমতো টানিতে থাকে এবং পিছনে একজন লোক লাঙলটিকে সজোরে মাটিতে চাপিয়া রাখে। ভূমি-কর্ষণের কাজ খুবই শ্রমসাধ্য, তাই পুরুষরাই চাষ করে। কিন্তু

ফসল-তোলার কাজ এরূপ শ্রমসাধ্য নয়, তাই ফসল তোলে মেয়েরা। ভোট মেয়েরা খুবই পরিশ্রমী। গম, যব, আলু প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান ফসল।

ভোট অঞ্চল অনুর্বর হওয়ায় ভোটদের অনলস পরিশ্রম সত্ত্বেও কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর উৎপন্ন হয় না। তাই কেবল কৃষিকার্যের দ্বারা ভোটদের জীবিকানির্বাহ সম্ভব হয় না। তাহারা পশুপালনও করে। পালিত পশুর মধ্যে গরু ও ছাগল-ভেড়াই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক দিক হইতে ভোটদের জীবনে কৃষির অপেক্ষা পশুপালনের গুরুত্বই অধিক। কিন্তু ভোট অঞ্চলে জমি অত্যন্ত পাথুরে এবং তাহা বরফাবৃত থাকায়, সেখানে তৃণ ও গাছপালা কম জন্মে; ফলে পশুরা খাদ্য সেখানে সংগ্রহ করা সহজ নহে। তাই ভোটরা তাহাদের পালিত গবাদি পশুর খাদ্যের সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়। ফলে গ্রামে ভোটদের স্থায়ী বাসস্থান থাকা সত্ত্বেও, তাহাদিগকে প্রায়-যাযাবরের মতো জীবন কাটাইতে হয়। পশুচারণের জন্য প্রায়ই তাহারা দক্ষিণে নিম্নাঞ্চলে নামিয়া আসে। পালে পালে পালিত পশু লইয়া গ্রামের সমস্ত ভোট পরিবারই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কৃষির মতোই পশুপালনেও ভোটদিগকে প্রকৃতির কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সংগ্রাম করিতে হয়।

আলমোড়ার পশুপালক সমাজ—তাহাদের বিচিত্র জীবন।— আলমোড়ার পশুপালক সমাজের জীবনযাত্রা বড়ই বিচিত্র। ইউরোপের আল্পস্ ও পীরেনিজ পার্বত্য অঞ্চলের পশুপালক সমাজের জীবনযাত্রার সহিত তাহাদের কিছুটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। আল্পস্ ও পীরেনিজ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তাহাদের পালিত গবাদি পশুর খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইয়া কতকটা যাযাবর জীবন যাপন করে। কিন্তু গ্রামে তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে, তাই তাহাদিগকে প্রকৃত যাযাবর বলা যায় না। তাহারাও জীবিকার্জনের জন্য কৃষি ও পশুপালন, উভয়ের উপরই নির্ভর করে। তাই গ্রামে থাকে তাহাদের কৃষিক্ষেত্র, স্থায়ী বাসগৃহ, অন্যদিকে পশুপালনের জন্য তাহাদিগকে যাইতে হয় এক পশুচারণ-ক্ষেত্র হইতে অন্য পশুচারণক্ষেত্রে, সেখানে তাহারা অস্থায়ী বাসা বাঁধে, যাপন করে যাযাবরের জীবন। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে তাহাদিগকে বিভিন্ন কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে হয়, ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে তাহাদের কর্মেরও পরিবর্তন ঘটে। কৃষিকার্যের সময় তাহাদের যৌথ-জীবনের তেমন প্রয়োজন হয় না, বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন পরিবার পৃথকভাবে চাষ করে। কিন্তু পশুচারণের জন্য তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধভাবে যাইতে হয়। তাই এসময়টা তাহাদিগকে কতকটা যৌথ-জীবন যাপন করিতে হয়। আলমোড়ার

কৃষি ও পশুপালন

স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান

পশুপালক সমাজের লোকরাও বৎসরের কিছুদিন কৃষিকার্যে ও বাকী সময় পশুচারণে অতিবাহিত করে। কৃষির জন্য তাহারা গ্রামে থাকে, পরিবারগুলি পৃথক পৃথক জমিতে চাষ-আবাদ করে। কিন্তু পশুচারণের জন্য তাহারা দলবদ্ধভাবেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রা করে। এই সময় পারিবারিক জীবনের অপেক্ষা যৌথ-জীবনই তাহাদের নিকট প্রধান হইয়া উঠে। গবাদি পশুর খাদ্য-সংগ্রহের জন্য আলমোড়ার লোকদের ঋতু অনুসারে উর্ধ্বাঞ্চল হইতে নিম্নাঞ্চলে এবং নিম্নাঞ্চল হইতে উর্ধ্বাঞ্চলে উঠানামা করিতে হয়। শীতকালে উর্ধ্বাঞ্চলে অর্থাৎ উত্তরাংশে অত্যধিক শীত পড়ে। তাই ঐ সময় উর্ধ্বাঞ্চল বাসের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠে। ফলে উর্ধ্বাঞ্চলের লোকরা দলবদ্ধভাবে ঐ সময় নিম্নাঞ্চলে আসে। শীতের অবসানে তাহারা আবার তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়। কেবল তাহারাই ঐ সময় উর্ধ্বাঞ্চলে ফিরিয়া যায় না, নিম্নাঞ্চলের লোকরাও ঐ সময় নিম্নাঞ্চল ছাড়িয়া উর্ধ্বাঞ্চলে যাত্রা করে।

গ্রামীণ ও যাযাবার জীবন

স্বতন্ত্র ও যৌথ জীবন

নিম্নাঞ্চলে যাত্রা।—আলমোড়ার উত্তরাংশে শীতকালে বরফ পড়ে। সর্বত্র সাদা বরফে ঢাকা পড়িয়া যায়। ঘাস ও গাছপালার চিহ্নমাত্র থাকে না। ফলে

পশুপালসহ স্থানান্তর যাত্রা

গবাদি পশুর খাদ্যাভাব ঘটে, কিন্তু নিম্নাঞ্চলে বরফ পড়ে না, তাই ঐ সময় নিম্নাঞ্চলে গবাদি পশুর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বাঞ্চলের

লোকরা দলবদ্ধভাবে সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া মোটঘাট ও গবাদি পশু সঙ্গে লইয়া দক্ষিণে নিম্নাঞ্চলের দিকে যাত্রা করে। অগ্রহায়ণে ফসল-কাটার কাজ শেষ হয় এবং শীত পড়িতে থাকে। ফসল-কাটার কাজ শেষ হইলেই গ্রহাচার্য আসিয়া যাত্রার দিন স্থির করিয়া দেন। কয়েকদিন ধরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুতি চলিতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য, বাসনকোসন, বিছানাপত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির লটবহর বাঁধা চলে। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে যাত্রার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সারিয়া গ্রামের লোকরা সপরিবারে দলবদ্ধভাবে গবাদি পশুর পাল লইয়া যাত্রা শুরু করে। ঘোড়ার পিঠে ও গরুর গাড়িতে মালপত্র বোঝাই করা হয়। পুরুষরা নিজেরাও পিঠে করিয়া মালপত্র বহিয়া লইয়া চলে। স্ত্রীলোকরা গাড়ি চালায়। অনেক স্ত্রীলোক ঘোড়ার পিঠে জিনিসপত্রের পোঁটলার উপর চড়িয়া বসে। ঝুড়ির মধ্যে শিশুদের বসাইয়া ঝুড়িগুলিকে ঘোড়ার পিঠের দুই দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। অনেক স্ত্রীলোক ঝুড়ির মধ্যে শিশুদের বসাইয়া ঝুড়ি পিঠে বাঁধিয়া লয়। এইভাবে গ্রামের পর গ্রাম হইতে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মোটঘাট ও গবাদি পশু লইয়া দক্ষিণে ভাবর অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সারাদিন যাত্রা করিয়া তাহারা সন্ধ্যার সময় পথে রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু ফেলে। দেখিতে দেখিতে পথিপার্শ্বে যেন একটি আস্ত গ্রাম গড়িয়া উঠে। তাঁবুর জীবনে ইহারা অভ্যস্ত। তাঁবুতে ইহারা খাওয়া-দাওয়া করে, গল্প-গুজব করে, ছোটখাটো আমোদ-প্রমোদও যে করে না এমন নহে। অনেকে ছোটখাটো হাতের কাজও করে। শেষরাত্রি হইতেই তাঁবু গুটাইয়া পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু হইয়া যায়। সকালে আবার যাত্রা শুরু হয়। এইভাবে সপ্তাহখানেক কাটে। তারপর তাহারা নিম্নাঞ্চলে ভাবরে আসিয়া পৌঁছে। ভাবর অঞ্চলে প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের জন্য বংশানুক্রমে নির্দিষ্ট চারণভূমি থাকে। নিজ নিজ চারণভূমিতে পরিবারগুলি অস্থায়ী ঘর বাঁধে এবং পশুদের থাকিবার জন্যও অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করে। একই গ্রামের লোক পাশাপাশি ঘর বাঁধিয়া থাকায়, এখানেও তাহাদের নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠে। ইহাতে তাহাদের গ্রামের পূর্ব সম্পর্ক বজায় থাকে, নূতন পরিবেশে আসিলেও তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না, তাহারা পরস্পর সাহায্য করে। প্রতি বৎসর একই নির্দিষ্ট চারণভূমিতে পরিবারগুলি আগমন করায় পরিবেশও তাহাদের কাছে নূতন লাগে না। অস্থায়ী গৃহগুলি নির্মিত হইয়া গেলে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হয়। তাহারা পশুচারণ করে; গবাদি পশুর দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত মাখন, ঘৃত ইত্যাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। এই স্থানে তাহাদিগকে বেশ কয়েক মাস থাকিতে হয়। তাই

যাত্রারম্ভ

যাত্রাপথে জীবনযাত্রা

নূতন বসতি

তাহারা চাষ-আবাদও করে। এই অস্থায়ী গ্রামের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অনেকে দোকান খুলিয়া বসে, অনেকে স্থানীয় বাজারে বা স্থানীয় লোকদের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যও শুরু করিয়া দেয়। ভাবর অঞ্চল অরণ্যে পূর্ণ। এখানে কাঠ কাটিবার জন্য দিনমজুরের চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে। অনেকে দিনমজুররূপে কাঠ কাটিবার কাজেও লাগে।

দৈনন্দিন কাজকর্ম

শীত শেষ হইলে পুনরায় নিজ নিজ গ্রামে ফিরিবার সময় আসে। কারণ, গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বাঞ্চলের বরফ গলিয়া যায়, আবার সমস্ত উর্ধ্বাঞ্চল তৃণলতায় ভরিয়া উঠে। তাই উর্ধ্বাঞ্চলে এখন আর পশুর খাদ্যের অভাব থাকে না। আবার লটবহর বাঁধা চলে। আবার নির্দিষ্ট দিনে সারা গ্রামের পরিবারগুলি গরুর গাড়িতে বা ঘোড়ার পিঠে মোটঘাট চড়াইয়া পশুর পাল লইয়া দলবদ্ধভাবে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়।

প্রত্যাবর্তন

উর্ধ্বাঞ্চলে যাত্রা।—গরম পড়িলে কেবল উর্ধ্বাঞ্চলের অধিবাসীরাই যে উর্ধ্বাঞ্চলে ফিরিয়া যায়, তাহা নহে। এখন নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরাও উর্ধ্বাঞ্চলে যাইতে শুরু করে। উর্ধ্বাঞ্চলের অধিবাসীরা শীতের সময় একবারমাত্র নিম্নাঞ্চলে নামে, কিন্তু নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই উর্ধ্বাঞ্চলে থাকে বা বারবার যাতায়াত করে। উর্ধ্বাঞ্চলের তৃণলতা এবং ওক গাছের পাতা পশুর পক্ষে অতিশয় পুষ্টিকর। তাই নিম্নাঞ্চলে পশুর খাদ্য থাকিলেও নিম্নাঞ্চলের লোকরা উর্ধ্বাঞ্চলে পশুচারণের জন্য যায়। উর্ধ্বাঞ্চলে পশুচারণের জন্য কেবল নিম্নাঞ্চল হইতে নহে, অন্যান্য বহু দূরবর্তী স্থান হইতেও লোক আসে। তবে উর্ধ্বাঞ্চল হইতে যেমন গ্রামগুলি সমগ্রভাবে নিম্নাঞ্চলে চলিয়া আসে, নিম্নাঞ্চলের লোকেরা তেমনটি করে না। বহুসংখ্যক সমর্থ লোক এবং বৃদ্ধবৃদ্ধা ও ছেলেমেয়েরা গ্রামেই থাকে। উর্ধ্বাঞ্চলের লোকেরা বৎসরে একবার নিম্নাঞ্চলে আসে, কিন্তু নিম্নাঞ্চলের লোকেরা বৎসরে কয়েকবার উর্ধ্বাঞ্চলে যায়। কয়েক ঘণ্টা বা একদিনের পথ হইলে—নিম্নাঞ্চল হইতে উর্ধ্বাঞ্চলের দূরত্ব কম হইলে—নিম্নাঞ্চলের লোকেরা উর্ধ্বাঞ্চলে চারিবার ওঠা-নামা করে। প্রথমে তাহারা একবার চৈত্রের শেষে গিয়া জ্যৈষ্ঠের প্রথমে ফিরিয়া আসে। কারণ, ঐ সময় নিম্নাঞ্চলে গম কাটিবার ও ধান বুনিবার সময় এবং সেজন্য নিম্নাঞ্চলে লোক ও গো-মহিষের প্রয়োজন থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসেই গম কাটা ও ধান্য বপনের কাজ শেষ হয়। তখন নিম্নাঞ্চলে লোকজনের ও গো-মহিষের চাহিদা কমে এবং জ্যৈষ্ঠের শেষে ও আষাঢ়ের প্রথমে নিম্নাঞ্চলের লোকরা উর্ধ্বাঞ্চলে দ্বিতীয়বার যাত্রা করে। আবার বর্ষা পড়িলে তাহারা

নিম্নাঞ্চল যাত্রার সহিত উর্ধ্বাঞ্চল যাত্রীর পার্থক্য

বিভিন্ন বার ওঠা-নামা

নিম্নাঞ্চলে ফিরিয়া আসে। কারণ, ঐ সময় নিম্নাঞ্চলে প্রচুর তৃণাদি জন্মে ও পশুর খাদ্যের অভাব থাকে না। তাহা ছাড়া, বর্ষাকালেই নিম্নাঞ্চলের লোকদের বাৎসরিক উৎসব হয়। এই উৎসবে যোগদানও ফিরিয়া আসার অন্যতম কারণ। শ্রাবণের শেষে বা ভাদ্রের গোড়ায় তাহারা তৃতীয়বার যাত্রা করে। ঐ সময় নিম্নাঞ্চলে পশুদের খাদ্যের অভাব না হইলেও, ঊর্ধ্বাঞ্চলে খাদ্য অধিকতর পুষ্টিকর বলিয়া তাহারা ঊর্ধ্বাঞ্চলে ফিরিয়া যায়। খারিফ শস্য তুলিবার সময় হইলেই পুনরায় তাহারা নামিয়া আসে। খারিফ শস্য তোলা হইয়া গেলে পুনরায় তাহারা ঊর্ধ্বাঞ্চলে যাত্রা করে এবং শীত পড়া পর্যন্ত ঊর্ধ্বাঞ্চলেই থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে এইরূপ চারিবার ওঠা-নামা করা সম্ভব হয় না। নিম্নাঞ্চলে নিজ বাসস্থান হইতে ঊর্ধ্বাঞ্চলের দূরত্ব যাহাদের যেমন বেশী, তাহাদের ওঠা-নামার বারও তেমনি কম হয়। কিংবা নিকটবর্তী স্থানের যে সকল পরিবারের লোকজন ও গো-মহিষ বেশী, চাষের বা ফসল-তোলার জন্য তাহাদিগকে নিম্নাঞ্চলে বারবার নামিতে হয় না, তাহারা চৈত্রের শেষে গিয়া শীতের পূর্ব পর্যন্ত একটানা ঊর্ধ্বাঞ্চলে থাকে।

ঊর্ধ্বাঞ্চলের লোকরা যেমন নিম্নাঞ্চলে আসিবার সময়ে দিনক্ষণ দেখিয়া ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া যাত্রা করে, নিম্নাঞ্চলের লোকরা ঊর্ধ্বাঞ্চলে যাইবার সময়েও ঠিক তেমনটিই করে।

ঊর্ধ্বাঞ্চলের লোকদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য যেমন ভাবরে বংশানুক্রমে নির্দিষ্ট চারণভূমি থাকে, নিম্নাঞ্চলের পরিবারদের জন্য ঊর্ধ্বাঞ্চলে কিন্তু তেমনটি থাকে না। ঊর্ধ্বাঞ্চলের উপত্যকাগুলিতে নিম্নাঞ্চলের এক-একটি গ্রামের জন্যই চারণভূমি নির্দিষ্ট থাকে। এই চারণভূমিগুলিকে **খাটা** বলে। খাটাগুলিকে গ্রামের সমস্ত পরিবারই যৌথভাবে ভোগ করে—খাটা কাহারও ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সম্পত্তি নহে, ইহা সমগ্র গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। খাটার মধ্যে এক স্থানে গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের গৃহগুলি নির্মাণ করা হয়। গৃহগুলি খুব মজবুত করিয়া তৈয়ার করা হয় না। খুঁটির উপর কাঠামো চাপাইয়া চালাঘরের মতো করা হয়। চালগুলি লতাপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। বন্য জন্তু যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য ঐ সকল গৃহের দরজা খুব নীচু ও ছোট করা হয়। গবাদি পশুর জন্যও অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা হয়। খাটার অস্থায়ী গৃহের নাম **খড়ক**। খড়কের আকার সাধারণতঃ চারি প্রকার হয়—চতুষ্কোণ, তাঁবুর মতো বৃত্তাকার, পিরামিডের মতো ত্রিকোণ এবং একচালার মতো লম্বা। খড়কগুলি পাথর ও কাঠ দিয়া মজবুত করিয়া তৈয়ার করা হয়। তাঁবুর মতো বৃত্তাকারে নির্মিত খড়কগুলিকে বলা হয় **ঘুঙ্‌ঘুটিয়া**।

খাটা

খড়ক

চারণক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন গ্রামের গবাদি পশু আসে, তাই এখানে গবাদি পশুর ক্রয়-বিক্রয় চলে।

আলমোড়ার হাটবাজার ও মেলা।—আমাদের গ্রামদেশের মতোই আলমোড়ার লোকেরা হাটবাজারেই তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে এবং উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র বিক্রয় করে। আলমোড়ার লোকসমাজে নাগরিক অর্থনীতি প্রভাব বিস্তার না করায়, এই হাটবাজারগুলিই আলমোড়ার প্রাচীন অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হইয়া আছে। আলমোড়ার লোকেরা কতক পরিমাণে প্রাচীন এবং কতক পরিমাণে যাযাবর জীবন যাপন করে, তাই স্থায়ী বাজার, গঞ্জ বা শহর এখানে গড়িয়া উঠে নাই। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন হাটগুলি বসে। হাটে শস্য, মাখন, দুধ, ছাগ, কম্বল, চাদর, সুতা, বাসনকোসন, নানাপ্রকার হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ক্রয়-বিক্রয় হয়। হাটগুলি ছোট এবং সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় ও নিতান্ত স্থানীয় জিনিসপত্রই এগুলিতে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

হাট

আলমোড়ার বড় বাজার বা শহরের অভাব মিটায় মেলাগুলি। জয়ন্তী, দশহরা, শিবরাত্রি, দোল, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে বড় বড় মেলা বসে। মেলাগুলিতে বহু গ্রামের লোক আসে। এমন কি অনেক মেলায় দূর হইতেও বহু লোকসমাগম হয়। আলমোড়ার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মেলা হইল **বাগেশ্বরের মেলা।** সরযূ ও গোমতী নদীর মিলন-স্থলে বাগেশ্বরের (মহাদেবের) মন্দির। প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তিতে এখানে একটি বিরাট মেলা হয়। বিশ-পঁচিশ হাজার লোক আসে এই মেলায়। আলমোড়ার বাহির হইতেও বহু লোক আসে। এই মেলায় শাল, গালিচা, কম্বল, বস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাঁশ, বেত ও কাঠের জিনিস, নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্য ও মনিহারী জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হয়। খাদ্যশস্য এবং গবাদি পশুও এই মেলায় প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। আলমোড়ার সকল মেলা এত বড় না হইলেও, এখানে বৎসরে প্রায় 100টি বড় মেলা হয়। ছোট মেলা হয় অসংখ্য। জেলার প্রত্যেক থানায় প্রায় প্রতি মাসে একটি করিয়া মেলা হয়। যে অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক হইতে যেমন উন্নত, সেই অঞ্চলে মেলার সংখ্যাও তেমনই বেশী। মেলাগুলি এই অঞ্চলের কেবল অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্রই নহে, এগুলি স্থানীয় লোকসমাজের আমোদ-প্রমোদেরও কেন্দ্র। মেলাগুলি যখন হয়, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মেলায় যোগদানের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠে, সমগ্র অঞ্চলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। এইভাবে কি অর্থনৈতিক দিক হইতে, কি মানসিক দিক হইতে, মেলাগুলি আলমোড়াবাসীদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

মেলা

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by food-producing economy? Trace its importance in the development of civilization. [খাদ্য-উৎপাদনকারী অর্থনীতি বলিতে কি বুঝ? সভ্যতার বিকাশে ইহার গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

2. Briefly describe the pastoral and agricultural life of the people of the Almora Hills. [আলমোড়া পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীদের পশুপালক ও কৃষিকর জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

3. Describe the seasonal migration of the Almora people with their cattle. Compare the migration of the people of the upper region with that of the people of the lower region. [বিভিন্ন ঋতুতে আলমোড়াবাসীদের পশুসহ স্থানান্তর-যাত্রা বর্ণনা কর। ঊর্ধ্বাঞ্চলের লোকদের স্থানান্তর-যাত্রার সহিত নিম্নাঞ্চলের লোকদের স্থানান্তর-যাত্রা তুলনা কর।]

4. What part do the fairs play in the life of the Almora people? [আলমোড়াবাসীদের জীবনে মেলার ভূমিকা বর্ণনা কর।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষি ও লোকসমাজ—পশ্চিমবঙ্গ

কৃষির প্রাধান্য ও ভারত।—আলমোড়ার লোকসমাজে আমরা দেখিয়াছি, কৃষি ও পশুপালন একই সঙ্গে চলিয়াছে এবং পশুপালনই কৃষির অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মানব-সমাজের বিকাশের ধারায় আমরা ইহাতে একটি পর্যায়ের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু ধীরে ধীরে মানব-সমাজে কৃষিই প্রাধান্য বিস্তার করিল। কৃষি ও পশুপালন হইতে আরও উন্নততর সমাজ যখন উদ্ভূত হইল, তখন তাহাতে শিল্পপ্রাধান্য দেখা দিল। যেমন ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সর্বোন্নত দেশগুলি শিল্পপ্রধান। কিন্তু শিল্পপ্রধান দেশগুলিতেও কৃষির ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। আমাদের ভারতবর্ষ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের মতো এখনও শিল্পপ্রাধান্য লাভ করে নাই, তাহা এখনও কৃষিপ্রধানই রহিয়াছে। তাই বর্তমানে আমাদের দেশে কৃষির গুরুত্বই সর্বাধিক। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা 70 জন ভূমির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজকর্ম হইতেই ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক হইয়া থাকে। ভারতীয় কৃষির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অসংখ্য প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয় এবং খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় না এমন ফসলের অপেক্ষা

খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন ফসলের প্রাধান্যই অধিক। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, যব, বিভিন্নপ্রকার কলাই ও দাল, আলু, আখ, তামাক, বাদাম, তিল, সরিষা, পাট, শণ, রেড়ি, লঙ্কা, মরিচ, তূলা, চা, কফি ও রবার প্রধান। ভারতের সর্বাধিক ভূমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, 8 কোটি 36 লক্ষ 69 হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। ধানের পরেই জোয়ারের স্থান। ঐ বৎসরের হিসাবে, 4 কোটি 30 লক্ষ 74 হাজার একর জমিতে জোয়ারের চাষ হইয়াছে। তাহার পরে স্থান গমের। ঐ বৎসরের হিসাব অনুসারে, 3 কোটি 32 লক্ষ 40 হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। শিল্পের জন্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিসও ভারতীয় কৃষি সরবরাহ করিয়া থাকে। যেমন—তূলা, পাট, আখ, বাদাম, চা, লাক্ষা। দেশের বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প ও চিনিশিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তূলা, পাট ও আখ এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে, 1 কোটি 87 লক্ষ 10 হাজার একর জমিতে তূলা, 25 লক্ষ 59 হাজার একর জমিতে পাট ও 59 লক্ষ 42 হাজার একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছে। বাদাম ও চায়ের উৎপাদনে ভারত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। লাক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত একপ্রকার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ধান, পাট, চা, চিনি, সরিষা, তিল ও রেড়ির উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়। কৃষিপণ্যের দ্বারা ভারত প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। ভারতীয় অর্থনীতি কৃষিপ্রধান হওয়ায় ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাও গ্রামপ্রধান। ভারতবর্ষে বহু বৃহৎ শহর রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের সমৃদ্ধি ও প্রাণশক্তির মূল গ্রামাঞ্চলেই নিহিত রহিয়াছে।

বিভিন্ন কৃষি ও কৃষির পরিমাণ

বাংলার কৃষিপ্রাধান্য ও সমাজ-ব্যবস্থা।—কৃষির দিক হইতে আমাদের "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গদেশ কম উল্লেখযোগ্য নহে। তাই বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রধানতঃ কৃষির উপরই নির্ভরশীল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষির যে প্রকার-ভেদ রহিয়াছে, তাহার ফলে তাহার সমাজ-ব্যবস্থায়ও কিছুটা বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপরই কৃষি প্রধানতঃ নির্ভরশীল। ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণের সমতল বা প্রায়-সমতল অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল—দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা—চায়ের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ধান ও পাটই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। তবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ধান যে একেবারে হয় না, এমন নহে।

ধান ও পাটের চাষের সহিত চায়ের চাষের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। তাই ধান ও পাটের চাষকে কেন্দ্র করিয়া যে সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে চায়ের চাষকে কেন্দ্র করিয়া যে সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ভিন্ন প্রকার। ধান ও পাটের চাষের সহিত চায়ের চাষের প্রধান পার্থক্য এই যে, কৃষকদের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত চেষ্টায় ধান ও পাটের চাষ সম্ভব। কিন্তু কোনও কৃষকের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত চেষ্টায় চায়ের চাষ সম্ভব নহে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ধান ও পাটের ফসল উঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে ধান ও পাটের চাষ সম্ভব। ফলে ইহাতে মূলধন কম লাগে। তাই কৃষকরা তাহাদের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত পরিশ্রমের দ্বারা ধান ও পাটের চাষ করিতে পারে। কিন্তু চায়ের ফসল উঠিবার জন্য কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ভূখণ্ড লইয়া চায়ের বাগানগুলি গড়িয়া তুলিতে হয়। চায়ের বাগানগুলিতে বহুসংখ্যক লোককে দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, চা-কে বিক্রয়ের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য কারখানার প্রয়োজন। এইসব নানা কারণে চায়ের চাষের জন্য মূলধন অত্যন্ত বেশী লাগে। তাই চায়ের চাষ কোনও একক চেষ্টায় সম্ভব নহে। ধান ও পাট চাষ করিয়া কৃষকরা উৎপন্ন ফসল নিজেরাই বাজারে বিক্রয় করে এবং তাহা হইতে তাহারা অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু চায়ের চাষে নিযুক্ত কৃষকরা নিজেরা চা বিক্রয় করিতে পারে না, চায়ের বাগানের তথা উৎপন্ন চায়ের উপর তাহাদের কোনও মালিকানা নাই, তাহারা নিয়মিত মাহিনা পায় মাত্র। এদিক হইতে চা-কৃষকরা শ্রমিক-শ্রেণীভুক্ত। তাই চায়ের চাষকে বিশুদ্ধ কৃষির পর্যায়ে ফেলা হয় না। এজন্য চায়ের চাষে নিযুক্ত কৃষকদিগকে বলা হয় "চা-শ্রমিক"। ধান ও পাটের চাষের উপর নির্ভরশীল কৃষকরা যে গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলে, তাহার সহিত চায়ের চাষের উপর নির্ভরশীল সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। কল-কারখানাগুলিতে যেমন বহু স্থান ও বহু জাতির লোক কাজ করে, চায়ের বাগানগুলিতেও তেমনি বহু স্থান ও বহু জাতির লোক কাজ করে। তাহাদের লইয়া গঠিত সমাজ নানাদিক হইতে কল-কারখানার শ্রমিক-সমাজের মতো। তাই চা-শিল্পের উপর নির্ভরশীল সমাজ-ব্যবস্থাকে বিশুদ্ধ গ্রামীণ সমাজ না বলিয়া মিশ্র-সমাজ বলা যাইতে পারে।

ধান ও পাটের চাষের সহিত চায়ের চাষের পার্থক্য

পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষ।—ধানই ভারতে উৎপন্ন প্রধান খাদ্যশস্য। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে, ভারতে ঐ বৎসর যখন 1 কোটি 16 লক্ষ 20 হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে চাউল (ধান নহে) উৎপন্ন হইয়াছে 3 কোটি 36 লক্ষ 10 হাজার টন। ভারতের যে সকল অঞ্চলে ধান সর্বাধিক উৎপন্ন হয়, পশ্চিমবঙ্গ

তাহার অন্যতম। ধানই হইল পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম কৃষিজ সম্পদ্। পশ্চিমবঙ্গের সেই আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় 1 কোটি 32 লক্ষ একর। ইহার 1 কোটিরও বেশী একর জমিতে—শতকরা প্রায় 80 ভাগ জমিতে—ধানের চাষ হয়।

সর্বপ্রধান কৃষিজাত দ্রব্য

মিহি, মোটা ও মাঝারী—এই তিন ভাগে ধানকে প্রধানতঃ ভাগ করা হইলেও পশ্চিমবঙ্গে বহুজাতের ধান জন্মে। চাষের সময় ও পদ্ধতি ভেদে ধানকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি—(১) **আমন**, (২) **আউশ** এবং (৩) **বোরো**।

আমন ধানের চাষই পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক হইয়া থাকে। চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় আমন ধানের চাষই বেশী হয়। মেদিনীপুরে আমন ধানের চাষ হয় সর্বাধিক। মেদিনীপুরে আবাদী জমির শতকরা 93 ভাগে আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। চব্বিশ পরগণা ও বর্ধমান জেলায় আবাদী জমির শতকরা 80 ভাগে এবং বীরভূম জেলায় আবাদী জমির শতকরা 50 ভাগে আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও হুগলী জেলায় আমন ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কোচবিহার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় কেবল আমন ধানেরই চাষ হইয়া থাকে। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে অন্যান্য ধানের সহিত আমন ধানেরও চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু নদীয়া জেলায় আমন ধানের চাষ হয় অত্যল্প। বর্ষার আরম্ভে আমন ধান রোপণ করা হয় এবং হেমন্তের শেষে বা শীতের প্রারম্ভে ফসল তোলা হয়। যে সকল জমি বর্ষাকালে বৃষ্টিতে অত্যধিক ডুবিয়া যায়, সেগুলিতে বর্ষার পূর্বেই—বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মের প্রথমে—আমন ধান বপন করা হয়। আমন ধানের চাউল অতিশয় সুস্বাদু এবং ইহাতে ভাতের পরিমাণও অন্যান্য ধানের তুলনায় বেশী হয়। তাই আমন ধানের চাহিদাই দেশে সর্বাধিক।

আমন ধান

বসন্তের শেষে বা চৈত্রের গোড়ায় আউশ ধানের বীজ বপন করা হইয়া থাকে এবং শ্রাবণ মাসে বা ভাদ্রের গোড়ায় আউশের ফসল তোলা হয়। আমন ধানের তুলনায় এই ধান অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহাকে আউশ (আশু) ধান্য বলা হয়। শ্রাবণ-ভাদ্রে ইহার ফসল উঠে বলিয়া অনেক স্থানে ইহাকে "ভাদুই" ধান বলে। চাষের পরিমাণের দিক হইতে আমন ধানের পরেই আউশ বা ভাদুইয়ের স্থান। তবে আমনের তুলনায় উহা সামান্যই। সমগ্র ধানজমির শতকরা 7 ভাগে মাত্র আউশ ধানের চাষ হয়। অনেক জমিতে আমন ও আউশ একই সঙ্গে বপন করা হয়। শ্রাবণ-ভাদ্রে আউশের ফসল তোলা হয় এবং আমনের ফসল তোলা হয় অগ্রহায়ণ-পৌষে। আউশ

আউশ ধান

ধানের জন্য প্রচুর বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। মেদিনীপুর ছাড়া অন্যান্য জেলাতে আউশ ধান অল্পাধিক পরিমাণে হইলেও, নদীয়া জেলাতেই আউশের চাষ হয় সর্বাধিক। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাতেও আউশ ধান যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আউশ ধানের চাউল আমনের চাউলের মতো সুস্বাদু নহে। ইহার চাউলের ভাতের পরিমাণও আমনের চাউলের তুলনায় কম হয়।
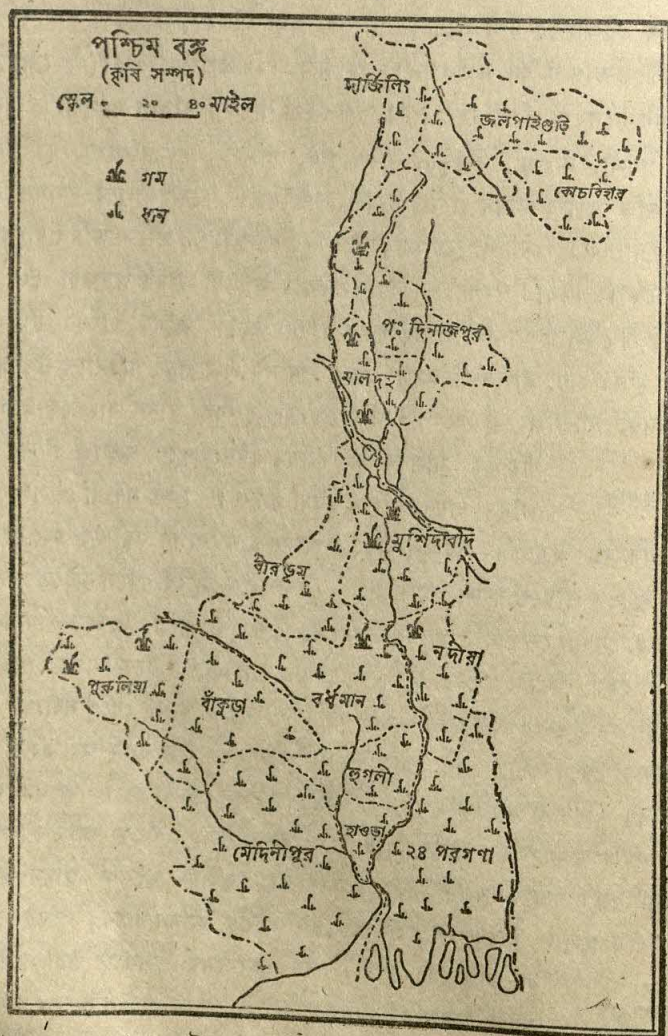
আমনের তুলনায় আউশ অল্পতর সময়ে উৎপন্ন হইলেও, বোরো ধান সর্বাধিক অল্প সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোপণের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই বোরো ধানের

ফসল উঠে। দুই মাসে বা ষাট দিনে হয় বলিয়া অনেক স্থানে ইহাকে "ষেটে" ধানও বলা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বোরো ধানের চাষ খুব অল্পই হইয়া থাকে। সমগ্র ধানজমির শতকরা মাত্র 0·4 ভাগ জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে বোরো ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলাতেও এই ধান সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। অন্যান্য জেলায় ইহার চাষ নগণ্য।

বোরো ধান

ধানের উৎপাদনের উপর পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সুদিন-দুর্দিন নির্ভর করে। ধানই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কেবল তাহাই নহে, ভাতই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে ধানের চাষ বাড়ে নাই। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় জীবনে সম্প্রতি যে অভাব-অভিযোগ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, প্রয়োজনের অনুপাতে ধান্যের উৎপাদনের অল্পতাই তাহার প্রধান কারণ। একদিন "ধনধান্যে"র জন্য বাঙ্গালী গর্ববোধ করিত। সে গৌরবের দিন সে আজ হারাইয়াছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও সম্প্রতি ধানচাষের অবনতি লক্ষ্য করা যায়। 1960-61 খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে 3 কোটি 36 লক্ষ 58 হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। সে তুলনায় 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে 3 কোটি 36 লক্ষ 10 হাজার টন, অর্থাৎ 48 হাজার টন কম। দেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে।

ধান্য উৎপাদন ও অন্ন-সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ।—চাষের পরিমাণের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গে ধানের পরেই পাটের স্থান। পাট অর্থকর চাষ; ইহা ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সাহায্য করে। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে, সারা ভারতে 22 লক্ষ 80 হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ঐ বৎসর পাট উৎপন্ন হইয়াছিল 63 লক্ষ 47 হাজার গাঁইট। (প্রতি গাঁইটের ওজন 400 পাউণ্ড।) এখন পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতে উৎপন্ন পাটের প্রায় অর্ধাংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাংলা দেশে পাটের চাষ ও পাটশিল্প রহিয়াছে। অবিভক্ত ভারতে পাটচাষে বাংলা দেশের স্থান ছিল পুরোভাগে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে সর্বাধিক ও সর্বোৎকৃষ্ট পাট জন্মিলেও, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা হইতেই সর্বাধিক পরিমাণ পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইত। তাই কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে, হুগলী নদীর তীরেই বড় বড় পাটকলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে 1947 খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ বিভক্ত হওয়ায়, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের পাটচাষীরা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি সমান অসুবিধায় পড়িয়াছিল। ফলে পাটকলগুলিতে পাট সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যাহাতে পাটের চাষ বৃদ্ধি করা যায়, সে-বিষয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা চলিতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই

এই চেষ্টা ফলবতী হয়। এখন পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলাতেই পাটের চাষ হইয়া থাকে এবং পাট বিশেষরূপে অর্থকর হওয়ায়, উহা অনেকস্থলে ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে নানারূপ চেষ্টা সত্ত্বেও ধানের উৎপাদন যে আশানুরূপ বৃদ্ধি করিতে পারা যায় নাই, পাটচাষের বিস্তারলাভও তাহার অন্যতম কারণ। পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ হয় মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া, মালদহ, কোচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলাতেও পাটের চাষ পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে পাট-চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ

আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুই প্রকার পাট চাষ করা হয়—**তিতা** ও **মিঠা**। তিতা পাটের পাতার স্বাদ তিক্ত, তাই ইহাকে তিতা পাট বলে। মিঠা পাটের পাতার স্বাদ তিক্ত নহে। তিতা পাটের আঁইশ বেশী। কিন্তু উহা মিঠা পাটের আঁইশের মতো নরম ও সূক্ষ্ম নহে। তিতা পাট সাধারণতঃ নীচু জমিতে ও মিঠা পাট অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে হয়। তিতা পাট সাধারণতঃ কিছু আগে বপন করা হয় এবং ইহার ফসল তোলা হয় কিছু আগে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মিঠা পাটের চাষই সর্বাধিক।

দুই প্রকার পাট

সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে পাটবীজ বপন করা হয়। পাটের চারাগুলি একটু বড় হইলে, পাটগাছের গোড়ার ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। বর্তমানে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন এবং হুইল-হো যন্ত্রের সাহায্যে পাটক্ষেতের ঘাস ইত্যাদি নিড়াইবার রীতি চালু করা হইতেছে। পাটক্ষেতে নানারূপ রাসায়নিক সার ও পাটের পাতার পোকা মারিবার জন্য নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্যও ব্যবহার করা চলিতেছে। সাধারণতঃ পাটের গাছগুলি দশ-বারো ফুট লম্বা হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করিলে পাটগাছগুলি পনের হইতে আঠারো ফুট পর্যন্ত লম্বাও হইয়া থাকে। পাটের ফসল তুলিতে তিন-চারি মাস সময় লাগে। পাটের গাছগুলি সুপরিণত হইলে সাধারণতঃ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছগুলিকে গোড়া হইতে কাটা হয়। তারপর গাছ হইতে পাতাগুলি ছাড়াইয়া পত্রহীন পাটের ডাঁটাগুলিকে বড় বড় আঁটি বাঁধিয়া নিকটবর্তী খানা-ডোবায় কিছুদিন ডুবাইয়া রাখা হয়। গাছগুলি পচিয়া নরম হইলে জলে জোরে নাড়িয়া-চাড়িয়া আছড়াইয়া আঁইশগুলিকে কাঠি হইতে পৃথক করা হয়। এইভাবে পাট ও পাটকাঠি বা প্যাকাটি উৎপন্ন হয়। প্যাকাটিগুলি জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আঁইশগুলিকে গুচ্ছাকারে জলে ভালো করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। তারপর গাঁইট

পাটের চাষ

বাঁধিয়া ব্যাপারীদের নিকট বিক্রয় করা হয়। ব্যাপারীরা ঐ পাট পাটকলে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

পাট হইতে নানাপ্রকার দড়াদড়ি, কাছি ও চট প্রস্তুত হইয়া থাকে। থলে, আসন, শতরঞ্জ প্রভৃতি চট হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাট হইতে সূক্ষ্ম সুতাও প্রস্তুত হয়। পাটের সূক্ষ্ম সুতা দিয়া বোনা কাপড় বা পট্টবস্ত্র এদেশে প্রাচীন কাল হইতে আদরের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। নানাপ্রকার মোটা কাপড়ও পাটের সুতা হইতে

প্রস্তুত হয়। কাগজ তৈয়ারির জন্যও পাট ব্যবহৃত হয়। দেশে ও বিদেশে পাটের ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা খুবই। ভারত হইতে বৎসরে প্রায় 150 কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য বাহিরে চালান যায়। এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় অর্ধাংশ পশ্চিমবঙ্গই অর্জন করিয়া থাকে।

পাটের উপযোগিতা ও অর্থকরতা

পাট অর্থকর কৃষি। ধান চাষ করিয়া কৃষকরা যে ফসল তোলে, তাহার একটি মোটা অংশ তাহারা নিজেরা ভোগ করে এবং উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে ছাড়ে। কিন্তু পাটের চাষে কৃষকরা যে ফসল তোলে, তাহার সামান্যতম অংশ তাহারা নিজেরা ব্যবহার করে এবং বাকী সমস্ত পাটই বাজারে বিক্রয় করে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের উপরই পাটচাষ ও পাটচাষীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পাট পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য হওয়ায়, পাটের ক্রয়-বিক্রয় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু পাট ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাতে পাটচাষীরা বিশেষ লাভবান হইতে পারে না। পাটের প্রকৃত ক্রেতা হইল পাটকলগুলি। কিন্তু পাটচাষীরা নিজেরা পাটকলে পাট বিক্রয় করিতে পারে না। তাহারা ব্যাপারী ও ফড়েদের মারফত বিক্রয় করিয়া থাকে। তাই পাটকলগুলি যে দামে পাট কেনে, তাহার একটি মোটা অংশ ব্যাপারী ও ফড়েদের পকেটে যায়। কৃষকরা গরীব। তাই পাট উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা বাজারে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। খুব অল্পসংখ্যক চাষীই উচ্চমূল্য পাইবার সুযোগের প্রতীক্ষায় পাট সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। পাট উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ চাষীই বাজারে পাট বিক্রয় করায়, ঐ সময় বাজারে পাটের আমদানি অত্যধিক হয়। ফলে পাটের দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়। অনেক সময় দাম এমন কমিয়া যায় যে, পাটের উৎপাদনের খরচ তোলাও দুরূহ হইয়া পড়ে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকদিগকে এইরূপ অল্পমূল্যেও ব্যাপারীদের কাছে পাট বিক্রয় করিতে হয়। অনেক সময় ব্যাপারীরা চাষীদিগকে পূর্ব হইতে দাদন দিয়া রাখে। পাট উঠিলেই মন্দার বাজারে কৃষকরা তাহাদিগকে পাট দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে ব্যাপারীরা পাটচাষীদের নিকট হইতে অল্পমূল্যে পাট কেনে এবং উচ্চমূল্যে পাটকলে বিক্রয় করে। ইহাতে ব্যাপারীরাই সিংহের অংশ লয় এবং গরীব চাষীরা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়। যদি পাটচাষীরা সরাসরি পাটকলে পাট বিক্রয়ের সুযোগ পায়, তবে পাটচাষীরা তাহাদের ন্যায্য মূল্য পাইত এবং দেশের পাটচাষ ও পাটচাষীদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হইত। দেশের পাটচাষ ও পাটচাষীদিগকে এই পরিস্থিতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

পাট বিক্রয় ও পাট-চাষীর সমস্যা

কৃষি ঋণ, সমবায় আন্দোলন, সমবায় সমিতি গঠন, পাটের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এখনও এই সকল ব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগ না ঘটায় অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হয় নাই, বৎসরের পর বৎসর পাটচাষীরা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে।
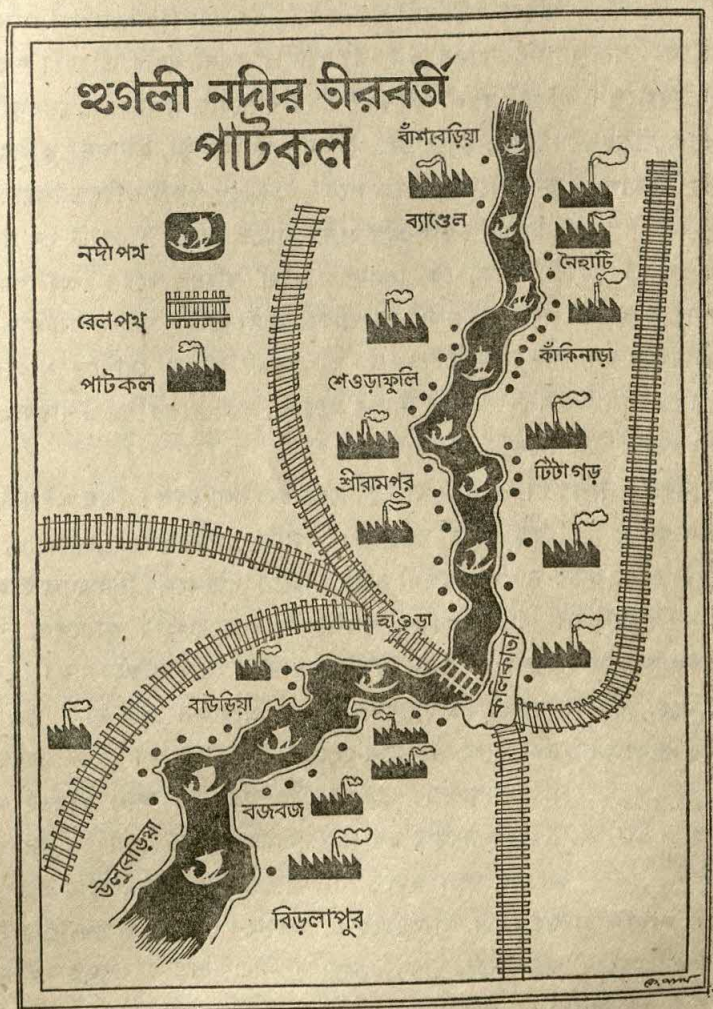
আমরা দেখিতেছি, পাটচাষ পাটকলের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশে পাটের উপযুক্ত পরিমাণ চাষ না হইলে পাটের কলগুলি যেমন চলিতে পারে না, তেমনি দেশে উপযুক্ত সংখ্যক পাটকল না থাকিলেও পাটচাষের ও পাটচাষীদের উন্নতি

সম্ভব নহে। পাটের উপর নির্ভরশীল পাটকলগুলি এবং বহু প্রদেশের অসংখ্য লোক জীবিকার জন্য নির্ভরশীল এই পাটকলগুলির উপর। 1951 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে, ভারতে যে 112টি পাটের কল আছে, সেগুলির মধ্যে 101টি আছে এই পশ্চিমবঙ্গে। পাটকলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এক-একটি শিল্প-নগর (industrial town)। পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি কলিকাতার উপকণ্ঠে ও হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলি হুগলী নদীর দুই তীরে বাঁশবেড়িয়া, ব্যাণ্ডেল, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, হাওড়া, বাউড়িয়া, উলুবেড়িয়া, নৈহাটি, কাঁকিনাড়া, টিটাগড় কলিকাতা, বজবজ, বিড়লাপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া আছে। এইরূপে একটি সুবিস্তৃত শিল্পাঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল পাটকল প্রতি বৎসর ভারতে উৎপন্ন 5 কোটি মণ পাটের মধ্যে প্রায় 3 কোটি মণ পাটকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করে। এই শিল্পাঞ্চল হুগলী নদীর জলপথ এবং কতকগুলি রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। পাট ও পাটজাত দ্রব্য এই জলপথ ও স্থলপথেই চালান হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, পাটচাষ কেবল পাটচাষীদের ভাগ্যই নিয়ন্ত্রণ করে না, ইহা দেশের শিল্প ও পরিবহণেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকে।

পাটের সহিত পাটকলের সম্পর্ক—কৃষির সহিত শিল্পায়নের

পরিবহণ-ব্যবস্থা।—ধান ও পাটের চাষের কথা বলা হইল। কিন্তু এই কৃষিজাত দ্রব্যগুলি স্থানীয় লোকেই ভোগ করে না। আমরা পাটের ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, পাট যেখানেই উৎপন্ন হউক না কেন, হুগলী নদীর তীরবর্তী পাটকলের শিল্পাঞ্চলে তাহাকে প্রেরণ করিতেই হয়। ধানের একাংশ স্থানীয় লোকরা ব্যবহার করিলেও, বিভিন্ন শহরের ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইতে বাকী অংশ স্থানান্তরে যায়। কেবল তাহাই নহে, কৃষিজাত দ্রব্যের দ্বারাই কৃষকদের সকল প্রয়োজন মেটে না। তাহাদের জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রায়ই অন্য স্থান হইতে আসিয়া থাকে। তাই দেশব্যাপী পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন। সুপ্রাচীন কাল হইতেই মানুষ পরিবহণ-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বাংলা দেশে প্রাচীন কাল হইতে পরিবহণের জন্য স্থলে গোযান এবং জলে নৌকা ও জাহাজ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও পথঘাটের উন্নতি হওয়ায় পরিবহণের জন্য মোটর ট্রাক, রেলগাড়ি, স্টীমার প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে। ঠেলাগাড়ি এবং রিক্শাও স্থানীয় পরিবহণের কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মোটর চলাচলের উপযোগী বহু নূতন রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। নদী ও খালসমূহের উপর অসংখ্য সেতু নির্মাণ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানের স্থলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও হইতেছে। ফলে বর্তমানে জলপথের তুলনায় স্থলপথেই পরিবহণের

গরুর গাড়ি, নৌকা, মোটর, রেল, স্টীমার ও বিমান

পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে যে সকল অঞ্চলে নৌকা ও জাহাজের সাহায্য ভিন্ন মাল চলাচলের সুযোগ ছিল না, সেই সকল অঞ্চলেও এখন লরী ও রেলগাড়ির সাহায্যে সহজেই মাল চলাচল ঘটিতেছে। কেবল লরী ও রেলযোগেই নহে, দূরবর্তী স্থানের বহু মাল আজকাল বিমানযোগেও চলাচল করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে চায়ের চাষ।—পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অর্থকর কৃষি হইল চা। পাটের পরেই ইহার স্থান। চা পানের পরিমাণ দেশে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চা সারা ভারতে ব্যবহৃত চায়ের একটি মোটা অংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। বিদেশেও চা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। চা উৎপাদনে ভারত এখন পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এখন পাটের পরেই ইহার স্থান। ইহা এখন প্রতি বৎসর প্রায় 110 কোটি টাকার সম-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে পার্বত্য অঞ্চলেই—দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়—চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। এই দুই জেলায় 138টি চায়ের বাগান রহিয়াছে। এই সকল বাগানে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ কয়েক লক্ষ একর।

অন্যতম প্রধান অর্থকর কৃষি

পশ্চিমবঙ্গের এই উত্তরাঞ্চল চা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চা-চাষের জন্য যেমন প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় বৃষ্টির জলের দ্রুত নির্গমনের। এই পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টির জল পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী হয় না, দ্রুত গড়াইয়া নীচে নামিয়া যায়। চায়ের জন্য সহজে ভাঙে এমন মাটির দরকার। অল্প রৌদ্র-তাপও লাগে। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই চা-চাষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু রহিয়াছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স্‌ অঞ্চলেই চাষের বাগানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রয়োজনীয় ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু

এদেশে চায়ের চাষ ধান ও পাটের চাষের মতো সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত নাই। এখন হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এদেশে চায়ের চাষের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি খুবই আশাপ্রদ অভিমত প্রকাশ করেন। চায়ের বাগানগুলি গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচুর মূলধন এবং চায়ের চা ও চা-শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। তাই এই নব-প্রবর্তিত কৃষিতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরাই সর্বপ্রথম হাত দেন। ইউরোপীয় মালিকানায় এদেশে চায়ের বাগানগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। 1885 খ্রীষ্টাব্দে 2,84,000 একর জমিতে চাষ হয়। ঐ বৎসর উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ছিল 720 লক্ষ পাউণ্ড। 1896 খ্রীষ্টাব্দে,

ভারতে চা-শিল্পের ইতিহাস

মাত্র এগারো বৎসরের মধ্যে, চায়ের চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় 4,33,000 একর এবং উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 1,660 লক্ষ পাউণ্ড। 1955-56 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে জানা যায়, ভারতবর্ষে ঐ সময় চায়ের চাষে 7 লক্ষ 80 হাজার একর জমি ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে চায়ের চাষ ও চা-শিল্প এদেশে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

চায়ের চাষের জন্য সুবিস্তৃত জমি ও সুদীর্ঘ কাল প্রয়োজন হয়। চায়ের চারাগুলিকে ছয় মাস হইতে দীর্ঘ তিন বৎসর কাল পর্যন্ত সযত্নে ও সন্তর্পণে নার্শারিতে রাখিয়া বড় করা হয়। তারপর চা-বাগানের জমি প্রস্তুত করিয়া ঐ চারাগুলিকে ক্ষেতে চারি-পাঁচ হাত অন্তর রোপণ করা হয়। পাতা তুলিবার উপযুক্ত হইতে গাছগুলির তিন হইতে ছয়-সাত বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে। গাছগুলি ঠিকমতো বাড়িলে পাতা তোলা শুরু হয়। এক-একটি গাছ হইতে একনাগাড়ে 30-40 পাউণ্ড পর্যন্ত পাতা তোলা চলে। দার্জিলিংয়ের বহু পুরাতন বাগিচায় শতাধিক বৎসরেরও চা-গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চা-গাছকে বাড়িতে দিলে উহা 19-20 ফুট পর্যন্ত উঁচু হইতে পারে। কিন্তু বেশী পরিমাণে পাতা পাইবার জন্য গাছগুলিকে মাঝে মাঝে ছাঁটিয়া দেওয়া হয় এবং 3-4 ফুটের বেশী উঁচু হইতে দেওয়া হয় না। ফলে গাছগুলি ঝাঁকড়া হইয়া ঝোপের মতো হয়। এইরূপ ঝাঁকড়া ছোট গাছে পাতা তুলিবারও সুবিধা। স্ত্রী-শ্রমিকরাই পাতা তুলিবার কাজ করে। পাতা তুলিতে শ্রমের অপেক্ষা ধৈর্যের বেশী প্রয়োজন হয়, তাই স্ত্রী-শ্রমিকদের দ্বারা এ-কাজ সহজেই করানো যায়। স্ত্রী-শ্রমিকরা গাছগুলির ডাল হইতে কুঁড়িসহ দুইটি পাতা এক-এক করিয়া তোলে। ইহাকে চা-বাগানের ভাষায় "পাতি টেপা" বলে। কিন্তু পাতা তুলিলেই চা উৎপন্ন হইল না। তোলা পাতাগুলিকে শুকাইবার জন্য মেলিয়া দেওয়া হয়। পাতা শুকাইতে উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা সময় লাগে। তখন শুষ্ক পাতাগুলিকে রোলারের চাপে ভাঙিয়া ফেলা হয়। এক-একটি রোলারে প্রায় 300 পাউণ্ড পাতা ধরে, তাহা হইতে প্রায় 100 পাউণ্ড চা হয়। রোলারে-ভাঙা চায়ের পাতাগুলিকে ভাজিয়া সেগুলি হইতে পাতার ডাঁটা বাছিয়া চালুনি দিয়া ছাঁকিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর চা করা হয়। এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে চায়ের বিভক্তকরণকে 'গ্রেডিং' (grading) বলে। গ্রেডিং করা হইলে চা বাক্সে ভর্তি করিয়া কলিকাতার নিলাম-বাজারে পাঠানো হয়। সেখান হইতে চা দেশ-বিদেশে বিক্রয় হয়।

চায়ের চাষ

ফসল তোলা

চায়ের প্রস্তুতি ও বিক্রয়-পর্ব

পাটচাষীদের যেমন সমস্যা আছে, তেমনি সমস্যা আছে চা-শ্রমিকদের। বহু-পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা বিশাল ক্ষেতগুলিতে অসংখ্য কর্মীর সাহায্যে চায়ের

চাষ হইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধান, পাট বা অন্যান্য চাষের সহিত চা-চাষের গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। এত মূলধন বিনিয়োগ ও এইরূপ বহুসংখ্যক কর্মীর সমাবেশের ফলে ইহাতে বড় বড় কল-কারখানার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়িয়াছে। তাই চা-বাগানে যাহারা কাজ করে, তাহাদিগকে কৃষক না বলিয়া বলা হয় "শ্রমিক"।

চা-বাগানের দৃশ্য

চা-শ্রমিকদের সমস্যা

বড় বড় কল-কারখানার মতোই ইউরোপীয় ও ভারতীয় ধনিকরা চা-বাগানগুলির মালিক। তাঁহাদের পরিচালনাধীনেই এই সকল বাগানে কাজ হইয়া থাকে। কল-কারখানার শ্রমিকদের যেমন নানা সমস্যা রহিয়াছে, চা-বাগানের শ্রমিকদেরও রহিয়াছে তেমনি নানা সমস্যা। কল-কারখানাগুলি পার্শ্ববর্তী লোকসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না।

কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পথঘাটের ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে এবং কল-কারখানাগুলিকে লইয়া প্রায় শহরাঞ্চলের মতো পরিবেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে পথঘাটের ভালো ব্যবস্থা না থাকায়, চা-বাগানগুলি পার্শ্ববর্তী লোকসমাজ হইতে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিত। কল-কারখানার মতোই চা-বাগানে বহু প্রদেশের লোক কাজ করে। তাহাদের অধিকাংশই বহিরাগত। পূর্বে ফড়ে বা আড়কাঠিদের সাহায্যেই তাহাদিগকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। পার্শ্ববর্তী লোকসমাজের সহিত যোগ না থাকায়, চা-শ্রমিকদিগকে কতকটা নির্বাসিতের মতো জীবনযাপন করিতে হইত। ধনিকরা তাহাদের শোষণের উপায়রূপেও এই ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। একবার চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত হইলে চা-শ্রমিকদের সেখান হইতে সহজে নিস্তার মিলিত না। চা-মালিকরা তাহাদিগকে নানাভাবে শোষণ করিত। বাহিরের সহিত যোগাযোগ না থাকায় এই শোষণ ও অত্যাচার অবাধে চলিত এবং চা-শ্রমিকরা দুঃখে-দারিদ্র্যে, রোগে-শোকে তাহাদের দুর্বহ জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিত। এখন ক্রমাগত শ্রমিক আন্দোলন, সরকারের হস্তক্ষেপ এবং চা-শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য নানারূপ আইন প্রণয়নের ফলে চা-শ্রমিকদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের বেতন পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, অনেকক্ষেত্রে বোনাস বা লাভের সামান্য কিছু অংশও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। তাহাদের বাসগৃহ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তবে এই চেষ্টা যে এখনও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বন-সম্পদ্।—প্রত্যেক দেশের উন্নতির জন্য তাহার উল্লেখযোগ্য বন-সম্পদ্ থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে অরণ্যের আয়তন যেমন কম, তেমনি কম তাহার বন হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের বাৎসরিক হার। সমগ্র ভারতে এখন মোট 2 লক্ষ 74 হাজার বর্গমাইল বন রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে এবং দক্ষিণাংশে সুন্দরবনে এবং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় কিছু পরিমাণে বন রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বনভূমির আয়তন মাত্র 4,400 বর্গ-মাইল। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় ইহা নগণ্য। সুন্দরবনের সুগভীর অংশের অধিকাংশই পাকিস্তানে পড়িয়াছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে যে বন রহিয়াছে, তাহাও সুগভীর নহে। তাই প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বন-সম্পদ্ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই রহিয়াছে বলিতে হয়। তাই উত্তরাঞ্চলের এই বন-সম্পদ্ দার্জিলিং ও

পশ্চিমবঙ্গের বন-সম্পদ্

জলপাইগুড়ির পার্বত্য অঞ্চলের লোকসমাজের অর্থনীতিতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বনজ সম্পদের মধ্যে কাঠই প্রধান। আদিম কাল হইতে কাঠ মানুষের জীবনের অন্যতম অপরিহার্য বস্তু হইয়া আছে। আধুনিক সভ্য যুগে ইহার ব্যবহার বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। গৃহ-নির্মাণের সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, রেলপথের স্লিপার, নৌকা ও জাহাজের খোল ইত্যাদি নির্মাণে কাঠ অপরিহার্য। দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রভৃতি ও কাগজের মণ্ড তৈয়ারির জন্য কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানিরূপেও কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কাঠ যে মানুষের অন্যান্য কত প্রকার কাজে লাগে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পশ্চিমবঙ্গের বন হইতে শাল, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। শিমুল, শিরিস, শিশু, জারুল, দেবদারু প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার কাঠও পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের বনে। সুন্দরবনে সুঁদরি ও গরান কাঠ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

কাঠ

বন হইতে কেবল কাঠই পাওয়া যায় না। বন হইতে মধু, চামড়া ট্যান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, নানাপ্রকার ভেষজ-উদ্ভিদ, গঁদ, রজন, লাক্ষা, বিড়ির পাতা, রবার প্রভৃতিও পাওয়া যায়। বন নানাভাবে আধুনিক শিল্পের (industry) নানা উপকরণ সরবরাহ করিয়া জাতীয় শিল্পের উন্নতির সহায়তা করে। বনের পশু-পক্ষীও দেশের উল্লেখযোগ্য সম্পদ্।

অন্যান্য বনজ দ্রব্য

বন পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক। দেশের কৃষিকার্যের সহিত অরণ্যের যোগসূত্র রহিয়াছে। অরণ্যের স্নিগ্ধ শ্যামলতা মেঘগুলিকে আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া থকে। তাই যে অঞ্চলের নিকটে নিবিড় অরণ্য আছে, সেখানে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। তাহা ছাড়া, ইহা বন্যা প্রতিরোধে, মৃত্তিকাকে সরস রাখিতে ও মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ করিতে সহায়তা করে। অরণ্যের অসংখ্য বৃক্ষরাজির মূল জাল বিস্তার করিয়া মৃত্তিকা-গর্ভে জল-নিঃসরণের বেগ মন্দীভূত করে। ইহাতে বন্যারোধের সহায়তা হয়। মৃত্তিকার মূলজালে জল বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহা দীর্ঘকাল মৃত্তিকার মধ্যে আটক থাকে; তাই অরণ্য ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকা অধিক দিন সরস থাকে। অরণ্য বৃষ্টির জলধারার নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করায় জলের স্রোতোবেগ মন্দীভূত করে এবং ইহাতে মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ হইয়া থাকে।

বনের পরোক্ষ উপযোগিতা

বন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মানুষের যে উপকার করিয়া থাকে, সেজন্য সকল দেশেই সরকার বনের সংরক্ষণ, নূতন নূতন বনের সৃষ্টি বা বনীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে

আগ্রহশীল। ভারত সরকারও এ-বিষয়ে নানাভাবে সচেষ্ট রহিয়াছেন। দেশব্যাপী বনমহোৎসব, বৃক্ষরোপণে সাহায্য ও উৎসাহ দান প্রভৃতি এই চেষ্টারই অঙ্গ।

বনজ সম্পদ্ যে নানাভাবে জাতীয় সমৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতির সহায়তা করে, তাহাই নহে, ইহা দেশের অসংখ্য লোকের জীবিকারও ব্যবস্থা করে।

পার্বত্য অরণ্যে কাষ্ঠ স্থানান্তরণ-ব্যবস্থা।—নিম্নাঞ্চলের অরণ্যগুলি হইতে কাষ্ঠ সাধারণতঃ যানবাহনের দ্বারাই স্থানান্তরিত করা হয়। নৌকা, রেল, লরী, গরুর গাড়ি প্রভৃতি এ-কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সর্বত্র পথঘাটেরও অভাব নাই। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে পথঘাট ও যানবাহনের সুব্যবস্থা নাই। সমতলভূমির সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল হইতে কাঠ রেল ও লরী যোগে কিছু পরিমাণে চালান দেওয়া হয়। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে রেলপথ বা মোটরের উপযোগী পথ আছে, সেখানেও কিছু পরিমাণ কাঠ রেল ও মোটর যোগে অন্য স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে কাঠ সাধারণতঃ চালান দেওয়া হয় অন্য উপায়ে। এই উপায়টি স্থানীয় লোকসমাজই উদ্ভাবিত করিয়াছে। বনে গাছগুলি কাটিবার পর গাছের সুবৃহৎ শাখাহীন কাণ্ড-গুলিকে হাতীর দ্বারা বা বহুলোকের সমবেত চেষ্টায় নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।
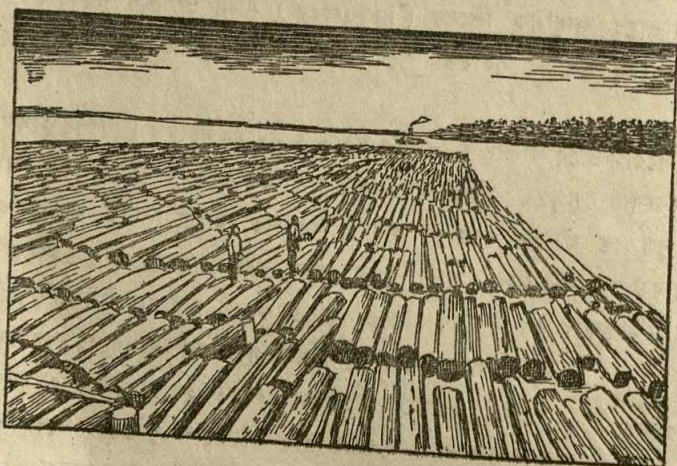
জঙ্গলে কাটা কাঠের খণ্ড ভাসাইয়া আনার পদ্ধতি

অনেক সময় কাণ্ডগুলিকে পর পর একত্র বাঁধিয়া ভেলার মতো করা হয়। পার্বত্য নদীগুলির স্রোত খুবই প্রবল। ফলে কাঠগুলি নদীতে ভাসিতে ভাসিতে স্রোতের টানে নীচের দিকে চলিতে থাকে। ঐ কাঠ নদীর বিভিন্ন স্থানে তুলিয়া লইবার

ব্যবস্থা থাকে। কাঠগুলি বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিলে কাঠগুলিকে তীরে তোলা হয় এবং নৌকায়, জাহাজে বা রেলে করিয়া বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়।
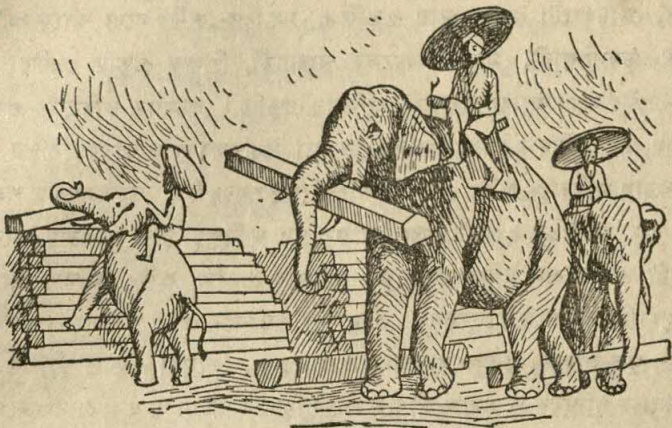
হাতীর দ্বারা কাঠ বহন করানো হইতেছে

সমতল বঙ্গের গ্রামীণ জীবন।—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবন সর্বত্র একরূপ নহে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির সহিত সমতলভূমির মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির বহুল পার্থক্য রহিয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষরা প্রধানতঃ চায়ের চাষ ও অরণ্যে কাজ করিয়া জীবিকার্জন করে। অন্যপক্ষে সমতল-ভূমির লোকরা ধান, পাট প্রভৃতি কৃষি দ্বারা জীবিকার্জন করে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সহিত সমতলভূমির গ্রামীণ জীবনের পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক।

পশ্চিমবঙ্গের সমতল অংশের গ্রামগুলির চেহারা প্রায় একই প্রকার। সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলের কিছু অংশ অত্যধিক নদী-নালায় ও বন-জঙ্গলে পূর্ণ হইলেও, অন্যান্য অঞ্চলে নদী-নালার এই বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। নদী-নালা অত্যধিক থাকিলে যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে, সমতলভূমির বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে তাহা নাই। গ্রামগুলি ঘন-সংবদ্ধ, যেন পরস্পরের সহিত গলাগলি—প্রাকৃতিক সবুজ পরিবেশে শান্তির কোলে গা এলাইয়া দিয়া রহিয়াছে। গ্রামে খড়ে-ছাওয়া মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের সংখ্যাই বেশী। কুটীরগুলির চারিদিকে সবুজ ক্ষেত ও বৃক্ষরাজির সমাবেশ। মধ্যবিত্তদের টালি বা টিনে ছাওয়া মাটির বাড়ীগুলিও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এই বাড়ীগুলি চেহারায় অনেক সময় বেশ বড় হয়। গ্রামে মধ্যে মধ্যে দুই-একটি ধনীর অট্টালিকাও যে দৃষ্ট হয় না, এমন নহে। গ্রামের গৃহগুলির এই প্রকার-ভেদ লক্ষ্য করিলেই গ্রামের সংগঠনের একটা রূপ সহজেই ধরা পড়ে। সেটি হইল এই যে, গ্রামে সাধারণ দরিদ্র মানুষেরই

বসতি বেশী, ধনীর সংখ্যা অত্যল্প এবং মধ্যবিত্তের সংখ্যা মাঝামাঝি। সাধারণ দরিদ্র মানুষের মধ্যে আছে কৃষক, জেলে, তাঁতী, কলু, ছুতার, কামার, কুমোর, মিস্ত্রী, ধোপা-নাপিত, ছোটখাটো দোকানদার প্রভৃতি। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে আছে ধনী কৃষক, সাধারণ ভূম্যধিকারী, মাঝারী ধরনের ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক। ধনিক-শ্রেণীর মধ্যে আছে ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতি। বর্তমানে জমিদারি-প্রথা লোপ পাওয়ায় এবং জমিদার পরিবারগুলির সন্তানরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন জীবিকা গ্রহণ করায় জমিদার-শ্রেণীর লোকরা অধিকাংশই শহরমুখী। তবে সম্প্রতি শহরাঞ্চলে জমির দাম অত্যধিক হওয়ায় এবং লোকসংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ধনী ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠাবান উকিল-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকও গ্রামে নিজ নিজ গৃহাদি নির্মাণ করিতেছেন। গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে পথঘাট নির্মিত হওয়ায়, স্কুল-কলেজ, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল, ক্লাব, সিনেমা প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায়, গ্রামাঞ্চলের পরিবেশ ও সমাজ-জীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং গ্রামগুলি পূর্বেকার এঁদো পুকুরের মতো বদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আর নাই। এখন শহরে যাঁহারা কাজকর্ম করেন, তাঁহাদের একটি বৃহৎ অংশও গ্রামাঞ্চল হইতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছেন। শহরের সহিত গ্রামের এই নিত্য যোগাযোগ ঘটায় গ্রামীণ জীবনে পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, আচার-ব্যবহার ও রুচির দিক হইতে শহরের প্রভাব ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে পড়িতেছে। ফলে গ্রামীণ জীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশের লক্ষ্য হইল শহর ও গ্রামের মধ্যে যে চিরাচরিত পার্থক্য ও ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা দূর করা। গ্রামাঞ্চলে পথঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি ঘটায়, ভারতের গ্রামাঞ্চলেও এই পার্থক্য ও ব্যবধান দূরীকরণে একটি কাজ মন্থরভাবে হইলেও অবিরাম চলিতেছে.।

গ্রামাঞ্চলের এই রূপান্তরের কাজ ক্রমাগত চলিলেও গ্রামীণ জীবনের মূল পর্যন্ত তাহা পৌছিতে অনেক বিলম্ব ঘটিবে। এই বিলম্বের প্রধান কারণ গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য। গ্রামাঞ্চল কৃষিপ্রধান হইলেও, কৃষক সম্প্রদায়—গ্রামাঞ্চলের যাহারা প্রধান স্তম্ভ—আজও দৈন্য-দুর্দশায় জর্জরিত। অন্নাভাবে, অর্থাভাবে, রোগে-শোকে, অশিক্ষায়, ঋণে তাহার জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। তাই শহরের প্রভাব বাহিরে কিছুটা রঙ লাগাইলেও, গ্রামীণ জীবনের অন্তস্থলে আজও তাহা প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সমতল বঙ্গের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মে। নদী-নালা, খানা-ডোবা ও পুষ্করিণী সমতল বঙ্গে প্রচুর পরিমাণে থাকায়, এখানকার লোকরা মাছ খাইতে অতিশয় অভ্যস্ত। সমতল বঙ্গে শাক-সব্জির চাষও হয় প্রচুর

পরিমাণে। তাই ভাত ও মাছের মতোই শাক-সব্‌জিও এখানে অন্যতম প্রধান খাদ্য। আম, কাঁঠাল, কলা, জাম, জামরুল, শসা, ফুটি, তরমুজ, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি প্রচুর সুস্বাদু ফল এখানে উৎপন্ন হয়। তাহাও সমতল বঙ্গের খাদ্য-তালিকায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। সমতল বঙ্গে ঘাস-খড় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ফলে এখানে গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পালিত হয়। ফলে সমতল বঙ্গের অধিবাসীদের খাদ্যে দুধ, ঘি, দধি, ছানা, মাংস প্রভৃতিও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। মুরগী এবং হাঁসও প্রচুর পরিমাণে গ্রামাঞ্চলে পালিত হয়। সেগুলির ডিম এবং মাংসও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারে। এককথায়, পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা সমতল বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্নতা ও প্রাচুর্য অধিক।

খাদ্য

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল শীতপ্রধান হওয়ায়, সেখানকার অধিবাসীরা অধিক পরিমাণে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু নিম্নবঙ্গে শীতের প্রাধান্য না থাকায়, এখানে সাধারণ মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের তেমন বাহুল্য নাই। পোশাকের দিক হইতে তাহাদের জীবন অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর। তবে সম্ভবতঃ শহরের প্রভাবেই বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদের মান পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হইতে দেখা যায়।

পরিচ্ছদ

গ্রামবাসীদিগকে পেশার দিক হইতে কৃষক, তাঁতী, জেলে, কলু, কামার, কুমোর, ছুতারমিস্ত্রী, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কৃষকদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁতীদের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে কলের কাপড আমদানি হইবার ফলে বেশ হ্রাস পাইয়াছিল। এখন কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য দেশে সরকারীভাবে চেষ্টা চলায় এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁতের ধুতি, শাড়ি প্রভৃতির চাহিদা বাড়ায়, গ্রামাঞ্চলে তাঁতশিল্পের উন্নতি হইতেছে এবং তাঁতীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। বহু কৃষক অবসর-সময়ে আয়-বৃদ্ধির জন্য তাঁতের কাজ করিয়া থাকেন। মাছ ধরা ও মাছের ব্যবসায়ের দ্বারা গ্রামাঞ্চলের বহুসংখ্যক লোক জীবিকার্জন করে। মৎস্য-চাষের দ্বারাও গ্রামাঞ্চলের বহুলোক নিজ নিজ আয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কলু, কামার, কুমোর প্রভৃতির ব্যবসায় পূর্বের মতো লাভজনক না হইলেও, গ্রামাঞ্চলে ইহাদের সংখ্যা এখনও নিতান্ত অল্প নহে। ঘানিতে তৈয়ারী তৈলের ব্যবহার নানা কারণে হ্রাস পাইয়াছে এবং কলে তৈয়ারী তৈলই আজ গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। তাই কলুদের আয় পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলে ঘানির অভাবও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাইতেছে। কলে তৈয়ারী লোহা ও ইস্পাতের জিনিস গ্রামাঞ্চলের লোকরাও নিত্য ব্যবহার করিতেছে। তবে লাঙলের ফলা, দা, কাটারি, বঁটি

প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য অনেক বস্তুর জন্য আজও গ্রামাঞ্চলে মানুষকে কামারের দ্বারস্থ হইতে হয়। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র শান দেওয়ার জন্যও গ্রামাঞ্চলে কামারদের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে। লোহার কড়াই, অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি প্রভৃতি রন্ধন-পাত্র, অ্যালুমিনিয়মের, কাচের, চীনামাটির বাসনকোসন ও পাত্রাদি গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে চালু হওয়ায়, কুমোরদের পূর্বেকার সেই আয় এখন আর নাই। একথা সত্য হইলেও, নিম্নবঙ্গের মৃৎশিল্প আজও গ্রামাঞ্চলের জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। মৃৎশিল্পের কথা বলিলে, মাটির পুতুল ও প্রতিমার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বহু স্থানের লোকরা এ-বিষয়ে এখনও অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। নিম্নবঙ্গে মৃত্তিকা দিয়া যে ধরনের প্রতিমা নির্মাণ করা হইয়া থাকে, ভারতের অন্যত্র তাহা কোথাও হয় না। তাই নিম্নবঙ্গে হিন্দু পরিবারে ও প্রতিষ্ঠানসমূহে মৃত্তিকা-নির্মিত প্রতিমাপূজা এমন ব্যাপক-ভাবে হয় যে, তাহার অন্যত্র আর তুলনা মেলে না। গ্রামাঞ্চলে পিতল-কাঁসার বাসন, মাদুর, কাঠের জিনিসপত্রও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলে পাস-করা চিকিৎসকের অভাব থাকিলেও, হাতুড়ে চিকিৎসক ও কবিরাজদের অভাব নাই। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এবং বহু স্থানে শিক্ষিত চিকিৎসকরা চিকিৎসার জন্য বসায়, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার ব্যবস্থাও পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে।

বিভিন্ন পেশা

এখন প্রত্যেক গ্রামেই প্রায় প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বহু উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। সরকার হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রামাঞ্চলে বহু নৈশ বিদ্যালয়ও খোলা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বহু নারীকল্যাণ সমিতি প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্থাও গঠিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ক্লাব ও পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের ধনী, মধ্যবিত্ত, এমন কি বহু অল্পবিত্ত, পরিবারও আজকাল বেতারযন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলে ডাকঘরের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়াছে। ফলে শিক্ষায়, বাহিরের সহিত যোগাযোগে ও পরিচয়ে গ্রামাঞ্চল পূর্বের সেই জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া এক নবজীবনের আস্বাদ পাইয়াছে। গ্রামের নিজস্ব আমোদ-প্রমোদগুলিও গ্রামাঞ্চলে রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা প্রায়ই নানারূপ পালপার্বণে মিলিত হয়। যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি গ্রামবাসীদের জীবনকে আনন্দমুখর করিয়া তোলে। গ্রামবাসীরা বিভিন্ন অঞ্চলে নানারূপ লৌকিক দেবদেবীর পূজা করে। মেলাগুলি গ্রামীণ জীবনের বৈশিষ্ট্য হইয়া আছে। মকরসংক্রান্তি, চড়ক প্রভৃতির মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা-সংস্কৃতি

গ্রামের নিজস্ব আমোদ-প্রমোদ

পার্বত্য গ্রাম ও নগর।—দক্ষিণবঙ্গের সমতল অঞ্চলের গ্রামগুলির সহিত উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামগুলির বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সকল পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামও আবার একরূপ নহে। যাহাই হউক, পার্বত্য গ্রামগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ে বা উপত্যকায় নদীর ধারেই গড়িয়া উঠে। কারণ, জীবনধারণ, দৈনন্দিন ব্যবহার ও কৃষিকার্যাদির জন্য জলের একান্তই প্রয়োজন। অনেক সময় ঝরনা, প্রস্রবণ ও কূপকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রামগুলি গড়িয়া উঠে। পার্বত্য গ্রামগুলি সমতলভূমির গ্রামগুলির মতো জনবহুল ও ঘন-সন্নিবদ্ধ নহে। জীবিকার প্রকার-ভেদে ও জীবিকার্জনের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য অনুসারেও গ্রামগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা কম-বেশী হয়। আকার বা গড়নের দিক হইতে পার্বত্য গ্রামগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে
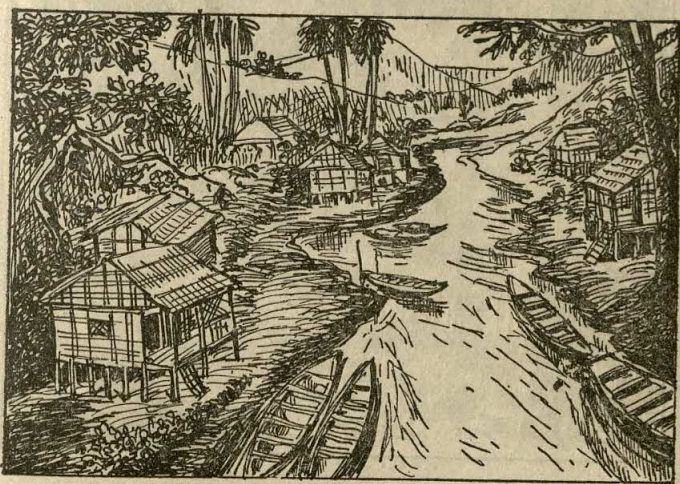
পার্বত্য অঞ্চলের একটি পাহাড়ী গ্রাম

বিভক্ত করা যায়। একধরনের গ্রামের আকার বৃত্তাকার হয় এবং ঐ সকল গ্রামের বাড়ীগুলি ঝরনা, প্রস্রবণ বা কূপকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে বিন্যস্ত থাকে। পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে আর একধরনের গ্রাম দেখা যায়। ইহাতে বৃত্তাকারে বন পরিষ্কার করিয়া পশুচারণ-ক্ষেত্র রচনা করা হয় এবং গ্রামের কুটীরগুলি থাকে এই পশুচারণ-ক্ষেত্রের ধারে ধারে। আবার অনেক গ্রাম চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রের আকারে গড়িয়া উঠে। ঐ আয়তক্ষেত্রের মধ্যস্থলে থাকে চতুষ্কোণ কৃষিক্ষেত্র এবং সেই কৃষিক্ষেত্রের ধারে ধারে গ্রামের কুটীরগুলি গড়িয়া উঠে। আবার এক শ্রেণীর পার্বত্য গ্রাম আছে, সেগুলি বৃত্তাকারে বা চতুষ্কোণ

পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম

আয়তক্ষেত্রের আকারে গড়িয়া না উঠিয়া, পার্বত্য নদীর তীর বা সংকীর্ণ উপত্যকার পাড়-বরাবর সুদীর্ঘ রেখার মতো গড়িয়া উঠে। আরও এক শ্রেণীর পার্বত্য গ্রাম দেখা যায়, সেগুলি পর্বতের পাদদেশ হইতে ত্রিকোণাকার হইয়া পর্বতের গা বাহিয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়, গ্রামের বেশীর ভাগ গৃহ নীচের অংশেই থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু অনুসারে, গ্রামের গৃহগুলি বিভিন্ন প্রকারের ও আকারের হয়। নিম্নবঙ্গে যেমন মৃত্তিকার দেওয়াল ও খড়ে-ছাওয়া কুটীরই বেশী দেখা যায়, পার্বত্য অঞ্চলে তেমনি কাঠ দিয়া তৈয়ারী ঘর-বাড়ীই বেশী। পাথর দিয়া অনেক স্থানে গৃহ নির্মিত হইয়া থাকে।

পার্বত্য অঞ্চলের একটি পাহাড়ী শহর

পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামের মতোই পার্বত্য অঞ্চলের শহরগুলিও হয় নানাপ্রকার। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে এইরূপ পার্থক্য ঘটে। কোন কোন পার্বত্য শহরে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা থাকে, আবার কোন কোন পার্বত্য শহরে থাকে কেবল কাঠের বাড়ী। শীতপ্রধান অঞ্চলের গৃহগুলির ছাদ এমনভাবে ঢালু রাখা হয়, যাহাতে বরফ দাঁড়াইতে না পারে। পার্বত্য শহরগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়েই গড়িয়া উঠে। তাই পার্বত্য শহরের বাড়ীগুলি পর্বত-গাত্রে বিভিন্ন উচ্চতায় থাকে—শহরের একাংশ থাকে পাহাড়ের নিম্নাংশে, আবার অন্যাংশ থাকে পাহাড়ের ঊর্ধ্বাংশে। সমতলভূমির শহরের মতো পার্বত্য ভূমির শহরগুলির গৃহসমূহ এমন ঘন-সন্নিবিষ্ট নহে; ফলে অলিগলির

শহর

সংখ্যাও কম। সমতলভূমির শহরগুলির মতো এত বেশী জনবসতি নাই এই সকল পার্বত্য শহরে।

প্রশ্নাবলী

1. Trace the importance of paddy cultivation in the economic life of West Bengal as well as India. [পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে ধানচাষের গুরুত্ব আলোচনা কর।]

2. What are the different types of paddy cultivated in West Bengal? Give a brief description of the methods of those different types of paddy. [পশ্চিমবঙ্গে কি কি ধরনের ধানচাষ হইয়া থাকে? ঐ সকল বিভিন্ন ধরনের ধানচাষের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।]

3. Describe the cultivation of jute in West Bengal. Trace its importance in the economy of our country. Describe the economic problem of the jute producing peasantry of West Bengal. [পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষীদের সমস্যা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

4. Describe the plantation and manufacture of tea in North Bengal. How does it differ from paddy and jute cultivation? [উত্তরবঙ্গে চায়ের চাষ ও উৎপাদন বর্ণনা কর। ধান ও পাট উৎপাদনের সহিত ইহার পার্থক্য কি?]

5. Trace the importance of forests in our economic life. How are the timbers carried from the hills to the downs? [আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে অরণ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর। কাঠগুলি কিভাবে পাহাড় হইতে নিম্নে পাঠানো হইয়া থাকে?]

6. Describe the village life of lower Bengal. [নিম্নবঙ্গের গ্রামীণ জীবন বর্ণনা কর।]

7. Describe the villages and towns in the hilly regions of India. [ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম ও শহরের বর্ণনা দাও।]
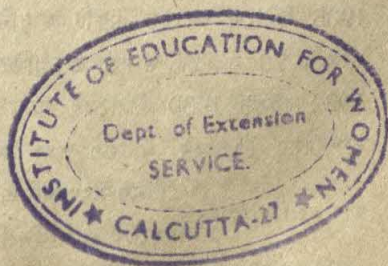
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্প

প্রাচীন কালে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশিল্পেরও উন্নতি শুরু হইয়াছিল। কিন্তু তখন শ্রমশিল্প প্রধানতঃ কুটীরশিল্পই ছিল, আধুনিক কল-কারখানার মতো কিছুই ছিল না। যাহাই হউক, ভারতকে তখন দুনিয়ার কারখানা (workshop) বলা হইত। বিশ্বের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলও ছিল ভারতবর্ষ। চাউল, গম, চিনি ও কার্পাস ছাড়াও ভারতবর্ষ সুতী কাপড়, রেশমী কাপড় ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য সভ্য বহির্বিশ্বে রপ্তানি করিত। ভারতীয় রেশম ও সুতী বস্ত্র, ধাতব দ্রব্যসামগ্রী, কাষ্ঠ-নির্মিত দ্রব্য, হস্তিদন্ত-নির্মিত সামগ্রীর জন্য ভারতীয় শ্রমশিল্পীরা জগতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ভারতের মসলিন বহির্বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত হইয়াছিল। বাংলা দেশও কুটীরশিল্পের জন্য পৃথিবীতে সুবিখ্যাত ছিল। বাংলার শিল্পজাত বস্ত্র বিশ্বের সর্বত্রই আদৃত হইত। অন্যান্য বহু শিল্পেও বাংলা দেশ পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। কিন্তু ইউরোপে যন্ত্র-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্পের দিন ফুরাইল। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ দেশগুলিতে বড় বড় কল-কারখানা গড়িয়া উঠিল। কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের প্লাবনে দুনিয়ার বাজারগুলি ভাসিয়া গেল। ভারতবর্ষ ঐ সময় পরাধীন থাকায় ইংলণ্ডের বাজারে পরিণত হইল। আইন করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানি বন্ধ করা হইল, এমন কি ভারতেও বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ফলে ইংলণ্ডে উৎপন্ন অসংখ্য দ্রব্য ভারতে বিক্রীত হইতে লাগিল, ভারতীয় শ্রমশিল্পীগণের রুজি-রোজগার গেল, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের কল-কারখানার কাঁচামাল সরবরাহের জন্য সুবিশাল কৃষিক্ষেতে পরিণত করা হইল। ফলে ভারত তথা বাংলার শিল্প মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। কিন্তু এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের উপযোগী খনিজ দ্রব্য, কাঁচামাল ও সুলভ শ্রমিকের অভাব ছিল না। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দেশীয় ও বিদেশীয় মূলধনে কিছু সূতার কল, পাটের কল ও কয়লার খনিতে কাজ শুরু হয় এবং ভারত শিল্পায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ করে। কাগজের কল, চামড়ার কারখানা প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। 1908 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে একটি আধুনিক লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হয়। পরবর্তী 70 বৎসরে ভারত দ্রুতগতিতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকে। 1922 হইতে 1939 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন দ্বিগুণের অধিক, ইস্পাতের উৎপাদন আটগুণ এবং কাগজের উৎপাদন প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পায়।

ভারতের নব-শিল্পায়ন

চিনির উৎপাদন এতই বৃদ্ধি পায় যে, দেশে উৎপন্ন চিনি হইতেই দেশের প্রয়োজন মিটে। সিমেন্টের উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে বাড়ে, 1935-36 খ্রীষ্টাব্দে দেশের প্রয়োজনীয় সমগ্র সিমেন্টের শতকরা 95 ভাগ

দেশেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের শিল্পায়নকে আরও দ্রুত করিয়া তোলে। বস্ত্র, কাগজ, চিনি, ইস্পাত, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ ও ধাতু-নির্মিত নানা সামগ্রী, ঔষধপত্র, চামড়ার জিনিস, নিত্যব্যবহার্য অসংখ্য দ্রব্যাদি, নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং সামরিক দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে থাকে। বহু নূতন নূতন শিল্পও দেশে গড়িয়া উঠে। এইভাবে যুদ্ধের শেষে ভারত পৃথিবীতে শিল্পপ্রধান প্রথম আটটি দেশের মধ্যে স্থান পায়।

পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতাতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। পরেও সুদীর্ঘকাল কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা অবস্থিত হওয়ায় কলিকাতা কেবল ভারতের সর্ববৃহৎ নগরে নহে, ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দরেও পরিণত হইয়াছিল। তাই কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই শিল্পায়নের সূত্রপাত হইয়াছিল। শিল্পায়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে কয়লা, তাহা পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জেই ভারতে সর্বপ্রথম 1854 খ্রীষ্টাব্দে তোলা হইয়াছিল। 1822 খ্রীষ্টাব্দে ঘুসুড়িতে সর্বপ্রথম কার্পাস বস্ত্রের কল স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতার সন্নিকটে 1854 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পাটশিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 1870 খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম কাগজের কলও স্থাপিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, ভারতের এই নব-শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ছিল। কিন্তু প্রথম যুগে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে শিল্পায়নের ব্যাপারে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ মূলধনের অভাব, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত কর্মী, কারিগর ও শ্রমিকের অভাব, তৃতীয়তঃ প্রয়োজনীয় কল ও যন্ত্রপাতির অভাব, চতুর্থতঃ পথঘাট ও যানবাহনের অসুবিধা, পঞ্চমতঃ সরকারের ঔদাসীন্য ও বহুক্ষেত্রে বিরোধিতা। এই সকল অসুবিধা যে এখন সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত হইয়াছে, তাহা নহে ; তবে অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে এবং ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। সরকারও উদ্যোগী হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের সূচনা

প্রাথমিক অসুবিধা

পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য প্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, চিনিশিল্প, চা-শিল্প, কাচশিল্প, কাগজশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, চর্মশিল্প, রবার-শিল্প, দিয়াশলাই-শিল্প প্রভৃতিই প্রধান। বর্তমানে মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা এবং রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানাও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সাইকেলের কারখানা, বৈদ্যুতিক ও বেতার যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা, সেলাইকল নির্মাণের কারখানা, মোটর মেরামতের কারখানা প্রভৃতিও ন্যূনাধিক পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শিল্পই কলিকাতার আশেপাশে গড়িয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্প

আসানসোল অঞ্চলে কয়লা ও খনিজ সম্পদ্ থাকায়, উহার নিকটবর্তী স্থানেও একটি সুবিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, উহার বেশীর ভাগই অবাঙ্গালীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য অবাঙ্গালী শ্রমিকও খাটিতেছে।
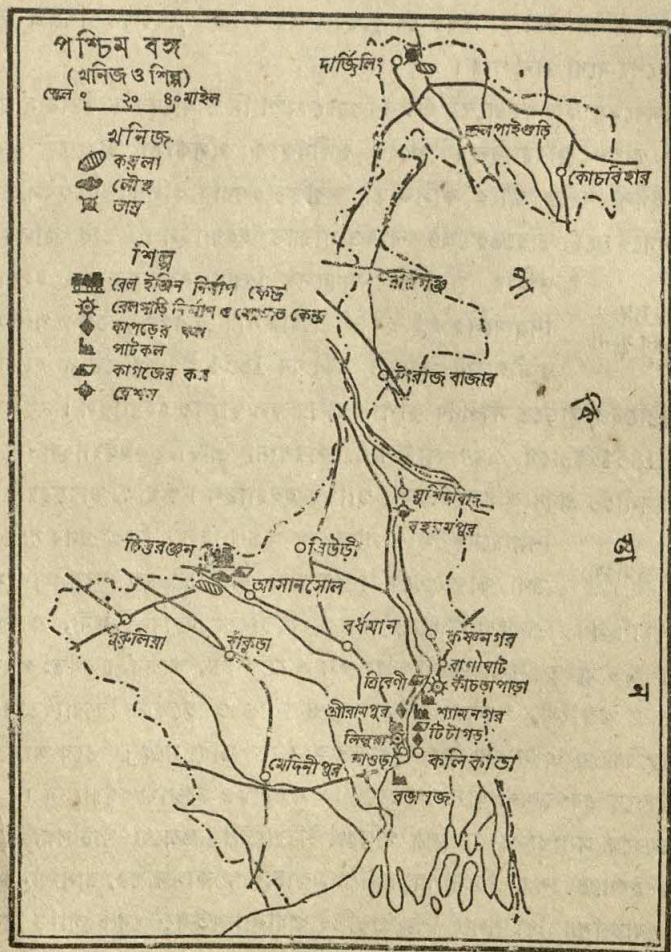
আধুনিক শিল্পায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কয়লা ও লোহা। তাই কয়লা ও লৌহ শিল্পকে মৌল শিল্প (basic industry) বলা হয়। এই দুইটি খনিজ সম্পদ্ পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কয়লা ও লোহার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলিয়া, বর্ধমান জেলার আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খনি।—আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় ছয়শত বর্গ-মাইল জুড়িয়া কয়লার খনি রহিয়াছে। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন, এই অঞ্চলে প্রায় 800 কোটি টন কয়লা ভূগর্ভে রহিয়াছে। এই অঞ্চলের কয়লা-খনিগুলি বেশ গভীর, রানীগঞ্জ অঞ্চলে 2,000 ফুটেরও অধিক নিম্নে কয়লার স্তর রহিয়াছে। রানীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি ভারতের গভীরতম কয়লার খনি। কয়লার খনিগুলি এই অঞ্চলে অত্যধিক গভীর হওয়ায় কয়লা তুলিবার জন্য খরচও হয় অত্যধিক। যাহাই হউক, আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চল হইতে সারা ভারতের প্রয়োজনীয় কয়লার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মোট 280টি কয়লার খনির মধ্যে 279টি কয়লার খনি রহিয়াছে এই আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে। বাকী একটি খনি রহিয়াছে দার্জিলিংয়ে। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়।

আধুনিক জগতে কয়লা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক কল-কারখানাগুলি চালু রাখিবার জন্য কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তি অপরিহার্য। আবার বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনেও কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কল-কারখানার গৃহাদি, ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি যে লৌহ ও ইস্পাত না হইলে হয় না, সেই লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনেও কয়লা অপরিহার্য। রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির চলাচলও কয়লার উপর নির্ভরশীল। গৃহ ও আধুনিক যানবাহনের উপযোগী পথঘাট নির্মাণের জন্য যে ইট, টালি, পিচ প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলিও কয়লা না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না। কয়লা হইতেই আলকাতরা এবং গ্যাস উৎপন্ন হয়। কয়লা হইতে বহু প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমানে শহরে এবং বহু গ্রামাঞ্চলেও কয়লা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কয়লা যে আধুনিক সভ্যতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহা অনস্বীকার্য। কয়লাকে আধুনিক শিল্প-সভ্যতার প্রাণশক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

1774 খ্রীষ্টাব্দে আসানসোল মহকুমার সীতারামপুর গ্রামের সন্নিকটে প্রথম কয়লা পাওয়া যায়। তারপর 1854 খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জ কয়লার খনি হইতে কয়লা তোলা শুরু হয়। কিন্তু দেশে বৃহৎ কল-কারখানা না থাকায় কয়লার খনিগুলি তেমন আশানুরূপ লাভজনক হয় না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (1914—18) কয়লার চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পায় এবং কয়লার খনিগুলি বেশ লাভজনক হইয়া উঠে। কিন্তু যুদ্ধের পর কয়লার খনিগুলি পুনরায় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। বিশ্বব্যাপী মন্দা, রেলের অত্যধিক মাশুল ও কয়লা প্রেরণে ব্যয়াধিক্য ও অসুবিধা, স্থানীয় চাহিদার অভাব প্রভৃতিই এই সঙ্কটের প্রধান কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (1939—45) বাধিবার ফলে পুনরায়

কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং কয়লার খনিগুলি দ্রুত লাভজনক হইয়া উঠে। দেশেও এই সময় বহু কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতেও কয়লার চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতালাভের (1947) পর দেশময় যে ব্যাপক শিল্পায়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে কয়লার চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে কল-কারখানা যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কয়লার ব্যবহার যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে কয়লার চাহিদা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং কয়লা-খনির ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই।

কয়লা-খনির দৃশ্য।—এক-একটি খনি এক-একটি সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থিত। ইহার দুইটি অংশ—একটি মাটির উপরে এবং একটি মাটির নীচে। কিন্তু উভয় অংশ মিলিয়াই খনির একটি অখণ্ড জগৎ। উপর ও নীচের যোগাযোগ এতই ঘনিষ্ঠ যে, তাহাকে পৃথক করিয়া ভাবা যায় না। অবশ্য, খনির উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। খনির উপরে অনেকগুলি ছোট-বড় পাকাবাড়ী ও সারি সারি বস্তি চোখে পড়ে। ছোট-বড় পাকাবাড়ীগুলিতে থাকে খনির ম্যানেজার, বড়বাবু, ইঞ্জিনিয়ার, খাজাঞ্চীবাবু, হাজিরাবাবু, বিজলীবাবু (ইলেকট্রিসিয়ান), কম্পাস-বাবু প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিদের অফিস, ডাক্তারখানা, স্টোর ও দোকানপাট, গুমটিঘর, ইঞ্জিনঘর, শ্রমিকদের বাতি রাখিবার ঘর এবং পদস্থ কর্মচারীদের বাসা। বস্তিগুলি শ্রমিকদের বাসস্থান বা কুলীধাওড়া। খনির উপরে আর একটি জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। সেটি হইল খনিগর্ভ হইতে উপরে মাল তুলিবার এবং মানুষের ওঠা-নামা করিবার জন্য খনিমুখে বসানো একটি যন্ত্র-চালিত ডুলি। চোখে পড়ে আরও একটি জিনিস—খনি হইতে তোলা কয়লা বহনের জন্য ট্রলি বা টবগাড়িগুলি। মাটির তলাতেই খনির আসল জগৎ। ওখানেই শত শত শ্রমিক অবিরাম কাজ করে। তাহারা ক্রমাগত সুড়ঙ্গের আকারে গাঁইতির সাহায্যে কয়লা কাটিয়া কাটিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কাটা কয়লাগুলিকে বেলচার সাহায্যে তুলিয়া টবগাড়িতে বোঝাই করিয়া উপরে তোলা হয়। কয়লা কাটিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে মাঝে মাঝে কয়লার থাম বা কাঁথি রাখিয়া যাওয়া হয়। শ্রমিকদের মাথার উপরের কয়লা ও মৃত্তিকা এই থামগুলির উপরই ভর করিয়াই যথাস্থানে থাকিতে পারে এবং খনিগর্ভটি কয়লা তুলিয়া লওয়ার পর বড় বড় স্তম্ভযুক্ত দালান বা গুহাগৃহের আকার ধারণ করে। কিন্তু এই কয়লার থামগুলিকেও শেষ পর্যন্ত রাখা হয় না, এগুলি হইতেও কয়লা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়। ঐ সময় খনির ছাদে খুঁটির ঠেক দিয়া তাড়াতাড়ি কয়লাগুলিকে খোঁচাইয়া নামানো হয়। ছাদের গায়ে যে কয়লা থাকে, তাহাও কাটিয়া লওয়া হয়। ছাদের কয়লা কাটা হইলে ছাদগুলি ধ্বসিয়া পড়ে এবং ভূ-পৃষ্ঠের জমি বসিয়া

যায়। খনি অঞ্চলে গেলে এইরূপ বসিয়া-যাওয়া ভূ-পৃষ্ঠ সর্বত্রই চোখে পড়ে। খনিতে শ্রমিকদিগকে নানা বিপদের ঝুঁকি লইয়া অতিশয় সতর্কভাবে কাজ করিতে হয়। খনিতে ধস নামিলে শ্রমিকদের সমূহ বিপদ্। সামান্য অসতর্কতার ফলেও এইরূপ ধস নামা অসম্ভব নহে। খনির মধ্যে শ্রমিকরা যখন যায়, তখন তাহারা নানারূপ বিপদ্, এমন কি জীবন্ত সমাধিলাভের সম্ভাবনা বুকে লইয়াই যায়। তাই খনি-শ্রমিকরা যথা-সম্ভব পবিত্রমনে খনিতে নামে। খনিতে কাজ করিবার সময়ে তাহারা গোলমাল, হৈচৈ বা নোংরা ঠাট্টা-পরিহাস করে না। খাতের মধ্যে গোলমাল করাও নিষিদ্ধ। কারণ শব্দ কয়লার গায়ে প্রতিহত হইলে কয়লার ধস নামিতে পারে। ধস নামা ছাড়া অন্যান্য নানাপ্রকার মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনাও আছে এখানে। অনেক সময় হঠাৎ খাতে জল উঠিতে থাকে এবং জলের স্রোতে কয়লা আল্‌গা হইয়া ধস নামে,
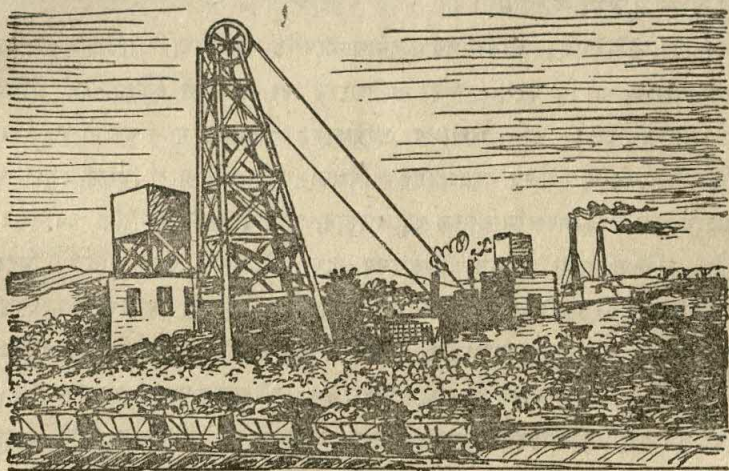
কয়লা-খনির একাংশ

এমন কি খনিগর্ত প্লাবিতও হইয়া যায়। অনেক সময় আবার খনিগর্ভে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং এই বিস্ফোরণের ফলে ধস নামে ও আগুন জ্বলিয়া উঠে। চারিদিকে অফুরন্ত কয়লা থাকায় এই আগুন সহজে নিবানো যায় না। তখন আগুনে বালি চাপা দিয়া খাতগুলি জলে ডুবাইয়া, খাতগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ভূগর্ভে এই আগুন বৎসরের পর বৎসর জ্বলিতে থাকে, উপর হইতেও ঐ আগুন অনেক সময় দেখা যায়।

খনিগর্ভে এইরূপ নানাবিধ বিপদের ঝুঁকি লইয়া হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। 1949 খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসাব অনুসারে, এদেশে কয়লা-খনি শ্রমিক ও

স্ত্রী-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে একাশি হাজার। খনিগুলিতে বিভিন্ন প্রদেশের লোক কাজ করে। আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লা-খনি অঞ্চলে সাধারণতঃ বিহার হইতেই শ্রমিক আমদানি করা হয়। এই শ্রমিকরা সারা বৎসর কাজ করে না, কৃষিকার্যের সময়ে তাহারা নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়। ঐ সময়ে খনি অঞ্চলে কাজের অসুবিধা হয়। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে খনিগুলিতে আধুনিক উন্নতধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করা হইয়া থাকে। অনেক সময় শ্রমিকের অভাব বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে মিটানো হয়। তবে প্রায় সকল খনিতেই যন্ত্রের পরিবর্তে হাতেই কয়লা কাটা হয়। ইউরোপের খনি-শ্রমিকদের তুলনায় এদেশীয় খনি-শ্রমিকদের দক্ষতা কম। যেখানে ইংলণ্ডের একজন খনি-শ্রমিক বৎসরে প্রায় 300 টন কয়লা তোলে, তখন এদেশীয় শ্রমিক বৎসরে 200 টনের বেশী কয়লা তুলিতে পারে না।

অবশ্য, ইউরোপীয় শ্রমিকদের তুলনায় এদেশীয় শ্রমিকরা পারিশ্রমিকও পাইয়া থাকে অনেক অল্প। ফলে এদেশীয় শ্রমিকদের দেহ ও স্বাস্থ্য ইউরোপীয় শ্রমিকদের মতো ভালো নহে। খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবনের মান আদৌ উন্নত নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া কুলী-ধাওড়ায় বাস করে এবং নিজ নিজ ধর্ম, সংস্কার, আচার ও রীতি-নীতি যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে বিভেদের ভাব নাই। নিজেদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ও জীবনের মান উন্নত করিবার জন্য তাহারা আজকাল সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতেছে। এই সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে তাহাদের পারিশ্রমিক পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনের মানও অনেকখানি উন্নত হইয়াছে। খনির খাতের ভিতর অনেক সময় খনি কর্তৃপক্ষের অতি লোভ ও অসতর্কতার ফলে দুর্ঘটনা ও শ্রমিকদের বিপদ্ ঘটে। তাহা হ্রাস করিবার জন্য সরকার নানা আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সচেষ্ট আছেন। শ্রমিকরাও সচেতন হওয়ায় খনির বিপজ্জনক খাতে তাহাদের খাটানোর পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। শ্রমিকদের বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি করিবার জন্য সরকার, খনির কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংঘগুলি চেষ্টা করিতেছেন।

খনি-শ্রমিকদের অবস্থা

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।—দেশের শিল্পায়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কয়লা যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনই একান্ত প্রয়োজন লৌহ ও ইস্পাত। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিও আসানসোলের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা থাকায়, আসানসোলের নিকটবর্তী বার্নপুর-কুলটি-হীরাপুর

অঞ্চলে সহজেই লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। 1889 খ্রীষ্টাব্দে কুলটি ও হীরাপুরে "বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি" নামে একটি লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। 1922 খ্রীষ্টাব্দে এখানে "ইণ্ডিয়ান্ আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি" নামে আরও একটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত শিল্পপতি আর্. এন্. মুখার্জী মার্টিন অ্যাণ্ড বার্ন কোম্পানির সহযোগিতায় বার্নপুরে একটি লোহা ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন—ইহার নাম "স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল"। 1936 খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি ইহার সহিত যুক্ত হয়। 1952 খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি আইন অনুসারে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিকল্পে কুলটি-হীরাপুরের ইণ্ডিয়ান্ আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি বার্নপুরের স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গলের সহিত মিলিত হয় এবং এই মিলিত কোম্পানির নাম হয় "দি ইণ্ডিয়ান্ আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড"। এই মিলনের ফলে লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানিগুলির মধ্যে অহেতুক প্রতিযোগিতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 1953 হইতে 1956 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েক বৎসরে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক 15 কোটি টাকা, ভারত সরকার কর্তৃক 10 কোটি টাকা এবং অন্যান্যভাবে 6 কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ফলে 1952-53 খ্রীষ্টাব্দে এখানে যখন মাত্র 3 লক্ষ টন ইস্পাত ও $1\frac{1}{2}$ লক্ষ টন কাঁচা লোহা (pig iron) উৎপন্ন হইয়াছিল, 1957 খ্রীষ্টাব্দে তখন 7 লক্ষ টন ইস্পাত ও 4 লক্ষ টন কাঁচা লোহা উৎপন্ন হইয়াছে। এই মিলনের ফলে শ্রমিকের সংখ্যাও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিলনের পূর্বে 1950 খ্রীষ্টাব্দে ঐ কোম্পানি দুইটি প্রায় পনের হাজার শ্রমিক নিয়োগ করিত। এখন এই মিলিত প্রতিষ্ঠানে বিশ হাজারের অধিক সংখ্যক শ্রমিক কাজ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে আর একটি লোহা ও ইস্পাতের কারখানা বর্ধমানের নিকটবর্তী দুর্গাপুরে ভারত সরকারের মালিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। রানীগঞ্জ হইতে কয়লা ও সিংভূম হইতে আকরিক লোহা এখানে আনা সহজসাধ্য। এখানে জলবিদ্যুৎ সরবরাহেরও সুব্যবস্থা রহিয়াছে। দুর্গাপুর হইতে একটি প্রায় শত মাইল দীর্ঘ খাল খনন করিয়া, হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া কলিকাতা বন্দরের সহিত দুর্গাপুরের যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। 1962 খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপুর কারখানা চালু হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহাকে আরও বাড়ানো চলিতেছে। উহা তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যেই 12·4 লক্ষ টন বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত এবং 3 লক্ষ টন

লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা

বিক্রয়যোগ্য কাঁচা লোহা উৎপাদন করিবে। এই লোহা ও ইস্পাতের কারখানাটির পরিচালন-ভার ভারত সরকারের হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাতের এই সকল কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। কারখানার মধ্যে লৌহ-পাথর (iron-ore) গালাইবার জন্য কতিপয় চুল্লী থাকে। চুল্লীগুলির বাহিরের-দিক ইট দিয়া তৈয়ারী এবং ভিতরের-দিক কঠিন তাপসহ লৌহের আবরণ দিয়া আবৃত। বৈজ্ঞানিক কৌশলে নির্মিত চুল্লীগুলির মধ্যে প্রজ্বলিত কয়লা থাকে এবং তাপ সৃষ্টি করে। অতঃপর চুল্লীগুলির মধ্যে লৌহ-পাথর, চুনাপাথর
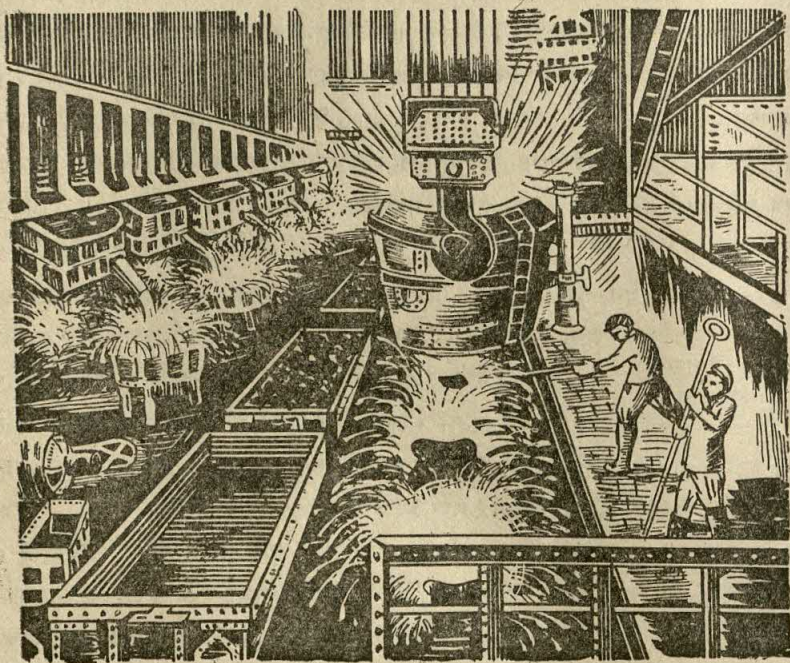
লৌহ ও ইস্পাত কারখানার অভ্যন্তরভাগের একাংশ

এবং ডলোমাইট্ দেওয়া হয়। ডলোমাইট্ চুল্লীগুলিতে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি করে এবং ঐ তাপে লৌহ-পাথর গলিয়া জলবৎ তরল হয়। চুনাপাথর লোহাকে পরিষ্কার ও শোধন করে। চুল্লীর নিম্নস্থ ছিদ্রপথে ঐ গলিত পদার্থ বাহির হইয়া আসে। ঐ গলিত লৌহ রেলগাড়ির সহিত সংযুক্ত বিরাট বিরাট পাত্রে আসিয়া পড়ে। পাত্রগুলি পূর্ণ হইলে রেলগাড়িটি সেগুলিকে লইয়া পরিশোধনের কারখানায় চলিয়া যায় এবং ঐ রেলগাড়িটির স্থলে অপর একটি পাত্রযুক্ত রেলগাড়ি আসিয়া দাঁড়ায়। পরিশোধনের

কারখানায় গলিত লৌহকে পরিষ্কার করা হয় এবং গলিত লৌহ ক্রমেই জমাট বাঁধিতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জমাট বাঁধিবার পূর্বে ঐ নরম লোহাকে নানাবিধ ছাঁচে ফেলিয়া নানারূপ দ্রব্যে পরিণত করা হয়। এইরূপে কড়ি, বরগা, রেলের পাত, রেলিং, শিক, রড প্রভৃতি লৌহদ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইস্পাত তৈয়ারি করিবার জন্য চুল্লীতে লোহা-পাথরের সহিত সিলিকা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার ধাতু দিতে হয় এবং পর পর কয়েকবার পরিশোধন করিতে হয়। কারখানার প্রায় সকল কাজই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। কারণ, গলিত লৌহের প্রচণ্ড তাপ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে। সর্বত্রই দক্ষ শ্রমিক ও যন্ত্রবিদ্‌গণ কারখানার কার্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার চুল্লীগুলি একবার নিবিলে সেগুলিকে জ্বালাইয়া পুনরায় চালু করিতে অনেক সময় লাগে। তাই চুল্লীগুলিকে নিবিতে দেওয়া হয় না এবং কারখানায় দিবারাত্র পালাক্রমে অবিরাম কাজ চলিতে থাকে। শ্রমিকরা পালাক্রমে আট ঘণ্টা করিয়া কাজ করে। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিকে ছোটখাটো একটি শিল্পনগর বলিয়া মনে হয়। লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারির জন্য বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন কারখানা রহিয়াছে, রহিয়াছে অসংখ্য চুল্লী, চিমনি,

লৌহ ও ইস্পাত কারখানার কর্মধারা
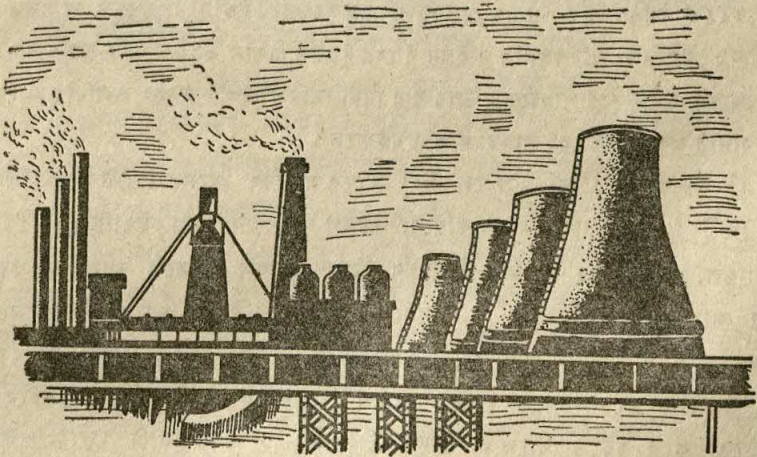
লৌহ ও ইস্পাত কারখানার বহির্ভাগের দৃশ্য

ক্রেন, জলের ট্যাঙ্ক, পেট্রোল পাম্প, অসংখ্য নর্দমা ও পাইপ এবং অসংখ্য কল ও যন্ত্রপাতি। কয়লা-খনিগুলি সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া থাকে, কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা তেমনটি নহে। ইহা অল্পতর স্থানের মধ্যে নানাবিধ ছোটখাটো কারখানা ও অসংখ্য কল ও জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে গঠিত। কয়লা-খনির তুলনায় লৌহ ও

ইস্পাত কারখানায় কর্মচাঞ্চল্যও অত্যধিক—এখানে সর্বত্র কল-কারখানায়, অফিসে, যানবাহনে, রাস্তাঘাটে, দোকানপাটে দিবারাত্রি অবিরাম কর্মব্যস্ততা লাগিয়াই আছে।

চিত্তরঞ্জন—রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা।—1853 খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ক্রমেই উহা সর্বভারতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কোন কারখানা এদেশে ছিল না। বিদেশ হইতেই রেল-ইঞ্জিন আমদানি করা হইত এবং এই খাতে কোটি কোটি টাকা বিদেশে যাইত। তাই স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার দেশে একটি রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার সালানপুর থানায় এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাম অনুসারে এই কারখানার নামকরণ হইয়াছে—চিত্তরঞ্জন। 1950 খ্রীষ্টাব্দের 26শে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র-প্রতিষ্ঠাদিবসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী মাননীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন।

কলিকাতা ও জামসেদপুরের সহিত ইহা রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লা-খনি অঞ্চল এবং বার্নপুর-কুলটি-হীরাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ইহা হইতে অধিক দূর নহে। অজয় ও বরাকর নদ ইহার নিকটেই অবস্থিত। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মাইথন বাঁধের দূরত্বও এখান হইতে মাত্র ছয় মাইল। চিত্তরঞ্জনের অনতিদূরে পাহাড়ের উপর বাঁধ দিয়া নির্মিত একটি সুবৃহৎ জলাধার হইতে কারখানায় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

এই কারখানাটির প্রতিষ্ঠাকালে উহা বৎসরে সাধারণ ধরনের 120টি রেল-ইঞ্জিন এবং 50টি পৃথক বয়লার নির্মাণ করিবে, এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল, ভারতীয় যন্ত্রবিদ্ ও কারিগরগণ নির্মাণ-কৌশল পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত আমেরিকান্ যন্ত্রবিদ্‌গণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং এই কারখানায় যতদিন পর্যন্ত ইঞ্জিন-নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রাংশ নির্মিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত প্রয়োজনমতো বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বিদেশ হইতে আমদানি করা হইবে। সেইমতো কাজ হইতে থাকে। 1953 খ্রীষ্টাব্দে এই কারখানাটি WG-শ্রেণীর 50টি রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ করে। সেগুলির মধ্যে 10টি বিদেশ হইতে আনীত যন্ত্রাংশের সাহায্যে নির্মিত হয়। 39 খানি ইঞ্জিনের 70 ভাগ যন্ত্রাংশ এবং 1 খানি ইঞ্জিনের 90 ভাগ যন্ত্রাংশ ভারতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু কারখানাটি দ্রুত স্বাবলম্বী হইয়া উঠে এবং কারখানাটিকে আরও প্রসারিত করা হয়। এখানে বৈদ্যুতিক রেলের ইঞ্জিন-ও তৈয়ারি করা হইতে থাকে। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে এই

কারখানায় 171টি WG ব্রড্‌গেজের বাষ্প-চালিত রেল-ইঞ্জিন এবং 5টি DC ব্রড্‌গেজের বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত রেল-ইঞ্জিন নির্মিত হয়। যাহাতে এই কারখানা প্রতি বৎসর 300টি রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। উহা তখন প্রতি বৎসর 60টি হইতে 70টি বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত রেল-ইঞ্জিনও নির্মাণ করিবে।
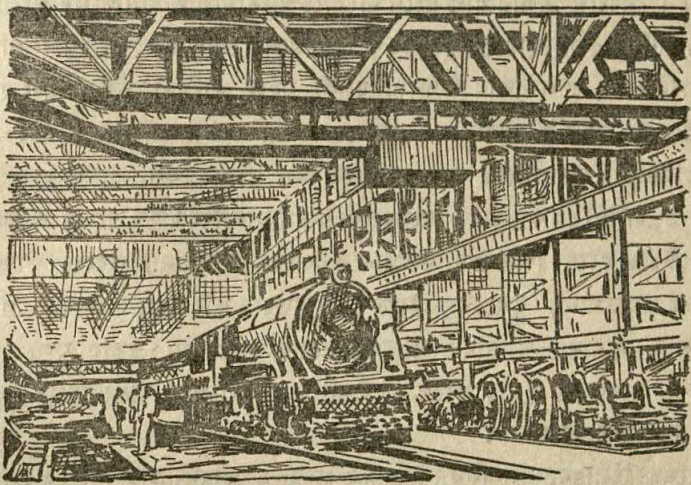
চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন কারখানার একটি দৃশ্য

চিত্তরঞ্জন কারখানাটি সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত। এই কারখানার উৎপাদন-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা ও ইস্পাতাদি আসানসোল-রানীগঞ্জ এবং বার্নপুর-কুলটি-হীরাপুর হইতে আমদানি করা হয়। এই বিরাট কারখানাটির মধ্যে ছোট ছোট বহু কারখানা রহিয়াছে, সেগুলিতে বিভিন্ন রকমের কাজ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র কারখানাগুলি রেলপথ দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত এবং নানাজাতীয় ক্রেন বিভিন্ন বিভাগের কার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। এখানকার বেশীর ভাগ শ্রমিকই পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার হইতে আমদানি করা হয়।

চিত্তরঞ্জনের এই শিল্পনগরটি পূর্ব-পরিকল্পনানুসারে নির্মিত হইয়াছে। শহরটির বিন্যাসে কোন প্রকার এলোমেলো এলোথেলো ভাব নাই। শ্রমিকদের বাসস্থানগুলি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। অন্যান্য গৃহ ও পথঘাটগুলিও সুপরিকল্পিত। সুবিন্যস্ত গৃহরাজি, পথঘাট, বৈদ্যুতিক আলো ও অন্যান্য ব্যবস্থা, যানবাহনের সুবিধা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দোকানপাট, হাটবাজার, ক্লাব ও আধুনিক আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা—সমস্তই চিত্তরঞ্জনকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। সর্বোপরি রহিয়াছে

নিকটবর্তী পাহাড় এবং অজয় ও বরাকর নদের প্রাকৃতিক পরিবেশ। স্থানটি অতীব স্বাস্থ্যকরও।

কলিকাতা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চল।—পশ্চিমবঙ্গে দুইটি প্রধান শিল্পাঞ্চল রহিয়াছে। প্রথমটি বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে এবং দ্বিতীয়টি কলিকাতা, কলিকাতার উপকণ্ঠ, হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং হাওড়া জেলার এক সুবিস্তীর্ণ এলাকায় অবস্থিত। বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে রহিয়াছে আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লা-খনি অঞ্চল, বার্নপুর-কুলটি-হীরাপুর-দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জনের লৌহ ও ইস্পাতের শিল্পাঞ্চল। কিন্তু কলিকাতা, কলিকাতার উপকণ্ঠ, হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং হাওড়া জেলার এক সুবিস্তীর্ণ এলাকায় রহিয়াছে নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাটের কল, কাগজের কল, ময়দার কল, চাউল-কল, লোহা ঢালাই ও রোলিংয়ের কারখানা, রেলের কারখানা, নানাবিধ ধাতব দ্রব্যের কারখানা, চীনামাটির ও কাচের জিনিসের কারখানা, রবারের কারখানা, ঔষধের কারখানা, বার্নিশের কারখানা, পেরেক-নাটবল্ট্ প্রভৃতির কারখানা, কলম, পেন্সিল, দিয়াশলাই, সাবান, নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্যের কারখানা, সূতার কল, গেঞ্জির কারখানা, চামড়া ও জুতার কারখানা ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অসংখ্য প্রকার যন্ত্রপাতির কারখানা।

দেশের শিল্পায়ন, আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য প্রকার যন্ত্রপাতি কলিকাতা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে নির্মিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914—18) সময় হইতে এদেশে শিল্প-প্রসার ত্বরান্বিত হইয়াছে এবং ঐ সময় হইতেই কলিকাতা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে যন্ত্রপাতির উৎপাদন ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে (1939—45) তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। হুগলী নদী এবং হাওড়া ও শিয়ালদহের রেলপথ দুইটি কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের শিল্পায়নে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছে। ঐ নদীপথে ও রেলপথে কাঁচামাল যেমন সহজে আসে, তেমনি সহজেই উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও যন্ত্রপাতি পশ্চিমবঙ্গের ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইতে পারে। পূর্বে বিদেশ হইতেই যন্ত্রপাতি আনানো হইত। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যন্ত্রপাতির চাহিদা যেমন বাড়িয়াছিল, তেমনই বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনাও সহজ ছিল না। তাই কতিপয় বিদেশী কোম্পানি কলিকাতায় ও হাওড়া অঞ্চলে যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপন করে। পরে এদেশীয় মূলধনেও যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। দেশে সকল ক্ষেত্রেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, যন্ত্রপাতির উৎপাদন খুবই লাভজনক হইয়া উঠে। বিভিন্ন কল-কারখানায় ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কৃষিতে ব্যবহার্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ধানের কল, তেলের কল, তাঁত, সেলাইয়ের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মোটর ও সাইকেলের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্য এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রেলপথ ও স্থলপথ।—কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্বে ভারতে সর্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। 1853 খ্রীষ্টাব্দের 16ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত 21 মাইল দীর্ঘ রেলপথটি সর্বপ্রথম চালু হইয়াছিল। 1855 খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত 122 মাইল দীর্ঘ রেলপথটি চালু হয়। এখন ভারতে সর্বসুদ্ধ 57,089 কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মিত রহিয়াছে। একই কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত রেলপথগুলির মধ্যে পৃথিবীতে ভারতীয় রেলপথসমূহের স্থান দ্বিতীয়। অবশ্য, অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতের রেলপথের পরিমাণ অত্যল্প। সমগ্র ভারতে যখন মাত্র 34,000 মাইল রেলপথ রহিয়াছে, তখন ইংলণ্ডের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশে রহিয়াছে আড়াই লক্ষ মাইলেরও বেশী রেলপথ। 1949 খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারতের 37টি বিভিন্ন রেলপথকে (railway system) আটটি অঞ্চলে (zone) বিভক্ত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতায় এই আটটি রেলপথ অঞ্চলের দুইটির —পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের—প্রধান কার্যালয় রহিয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুই হাজার মাইল রেলপথ রহিয়াছে। উহার বেশীর ভাগই ব্রড্‌গেজ। তবে কতকগুলি ন্যারোগেজ রেলপথও আছে। কলিকাতার দুই দিকে, পশ্চিমে ও পূর্বে, হাওড়ায় ও শিয়ালদহে দুইটি বিরাট রেল-স্টেশন রহিয়াছে। এই দুইটি রেল-স্টেশন হইতেই পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রেলপথগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গ-বিভাগের ফলে আসাম ও উত্তরবঙ্গের সহিত কলিকাতার ও দক্ষিণবঙ্গের সরাসরি রেলপথের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, বর্তমানে একটি মিটারগেজ লাইন স্থাপন করিয়া আসাম ও উত্তরবঙ্গকে কলিকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। রেলপথগুলি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শিল্পাঞ্চল ও কৃষি-অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। কলিকাতা রেলপথগুলির এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তথা উত্তর ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সম্প্রতি হাওড়া ও শিয়ালদহ হইতে বৈদ্যুতিক ট্রেনও চলাচল করিতেছে। উহাতে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যাত্রীদের একাংশের খুবই সুবিধা হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় রেলপথ যথেষ্ট নহে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রেলপথগুলি মাল ও যাত্রী বহিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। রেলপথ ও গাড়ি বৃদ্ধি করিয়া এই অভাব দূর করিবার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন।

রেলপথ

কেবল রেলপথ নহে, ভারতে স্থল-পরিবহণের কার্যে বহু জাতীয় সড়ক, সড়ক এবং রাস্তাও ব্যবহৃত হইতেছে। 1947 খ্রীষ্টাব্দের 1লা এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সড়করূপে কতকগুলি পথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সকল জাতীয় সড়কের সংরক্ষণ, বিলুপ্ত অংশের সংস্কার ও পুনর্যোজন, কয়েক হাজার কালভার্ট ও সেতু নির্মাণও এই দায়িত্বের অন্তর্গত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ 872 মাইল জাতীয় সড়ক (national highways) রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় সড়কগুলির মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-ই প্রধান। কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, আসানসোল, রানীগঞ্জ ও বার্নপুরের শিল্পাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে মাল এই পথে রাত্রিদিন বাহিত হইতেছে। এই রাস্তাটি কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায়, কলিকাতা বন্দর হইতে বা কলিকাতা বন্দরে উত্তর ভারতের বহু পরিমাণ মাল দিবারাত্র আনাগোনা করিয়া থাকে। কলিকাতা-বোম্বাই, কলিকাতা-মাদ্রাজ, কলিকাতা-বনগাঁ, কলিকাতা-শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি-গ্যাংটক, বিহার-আসাম প্রভৃতি জাতীয় সড়কগুলি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া বিস্তৃত থাকায় স্থলপথে মাল পরিবহণে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। জাতীয় সড়ক ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গে বহু সড়ক ও রাস্তা রহিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর বহু সড়ক ও রাস্তা নির্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল পথে মোটরযোগে অসংখ্য যাত্রী রাত্রিদিন আনাগোনা করিতেছেন এবং প্রচুর মাল বাহিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় 5,000 মাইল। এই সকল রাস্তায় বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট্ কার, জীপ, লরী, সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিক্শা প্রভৃতি যাত্রী ও মাল বহন করিয়া থাকে। যানবাহনের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 1947 খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের শেষে সারা ভারতে যখন 2,11,949টি মোটরগাড়ি ছিল, 1961 খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের শেষে তাহা 6,75,221টি হইয়াছে। এই অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গেও মোটরগাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, বহু মাইল বিস্তৃত কাঁচা রাস্তাও পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্যান্য সময়ে এই সকল রাস্তায় মোটরলরী চলিতে পারে। মালবহনের কার্যে প্রচুর পরিমাণে গোযানও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাতীয় সড়কগুলির সংরক্ষণ, নির্মাণ ও মেরামতের ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য রাস্তাসমূহের ভার প্রাদেশিক সরকার, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

অন্যান্য স্থলপথ

জলপথ ও কলিকাতা বন্দর।—ভারত সমুদ্রবেষ্টিত ও নদনদীতে পরিপূর্ণ। তাই ভারতে পরিবহণের কার্যে জলপথের গুরুত্বও কম নহে। ভারতে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল জলপথ রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে প্রধান হইল গঙ্গানদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ এবং তাহাদের শাখানদী ও উপনদীসমূহ, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী ও তাহাদের

সহিত সংযুক্ত খালগুলি, কেরালা খাল ও উপকূলবর্তী জলপথ, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের বাকিংহাম ক্যানেল, উড়িষ্যার মহানদীর ক্যানেল-সমূহ এবং পশ্চিম উপকূলভাগের ক্যানেল-সমূহ। বর্তমানে 1,557 মাইল নদীপথে যন্ত্র-চালিত জলযানসমূহ চলাচল করে এবং 3,587 মাইল নদীপথে চলাচল করে বৃহৎ নৌকাসমূহ। পশ্চিমবঙ্গে অনেক নদনদী রহিয়াছে। সেগুলির অনেক-গুলিতে এবং বহু খালে নৌকা চলাচল করিলেও, একমাত্র হুগলী নদী ছাড়া অন্যান্য নদনদীগুলি জাহাজ চলাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই বর্তমানে হুগলী নদীই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নৌপথরূপে ব্যবহৃত হয়। হুগলী নদীর তীরবর্তী কলিকাতা বন্দর ছাড়া বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আর কোনও বন্দর নাই। হলদি ও হুগলী নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে হলদিয়া নামে পশ্চিমবঙ্গে আর একটি বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইলেও, তাহা কলিকাতা বন্দরেরই সহকারীরূপে কার্য করিবে। কলিকাতা বন্দরটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। ভারতের বৃহত্তম বন্দর হইল বোম্বাই। কিন্তু উত্তর ভারতে কলিকাতাই বৃহত্তম বন্দর। ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দরসমূহের মধ্যে একমাত্র কলিকাতা বন্দরই নদীতীরে অবস্থিত। নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় সামুদ্রিক বন্দরসমূহ হইতে ইহার সমস্যাও স্বতন্ত্র। ইহার প্রধানতম সমস্যা হইল নদীতে পলি পড়িবার ফলে নদীর গভীরতা হ্রাস নিবারণের সমস্যা। হুগলী নদীতে পলি পড়ায় হুগলী নদীর মুখ ক্রমেই অগভীর হইয়া উঠিতেছে, তাই এই বন্দরে বৃহৎ পণ্যবাহী জাহাজসমূহের আনাগোনা বর্তমানে সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের নদীপথ

উত্তর ভারতের বৃহত্তম বন্দর

নদীতীরবর্তী একমাত্র বৃহৎ বন্দর

কলিকাতা বন্দরটি বঙ্গোপসাগর হইতে 80 মাইল উত্তরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। কলিকাতা বন্দরটি নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে অধিকসংখ্যায় বৃহৎ জাহাজসমূহ চলাচল করিবার পথে অসুবিধা ঘটে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও নানা কারণে ইহা এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছে। 1690 খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কুঠিয়াল জোব চার্নক কলিকাতা শহরের পত্তন করেন এবং উহার 67 বৎসর বাদে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হওয়ায়, উহা বৃটিশ ভারতের রাজধানীতে পরিণত হয়। ফলে কলিকাতা শহর ও কলিকাতা বন্দরের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। প্রায় সার্ধ শতাব্দী কাল কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী থাকায় কলিকাতা যেমন ভারতের বৃহত্তম শহরে পরিণত হয়, তেমনই উহা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ইহা বর্তমানে রেলপথ ও অন্যান্য স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথের দ্বারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পূর্বপাঞ্জাবের সহিত যুক্ত। ঐ সকল অঞ্চলে যে-সব কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন

হয়, তাহা কলিকাতা বন্দরের সাহায্যেই বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে। হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এবং হাওড়া, চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতায় সুবৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠায়, এই বন্দরের গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাহির হইতে আমদানী দ্রব্যের একটি সুবৃহৎ অংশ কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমেই উত্তর ভারতে, এমন কি নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি স্থানেও সরবরাহ হইয়া থাকে। নদীতীরে নোঙর করিবার সুবিধা থাকায়, কলিকাতা বন্দর হুগলী নদীর তীরে উত্তরে শ্রীরামপুর হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ স্থানে হুগলী নদীর উভয় তীরেই অসংখ্য জেটি ও গুদাম রহিয়াছে—রহিয়াছে জাহাজে মাল বোঝাই করিবার এবং জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার ব্যবস্থা।

প্রতি বৎসর কলিকাতা বন্দর দিয়া প্রায় এক কোটি টন মাল যাতায়াত করে। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে, কলিকাতা বন্দরে ঐ বৎসর 1,806টি জাহাজ প্রবেশ করিয়াছে। বাহির হইতে মাল আমদানি হইয়াছে 48 লক্ষ 8 হাজার টন এবং বাহিরে মাল রপ্তানি হইয়াছে 44 লক্ষ 2 হাজার টন। কলিকাতা বন্দর হইতে

আমদানি-রপ্তানি

যে সকল দ্রব্য বাহিরে রপ্তানি হয়, সেগুলির মধ্যে পাট, পাট-জাত দ্রব্য, চা, কফি, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, চামড়া, হাড়, শণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কাপড়, চিনি, তৈল ও তৈলবীজ। যে সকল দ্রব্য বাহির হইতে আমদানি হয়, সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, লৌহ ও ইস্পাত, পেট্রোল, রবার, লবণ, নানাবিধ খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য, চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য, মাখন, গুঁড়া দুধ, অসংখ্য প্রকার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ও বিলাসদ্রব্য।

কলিকাতা বন্দর মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরের মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি পোর্ট ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। উক্ত বোর্ড "পোর্ট কমিশন" নামে পরিচিত। বন্দরের সংস্করণ ও তত্ত্বাবধান, উন্নতিবিধান ও অন্যান্য সকল প্রকার দায়িত্ব পোর্ট কমিশনের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কলিকাতা বন্দরের আয় প্রচুর। কর্মচারীদের বেতন এবং খরচখরচাদি বাদে উহা হইতে 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে 82 লক্ষ 72 হাজার টাকা লাভ হইয়াছে।

পরিচালন ব্যবস্থা ও আয়

কলিকাতা শহরের মতোই কলিকাতা বন্দরও একটি অতিশয় কর্মব্যস্ত অঞ্চল। কলিকাতা বন্দরের মধ্যে খিদিরপুরের ডক এলাকাই সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল। অন্যান্য স্থানেও কর্মব্যস্ততা কম নহে। এই বন্দরে হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী প্রতি-[illegible]ত কাজ করিতেছে। শত শত জাহাজের ভিড়। অবিরাম চলিয়াছে ক্রেনের

সাহায্যে জাহাজে বা জাহাজ হইতে মাল তোলা-নামানো, কুলীদের দ্বারা মাল খালাস করা, গুদামে মাল জমা করা, গাড়িতে করিয়া অন্যত্র মাল পাঠানো, মালপত্রের হিসাব রাখা, শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া ও নানারূপ ব্যবস্থা করা এবং হাজারো রকম অন্যান্য কাজ। দেশের ব্যাপক শিল্পায়ন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও অগ্রগতির ফলে কলিকাতা বন্দরের কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হুগলী নদীর মুখে চর পড়ায় প্রয়োজনানুসারে কাজ করা

কর্মচাঞ্চল্য
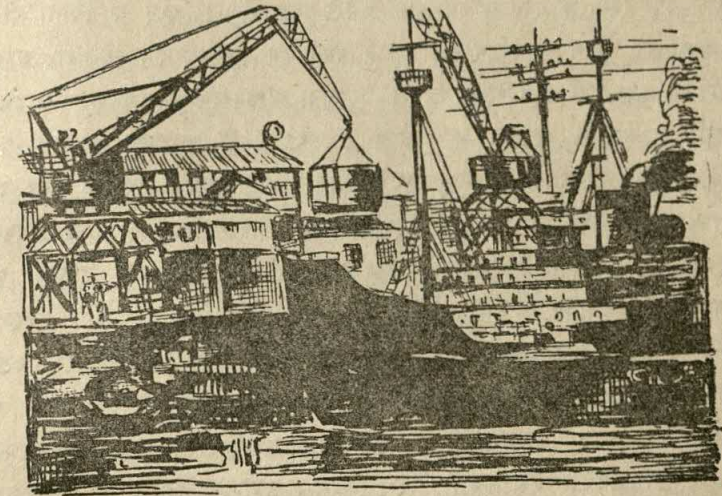
কলিকাতা বন্দরের একটি দৃশ্য

এই বন্দরের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। ড্রেজারের সাহায্যে মাটি কাটিয়া নদীর তলদেশ গভীর রাখিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহাতেও হুগলী নদীর মোহানাকে যথেষ্ট পরিমাণে গভীর এবং বেশীসংখ্যক ও সুবৃহৎ জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত রাখা একটি দুরূহ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হইলে হুগলী নদীর জলধারা বৃদ্ধি পাইবে এবং চর পড়িবার প্রবণতা হ্রাস পাইবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও কলিকাতা বন্দর প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। তাই কেন্দ্রীয় সরকার মেদিনীপুর জেলায় হুগলী ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে হলদিয়া নামে একটি নূতন বন্দর স্থাপনের কাজে হাত দিয়াছেন। হলদিয়া বন্দরটি কলিকাতা বন্দরের সহযোগী ও পরিপূরকরূপে কাজ করিবে।

কলিকাতা বন্দরের অসমতা

বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র কারখানা।—বৃহৎ শিল্পে বর্তমানে দেশে প্রচুর উন্নতি হইলেও, ভারতকে এখনও প্রধানতঃ ক্ষুদ্র কারখানার উৎপাদনের নির্ভর করিতে হয়।

সমগ্র ভারতে কুটীরশিল্পে প্রায় 2 কোটি লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। কেবল তাঁত-শিল্পেই প্রায় 50 লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। উহা প্রায় সমস্ত বৃহৎ শিল্প, খনি ও বাগিচাগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যার সমান। পশ্চিমবঙ্গেও অসংখ্য ক্ষুদ্র কারখানা রহিয়াছে। দেশে এইরূপ ক্ষুদ্র কারখানার আধিক্যের প্রধান কারণ, মূলধনের স্বল্পতা। সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া প্রায়শঃই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা গড়িয়া তোলা হয়। পাঁচ লাখের অনধিক মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে এমন কারখানাগুলিকেই সরকারীভাবে ক্ষুদ্র কারখানা বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সকল কারখানার মূলধন যেমন কম, তেমনই কম এইগুলির আকার ও আয়তন এবং কর্মী ও শ্রমিকের সংখ্যা। সারা পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ ক্ষুদ্র কারখানা ছড়াইয়া থাকিলেও, হাওড়া, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই এগুলির সংখ্যা অধিক। মূলধনের অল্পতার জন্য ক্ষুদ্র কারখানার স্থাপনা এদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ চালু হইলেও, সম্প্রতি বঙ্গ-বিভাগের ফলে উদ্‌বাস্তগণের আগমনের জন্য উহা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্‌বাস্তগণ নিরুপায় হইয়া ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র কারখানার উন্নতিসাধন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের হইলেও, কেন্দ্রীয় সরকারও যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দিয়া থাকেন। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে 5 কোটি 23 লক্ষ টাকা ঋণ ও সাহায্য দিয়াছেন। উদ্‌বাস্তদিগকেও ক্ষুদ্র কারখানা নির্মাণের জন্য অনেকক্ষেত্রে ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ফলে কেবল হাওড়া, কলিকাতা ও কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নহে, অন্যান্য জেলার শহরাঞ্চলে বা উপযুক্ত স্থানে বহু ক্ষুদ্র কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ক্ষুদ্র কারখানার গুরুত্ব

তাঁতশিল্প ছাড়া, অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প হইতে মোজা-গেঞ্জি, চীনামাটি, কাচ ও প্ল্যাস্‌টিকের নানাবিধ দ্রব্য, চিরুনি, বোতাম, খেলনা, নানাবিধ ধাতব দ্রব্য, এমন কি ছোটখাটো যন্ত্রাংশও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র শিল্পে অল্প মূলধনে ও অল্প শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় নানারূপ সুবিধাও যেমন রহিয়াছে, তেমন অসুবিধাও বহু রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কারখানাগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্য বৃহৎ কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় যেমন হার মানে, তেমনই বাজার পাইবার জন্য ক্ষুদ্র কারখানাগুলির নিজেদের মধ্যে অনেক সময় ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা চলে। ক্ষুদ্র কারখানা হইতে পাইকাররা অনেক সময় যে দামে মাল কিনিয়া বাজারে সরবরাহ করেন, সে দামও অনেক সময় ন্যায্য হয় না। যাহাই হউক, ক্ষুদ্র কারখানাগুলি আমাদের নিত্যব্যবহার্য বহু সামগ্রী সরবরাহ করিয়া জাতীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় রাখিতে যে বহুলাংশে সাহায্য করিতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের নানা-প্রকার ক্ষুদ্র কারখানা

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা।—কামারপাট পাহাড়ের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতা হইতে নির্গত হইয়া দামোদর নদ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলীতে গিয়া মিশিয়াছে। বরাকর, যমুনিয়া, কোনার ও বোকারো ইহার প্রধান উপনদী। দামোদর নদ ছোটনাগপুর পাহাড়ের উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বরাকর নদের সহিত মিলিত হইবার পরই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া হুগলী নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। বিহারের প্রায় 7,000 বর্গ-মাইল এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 2,000 বর্গ-মাইল স্থানে দামোদর নদটি অবস্থিত। পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এই নদী প্রচুর পরিমাণে বালি ও মাটি বহন করিয়া আনে। ফলে এই নদীর নিম্নাঞ্চলে চর পড়িয়াছে এবং গভীরতা ও বিস্তার অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ফলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হইলে যে প্রচণ্ড স্রোতোবেগের সৃষ্টি হয়, তাহা ধারণ করিবার শক্তি ইহার নাই বলিলেই চলে। তাই দামোদর নদে প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা হইত। কিভাবে এই বন্যা ও প্লাবন রোধ করা যায়, তাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করা হইতেছিল। ফলে স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য "দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন" বা সংক্ষেপে ডি. ভি. সি. নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। মূলতঃ বন্যা-প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইলেও, ইহাকে একটি বহুমুখী প্রকল্পে (multi-purpose project) রূপায়িত করা হয়, বন্যারোধ, সেচ-ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও নাব্য খালের সাহায্যে যোগাযোগ সাধন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হয়। এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুক্তভাবে গ্রহণ করেন। দুইটি পর্যায়ে এই প্রকল্প রূপায়িত হইবে স্থির হয়। প্রথম পর্যায়ের কাজ 1948 খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি গৃহীত হয়—(1) তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পঞ্চেট পাহাড়ে চারিটি বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করা হইবে। কোনার বাঁধে ছাড়া অন্যান্য তিনটি বাঁধেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র থাকিবে। কোনার বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। (2) বোকারোতে একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। (3) 800 মাইল দীর্ঘ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণের লাইনসমূহ এবং কিছুসংখ্যক বৈদ্যুতিক শক্তি সাব-স্টেশন থাকিবে। (4) দুর্গাপুরে একটি জলসেচের জন্য বাঁধ ও জলাধার নির্মিত হইবে। উহার সহিত জলসেচ ও নৌ-চলাচলের জন্য বহু খাল সংযুক্ত

দামোদর নদ

পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

পরিকল্পনার কার্যক্রম
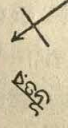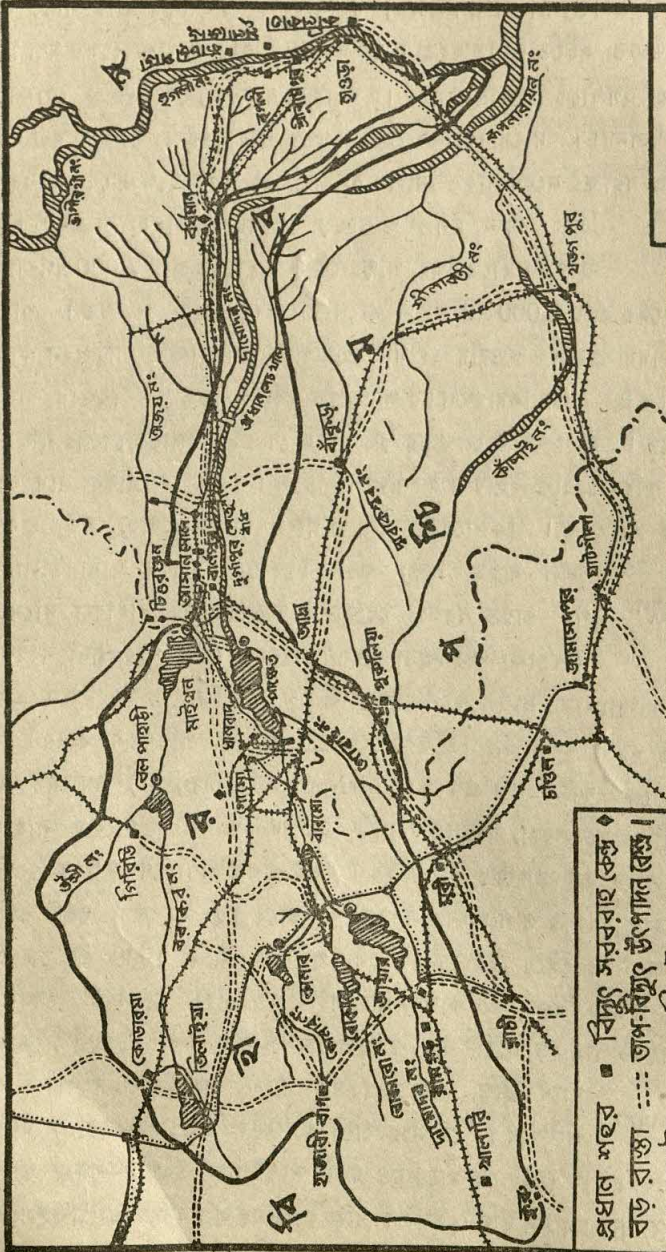
দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা
প্রধান শহর ■ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ◆
বড় রাস্তা ::::: তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ।
রেল লাইন —— জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ⊙
বৈদ্যুতিক লাইন —— সেচ অঞ্চল ——
উত্তর
কোডারমা
গিরিডি
বেল পাহাড়ী
বরাকর নং
তিলাইয়া
মাইথন
চিত্তরঞ্জন
আসানসোল
অজয় নং
বর্ধমান
ভাগীরথী নং
দামোদর নং
দুর্গাপুর সেতু বাঁধ
ধানবাদ
পাঞ্চেত
কোনার
বোকারো
বোকারো নং
হাজারী বাগ
রামগড়
খালারি
রাঁচী
মুরী
আদ্রা
বাঁকুড়া
পুরুলিয়া
দ্বারকেশ্বর নং
শীলাবতী নং
কাঁসাই নং
খড়্গপুর
ঘাটশীলা
জামসেদপুর
চণ্ডিল
রূপনারায়ণ নং
হাওড়া
কলিকাতা
শ্রীরামপুর
হুগলী
হুগলী নং
উদ্ধারণপুর

থাকিবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আয়ার, বোকারো ও বেলপাহাড়ীতে বাঁধ নির্মাণ করা হইবে এবং বারমোতে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের একটি কেন্দ্র থাকিবে। দামোদর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রায় একশত দুই কোটি আশি লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হয়।

বরাকর নদীর উপর তিলাইয়া বাঁধের নির্মাণকার্য 1953 খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। সমগ্র বাঁধটি কংক্রিটে নির্মিত এবং কংক্রিটে নির্মিত বাঁধের দুই দিকে মাটির বাঁধও রহিয়াছে। কোনার বাঁধটির নির্মাণকার্য 1955 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হইয়াছে। বরাকর নদীর তীরে অবস্থিত মাইথন বাঁধের নির্মাণকার্য 1957 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হইয়াছে। এই বাঁধে 11 লক্ষ 4 হাজার একর-ফুট জল ধরিয়া রাখে। বাঁধের নিকটে ভূগর্ভে একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রও রহিয়াছে। ঐ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের উৎপাদন-ক্ষমতা 60,000 কিলো-ওয়াট্। পঞ্চেট পাহাড়ের বাঁধটির নির্মাণকার্য 1959 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হইয়াছে। বাঁধের নিকটে 40,000 কিলোওয়াট্ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই চারিটি বাঁধ ও জলাধারই বিহারে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে নির্মিত বাঁধ ও জলাধারটির নির্মাণকার্য 1955 খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। এই বাঁধ 2,271 ফুট দীর্ঘ এবং 38 ফুট উচ্চ। এই বাঁধ ও জলাধার সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হইলে, 9 লক্ষ 73 হাজার একরেরও অধিক জমিতে জলসেচ হইবে। বামতীরের প্রধান খালটির প্রায় 85 মাইল নৌযোগ্য হইবে এবং রানীগঞ্জের কয়লা-খনি অঞ্চলের সহিত কলিকাতার যোগসাধন করিবে। তিলাইয়া, মাইথন ও পঞ্চেট পাহাড়ে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলিতে 1 লক্ষ 4 হাজার কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতে পারিবে। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে।

পরিকল্পনার রূপায়ণ

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত বন্যারোধ ও সেচের প্রকল্প প্রায় কার্যে পরিণত হইয়াছে। পরিকল্পনায় 9 লক্ষ 73 হাজার একর ভূমিতে সেচ লক্ষ্যরূপে নির্ধারিত হইলেও, 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ একর ভূমিতে সেচ-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৎসর রবি ফসলের জন্য 21,000 একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করা হয়। 1962-63 খ্রীষ্টাব্দে খারিফ ফসলের জন্য সাড়ে ছয় লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তিও উৎপন্ন হইতেছে। এই পরিকল্পনা হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি কলিকাতা, আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামসেদপুর এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বহু শহরে ও শিল্পাঞ্চলে নিত্য সরবরাহ করা হইতেছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার

উপযোগিতা

অন্তর্গত অঞ্চলের আয়তন প্রায় সাড়ে নয় হাজার বর্গ-মাইল। বিহারের পালামৌ, রাঁচী, হাজারিবাগ, সাওতাল পরগণা ও মানভূম এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া জেলাগুলি এই পরিকল্পনা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার রাজ্য সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার মিলিতভাবে বহন করেন।

হাওড়ার মতো পুরাতন শহর ও চিত্তরঞ্জনের মতো নূতন শহরের তুলনা।—হাওড়া একটি পুরাতন শিল্পপ্রধান শহর। ইহা ধীরে ধীরে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে রচনা করা হয় নাই। আজ এখানে কিছু বাসস্থান, কাল ওখানে কিছু কল-কারখানা, সেখানে দোকানপাট-হাটবাজার এবং যাতায়াত ও যানবাহনের সুবিধার জন্য কিছু পথঘাট—এমনি করিয়াই এই শহরের সূত্রপাত হইয়াছিল। পরে ক্রমেই জনসংখ্যা বাড়িল, কল-কারখানা বাড়িল, দোকানপাট, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, অলিগলিও বাড়িল—এমনি করিয়া উহা একটি জনবহুল শিল্পপ্রধান শহরে পরিণত হইল। ফলে এই শহরে বাসস্থান, কল-কারখানা, দোকানপাট, হাটবাজার, পথঘাট—সবই বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলোভাবে যেন পরস্পরের উপর চাপাচাপি করিয়া নির্মিত হইয়াছে। রাস্তাগুলি কোথাও প্রশস্ত, কোথাও অপ্রশস্ত, কোথাও এমন সংকীর্ণ যে যানবাহন চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। রাস্তাগুলি সর্বত্রই আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। জল-সরবরাহ, পায়খানা ও পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্তও তদনুরূপ। রাস্তার পার্শ্বে অনাবৃত পচা নোংরা নর্দমাগুলি হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, মাছি ভনভন করিতেছে। রাস্তাগুলির অধিকাংশই ইট ও খোয়া দিয়া তৈয়ারী। রাস্তায় জল দেওয়ার ও রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখিবার সুব্যবস্থা না থাকায়, রাস্তাগুলি ধূলাবালিতে পূর্ণ থাকে। শহরের মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় এবং এঁদো পুকুর ও খানাডোবাও দেখা যায়। শহরের সর্বত্রই মশার উপদ্রব। দোকানপাট, হাটবাজারের মধ্যেও কোন শৃঙ্খলা নাই, সেগুলি যেমন বিশৃঙ্খল ও অপরিচ্ছন্ন, তেমনি অস্বাস্থ্যকর। শহরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে-সেখানে কল-কারখানা গড়িয়া উঠায় শহরটি প্রায়ই ধোঁয়ায় ভরিয়া থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া-ওঠা পুরাতন সকল শহরেরই অবস্থা এইরূপ। তবে হাওড়া শহরকে সেগুলির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলা চলে।

পুরাতন শহর—হাওড়া

কিন্তু আধুনিক শিল্পনগরগুলি এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ও বিশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠে নাই। সেগুলি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হইয়াছে। এইরূপ আধুনিক শিল্পনগরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনে কল-কারখানা ও বাসস্থানের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল স্বতন্ত্র। মূল শহরটি কারখানা এলাকার বাহিরে হওয়ায় তাহা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন

হয় না, তাহা বেশ স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও ঋজু। রাস্তার উপর হইতেই বাড়ীগুলি নির্মিত হয় নাই, রাস্তা হইতে বেশ কিছুটা ব্যবধানে বাড়ীগুলি নির্মিত হইয়াছে। বাড়ীগুলির মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে দুর্গন্ধযুক্ত খোলা নর্দমা নাই, আছে সারি সারি গাছ ও সেগুলির শীতল ছায়া ও শ্যামল শোভা। পথগুলির অধিকাংশ পিচ-ঢালা ও পরিচ্ছন্ন এবং যানবাহন চলাচলের পক্ষে অতিশয় উপযুক্ত। আলো, জল-সরবরাহ, পায়খানা ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা সুন্দর। বাজার ও দোকান-পাটগুলি সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মাছ-মাংসের বাজারটি সর্বত্র জাল দিয়া ঘেরা, তাই মাছির উপদ্রব নাই। এখানে বস্তির চিহ্নমাত্র নাই। শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট বাসগৃহগুলিও সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত। সুসজ্জিত উঠান, বাগান ও মাঠ চারিদিকেই চোখে পড়ে। সমগ্র শহরটির মধ্যেই একটি শৃঙ্খলা ও সুবিন্যস্ত ভাব রহিয়াছে। বাসগৃহ, দোকানপাট, বাজার, বিদ্যায়তন, চিকিৎসালয়, প্রমোদভবন—সবই পরিকল্পনানুযায়ী পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সর্বত্রই রহিয়াছে ধূলিধোঁয়াহীন নির্মল আলো-বাতাস, সুপরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

আধুনিক শহর—চিত্তরঞ্জন

প্রশ্নাবলী

1. Describe coal mining in Asansol-Raniguni area and its importance on the economy of our country. [আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা-খনিসমূহ এবং আমাদের দেশের অর্থনীতিতে উহার গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

2. Describe a coal mine and the life of the miners. [কয়লা-খনি ও খনি-শ্রমিকদের জীবন বর্ণনা কর।]

3. Describe the iron and steel industry of West Bengal. [পশ্চিমবঙ্গের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বর্ণনা কর।]

4. Describe the manufacture of railway engines in Chittaranjan. [চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের বর্ণনা দাও।]

5. Describe the engineering works in Calcutta and Howrah. [হাওড়া ও কলিকাতার যন্ত্রপাতির কারখানার বিবরণ দাও।]

6. Describe the organisation of rail and road transport in our country with special reference to West Bengal. [আমাদের দেশের, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের, রেলপথ ও স্থলপথের পরিবহণ-ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।]

7. Describe the multi-purpose project of the D. V. C. area. [ডি. ভি. সি. এলাকার বহুমুখী প্রকল্প বর্ণনা কর।]

8. Describe the Port of Calcutta. [কলিকাতা বন্দরের বর্ণনা দাও।]

9. Contrast between an old town like Howrah and a new town like Chittaranjan. [হাওড়ার মতো একটি পুরাতন শহরের সহিত চিত্তরঞ্জনের মতো একটি নূতন শহরের তুলনা কর।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদের দেশের গ্রাম ও শহর

গ্রাম ও ভারতের গ্রামপ্রাধান্য।—মানুষ যখন পশুপালন করিত এবং পশুর খাদ্যের সন্ধানে যাযাবরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন প্রকৃতপক্ষে গ্রাম বলিয়া কিছু ছিল না। কৃষিকার্য আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করিল এবং গ্রামের উৎপত্তি হইল। সাধারণতঃ কতিপয় পরিবার লইয়া গড়িয়া উঠে এক-একটি পল্লী বা পাড়া এবং কতিপয় পল্লী বা পাড়া লইয়া গঠিত হয় এক-একটি গ্রাম। গ্রামকেই স্থায়ী মানব-সমাজের আদিরূপ বলা চলে। ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থান খনন করিয়া আট-দশ হাজার বৎসরেরও পুরাতন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

গ্রামের উৎপত্তি

আদিম কালে কৃষিকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাই যেখানে কৃষির প্রাধান্য অধিক, সেখানে গ্রামের সংখ্যাও অধিক। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। তাই ভারত গ্রামপ্রধান দেশ, তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতিও গ্রামীণ। ভারতে গ্রামের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশী। সে তুলনায় ভারতে ছোট-বড় শহরের সংখ্যা মাত্র প্রায় তিন হাজার। ভারতে এখন শতকরা 25 ভাগেরও কম লোক শহরে বাস করে। ভারতের অন্যান্য অংশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও গ্রামের সংখ্যা শহরের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গে এখন গ্রামের সংখ্যা প্রায় 35 হাজার; আর শহরের সংখ্যা মাত্র 114টি। 1961 খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারির হিসাব অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি উনপঞ্চাশ হাজার। ইহার মধ্যে প্রায় দুই কোটি চৌষট্টি হাজার লোক গ্রামে বাস করে। আর শহরে বাস করে মাত্র সাড়ে পঁচাশি লক্ষ লোক।

ভারতের গ্রামপ্রাধান্য

গ্রামের আকারগত শ্রেণী-বিভাগ।—ভারতের গ্রামগুলিকে সাধারণতঃ আকার ও গঠনের দিক হইতে প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(1) বিক্ষিপ্ত ও (2) সুসংবদ্ধ। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পথঘাটের কারণেই সাধারণতঃ গ্রামের গঠনে এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। যেসব অঞ্চলে নদী-নালা খুব বেশী, যাতায়াতের পথঘাটের অভাব, লোকসংখ্যার অল্পতা বা অভাব, বাসোপযোগী ভূমির অল্পতা ও অভাব, সেখানেই সাধারণতঃ গ্রামগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে—সেগুলি সাধারণতঃ সুসংবদ্ধ বা পরস্পর-সংলগ্ন হয় না। ভারতীয় সমাজে জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায় হিসাবে লোকে পরস্পর হইতে ব্যবধান রক্ষা করিয়া বসবাস করে। তাহার ফলেও অনেকক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত গ্রামসমূহ গড়িয়া উঠে।

দুই শ্রেণীর গ্রাম

আবার নদীতীরে বা বড় রাস্তার ধারে যেখানে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠে, সেখানে যাতায়াতের স্থবিধা থাকে। সেখানে জনসংখ্যা ও বাসোপযোগী ভূমি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, গ্রামগুলি সাধারণতঃ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বা অসংবদ্ধ না থাকিয়া পরস্পর সংলগ্ন ও স্থসংবদ্ধ আকার ধারণ করে। বন্যজন্তুর উৎপাত ও দস্যু-তস্করের ভীতি থাকিলেও স্থসংবদ্ধ গ্রাম গড়িয়া উঠিবার কারণ ঘটে। যেখানে সমবেত চেষ্টায় বা সরকারী সাহায্যে বন-জঙ্গল সাফ করিয়া বা জলাভূমি ভরাইয়া নূতন নূতন গ্রাম গড়িয়া তোলা হয়, সেখানেও সাধারণতঃ স্থসংবদ্ধ গ্রাম গড়িয়া উঠে। শহরের উপকণ্ঠে বা সন্নিকটে অবস্থিত গ্রামগুলিও প্রায়ই স্থসংবদ্ধ হয়।

গ্রামের গৃহসমূহের অবস্থিতি বা বিন্যাসের দিক হইতেও গ্রামগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—পিণ্ডাকৃতি গ্রাম, দণ্ডাকৃতি গ্রাম, আয়তাকার গ্রাম, বিচ্ছিন্ন গৃহ-সমষ্টিপূর্ণ গ্রাম। পিণ্ডাকৃতি গ্রামে গৃহসমূহের অবস্থিতি অনির্দিষ্ট হয়; সেগুলি স্থযোগ-স্থবিধা মতো যত্র-তত্র গড়িয়া উঠে, সেগুলির অবস্থান ও বিন্যাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র নিয়ম-শৃঙ্খলা নাই। এখানে প্রথম হইতে কোনও নির্দিষ্ট পথ থাকে না। বিভিন্ন গৃহ হইতে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর যাতায়াতের ফলেই এলোমেলোভাবে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথগুলি গড়িয়া উঠে। দণ্ডাকৃতি গ্রামে গৃহগুলি বড় রাস্তার দুই দিকে সমান্তরালভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। ফলে গ্রামগুলি লম্বা-চওড়া ও চৌকস না হইয়া দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত হইয়া পড়ে। কতকগুলি দণ্ডাকৃতি গ্রাম পাশাপাশি বা আড়াআড়ি গড়িয়া উঠিলে আয়তাকার গ্রাম গড়িয়া উঠে। আয়তাকার গ্রামে সমান্তরাল বা আড়াআড়িভাবে রচিত বহু বড় রাস্তা থাকে। দণ্ডাকৃতি বা আয়তাকার গ্রামের পথগুলি মানুষ ও গৃহপালিত পশুর যাতায়াতের ফলে গড়িয়া উঠে না। পথগুলি আগে হইতেই থাকে। পথের দুই ধারেই গৃহগুলি নির্মাণ করা হয়। অনেক সময় নদীতীরেও এই ধরনের গ্রাম গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। পার্বত্য গ্রামগুলির গড়ন সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সেগুলি অনেক সময় দণ্ডাকৃতি বা সরলরেখার মতো, অনেক সময় ত্রিকোণাকার, অনেক সময় চক্রাকার, অনেক সময় আয়তাকার হয়। পানীয় জল, কৃষিক্ষেত্র, পথঘাট প্রভৃতি এই সকল গ্রামের গঠনভঙ্গী বা গৃহসমূহের বিন্যাসকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। অনেক গ্রামে গৃহগুলি পরস্পর হইতে যথেষ্ট দূরে থাকে। কৃষিযোগ্য ও বাসযোগ্য ভূমির অভাব, জনসংখ্যার অল্পতা, পথঘাটের অস্থবিধা প্রভৃতি কারণে ইহা ঘটিয়া থাকে।

গৃহবিন্যাস অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ

দক্ষিণবঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রাম।—দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলি সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ। প্রায়ই দেখা যায়, দুই গ্রামের মধ্যে বিরাট বিরাট প্রান্তর বা কৃষিক্ষেত্র।

গ্রামগুলির অন্তর্গত পল্লী বা গৃহ-সমষ্টিগুলিও সকল সময়ে ঘনসন্নিবিষ্ট বা সুসংবদ্ধ নহে। প্রায়ই বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র বা মাঠ দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে এই পল্লী বা গৃহ-সমষ্টির মধ্যে ব্যবধান বা দূরত্ব এতই বেশী যে, এগুলিকে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও ভুল হয় না। তবে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য একটি বিস্তৃত এলাকার মধ্যে অবস্থিত কতিপয় পল্লীকে বা এইরূপ অতিশয় ক্ষুদ্র গ্রামকে এক-একটি গ্রাম বলিয়া গণ্য করা হয়। দক্ষিণবঙ্গের অনেক গ্রামের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান এক মাইলেরও বেশী হয়। দক্ষিণবঙ্গের শতকরা 80 ভাগ লোক কৃষিজীবী। ফলে প্রত্যেক গ্রাম বা পল্লীর সহিত বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেত্র থাকে। এই কৃষিক্ষেত্রগুলিই গ্রাম ও পল্লীগুলির মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ অনুচ্চ বা গভীর হওয়ায় বর্ষাকালে সেগুলি জলে ডুবিয়া যায়। এইরূপ অনুচ্চ বা গভীর জমির তুলনায় বাসোপযোগী উচ্চভূমিও অল্প। তাহা ছাড়া, দক্ষিণবঙ্গ নদী-নালা ও খাল-বিলে পূর্ণ। তাই পথঘাটের সুবিধাও অল্প। ইহাই গ্রামগুলির অসংবদ্ধ হইবার অন্যতম কারণ। তাই বলিয়া দক্ষিণবঙ্গে ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুসংবদ্ধ গ্রাম যে একেবারে নাই, তাহা নহে। তবে ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুসংবদ্ধ গ্রামের সংখ্যা অসংবদ্ধ গ্রামগুলির তুলনায় অনেক অল্প। কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিই অসংবদ্ধ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত —কৃষিক্ষেত্রের ব্যবধানে দূরে দূরে অবস্থিত। কিন্তু কৃষিপ্রধান গ্রাম ছাড়াও অন্য ধরনের গ্রামও দক্ষিণবঙ্গে রহিয়াছে। এইগুলিকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা চলে। এই সকল গ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের অপেক্ষা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাস অধিক—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বৃত্তিজীবী, চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কামার, কুমোর, কাঁসারী, তন্তুবায়, ছুতারমিস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পী ও কারিগর সম্প্রদায় প্রভৃতিই এই সকল বর্ধিষ্ণু গ্রামে অধিক সংখ্যায় বাস করেন। এইগুলিতে লোকবসতিও যেমন বেশী, পথঘাটের সংখ্যা ও সুবিধাও তেমনি অধিক। এই সকল গ্রামে দোকানপাটও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। বর্তমানে এই ধরনের গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসা-কেন্দ্র, হাসপাতাল, সাধারণ পাঠাগার, ক্লাব প্রভৃতিও যথেষ্ট সংখ্যায় রহিয়াছে। এগুলিতে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক। ধনী ও মধ্যবিত্ত বহু পরিবার এই সকল গ্রামে বাস করেন। এই সকল গ্রামের সহিত শহরাঞ্চলের যোগাযোগও অধিক পরিমাণে থাকে। অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানও কৃষিপ্রধান গ্রামের তুলনায় উন্নততর হয়। এগুলিতে অট্টালিকা ও মাটির বড় বড় বাড়ী দেখা যায়। বহু বড় দীঘি ও পুষ্করিণীও থাকে। দক্ষিণবঙ্গ নদী-নালায় পূর্ণ হওয়ায়, এখানে মৎস্যজীবীও প্রচুর পরিমাণে বাস করে। দক্ষিণবঙ্গের অনেক গ্রাম মৎস্যজীবীপ্রধান। কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী-প্রধান গ্রামগুলিতে কুটীরের সংখ্যাই অধিক। এই সকল গ্রাম প্রায়ই অসংবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত।

কেরালার অসংবদ্ধ গ্রাম।—কেরালা রাজ্যের উত্তরাংশের গ্রামগুলি আমাদের দক্ষিণবঙ্গের মতোই অসংবদ্ধ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তবে দক্ষিণ কেরালার গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুসংবদ্ধ। উত্তর কেরালায় নদী-নালা, হ্রদ ও সমুদ্রের খাঁড়ি অধিক সংখ্যায় থাকায়, সেখানে গ্রামগুলি অসংবদ্ধ ও বিক্ষিপ্তভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর কেরালার পল্লীগুলি বেশ দূরে দূরে অবস্থিত। শস্যক্ষেত্র ও নারিকেল-কুঞ্জগুলি প্রায়ই পল্লীগুলিকে পৃথক করিয়া রাখে। এখানে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার ভাবটা বেশ উগ্র। ঐ সকল তথাকথিত অস্পৃশ্য বা নিম্নশ্রেণীর লোকরা গ্রামের প্রান্তে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর পল্লী হইতে বেশ খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া বাস করে। গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। উপকূলবর্তী অঞ্চলে নারিকেল গাছ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। তাই নারিকেল সংগ্রহ ও বিক্রয় করিয়াও বহুলোক জীবিকানির্বাহ করে। নদী, খাল ও খাঁড়িগুলিতে নারিকেল বহনের জন্য নৌকাগুলি প্রায়ই সারিবদ্ধভাবে থাকিতে দেখা যায়। উত্তর কেরালার গ্রামের সমস্ত জমির মালিক প্রায়ই একজন হন। তিনিই গ্রামপ্রধান, তাঁহার অধীনেই কৃষকরা চাষ-আবাদ করে।

উত্তর কেরালা

দক্ষিণ কেরালার গ্রামগুলি কৃষিপ্রধান হইলেও সুসংবদ্ধ। এখানে গ্রামগুলির মধ্যে দূরত্ব বা ব্যবধান বেশী হয় না; গ্রামগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন বলা চলে। প্রত্যেক গ্রামে দেবতার মন্দির থাকে। সাধারণতঃ এইসব মন্দিরের পুরোহিত নাম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণরাই গ্রামের জমির মালিক হন। গ্রামের কৃষকরা তাঁহার অধীনেই চাষবাস করে। নাম্বুদ্রি-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া, ধনী নায়াররাও অনেক সময় জমির মালিক হইয়া থাকেন। দরিদ্র নায়াররা তাঁহার অধীনে চাষ-আবাদ করে।

দক্ষিণ কেরালা

উত্তর প্রদেশের সুসংবদ্ধ গ্রাম।—উত্তর প্রদেশের গ্রামগুলি যথেষ্ট ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুসংবদ্ধ। গ্রামগুলির এই ঘনসন্নিবেশ ও সুসংবদ্ধতার কতিপয় কারণ আছে। উত্তর প্রদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামান্য হওয়ায়, কৃষকদিগকে কৃষিকার্যের জন্য সেচের ব্যবস্থা করিতে ও রাখিতে হয়। একটি কূপের নিকট হইতে নর্দমার আকারে খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রগুলিতে সাধারণতঃ জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এইরূপ কূপ হইতে খালের সাহায্যে জলসেচের জন্য সমবেত প্রয়াসের প্রয়োজন। সুসংবদ্ধ ও ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রামে ঐ সমবেত প্রচেষ্টা যতখানি সহজে ফলপ্রদ হইতে পারে, বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ গ্রামে তাহা হয় না। তাই উত্তর প্রদেশে ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রামের সংখ্যাই বেশী। গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত অঞ্চলেও গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, সুসংবদ্ধ ও বৃহদাকার হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, অনেক সময় লোকে সমবেত প্রচেষ্টায় বন-জঙ্গল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্র

ও বাসস্থান রচনা করে। এই সকল ক্ষেত্রেও গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুসংবদ্ধ হয়। জন্তু-জানোয়ার ও দস্যু-তস্করের ভীতিও গ্রামগুলিকে ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুসংবদ্ধ করিতে উৎসাহিত করে। যেসব অঞ্চলে নদী-নালা ও সেচ-ব্যবস্থার অভাব, সেখানে লোকবসতি অতিশয় বিরল, সেখানে গ্রাম নাই বলিলেই চলে। উত্তর প্রদেশের গ্রামগুলিতে কৃষকরাই অধিক সংখ্যায় বাস করে। অন্যান্য পেশার লোকের সংখ্যাও খুব কম নহে। গ্রামগুলিতে তালুকদার, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর ধনিকরাও বাস করে। কৃষকদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়—যাহাদের নিজেদের জমি আছে এমন শ্রেণীর কৃষক এবং যাহাদের নিজেদের জমি নাই, অপরের জমিতে কাজ করে এমন শ্রেণীর কৃষক। প্রথম শ্রেণীর কৃষকের সংখ্যাই অবশ্য বেশী। গ্রামের সঙ্গেই গ্রামবাসীর কৃষিক্ষেত্র থাকে। দুইটি বসতির মধ্যে সাধারণতঃ একটি করিয়া প্রশস্ত পথ থাকে। বাড়ীগুলি পাশাপাশি প্রায়-সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। বাড়ীগুলির দেওয়াল সাধারণতঃ মাটি দিয়া তৈয়ার করা হয়। চালগুলি ছাওয়া হয় টালি বা খাপরা দিয়া। কোন গ্রাম আয়তনে—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে—বেশ বড়। কোনও কোনও গ্রাম কয়েক বর্গ-মাইল জুড়িয়া অবস্থিত থাকে।

ঘনসন্নিবেশ ও সুসংবদ্ধতার কারণ

পাঞ্জাবের সুসংবদ্ধ গ্রাম।—পাঞ্জাবের গ্রামগুলিও উত্তর প্রদেশের গ্রামগুলির মতোই সুসংবদ্ধ। এখানেও গ্রামগুলির ঘনসন্নিবেশ ও সুসংবদ্ধতার প্রধান কারণ অল্প বৃষ্টিপাত ও জলাভাব। পাঞ্জাবে প্রায়ই নদীতীরবর্তী স্থানে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠে। এই সকল গ্রাম প্রায়ই দণ্ডাকৃতি হয়—বাড়ীগুলি প্রায়ই পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রাস্তার দুই দিকে সারিবদ্ধভাবে থাকে। ইংরেজ আমলে পাঞ্জাবের নদীগুলি হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে জলসেচের জন্য অনেক খাল কাটা হইয়াছিল। ঐ সকল খাল হইতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ হইয়া থাকে। জলসেচের কার্যে যে সহযোগিতা ও সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন হয়, তাহার জন্যও ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুসংবদ্ধভাবে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যায়। অনেক স্থানে পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী বা কূপ থাকে। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে বলে "পনঘট"। এই সকল পনঘটকে কেন্দ্র করিয়াও বহু গ্রাম গড়িয়া উঠে। যেখানে নদী বা খাল নাই, সেখানে কূপ হইতে নালার সাহায্যে জল তুলিয়া কৃষিক্ষেত্রে সেচ-ব্যবস্থা করিতে হয়। এজন্য সমবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সে কারণেও গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। গ্রামের পাশেই কৃষিক্ষেত্র থাকে। অনেক স্থলে কৃষিক্ষেত্রের দুই দিকে গ্রাম দেখা যায়।

সুসংবদ্ধতার কারণ

বিভিন্ন ধরনের শহর।—গ্রাম স্থায়ী মানব-সমাজের আদিরূপ হইলেও, শহর কিন্তু তেমনটি নহে। উহা মানব-সভ্যতার পরবর্তী কালের উদ্ভাবন। কৃষিকার্যের ফলে

মানুষ যখন স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিল এবং নিজেদের প্রয়োজনের অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল, তখন সমাজে উদ্বৃত্ত খাদ্য দেখা দিল। সমাজে খাদ্য উদ্বৃত্ত হওয়ায় মানুষ অন্যান্য শিল্পকার্যে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিতে পারিল। নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতি হইল। কৃষকরা তাহাদের উদ্বৃত্ত বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় নানাজাতীয় শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। ফলে সমাজে বিনিময়-ব্যবস্থা ও পরে ব্যবসায়-বাণিজ্য দেখা দিল। বিনিময় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি ক্রমেই গঞ্জে ও পরে শহরে পরিণত হইল। সমাজের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য যাহাদের হস্তে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইল, তাহারা ক্রমেই ধনী হইল। ধনীরা সুকৌশলে উৎপাদকদিগকে বঞ্চিত করিয়া আরও ধনী হইল। এইরূপে সমাজে ধনী ও নির্ধন দুই শ্রেণীর লোক দেখা দিতে লাগিল। সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায় রাষ্ট্রেরও উৎপত্তি হইল। ফলে দেশে ও সমাজে শাসন-ব্যবস্থার বহু কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। এই সকল কেন্দ্রও শহরে পরিণত হইল। এইরূপ নানা কারণে, আমরা লক্ষ্য করি, গ্রামীণ সমাজ হইতেই শহরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রাচীন কালে যাতায়াত ও পরিবহণের অধিকাংশই জলপথে হইত। তাই প্রাচীন শহরের অধিকাংশই নদী বা সমুদ্র তীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন হইতে পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতে যে সুসমৃদ্ধ শহর ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা সিন্ধু সভ্যতার যুগের মহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাই। মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা নদীতীরেই অবস্থিত ছিল। পরবর্তী কালের বারাণসী, অযোধ্যা, পাটলিপুত্র প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ শহরই নদীতীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। একালের শ্রেষ্ঠ শহর কলিকাতা ও দিল্লী নদীতীরে এবং বোম্বাই সমুদ্রতীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। আজকাল স্থলপথে যাতায়াত ও পরিবহণ সুসাধ্য হওয়ায়, অনাব্য ও দুর্গম স্থানেও শহর গড়িয়া উঠিতেছে।

শহরের উৎপত্তির কারণ

উৎপত্তির স্থান

শহরগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ নানা কারণে হইয়াছে। এই সকল শহরকে আমরা উৎপত্তি ও বিকাশের প্রধান কারণসমূহের দিক হইতে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। যেমন—বাণিজ্য-কেন্দ্র, প্রশাসনিক কেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, খনি অঞ্চল, তীর্থস্থান, স্বাস্থ্যাবাস।

প্রাচীন কাল হইতে দেখা যাইতেছে, দেশের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি সহজেই শহরে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন কালের বারাণসী, ভৃগুকচ্ছ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি এই ধরনের শহর ছিল। একালে কলিকাতা ও বোম্বাইকে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা চলে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা ও শান্তি-

শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়। এই সকল প্রশাসনিক কেন্দ্রের মধ্যে যেগুলি সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করে, সেগুলি সুবৃহৎ শহর ও রাজধানীতে পরিণত হয়। ভারতের প্রাচীন অযোধ্যা, বারাণসী, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী এবং আধুনিক কালের কলিকাতা, দিল্লী, পাটনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরগুলি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কোনও স্থানে অধিক পরিমাণে কল-কারখানা স্থাপিত হইলে, সেখানেও শহর গড়িয়া উঠে। হাওড়া, জামসেদপুর, বার্নপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, ভিলাই, রাউরকেল্লা প্রভৃতি এই ধরনের শহরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনও অঞ্চলে খনি আবিষ্কৃত হইলে, খনির কাজকর্মের জন্য যে অসংখ্য লোকসমাগম ঘটে, তাহার ফলেও শহর গড়িয়া উঠে। এ ধরনের শহরের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রানীগঞ্জ, বরাকর, ডিগবয় ইত্যাদি। তীর্থস্থানগুলিতে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর যাতায়াতের ফলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং পথঘাট ও গৃহাদিরও সুব্যবস্থা করিতে হয়। ফলে তীর্থস্থানগুলিও দ্রুত শহরে পরিণত হয়। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, পুরী, ভুবনেশ্বর, বৃন্দাবন প্রভৃতি এই ধরনের শহরের দৃষ্টান্ত। সমুদ্রতীরে বা পার্বত্য অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহেও এক শ্রেণীর শহর গড়িয়া উঠে। দার্জিলিং, মুসৌরী, সিমলা, নৈনিতাল, রাঁচী, দেওঘর, পুরী, গোপালপুর প্রভৃতি ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরিবহণ-কেন্দ্রগুলিও শহরে পরিণত হইয়া থাকে। হাওড়া, কলিকাতা বন্দর, খড়্গপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

নানা ধরনের শহর

ভারতের শহরগুলিকে অবস্থিতির দিক হইতে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়—পার্বত্য শহর ও সমতলভূমির শহর। ঘর-বাড়ী ও গঠনের দিক হইতে পার্বত্য ও সমতলভূমির শহরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

আমাদের বাসস্থান ও গৃহ।—আমাদের বাসগৃহগুলির বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা সাধারণতঃ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(1) প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব এবং (2) গৃহ-নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাচুর্য। সকল প্রকার জলবায়ুতে একই প্রকার গৃহ কখনই বাসোপযোগী হইতে পারে না। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু অনুসারে গৃহেরও প্রকার-ভেদ ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান অঞ্চলে যেরূপ গৃহ একান্ত উপযোগী, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সেরূপ গৃহ বাসের অযোগ্য। যে অঞ্চলে বর্ষা অত্যধিক, সে অঞ্চলে যে ধরনের গৃহ নির্মাণ করিতে হয়, যে অঞ্চলে বারিপাত অত্যল্প, সে অঞ্চলে সেরূপ গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। গৃহ-নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য ও অভাব ভেদেও গৃহাদির পার্থক্য ঘটে। স্থানাভাব ও স্থানের প্রাচুর্যও গৃহাদির আকার ও প্রকারের পার্থক্য ঘটায়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে অধিক পরিমাণে বাস্তুভূমি

সংগ্রহ করা যায়, সেখানে গৃহের সম্প্রসারণ সাধারণতঃ পাশের দিকেই ঘটিয়া থাকে। তাই গ্রামাঞ্চলে পাকাবাড়ী সাধারণতঃ একতলা দোতলা হয়। কিন্তু শহরে যেখানে স্থানাভাব অধিক, সেখানে গৃহাদির সম্প্রসারণ সাধারণতঃ উপরের দিকেই হইয়া থাকে এবং স্থাপত্যবিদ্যার উন্নতির ফলে সেখানে এখন আকাশচুম্বী বহুতল গৃহ নির্মিত হইতেছে। একই স্থানে সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকরা বাস করে। ফলে তাহাদের আর্থিক সামর্থ্য ও রুচি অনুসারেও বাসগৃহগুলির মধ্যে প্রকার-ভেদ ঘটে। ধনীর সুউচ্চ অট্টালিকার অনতিদূরেই দরিদ্রের পর্ণকুটীর দেখা যায়। গৃহ-নির্মাণের উপযোগী উপকরণের প্রাচুর্য ও অভাবও গৃহের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

গৃহ-নির্মাণের প্রকার-ভেদের কারণ

যেখানে গৃহ-নির্মাণের উপযোগী মৃত্তিকা সহজে পাওয়া যায়, সেখানে মৃত্তিকার দেওয়াল দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে তাহা পাওয়া যায় না, সেখানে পাথর, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি দিয়া দেওয়াল তৈয়ার করা হয়। বাংলা দেশে ধানের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। তাই এখানে খড় সুলভ। তাই ঘরের চাল সাধারণতঃ খড়েই ছাওয়া হয়। উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থানে যেখানে গমের চাষ বেশী হয়, সেখানে খড় সুলভ নহে। তাই সেখানে খাপরায় বা খোলায় ছাওয়া বাড়ীই বেশী। হিমালয় অঞ্চলে যেখানে শ্লেট-পাথর সুলভ, সেখানে চালে শ্লেটের টালিও ব্যবহৃত হয়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং অনেক পার্বত্য অঞ্চলে কাঠ সুলভ হওয়ায়, সেসব স্থানে গৃহ-নির্মাণে কাঠের ব্যবহার অধিক পরিমাণে করা হইয়া থাকে। যেসব স্থানে বাঁশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানে খুঁটি, দেওয়াল, বেড়া, এমন কি ছাউনিও বাঁশের হইয়া থাকে। বাংলা দেশে সাধারণ মানুষ মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়া তৈয়ারী গৃহে বাস করে। অনেকে গৃহে কাঠ বা বাঁশের খুঁটি লাগায়। মধ্যবিত্ত লোকরা অনেকে আবার ঘরে খড়ের বদলে টিন বা টালির ছাউনি দেয়। অনেকে মাটির দ্বিতল গৃহও করে। অবস্থাপন্ন লোকরা কোঠাবাড়ী ও অট্টালিকা করে। ধনীর বাড়ীতে আবার অনেক মহল থাকে; যেমন—সদর মহল, অন্দর মহল, কাছারিবাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত গৃহে একাধিক কক্ষ, রান্নাঘর, গোশালা, গোলাঘর ইত্যাদিও থাকে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকাবাড়ী ছাড়া, অন্যান্য ঘর-বাড়ীর গঠনেও বেশ পার্থক্য লক্ষিত হয়। গৃহগুলি আসন বা ভিত্তিভূমি এবং ছাদের দিক হইতে বিভিন্ন প্রকার হয়। কোন কোন অঞ্চলে গৃহের আসন বা ভিত্তিভূমি আয়তাকার। আবার কোন কোন অঞ্চলে আসন চক্রাকার। বাড়ীর ছাদও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ হয়—কোথাও ছাদ ঢালু চালযুক্ত হয়, কোথাও চাল শঙ্কুবৎ বা টোপরের আকারের হয়, আবার কোথাও বা হয় সমতল। ভারতের যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পঁচিশ

ইঞ্চিরও কম, সেই সব অঞ্চলে সাধারণ গৃহেও সমতল ছাদ দেখা যায়। এই ধরনের ছাদ উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে মহীশূর ও অন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত নানা স্থানে চোখে পড়ে। সমতল ছাদে ধোঁয়া বাহির হইবার উপযোগী চোঙ বা চিমনি থাকে। ভারতের অধিকাংশ স্থানেই আয়তাকার আসন ও ঢালু চালযুক্ত গৃহই প্রচলিত। এই সকল গৃহ অনেক সময় দ্বিতল-ত্রিতল হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের গৃহ সর্বত্রই চোখে পড়ে। চক্রাকার আসন ও শঙ্কুবৎ চালযুক্ত গৃহ ভারতে খুব কমই দেখা যায়। ভারতের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন উপজাতির মধ্যে এই ধরনের গৃহনির্মাণ-রীতি প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন প্রকার গৃহ

গৃহের দেওয়ালগুলিও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপকরণ দিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মাটির দেওয়ালই অধিক প্রচলিত। বাঁশ ও কাঠ যে সকল অঞ্চলে অধিক পাওয়া যায়, সেখানে শালের বল্লা পাশাপাশি বসাইয়া বা চেরা বাঁশের বেড়া দিয়াও দেওয়াল তৈয়ার করা হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে কাঠের কাঠামোতে চেরা-বাঁশ-দিয়া-বোনা টাটি লাগাইয়া দেওয়াল বানানো হয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে মাটির দেওয়াল অধিক প্রচলিত হইলেও, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে যেখানে পাথর সুলভ, সেখানে পাথর দিয়া এবং কাংড়া, কুমায়ুন প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে কাঠ সুলভ, সেখানে কাঠ দিয়া দেওয়াল তৈয়ার করা হইয়া থাকে। বাংলা দেশে খড় ও ছনের ছাউনিই সুপ্রচলিত। মধ্যবিত্তরা অনেকে টিন ও টালি দিয়া ঘর ছাইয়া থাকেন। অন্যান্য স্থানে খাপরা দিয়া ঘর ছাওয়া হয়। হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে শ্লেটপাথরের টালি ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতে অনেক স্থানে ঘাস, লতাপাতা ও নারিকেল পাতা দিয়া ঘর ছাইতে দেখা যায়। এক ধরনের অর্ধ-বৃত্তাকার টালিও তাঁহারা ব্যবহার করেন। দূর দক্ষিণ ভারতে অনেকে দুই, তিন, এমন কি চারি স্তর টালি উপর-উপরি সাজাইয়া চাল পুরু করিয়া ছাইয়া থাকেন। ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে বাঁশ মাঝামাঝি চিরিয়া ও তাহার গাঁইটগুলির ভিতরের অংশ চাঁছিয়া ফেলিয়া দিয়া সেগুলিকে কতকটা খাপরার মতো পর পর সাজাইয়া চালের ছাউনি রচনা করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার দেওয়াল ও চাল

গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যাদি বিক্রয়-ব্যবস্থা।—গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত ও কুটীরশিল্পজাত যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেগুলি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র হইল হাট। অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে হাট বসে। হাটগুলি সপ্তাহে এক বা একাধিক দিনে সকালে বা বিকালে বসে। এখানে গ্রামের কৃষক ও কুটীরশিল্পীরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য আনে। ধান, চাউল, দাল, কলাই, পাট, শাক-সবজি, ফল-মূল, পান, মাছ, ডিম, মাংস,

ছানা, দধি, হাঁড়ি-কলসী ও অন্যান্য মৃৎপাত্র, বাঁশ ও বেতের বহু জিনিস, মাদুর, গামছা, মশারি, তাঁতে-বোনা শাড়ি-কাপড় প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য আসে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ক্রেতারা এই সকল দ্রব্য নিজ নিজ প্রয়োজনে কিনিতে আসে। আবার দূর দূর স্থান হইতেও পাইকাররা আসিয়া গ্রামের হাটে মাল সংগ্রহ করিয়া, শহরে-বাজারে বা অন্য হাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যায়। প্রত্যেক হাটে বহু স্থায়ী দোকান থাকে। যেমন—মুদীর দোকান, মিষ্টান্নের দোকান, চায়ের দোকান, তেলে-ভাজার দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারী দোকান। কামারশালা, ছুতোরের কারখানা প্রভৃতিও থাকে। এখানে গ্রামাঞ্চলের লাঙল, কোদাল, কাটারি, কাস্তে, আসবাবপত্র সরবরাহ ও মেরামত হয়। শহর হইতেও অনেক সময় দোকানদার ও ফেরিওয়ালারা হাটে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে আসে। হাট গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহাতে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য যেমন বিক্রয় হয়, তেমনি স্থানীয় লোকদের অজস্র প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু মেলে।

হাট

গ্রামাঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য কেবল হাটেই বিক্রয় হয় না। বিশেষ বিশেষ বস্তুর উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা গ্রামাঞ্চল খ্যাতিলাভ করে। ফলে গ্রামের উৎপাদনকারীদের কাছে আসিয়া বাহিরের ক্রেতারা, বিশেষতঃ পাইকাররা, মাল সংগ্রহ করে। কোন্ গ্রামে কি মাল সুলভে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহাও যেমন ব্যবসায়ীরা জানে, তেমনি গ্রামের উৎপাদনকারী কৃষক ও কুটীরশিল্পীরা জানে কখন গ্রামে ব্যবসায়ীরা আসিবে। তাই গ্রামের কৃষক ও কুটীরশিল্পীরা অনেক সময় তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য হাটে লইয়া না গিয়া বাড়ীতেই মজুত রাখে এবং ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে। ইহাতে গ্রামের উৎপাদনকারীরা যেমন হাটে-বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বহিয়া লইয়া যাইবার মেহনত ও ঝামেলার হাত হইতে রক্ষা পায়, তেমনি ব্যবসায়ীরাও হাট ও বাজার অপেক্ষা অনেক সুলভে মাল সংগ্রহ করিতে পারে। উৎপাদনকারীদের হাতে রাখিবার জন্য ব্যবসায়ীরা অনেক সময় আগাম মূল্য দাদন দেয়। দাদন লইবার ফলে উৎপাদনকারী অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় বটে, অনেকক্ষেত্রে অভাবের সময় টাকা আগাম পাইলে তাহাদের সুবিধাও হয়। এইরূপ পণ্যবিক্রয়কারী গ্রাম ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

পণ্যবিক্রয়কারী গ্রাম

শিল্পসমৃদ্ধ গ্রাম।—প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের গ্রামগুলি কুটীরশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষির পাশাপাশি শিল্পকার্য চলিত। বৃটিশ আমলে ভারতের এই গ্রামীণ শিল্প অনেক পরিমাণে তাহার পূর্ব মহিমা হারাইলেও, আজও তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এখন দেশে কল-কারখানার কিছু উন্নতি হইলেও,

ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে কুটীরশিল্প একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। সারা ভারতে প্রায় 2 কোটি লোক কুটীরশিল্পে ব্যস্ত থাকে। হস্ত-চালিত তাঁতশিল্পেই প্রায় 50 লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। দেশের সমগ্র বড় কল-কারখানায় যে সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে, ইহা প্রায় তাহার সমান। তাই কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে 264 কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কেবল হস্ত-চালিত তাঁতের উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়াছেন 34 কোটি টাকা।

গ্রাম ও কুটীরশিল্প

তাঁতশিল্পের জন্য ভারত তথা বাংলা দেশ চিরদিন সুবিখ্যাত ছিল। ঢাকাই মসলিন বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে ও তথা পশ্চিমবঙ্গে তাঁতশিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। এখন বহু গ্রামে তাঁতীরা তাহাদের পূর্ব ব্যবসায়ে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতেছে। অনেক কৃষকও অবসরসময়ে তাঁত-শিল্পে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, দেশে খাদির সমাদর ও প্রচলন হওয়ায়, অন্যান্য শ্রেণীর লোকরাও বয়নশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 1962 খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত নয় মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, 386 লক্ষ 19 হাজার গজ খাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রায় 13 লক্ষ 73 হাজার লোক নিযুক্ত আছে। আমাদের দেশের তাঁতীরা কেবল সুতী বস্ত্রই তৈয়ার করে না। তাহারা উৎকৃষ্ট রেশমী কাপড়ও উৎপন্ন করিয়া থাকে। পশ্চিম-বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় অতি উন্নতধরনের সুতী কাপড় উৎপন্ন হয়। হুগলী জেলার ফরাসডাঙা ও ধনেখালি এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুর উৎকৃষ্ট ধুতি ও শাড়ি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। রেশমশিল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বয়নশিল্প

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারত উন্নতধরনের মৃৎপাত্র নির্মাণ করিয়া আসিতেছে। এখন হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও ভারত যে কিরূপ উন্নতধরনের মৃৎপাত্র উৎপাদন করিত, তাহার বহু অপূর্ব নিদর্শন হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজও ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে উন্নতধরনের মৃৎপাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের জীবনে মৃৎশিল্পজাত দ্রব্য একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্পীরা কেবল হাঁড়ি, কলসী, সরা, মালসা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নাই। তাঁহারা মাটির সুন্দর সুন্দর পুতুল ও খেলনাও নির্মাণ করিতে পারেন। নদীয়ার

মৃৎশিল্প

কৃষ্ণনগরের পুতুল সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাস্কর বা মূর্তিশিল্পীরা মৃত্তিকা দিয়া অপরূপ মূর্তিসকল নির্মাণ করিয়া থাকেন, যাহা সর্বত্রই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

অন্যান্য শিল্প

কেবল বয়নশিল্প ও মৃৎশিল্পেই নহে, অন্যান্য নানাবিধ কুটীরশিল্পেও পশ্চিমবঙ্গ অতিশয় উন্নত। মাদুরশিল্পের জন্য মেদিনীপুর, নদীয়া ও বর্ধমান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিতল-কাঁসার বাসনের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার (খাগড়ার) নাম করিতে হয়। লবণ উৎপাদনে মেদিনীপুরের স্থান সর্বাগ্রে। ছুরি-কাঁচি উৎপাদনের জন্য বর্ধমান (কাঞ্চননগর) উল্লেখযোগ্য।

গ্রামাঞ্চলে মেলা।—ভারতের সর্বত্রই গ্রামাঞ্চলে মেলা বসে। মেলাগুলি সাধারণতঃ দেবদেবীর পূজা, ধর্মানুষ্ঠান ও পর্ব-পার্বণকে উপলক্ষ্য করিয়া বসিলেও, আসলে এগুলি গ্রামাঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র হইয়া উঠে। পার্বত্য অঞ্চলের মেলার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভারতের সমতলভূমিতেও এ ধরনের অসংখ্য মেলা বসিয়া থাকে। মেলাগুলি অনেক সময় এক মাস পর্যন্তও চলে। মেলা উপলক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের বহু দূরবর্তী স্থান হইতেও লোকসমাগম হয়। তাহারা দেবতার স্থানে পূজা দিয়া পুণ্যার্জন করে, ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে, আমোদ-প্রমোদ করে। এই সকল মেলায় স্থানীয় উৎপাদকরা তাহাদের উৎপন্ন কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করে। দূর হইতে ব্যবসায়ীরা আসে। মেলাতে কেবল কাপড়-জামা, খেলনা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজ্য দ্রব্য, শস্য ও শাক-সব্জি, শিল্পজাত নানা-প্রকার দ্রব্যই বিক্রয় না। অনেক মেলায় জীবজন্তু ও পশুপক্ষীও বিক্রয় হইয়া থাকে। বিহারের শোনপুরের মেলা গরু-ঘোড়া, হাতী-উট প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন মেলায় নৌকা বিক্রয় হয়, কোথাও কোথাও ঘোড়া, হাতী, কুকুর প্রভৃতিও বিক্রয় হইয়া থাকে।

মেলার গুরুত্ব

পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য মেলা হইয়া থাকে। রথযাত্রার মেলা, পৌষ সংক্রান্তির মেলা, চৈত্র সংক্রান্তির বা চড়কের মেলা প্রভৃতি বহু গ্রামাঞ্চলে হইয়া থাকে। অনেক মেলা সপ্তাহকালও চলে। পশ্চিমবঙ্গের নান্নুরে (বীরভূম), ফরিদপুর গ্রামে (মুর্শিদাবাদ), জল্পেশে (জলপাইগুড়ি), চাবরাবন্দে (কুচবিহার) ও বিন্দোলে (পশ্চিম দিনাজপুর) প্রায় এক মাস ধরিয়া মেলা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী হিসাব অনুসারে প্রায় 1,680টি মেলা হয়। শীতকালেই অধিকসংখ্যক মেলা হয়। এই সময় কেবল নূতন ফসল উঠায় গ্রামবাসীদের মন আনন্দে পূর্ণ হয় না, এই সময় পথঘাটের সুযোগ-সুবিধাও বাড়ে। বর্ষাকালেই মেলা

পশ্চিমবঙ্গের মেলা

সবচেয়ে কম হয়। তাহা হইলেও জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষ্যেও অনেক মেলা হইয়া থাকে। দিনাজপুরের নেকমর্দের মেলা, কেঁদুলির (জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব) পৌষ সংক্রান্তির মেলা, মাহেশের (হুগলী) ও মহিষাদলের (মেদিনীপুর) রথের মেলা, পৌষ সংক্রান্তিতে সাগরদ্বীপের মেলা, মালদহের গাজোল থানার ধাওয়ালের মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশের বাহিরেও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য মেলা হইয়া থাকে। অনেকগুলি সর্বভারতীয় মেলা রহিয়াছে। এই সকল মেলায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে লোক-সমাগম হয়। এইগুলির মধ্যে কুম্ভমেলা ও পশ্চিমবঙ্গের সাগরমেলা প্রধান। পুরীর রথযাত্রার মেলা, প্রয়াগের কুম্ভ ও অর্ধ-কুম্ভ মেলা, আজমীরের নিকটবর্তী পুষ্করতীর্থের মেলা, আগ্রার নিকটবর্তী বক্রেশ্বরের মেলা, উত্তর প্রদেশের বদাউন জেলার কাকোরা গ্রামের মেলা, বিহারের শোনপুরের মেলা, মহীশূরের কোলার জেলার অবনীগ্রামের মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির অনেক মেলাতেই হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষ প্রভৃতিও ক্রয়-বিক্রয় হয়।

ভারতীয় মেলা

গ্রাম হইতে নগর ও মহানগর—কলিকাতার কাহিনী।—অনেক সময় গ্রাম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া শহরে পরিণত হয়। নানা কারণে এইরূপ হইতে পারে। কোন গ্রাম নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় বা পথঘাটের সুযোগ-সুবিধা থাকায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে। ব্যবসায়ের সূত্রে সেখানে বহু লোকসমাগম হইলে এবং স্থায়িভাবে বহুলোক বসবাস করিলে, গ্রাম ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হইতে পারে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া কোন গ্রামে থানা, আদালত, সরকারী কার্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইলে, সেখানে লোকসমাগম, লোকের বসবাস ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সেই গ্রামও শহরে পরিণত হইতে পারে। কোথাও কল-কারখানা স্থাপিত হইলে সেখানেও বহু শ্রমিক ও কর্মচারীর বসবাস, পথঘাটের ও যানবাহনের উন্নতি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে শহর গড়িয়া উঠিতে পারে। কোথাও যানবাহন ও পরিবহণের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র, যেমন রেলওয়ে-জংসন, বিমানঘাঁটি, স্টীমার-স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানেও লোকসমাগম এবং লোকের বসবাস ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। সেখানেও শহর গড়িয়া উঠিতে পারে। যদি কোনও গ্রামে হঠাৎ খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ্ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলেও সেখানেও শহর গড়িয়া উঠিতে পারে। কোনও গ্রাম তীর্থকেন্দ্ররূপে অলৌকিক মাহাত্ম্য লাভ করিলেও ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হইতে পারে। কোনও স্থানে উপনিবেশকারী বা উদ্বাস্তুরা প্রচুর সংখ্যায় আসিয়া বসবাস করিলে এবং সেখানে বহু দোকানপাট,

বিভিন্ন কারণ

পথঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আমোদ-প্রমোদ-কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হইলে তাহাও শহরে পরিণত হইতে পারে।

অনেক সময় উপরি-উক্ত একাধিক কারণ একই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। তখন শহরটি দ্রুত বিকাশলাভ করে এবং শহর হইতে মহানগরে পরিণত হইতে পারে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কলিকাতা। কলিকাতা বৃটিশ আমলে এদেশীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে বহু কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। যানবাহন ও পরিবহণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘাঁটিরূপেও তাহা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। তীর্থস্থান ও স্থান-মাহাত্ম্যও কলিকাতায় কম ছিল না—কালীঘাট হিন্দুদের অন্যতম পীঠস্থান। ফলে কলিকাতা যে গ্রাম হইতে শহরে এবং শহর হইতে মহানগরে পরিণত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

কলিকাতা এখন পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শহর। 1961 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে খাস কলিকাতার আয়তন 103·60 বর্গ-কিলোমিটার। ইহার জনসংখ্যা 29 লক্ষ 27 হাজার 2 শত 89 জন। এখানে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে বাস করে 28 হাজার 2 শত 56 জন লোক। এখানকার গৃহের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ (5,91,122)। কলিকাতার উপকণ্ঠসমূহকে লইয়া গঠিত বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা প্রায় 70 লক্ষ।

কিন্তু এখন হইতে আড়াই শত বৎসর পূর্বে কলিকাতা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম মাত্র ছিল। উত্তরে বাগবাজারের খাল হইতে দক্ষিণে বড়বাজারের টাঁকশাল পর্যন্ত ছিল সুতানুটি গ্রামটি। তাহার দক্ষিণে বড়বাজার হইতে বর্তমান কাস্টম্‌স্ হাউস্ পর্যন্ত ছিল কলিকাতা গ্রাম। তাহার দক্ষিণে কালীঘাটের আদিগঙ্গা পর্যন্ত ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম। গ্রামগুলি ছিল জনবিরল, বন-জঙ্গল ও জলাভূমিতে পূর্ণ। আজকের কল-কোলাহলে মুখরিত, কর্মচঞ্চল, আলো-ঝলমল চৌরঙ্গী ছিল দুর্গম অরণ্যে ঢাকা। দিনের বেলাতেও এই পথ দিয়া লোক চলিতে সাহস করিত না। দস্যু ও বন্যজন্তুর ভয় ছিল সর্বত্র।

মুঘল বাদশাহ্ ঔরংজেবের আমলে তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন বাংলা দেশে ইংরেজদের কুঠি ছিল কাশিমবাজারে ও হুগলীতে। 1686 খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কুঠির ইংরেজ কর্তা জোব চার্নক একবার সুতানুটি গ্রামে নামিয়াছিলেন। তখন তিনি এই স্থানে একটি কুঠি স্থাপনের কথা প্রথম চিন্তা করেন। 1688 খ্রীষ্টাব্দে শুল্ক লইয়া মুঘল শাসনকর্তার সহিত ইংরেজদের বিবাদ বাধে এবং ইংরেজরা হুগলী হইতে বিতাড়িত হন। পরে তাঁহারা মার্জনা ভিক্ষা করিলে, ঔরংজেব তাঁহাদিগকে বাংলা দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেন। এখন, 1690 খ্রীষ্টাব্দে, জোব চার্নক সুতানুটি গ্রামে ইংরেজদের নূতন কুঠি স্থাপন

করেন। এই স্থানটি হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় এবং সমুদ্রের দূরত্ব অল্প হওয়ায় জোব চার্নক ইহাকে কুঠি স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান মনে করেন। সুতানুটি তখন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। ইংরেজরা কয়েকটা চালা গড়িয়া ও তাঁবু টাঙ্গাইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করে। ক্রমেই ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কুঠির কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘর-বাড়ী, দোকানপাট, হোটেল-সরাইখানা প্রভৃতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এখন ইংরেজরা এই স্থানকে শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিয়া তুলিবার অজুহাতে 1696 খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি দুর্গ স্থাপন করে। তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়াম। তাঁহার নাম অনুসারে এই দুর্গের নাম হয় "ফোর্ট উইলিয়ম"। এখনকার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটি পরে নির্মিত হয় এবং উহা গোবিন্দপুর গ্রামে অবস্থিত। 1698 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সুবাদারকে ষোল হাজার তঙ্কা নজরানা দিয়া তাঁহার অনুমোদনক্রমে বড়িষা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট হইতে মাত্র তের শত টাকায় সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানি ক্রয় করেন। এইভাবেই কলিকাতা শহরের পত্তন হয়। এই অঞ্চলে দুর্গ স্থাপিত হওয়ায় দস্যু-তস্করের উপদ্রব হ্রাস পায়। ফলে লোকে এখানে বসবাস করিতে সাহস পায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও লোকবসতি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর-বাড়ী, দোকানপাট, হোটেল-সরাইখানা, পথঘাট, গির্জা, মসজিদ প্রভৃতি স্থাপিত হইতে থাকে। এইভাবে কলিকাতা শহরের বিকাশ ঘটিতে থাকে। লোকবসতি দ্রুত বাড়িতে লাগিল। 1690 হইতে 1710 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র বিশ বৎসরে এখানকার লোকসংখ্যা বারো হাজার হয়। ইহার চল্লিশ বৎসর বাদে 1751 খ্রীষ্টাব্দে এখানকার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় চারি লক্ষ নয় হাজারে। 1757 খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইলে, বাংলা দেশে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে তখন কলিকাতাই হয় বৃটিশ ভারতের রাজধানী। কলিকাতা অতঃপর প্রায় দেড় শতাব্দী কাল বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল।

এইভাবে কলিকাতা কেবল বৃটিশ ভারতের রাজধানী হইল না, কলিকাতা এখন সমগ্র ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্বপ্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। হুগলী নদীর তীরে ও কলিকাতায় অসংখ্য কল-কারখানা গড়িয়া উঠিল। কলিকাতায় গড়িয়া উঠিল বন্দর ও পোতাশ্রয়। কলিকাতা বৃটিশ ভারতের কর্মকেন্দ্র ও কর্মস্থল হওয়ায় এখানে যেমন লোকবসতি দ্রুত বাড়িল, তেমনি অসংখ্য পথঘাট নির্মিত হইল, অসংখ্য দোকানপাট, সরকারী ও বেসরকারী কার্যালয়, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, থিয়েটার-সিনেমা, পাঠাগার, ক্লাব প্রভৃতি স্থাপিত হইল। যানবাহনের

সীমা-সংখ্যা রহিল না। জনসংখ্যার দিক হইতে খাস কলিকাতা এখন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হইলেও, কলিকাতার সংলগ্ন সমগ্র উপকণ্ঠ ও শিল্পাঞ্চল ধরিলে ইহাকে ভারতের বৃহত্তম নগর বলা চলে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by scattered and compact villages of our country ? Describe the villages of South Bengal, North Kerala, Uttar Pradesh and the Punjab from this point of view. [বিক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ গ্রামসমূহ বলিতে কি বুঝ ? এই দিক হইতে বিচার করিয়া দক্ষিণ বাংলা, উত্তর কেরালা, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের গ্রামসমূহের বর্ণনা দাও।]

2. What part do the fairs play in the village life of our country ? [গ্রামীণ জীবনে মেলাগুলির ভূমিকা বর্ণনা কর।]

3. How do the village people market their produce ? [গ্রাম্য লোকরা কিভাবে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে ?]

4. What do you know of the cottage industry of our country ? [আমাদের দেশের কুটীরশিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

5. How do the villages grow into towns ? [গ্রামগুলি কিভাবে শহরে পরিণত হয় ?]

6. Describe the growth of the City of Calcutta from the three small villages. [তিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে কিভাবে কলিকাতা মহানগরীর উৎপত্তি হইল, তাহা বর্ণনা কর।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদেশের বিভিন্ন স্থানীয় লোকসমাজের জীবনযাত্রা

আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানীয় লোকসমাজ ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন বিদেশের কিছু স্থানীয় লোকসমাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব যে বিভিন্ন লোকসমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তাহা এই সকল আলোচনা হইতে কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইবে। এই সকল লোকসমাজের কাহিনী হইতে ইহাও উপলব্ধি করা যাইবে যে, মানুষ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও মানুষ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের দাস নহে, সে নিজের প্রয়োজন
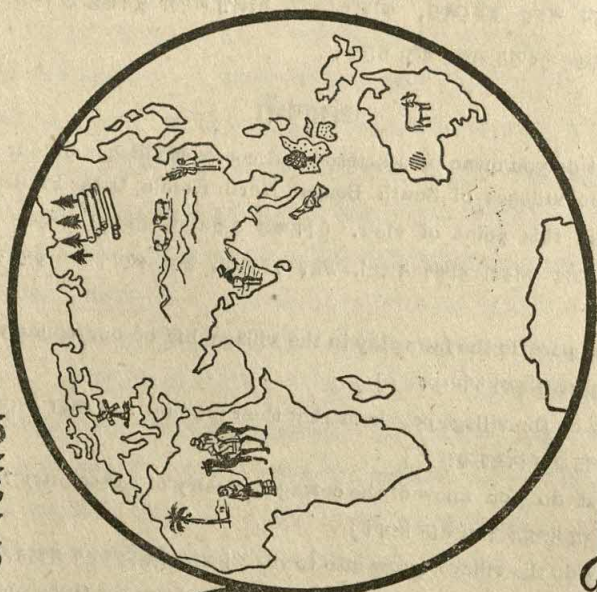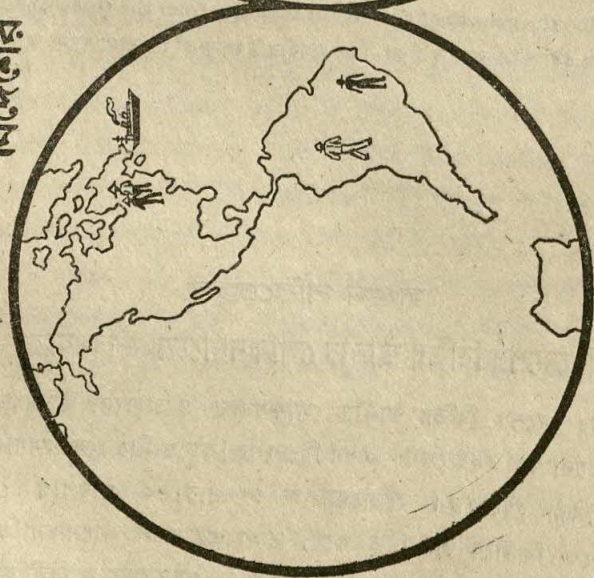
বিদেশের জনগোষ্ঠী
জনগোষ্ঠীর জীবনায়ন

অনুসারে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে বহুলাংশে পরিবর্তিত করিয়াছে এবং নিজেদের প্রয়োজনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

উত্তর সাইবেরিয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে বল্গা-হরিণ পালন

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—সাইবেরিয়া হইল বর্তমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উত্তর এশিয়ার একটি দেশ। ইহার উত্তর অংশ পশ্চিমে উরাল পর্বতমালা হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর সাইবেরিয়া উত্তর মেরুর নিকটে অবস্থিত হওয়ায়, এখানে প্রচণ্ড শীত এবং এই অঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছাদিত থাকে। শীতকালে এখানকার তাপ সাধারণতঃ হিমাঙ্ক হইতে 59 ডিগ্রি নীচে নামে। বৃষ্টিপাত এখানে বৎসরে দশ-বারো ইঞ্চি হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তর দিকে শীত অধিকতর তীব্র। এই অঞ্চলের নদীগুলি উত্তরে উত্তর মহাসাগরে গিয়া পতিত হইয়াছে। উত্তরাংশে শীত তীব্রতর হওয়ায়, নদীগুলির মোহানা বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত ও অবরুদ্ধ থাকে। দক্ষিণ অংশে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক। তাই নদীগুলির মোহানায় বরফ গলিবার আগেই নদীর উপরের দিকে বরফ আগে গলে। মোহানাগুলি বরফে অবরুদ্ধ থাকায় গলিত বরফ হইতে উৎপন্ন জলস্রোত নদীমুখ দিয়া সমুদ্রে বাহির হইতে পায় না, তাহা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়া চারিদিকে জলাভূমির সৃষ্টি করে। এইসব জলাভূমি জলজ তৃণ ও শৈবালজাতীয় উদ্ভিদে পূর্ণ। এই সকল উদ্ভিদ বল্গা-হরিণের অতি প্রিয় খাদ্য। ইহা ছাড়া, এখানে খর্বাকৃতি দেবদারুজাতীয় একপ্রকার গাছও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। খর্বাকৃতি পাইন, ফার, স্প্রুস প্রভৃতি গাছও এখানে জন্মে। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই স্বল্পমেয়াদী গ্রীষ্মকালে কিছু কিছু রঙিন ফুলের গাছও জন্মিয়া থাকে।

শীতের রাজত্ব

উদ্ভিদ

আদিবাসীদের জীবনযাত্রা।—এখানে তুঙ্গু, চুকিন, সাময়েদ, ইয়াকভ প্রভৃতি উপজাতির বাস। ইহারা মৎস্য এবং বল্গা-হরিণ, সিন্ধুঘোটক ও ভল্লুকের মাংস খাইয়া জীবনধারণ করে। খাদ্য আহরণের চেষ্টায় ইহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রচণ্ড শীতের সময় ইহারা চামড়া অথবা বরফের তৈয়ারী ঘরে আশ্রয় লয়। চামড়ার তৈয়ারী পোশাক-পরিচ্ছদ ইহাদের শীত নিবারণ করে। এই অঞ্চলে শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ অত্যধিক জন্মায়। এগুলি হরিণের প্রিয় খাদ্য। তাই বল্গা-হরিণ নামে পরিচিত এক ধরনের হরিণ এই অঞ্চলে

অধিবাসী

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল বল্গা-হরিণ স্থানীয় অধিবাসীদের অনেক কাজে লাগে। স্থানীয় লোকরা বল্গা-হরিণকে পোষ মানাইয়া গৃহপালিত পশুতে পরিণত করিয়াছে। ইহাদের দুগ্ধ ও মাংস স্থানীয় অধিবাসীদের প্রিয় খাদ্য। ইহাদের চামড়া ও লোম দিয়া স্থানীয় লোকরা নানারূপ পোশাক-পরিচ্ছদ বানায়। ইহাদের চামড়া দিয়া উহাদের বাড়ীও তৈয়ার হয়। কেবল তাহাই নহে, বল্গা-হরিণ দিয়া এই তুষারাবৃত অঞ্চলে লোকরা "স্লেজ" নামে চাকাহীন একপ্রকার গাড়ি টানায়। তাই বল্গা-হরিণকে এখানকার লোক-সমাজের জীবনযাত্রার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দেখা যায়।

বল্গা-হরিণের ব্যবহার
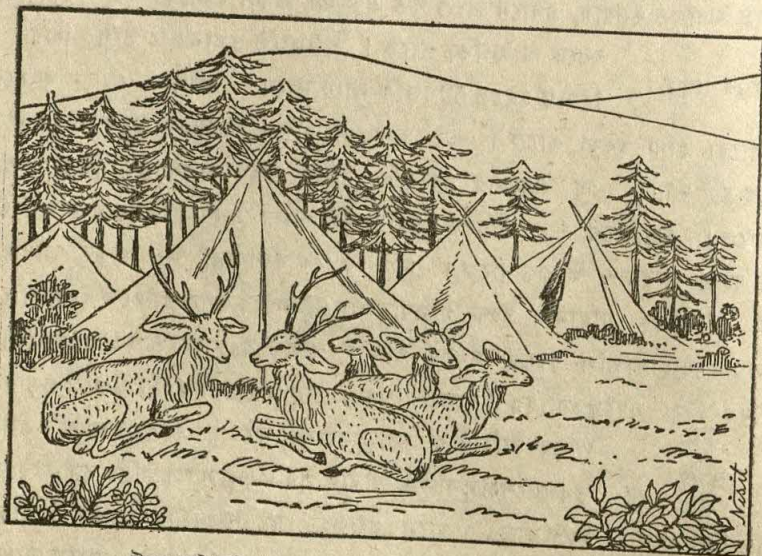
উত্তর সাইবেরিয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে বল্গা-হরিণ পালনের দৃশ্য

বিপ্লবের পূর্বের ও পরের অবস্থা।—সোভিয়েট বিপ্লবের পূর্বে জারগণের আমলে এই অঞ্চল অতিশয় দুর্গম ও অস্বাস্থ্যকর ছিল। তাই গুরু অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের এখানে নির্বাসিত ও কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এই অঞ্চল সভ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। জারগণের আমলে এই অঞ্চলের কোনও উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবের পর এই অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। এখানে এখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের লোকরাও আসিয়া বসবাস করিতেছে। এখানে চাষবাসের ব্যবস্থা ও নানা উন্নতির কাজ চলিতেছে। এখানে কয়লা, সোনা, তামা ও দস্তার বহু খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সোভিয়েট যুগে উন্নতি

এবং এই অঞ্চল অত্যন্ত শীতপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও, এখানে কল-কারখানা ও শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। এখানকার অরণ্যভূমিগুলি হইতে সম্ভবমতো সম্পদ্ আহরণের কাজ চলিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদীর মোহানাগুলিকে পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং নদীগুলিকে নৌ-চলাচলের উপযুক্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। এখানে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান্ ও তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়ান্ রেলপথগুলির মতো বড় বড় রেলপথও গড়িয়া উঠিয়াছে। বিমান চলাচলেরও সুব্যবস্থা রহিয়াছে। মস্কো হইতে তিনটি বিমানপথে এই অঞ্চলে যাতায়াত করা যায়।

সোভিয়েট বিপ্লবের পূর্বে এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল বল্গা-হরিণ পালন। বিপ্লবের পর এই অঞ্চলে অন্যান্য নানা দিক দিয়া যেমন অর্থ নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তেমনি সমবায় পদ্ধতিতে বল্গা-হরিণ পালনেরও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। বল্গা-হরিণ পালন বেশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। হরিণের মাংস, চামড়া প্রভৃতি এখন প্রচুর পরিমাণে বাহিরে রপ্তানি হইতেছে এবং তাহার বিনিময়ে বল্গা-হরিণ-পালকগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় বহু বস্তু সহজেই পাইতেছে। তাহাদের জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হইয়াছে। তাহারা বাহিরের সভ্য জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং তাহারা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিকে পরিণত হইয়াছে।

বল্গা-হরিণ পালনে উন্নতি

মালয়ের একটি লোকসমাজ

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—মালয় উপদ্বীপটি ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু তাই উষ্ণ। কিন্তু ইহা সমুদ্রের দ্বারা তিনদিকে বেষ্টিত হওয়ায়, এখানে বৎসরের সকল সময় অল্পাধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই এই অঞ্চল গভীর জঙ্গল ও জলাভূমিতে পূর্ণ। এই অরণ্যময় অঞ্চলে সেমাং, সাকাই, জাকুন, ওরাং, বেলুয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত বহু উপজাতি বাস করে। এই সকল উপজাতির মধ্যে সেমাং-ই প্রধান। অন্যান্য উপজাতির লোকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সেমাংদের প্রায় অনুরূপ।

অরণ্যবাসী লোকসমাজ।—সেমাংরা খর্বাকৃতি, ইহাদের রঙ কালো, নাক চেপটা। ইহাদের সহিত আন্দামানীদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। আন্দামানীদের মতো ইহারাও খাদ্যাদি উৎপাদন করিতে পারে না। ইহারা বনে ফল-মূল আহরণ ও বন্য জীবজন্তু শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহারা কোথাও স্থায়িভাবে বসবাস করে না। ইহারা

সেমাংদের জীবনযাত্রা

কিছুদিন অন্তর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায় এবং এইভাবে যাযাবরের মতো অরণ্যের বিভিন্ন স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা যখন যেখানে থাকে, সেখানেই অস্থায়ী বাসস্থান বা আশ্রয় তৈয়ার করিয়া লয়। ইহারা বাঁশ ও তালপাতা দিয়া সাধারণতঃ কুটীর নির্মাণ করে। ইহারা খুব ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক-এক দলে পনের-কুড়ি জনের বেশী লোক থাকে না। নিকটস্থ কয়েকটি দল লইয়া ইহাদের এক-একটি গোষ্ঠী হয়। গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহাদি আত্মীয়তা হয়, কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর লোকদের সহিত হয় না। বিবাহের পর বর নিজের দল ছাড়িয়া কন্যার দলে কিছুদিন বাস করে, তারপর পত্নীকে লইয়া নিজ দলে ফিরিয়া আসে। সেমাংদের বিভিন্ন দল অরণ্যের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সকল অঞ্চল প্রায় নির্দিষ্ট থাকে। সেমাংরা শিকারের জন্য বাঁশের অস্ত্র ও তীর-ধনুক ব্যবহার করে। ইহারা তীরগুলির অগ্রভাগে বিষ লাগাইয়া লয়। ইহারা লোহার ব্যবহার জানে না। পাথর ঘষিয়া অস্ত্র বা হাতিয়ার তৈয়ার করিতেও পারে না। বাঁশই ইহাদের প্রধান হাতিয়ার ও অস্ত্র। ইহারা বন্য শূকর, খরগোস ও ইঁদুর শিকার করে। এই সকল জীবজন্তুর মাংস ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

মালয়ের আধুনিক লোকসমাজ।—মালয়ে এই সকল আদিবাসী ছাড়াও, পরবর্তী কালে বহু ইউরোপীয় ও এশীয় জাতি আসিয়া বাস করিয়াছে। এখানে চীনা ও ভারতীয়ের সংখ্যা প্রচুর। মালয়ে প্রচুর পরিমাণে রবার উৎপন্ন হয়। পূর্বে লোকে এখানে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া রবার গাছ হইতে রবার সংগ্রহ করিত। এইরূপে যথেষ্ট রবার সংগ্রহ করিতে প্রচুর শ্রম ও সময় লাগিত। তাহা ছাড়া, উহা বিপজ্জনকও ছিল। যানবাহনের সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। তাই ইউরোপীয়রা এখানকার সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে অরণ্য সাফ করিয়া রবারের আবাদ শুরু করে। রবারের চাষের কাজ স্থানীয় আদিবাসীদের দ্বারা সম্ভব না হওয়ায়, ইউরোপীয়রা চীন ও ভারত হইতে বহু-সংখ্যক শ্রমিক আমদানি করে। এই সকল শ্রমিক এখন এখানে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। তাই মালয়ের বর্তমান অধিবাসীদের বেশ একটি অংশ চীনা ও ভারতীয়। অল্পকালের মধ্যে এই অঞ্চলে রবার-চাষ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

রবার-বাগিচা

সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে রবার গাছের বনগুলি সযত্নে সৃষ্টি করা হইয়াছে। রবার গাছগুলির ছাল চাঁছিয়া দিয়া তলায় পাত্র বসাইয়া রাখিলে তাহাতে গাছের রস আসিয়া জমে। রবার গাছের রসকে ইংরেজিতে ল্যাটেক্স্ (latex) বলে। ল্যাটেক্সের সহিত গন্ধক মিশাইয়া জ্বাল দিয়া গরম করিলে, তাহা শক্ত হইয়া রবারে পরিণত হয়। ঐ রবার হইতে কারখানায় নানাবিধ রবারের দ্রব্য

উৎপন্ন হয়। কাঁচামাল হিসাবে রবার মালয় হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।
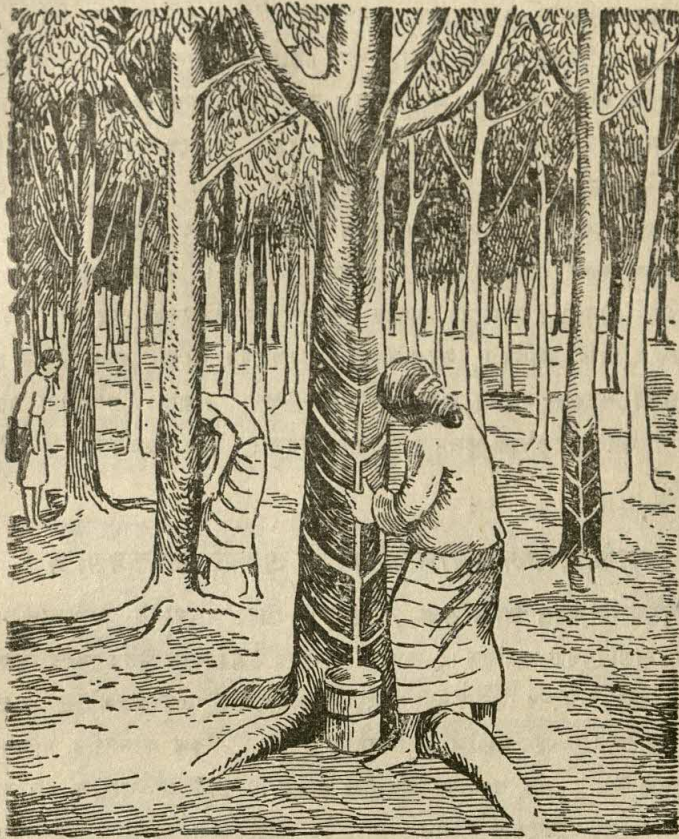
রবার সংগ্রহ করা হইতেছে

রবার ছাড়া, মালয়ে টিনও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রবার-চাষের জন্য বন-জঙ্গল সাফ করিতে গিয়া মালয়ে টিনের খনি আবিষ্কৃত হয়। ইউরোপীয়রা টিনের খনিগুলিতে কাজ শুরু করে এবং টিনের খনিতে কাজ করিবার জন্য চীন ও ভারত হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক আমদানি করে। টিন উৎপাদনের জন্য মালয় বিখ্যাত হইয়াছে।

টিনের খনি

মালয়ের সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য নারিকেল গাছ রহিয়াছে। তাই এখানে নারিকেল তৈলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নারিকেল সংগ্রহ এবং নারিকেল তৈল তৈয়ারির কাজেও বহু লোক

নারিকেল তৈল

নিযুক্ত রহিয়াছে। এখানে কলা, আনারস, ধান, সাগু, তামাক প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

রবারের বাগিচায় ও রবারের কারখানায়, টিনের খনিতে ও বিভিন্ন কল-কারখানায়, নারিকেল সংগ্রহ ও নারিকেল তৈলের উৎপাদনে এবং কৃষিকার্যের জন্য মালয়ে বাহির হইতে বহু লোক আসিয়াছে। ব্যবসায়ের জন্যও বহু লোক আসিয়াছে। এইভাবে মালয়ের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালয়ে অনেকগুলি ছোট-বড় শহরও গড়িয়া উঠিয়াছে। সেগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ও পেনাঙ। সিঙ্গাপুর পৃথিবীর মধ্যে টিন উৎপাদনের বৃহত্তম কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক বন্দর হিসাবেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। এখানকার বেশীর ভাগ অধিবাসীই চীনা। মালয়ের অন্যান্য অংশেও মালয়ীদের অপেক্ষা বহিরাগত লোকদের সংখ্যাই অধিক। সমগ্র মালয়ে মালয়ীদের সংখ্যা শতকরা মাত্র চল্লিশ, ভারতীয়দের শতকরা পনের এবং চীনদের শতকরা চল্লিশ। মালয়ীরা মালয়ের অরণ্যবাসী উপজাতিগুলির তুলনায় বহুগুণে উন্নত। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী।

সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী একটি লোকসমাজ

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উত্তর অংশে কানাডা দেশটি অবস্থিত। কানাডা দেশের উত্তর অংশ উত্তর মেরুর নিকটবর্তী হওয়ায়, কানাডা দেশের তিন-চতুর্থাংশ বরফাবৃত থাকে। এই অঞ্চল তুন্দ্রা ও তাইগা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে লোকবসতি বিরল। কিন্তু কানাডার দক্ষিণ অংশ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। এই অঞ্চলের উর্বরতাও অধিক। তাই এই অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। কানাডার দক্ষিণে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত যে পর্বতমালা রহিয়াছে, তাহাতে "লেক সুপিরিয়র" নামক হ্রদটি অবস্থিত। এই লেক

সেণ্ট লরেন্স নদী

সুপিরিয়র হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া সেণ্ট লরেন্স নদীটি হিউরন, মিচিগান, ইরি, ওণ্টারিও প্রভৃতি হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেণ্ট লরেন্স সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চল খুবই উর্বর। ইহার তীরে কানাডার বিখ্যাত কুইবেক ও মন্ট্রিল শহর অবস্থিত। কুইবেকের নিকট এই নদীর প্রসার প্রায় দুই মাইল হইলেও, এই নদী যেখানে সেণ্ট লরেন্স সাগরে পড়িয়াছে, সেখানে ইহার প্রসার প্রায় পঞ্চাশ মাইল। নদীর মোহানা এইরূপ প্রশস্ত হইলে কি হইবে, শীতকালে ইহাতে বরফ জমে এবং নদীমুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। ফলে এই সময় নদীর জল সাগরে গিয়া পড়িতে পারে না। ইহার ফলে নদীর জল

স্থানে স্থানে জমিয়া নদীর গতিপথে বিভিন্ন হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। শীতকালে নদীমুখ বরফে বন্ধ থাকায়, উহা নৌ-চলাচলের পক্ষেও অযোগ্য হইয়া উঠে। তাই শীতকালে কুইবেক হইতে মোহানার নিকটে অবস্থিত মন্‌ট্রিল শহরে জাহাজযোগে মালপত্র পাঠানো যায় না। তবে বৎসরের অন্যান্য সময়ে এই নদীতে জাহাজ চলে।

সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকায় বনজ সম্পদ্ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। সমগ্র কানাডার প্রয়োজনীয় কাঠ প্রায় এই অঞ্চলের অরণ্যসমূহ হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে। এখানেও কাঠগুলি অরণ্য হইতে আমাদের দেশের পার্বত্য অরণ্য হইতে কাঠ পাঠাইবার কতকটা অনুরূপ কৌশলেই পাঠানো হইয়া থাকে। কাঠগুলিকে চিহ্নিত করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কাঠগুলি ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হইয়া নদীর মোহানার নিকটবর্তী স্থানে গিয়া পৌঁছিলে সেখানে জল হইতে তোলা হয়। এখান হইতে কাঠ দেশের ভিতরে ও বাহিরে বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়। কাঠ হইতেই কাগজের মণ্ড হয়। এই কারণেই এই অঞ্চলে বহু কাগজের কল গড়িয়া উঠিয়াছে।

অরণ্য সম্পদ্
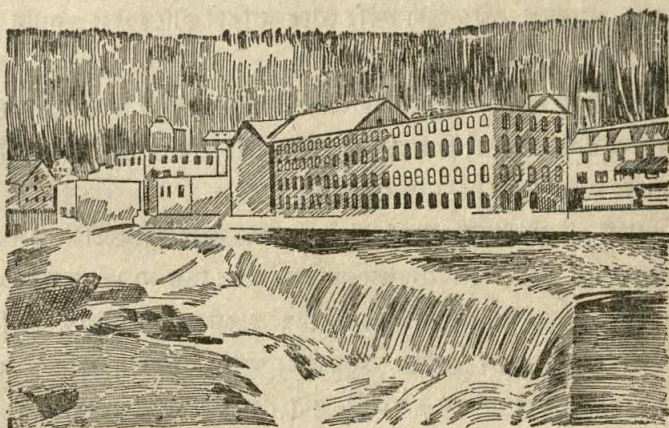
একটি কাগজের কলের দৃশ্য

সেণ্ট লরেন্স নদীর গতিপথে যে সকল হ্রদ রহিয়াছে এবং সেগুলির গতিপথে যে সকল হ্রদ আছে, সেগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খনিজ সম্পদে পূর্ণ। এখানে কয়লা, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও খনিজ তৈল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলে, এই অঞ্চলে বহু শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। কেবল খনিজ দ্রব্যের কল-কারখানাই নহে, এখানে বহু কাগজের কল, কাপড়ের কল, জুতার কারখানা প্রভৃতি রহিয়াছে। এই সকল কল-কারখানায়

খনিজ সম্পদ্ ও কল-কারখানা

উৎপন্ন দ্রব্য মন্‌ট্রিল বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। শীতকালে সেণ্ট লরেন্স নদীতে যখন বরফ জমে, তখন এই রপ্তানি-কার্য অতলান্তিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত হ্যালিফক্স বন্দর হইতেই চালানো হয়।

কৃষিজ সম্পদেও কানাডা অতিশয় সমৃদ্ধ। কানাডায় এতই অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হয় যে, উদ্‌বৃত্ত গম প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে পৃথিবীর বহু দেশে রপ্তানি করা হয়। ভারতও প্রতি বৎসর কানাডার গম প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া থাকে। কানাডার মধ্য অঞ্চলেই ম্যানিটোবা, অ্যালবার্ট, স্যাচকাচোয়ান প্রভৃতি স্থানেই কৃষিক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। কৃষিকার্যের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকরা মধ্য কানাডায় চলিয়া আসে এবং সেখানে কৃষিকার্য করে। কৃষির দিক হইতে সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকাও এখন খুবই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষিকার্যের জন্য ছোট ছোট খামারে বলদে-টানা লাঙল ব্যবহৃত হইলেও, বড় বড় খামারে ট্রাক্টর ব্যবহৃত হয়। ফসল তুলিবার কাজও অনেকক্ষেত্রেই যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে। সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকায় উন্নতধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা রহিয়াছে। উৎপন্ন ফসল রেলযোগে সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছে এবং সেখান হইতে উহা দেশ-বিদেশে চালান হয়।

কৃষি-সম্পদ্

কানাডায় দুইটি প্রধান রেলপথ রহিয়াছে। ঐ রেলপথ দুইটি কানাডার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রেলপথ দুইটির নাম কানাডিয়ান্ প্যাসিফিক্ রেলওয়ে এবং কানাডিয়ান্ ন্যাশনাল রেলওয়ে।

অধিবাসী।—দুই শতাব্দী পূর্বেও সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চল গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। সেখানে জন-বসতিও বিশেষ ছিল না। তারপর এখানে ইউরোপ হইতে ফরাসীরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে স্পেনিয়ার্ড, ওলন্দাজ, জার্মান ও ইংরেজ জাতির লোকরাও আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। কানাডার রাজধানী কুইবেক শহরে ফরাসী-ভাষী লোকের সংখ্যাই অধিক। তবে কানাডার অন্যান্য অঞ্চলে ইংরেজী-ভাষী লোকের বাসই বেশী। কানাডায় বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস হইলেও, কানাডাবাসীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ গভীর। কানাডা ভারতের মতোই সুদীর্ঘকাল বৃটিশ অধিকারে থাকিলেও, এখন স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বিশ্বের দরবারে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের মতোই কানাডাও বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য।

মৎস্যজীবী লোকসমাজ।—কানাডা কৃষিকার্যে ও শ্রমশিল্পে খুবই উন্নত হইলেও, সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অসংখ্য লোক মৎস্যজীবী। ইহারা অতলান্তিক সমুদ্রে মাছ ধরে। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মতোই কানাডা হইতে

প্রচুর পরিমাণে মৎস্য বিদেশে রপ্তানি হয়। উষ্ণ ও শীতল জলস্রোতের সংযোগে ও সমুদ্রের উপকূলভাগের অগভীরতার ফলেই এখানে মাছও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মাছ ধরা এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও রপ্তানির কাজে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে খুবই দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শুষ্ক মৎস্য সংরক্ষিত করিয়া রপ্তানির উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য এখানে বহু কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। মন্ট্রিল ও হ্যালিফক্স হইতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার টন টিনে-ভরা মৎস্য ও শুষ্ক মৎস্য বিদেশে রপ্তানি হয়।

জুইডার জী-র নিকটবর্তী লোকসমাজ

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—ইউরোপের পশ্চিমে উত্তর সাগরের তীরে হল্যাণ্ড দেশটি অবস্থিত। স্থলভাগ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চেই থাকে। কিন্তু হল্যাণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে বহু নিম্নে রহিয়াছে। সমুদ্রের জল বাঁধ দিয়া প্রতিরোধ করিয়া এই নিম্নভূমিকে মনুষ্যবাসের উপযোগ করিয়া তোলা হইয়াছে। হল্যাণ্ডের ভূমির এই নিম্নতার জন্য ইহার আর এক নাম "নেদারল্যাণ্ডস্" বা নিম্নভূমি। জুইডার জী শব্দের অর্থ হইল—দক্ষিণ সাগর। এই জুইডার জী সমুদ্রের একটি অগভীর খাঁড়ি মাত্র। উহা উত্তর সাগরের সহিত সংযুক্ত। জুইডার জী-র তীরবর্তী অঞ্চল সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে নিম্ন হওয়ায়, প্রায়ই সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়া ঐ অঞ্চলকে প্লাবিত করিত এবং একবার জল প্রবেশ করিলে তাহা বাহির করা দুঃসাধ্য ছিল। ফলে, জুইডার জী-র তীরবর্তী অঞ্চল প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের জলে ডুবিয়া থাকিত।

জুইডার জী পরিকল্পনা।—এই অঞ্চলকে উদ্ধার ও রক্ষা করিবার জন্য বহু শতাব্দী কাল ধরিয়া ওলন্দাজগণ সমুদ্রের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়াছে। এই সংগ্রামে তাহারা বিজয়ীও হইয়াছে। হল্যাণ্ডে একটি প্রবচন সুপ্রচলিত আছে—"ভগবান্ পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু ওলন্দাজগণ হল্যাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে।" এই প্রবচনটি একান্তই সত্য। 1918 খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা উত্তর সাগরে একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করিয়া, সমুদ্রের প্লাবন হইতে দেশকে রক্ষা করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বহু পরিমাণ অর্থব্যয়ে ওলন্দাজগণ অবশেষে বহু মাইল দীর্ঘ ও প্রায় পঁচিশ ফুট উচ্চ বাঁধ (dyke) নির্মাণের কার্যে সফল হয়। বাঁধের উপর নির্মিত হইয়াছে কঠিন কংক্রিটের প্রশস্ত রাস্তা। এই বাঁধ থাকিবার ফলে সমুদ্রের জল আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এখন জুইডার জী-র জল নিষ্কাশিত করিয়া এখানে কৃষির উপযোগী বহু পরিমাণ জমি উদ্ধার করা হইয়াছে,

মানুষের ধন-প্রাণকে নিঃসংশয়ভাবে নিরাপদ করা হইয়াছে। জল-নিষ্কাশনের ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে বহু হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। এগুলি সেচকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। জল-নিষ্কাশনের জন্য বহু খালও কাটিতে হইয়াছে। সেগুলিও সেচের কাজে সাহায্য করিতেছে। খালগুলি দেশের অভ্যন্তরে জলপথরূপেও ব্যবহৃত হইতেছে। হ্রদগুলির জল লোনা। হ্রদের লবণাক্ত জলকে মিষ্ট করিবার জন্য এখন নানাভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। নদীর মিষ্ট জল হ্রদে আসিয়া পড়ে। সমুদ্রে ভাটা পড়িলে জল-নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত ফটক দিয়া হ্রদের বাড়তি জল সমুদ্রে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া চালাইয়া হ্রদগুলির জলের লবণাক্ত ভাব হ্রাস করিয়া মিষ্ট করিয়া তোলা হইতেছে। জুইডার জী-র বাঁধের ও জল-নিষ্কাশনের কাজ শেষ হইলে চারিটি "পোলডার" পাওয়া যাইবে। সমুদ্রের অপেক্ষা নিম্নতর ভূমিকে ওলন্দাজরা "পোলডার" বলে। 1932 খ্রীষ্টাব্দে এই বাঁধের নির্মাণ-কার্য বহুলাংশে সম্পূর্ণ হয়। তবে এই পরিকল্পনার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 1945 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানরা বোমা ফেলিয়া বাঁধটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে কিছু পরিমাণ জল ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। ইহাতে একটি পোলডার জলমগ্ন হইয়া যায়। এখন পুনরায় জল সেচিয়া ঐ পোলডারটিকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঁধ-নির্মাণ ও জল-নিষ্কাশন

এই লোকসমাজের প্রধান জীবিকা।—জুইডার জী অঞ্চল জলমগ্ন থাকিত। তাই প্রাচীন কাল হইতেই এখানকার লোকে মৎস্যজীবী ছিল। বাঁধ নির্মাণ করিয়া জল নিষ্কাশন করিয়া দেওয়ায় মাছ ধরা এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইলেও, এখনও মাছ ধরা এবং মাছের ব্যবসায় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। নদী-নালা, খাল-বিল ও হ্রদগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় এবং এই মাছ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানিও হইয়া থাকে।

মাছ ধরা ও মাছের ব্যবসায়

জুইডার জী পরিকল্পনার সাফল্যের ফলে এখন এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণ-ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার কৃষিক্ষেত্রগুলিতে গম, ওট, আলু ও নানাপ্রকার সব্‌জি এবং নানাপ্রকার ফুল-ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষিকার্যে ফুলের চাষ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। এখানে অসংখ্য ফুলের বাগিচা আছে। বসন্তকালে এখানে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে এবং এখানকার ফুল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

কৃষি

গো-পালন এখানকার অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। এই অঞ্চলে দুধ, মাখন ও পনির প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার পশুপালন এখন এমন উন্নত হইয়া উঠিয়াছে যে, মাখন ও পনির উৎপাদন ও ব্যবসায়ের জন্য জুইডার জী অঞ্চল পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আকমার (Alkmaar) নামক বাজারটি মাখন ও পনির ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। গ্রামাঞ্চলেও মাখন ও পনির ক্রয়-বিক্রয়ের অসংখ্য কেন্দ্র রহিয়াছে। ঐ সকল কেন্দ্র হইতে আকমারে মাখন ও পনির আসে এবং আকমার হইতে তাহা দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়।

গো-পালন

জুইডার জী অঞ্চলে এখন বহু গ্রাম, শহর, পথঘাট, দোকানপাট ও ব্যবসায়-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রামগুলিতে রহিয়াছে সুরম্য পরিচ্ছন্ন গৃহ, উর্বর কৃষিক্ষেত্র, তৃণাচ্ছাদিত চারণভূমি, সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগিচা ও পথঘাট। শহরগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ। এখানকার লোকে মালপত্র প্রেরণের জন্য কুকুরের গাড়ি ব্যবহার করে। এখানে সাইকেলের ব্যবহার খুবই দেখা যায়। মোটরগাড়ি ও রেলগাড়িও এখন এখানে অন্যতম প্রধান যানবাহনে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র-তীরবর্তী দেশ বলিয়া, প্রাচীন কাল হইতেই ওলন্দাজগণ জাহাজ-নির্মাণে ও নৌ-চালনায় সুপটু। এখানে নির্মিত অসংখ্য জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়া দেশ-বিদেশে আনাগোনা করে। সামুদ্রিক অভিযানে ও বাণিজ্যে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই ওলন্দাজরা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। একদা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, ভারতে ও আফ্রিকায় তাহারা কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য নহে, উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যও স্থাপন করিয়াছিল।

উত্তর চীনের একটি লোকসমাজ

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—চীন সুবিশাল দেশ। এই দেশের বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। উত্তর চীন শীতপ্রধান। ইহার উত্তর দিকে কোন পাহাড়-পর্বত না থাকায়, এখানে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া অপ্রতিহতভাবে বহিতে থাকে ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। তবে উত্তর চীনের জলবায়ু কৃষির পক্ষে অনুপযুক্ত নয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ু বৃষ্টিপাত ঘটায়। তবে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী নহে—বৎসরে প্রায় বিশ ইঞ্চি। মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেও চলে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া হোয়াং হো ও ইয়াংসি নদী প্রবাহিত। এই দুই নদীর জল কৃষিকার্যে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, এই দুই নদীর অববাহিকা অঞ্চল উর্বর পলিমাটি দিয়া গঠিত। তাই এই অঞ্চল যথেষ্ট উর্বর হওয়ায়, সুপ্রাচীন কাল হইতেই এখানে

কৃষিকার্য চলিয়া আসিতেছে। নদী কৃষিকার্যে সহায়তা করিলেও নদীর বন্যা অন্যতম সমস্যা। হোয়াং হো নদীর বন্যায় এই অঞ্চল অনেক সময় ভয়ঙ্করভাবে প্লাবিত হয় এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। তাই চীনারা এই নদীর নাম দিয়াছে "হোয়াং হো" বা "দুঃখের নদী"। উত্তর চীনে বারিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় চারি মাসের বেশী কৃষিকার্য হয় না। তাহা ছাড়া, এই অঞ্চলে অধিবাসীর সংখ্যাও অত্যধিক। তাই মাথা-পিছু কৃষিযোগ্য জমিরও অভাব। ফলে এই অঞ্চলে অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ অল্প। চীনারা তাই সামান্য পরিমাণ জমিও পতিত রাখিতে পারে না। তাহারা রাস্তার দুই দিকের জমিতেও চাষ করে। জমির মধ্যকার আল খুবই সরু করিয়া দেয়, যাহাতে বেশী জমি নষ্ট না হয়। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহারা মানুষের মল ব্যবহার করে। এইভাবে জমির সাররূপে মানুষের মলের ব্যাপক ব্যবহার আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। উত্তর চীনে গম, যব, ভুট্টা, মটর, আলু, সোয়াবিন প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। জমির অভাবের জন্য পশুচারণের উপযোগী ক্ষেত্রের একান্তই অভাব। তাই উত্তর চীনে পশুপালনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শূকর ও মুরগীই ইহাদের প্রধান গৃহপালিত জীব। ইহারা গৃহের আশেপাশের আবর্জনা প্রভৃতি হইতেই নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং ইহাদের জন্য চারণক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় না।

কৃষি

কৃষিকার্য উত্তর চীনের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা হইলেও, ইহাদের অন্যতম উপজীবিকা হইল রেশম উৎপাদন। ইহারা নিজ নিজ গৃহে গুটিপোকার চাষ করে। গুটিপোকার চাষ সাধারণতঃ মেয়েরাই করিয়া থাকে। এই অঞ্চলে তাই প্রচুর পরিমাণে রেশম ও রেশমী কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতেই রেশম ও রেশমী বস্ত্র সম্পর্কে চীনের খ্যাতি রহিয়াছে। প্রাচীন কালে চীনা রেশমের কাপড় বা চীনাংশুক ভারতেও আমদানি করা হইত।

বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থা।—চীনদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও লোকায়ত্ত সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবার (1949 খ্রীঃ) পর উত্তর চীনের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। জমিদারের নিকট হইতে জমি লইয়া কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। কৃষির জন্য যৌথ খামার ও সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সমবায়-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় জমির খণ্ডিতকরণ বন্ধ হইয়াছে। ভূমিক্ষয় রোধের জন্যও ব্যবস্থা করা হইতেছে। হোয়াং হো নদীর বন্যা হইতে দেশরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইতেছে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা কৃষকদিগকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করিয়া

তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা সম্ভব হয় নাই। শীতল ঝটিকা, বন্যা ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখনও প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং কৃষিকার্যের ও খাদ্যোৎপাদনের বিঘ্ন ঘটায়। ফলে আজও খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চলে কয়লা, লোহা ও তেলের খনিও আছে। ফলে এই অঞ্চলে বহু কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে বহু রেলপথ ও পথঘাট নির্মাণ করা হইয়াছে। চীনদেশের রাজধানী এই অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায়, এই অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িয়াছে এবং তাহা এই অঞ্চলের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে।

আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের পশুপালন ও গম-উৎপাদন

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টাইনায় সুবিস্তৃত তৃণভূমি রহিয়াছে। এই সকল তৃণভূমি সাধারণতঃ দীর্ঘ ও ঘন হরিদ্রাভ ঘাসে ঢাকা। এই তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলকে প্রেইরি (Priarie) বলা হইয়া থাকে। প্রেইরির জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অল্প। গ্রীষ্মকালেই সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। তাই এখানে বড় বড় গাছের সংখ্যা খুবই কম।

আদিম অধিবাসী।—ইউরোপীয়দের আমেরিকার দুই মহাদেশে প্রবেশ ও প্রাধান্য-বিস্তারের পূর্বে প্রেইরি অঞ্চলে রেড ইণ্ডিয়ান্‌রাই বাস করিত। কলাম্বাস্ ভুল করিয়া আমেরিকার ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাই এই ভূখণ্ডের আদিম অধিবাসীরা 'ইণ্ডিয়ান্' নামেই পরিচিত হইয়াছিল। ইহাদের গাত্রবর্ণ রক্তাভ পীত হওয়ায়, ইহারা "রেড ইণ্ডিয়ান্" বা 'লাল ভারতীয়' আখ্যা পাইয়াছিল। প্রেইরি অঞ্চলে বাইসন নামে পরিচিত একপ্রকার বন্য গরু বাস করিত। তাহা শিকার করাই রেড ইণ্ডিয়ান্‌দের প্রধান জীবিকা ছিল। বাইসনকে তাহারা পোষ মানাইতে পারিত না। তাই বাইসন শিকারের জন্য তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। ফলে রেড ইণ্ডিয়ান্ সমাজ ছিল যাযাবর শিকারীর সমাজ। তীর-ধনুকই ছিল তাহাদের প্রধান অস্ত্র। তাহারা গায়ে চামড়ার পোশাক ও মাথায় বর্ণবিচিত্র পাখীর পালকের মুকুট পরিত। ইউরোপীয়রা আমেরিকা ভূখণ্ডে অধিকার বিস্তার করিবার কালে এই রেড ইণ্ডিয়ান্‌দের সহিত তাহাদের বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। ইউরোপীয়দের হাতে অসংখ্য রেড ইণ্ডিয়ান্ নিহত হয়, অনেক উপজাতি ও গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাহারা ইউরোপীয়দের বশ্যতা স্বীকার করে। তাহারা ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে

আসিয়া ঘোড়ায় চড়িতে, বন্দুক ছুঁড়িতে এবং ইউরোপীয় বেশভূষা গ্রহণ করিতে শিখে। তাহারা যাযাবর শিকারীর জীবন ত্যাগ করিয়া পশুপালন ও কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করে।

প্রেইরি অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা।—ইউরোপীয়রা প্রেইরি অঞ্চলে আসিবার পর এই অঞ্চলে গো-পালন ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। গো-খামারগুলিকে বলে "র‍্যাঞ্চ" (ranch)। এক-একটি র‍্যাঞ্চে বহু শত গাই, বাছুর ও বলদ থাকে। বড় র‍্যাঞ্চগুলিতে গরুর সংখ্যা হয় কয়েক হাজার। র‍্যাঞ্চের মালিকদের অধীনে বহু কাউবয় (cowboy) বা রাখাল থাকে। তাহারা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া র‍্যাঞ্চের গরুগুলিকে তৃণভূমিতে চরাইতে লইয়া যায়। রাখালদের হাতে একপ্রকার লম্বা শক্ত দড়ি থাকে। এই দড়িকে বলা হয় "ল্যাসো" (lasso)। ল্যাসোর ডগায় একটি ফাঁস থাকে।

গো-পালন—র‍্যাঞ্চ
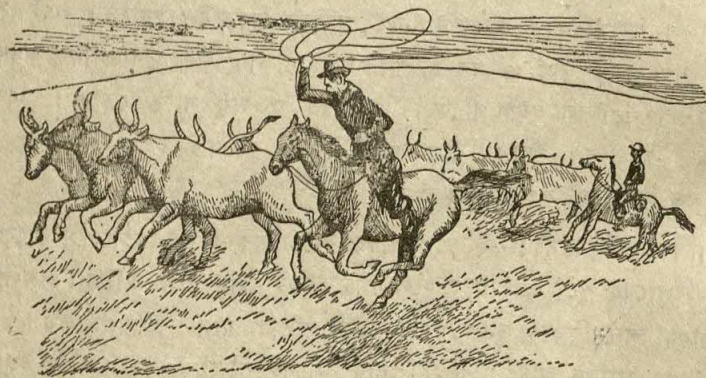
প্রেইরি অঞ্চলের কাউবয়

ফাঁসগুলি এমন কৌশলে তৈয়ারি যে, গরু দলভ্রষ্ট হইলে রাখালরা দূর হইতে ল্যাসো ছুঁড়িয়া দলভ্রষ্ট গরুর গলায় ফাঁস আট্‌কাইয়া দেয় ও তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে। র‍্যাঞ্চের রাখালরা সাধারণতঃ রেড ইণ্ডিয়ান্। তাহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া র‍্যাঞ্চের কাছে কাঠের ঘরে বাস করে। র‍্যাঞ্চের মালিকরা সকলেই প্রায় ইউরোপীয়। রেড ইণ্ডিয়ান্ মালিক কদাচিৎ দেখা যায়।

প্রেইরি অঞ্চলে শহরের সংখ্যা কম। শহরগুলি বেশ দূরে দূরে অবস্থিত। শহরে গরুর বেচা-কেনা হইয়া থাকে। কাউবয়রা গরুর দল লইয়া শহরে যায় এবং সেখানে সেগুলিকে বিক্রয় করে। তাহাদিগকে দিগন্ত-বিস্তৃত বহু মাঠ ও কৃষিক্ষেত্র পার হইয়া শহরে যাইতে হয়। তাহারা অনেক সময় তাঁবু ফেলিয়া ও আগুন জ্বালাইয়া বিশ্রাম করে।

শহর

প্রেইরি অঞ্চলে কৃষিকার্যও হইয়া থাকে ব্যাপকভাবে। গমই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কৃষিক্ষেত্রগুলির আয়তন বেশ বড় হওয়ায়, এখানে ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ হয় এবং ড্রিল-যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা হয়। গমের ফসল অল্পদিনের মধ্যেই উঠে। গ্রীষ্মকালে বরফ-গলা জল না শুষ্ক হইতেই বীজ বোনা হয় এবং ফসল তোলা হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। ফসল তোলা ও ঝাড়াই হয় 'কম্বাইন' যন্ত্রের সাহায্যে। গম বস্তা বোঝাই হইয়া কৃষিক্ষেত্র হইতে চালান যায় গমের আড়তে। গমের গাছগুলি কাহারও কাজে লাগে না; তাই সেগুলি মাঠেই পড়িয়া থাকে এবং সেগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই খড়-পোড়ানো ছাই সারের কাজ করে। যে খড় পোড়ানো হয় না, সেগুলিকেও লাঙল করিবার সময় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। সেগুলি পচিয়া সার হয়। প্রেইরি অঞ্চলে উৎপন্ন গম আমেরিকার ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু পরিমাণে রপ্তানি হয়।

কৃষি

প্রেইরি অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম। তাই হাটবাজারের মতো বিদ্যালয়গুলিও এখানে বেশ দূরে দূরে অবস্থিত। বিদ্যালয়গুলি বেশ দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ায়, তথাকার বালক-বালিকারা সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া বিদ্যালয়ে যায়। বালক-বালিকারা ঘোড়ায় চড়িতে খুবই অভ্যস্ত। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাশেই ঘোড়ার আস্তাবল থাকে। এখানে ঘোড়াই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বাহন। তাই এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অশ্বারোহণে নিপুণ।

অশ্বারোহণ

উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলে কৃষিকার্যের অপেক্ষা গো-পালনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলে—আর্জেন্টাইনায়—পশুপালনের অপেক্ষা কৃষিকার্যের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় অধিক। এখানে গো-পালনের সঙ্গে মেষ-পালনও করা হইয়া থাকে। তাই এখানে প্রচুর পরিমাণে পশমও উৎপন্ন হয়। আর্জেন্টাইনার প্রেইরি অঞ্চল উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের তুলনায় সমৃদ্ধ ও উন্নত। এখানে ঘর-বাড়ী, পথঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় রহিয়াছে।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার খনি অঞ্চলের লোকসমাজ

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ তিনদিকে সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। পূর্বদিকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অবশিষ্ট স্থলভাগ। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ইহার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া

থাকে। ইহা ছাড়া, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য অংশ মরুময়। এই সকল অংশে জলবায়ু শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যল্প। মরুময় অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েকটি বড় হ্রদ আছে। হ্রদগুলির উপকূলবর্তী অঞ্চল খনিজ সম্পদে পূর্ণ।

অধিবাসী।—ইউরোপীয়দের মধ্যে ওলন্দাজগণই অস্ট্রেলিয়ায় সর্বপ্রথম আগমন করে। কিন্তু তাহারা সেখানে বেশীদিন থাকে নাই। ইংরেজগণই এখানে কয়েদীদিগকে পাঠাইতে থাকে এবং ইংরেজ কয়েদীরাই এখানে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করে। পরে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকরাও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আদিম অধিবাসী বাস করিত। ইহাদের গায়ের রঙ তামাটে, নাক চেপটা ও মাথার চুল কোঁকড়ানো। আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির লোকদের সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহারা চাষবাস বা পশুপালন করিত না। ইহারা ফল-মূল আহরণ ও শিকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিত। ইহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বাস করিত। ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর ইহারা গভীর বনের দিকে চলিয়া যায়। পরে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা আন্দামানী আদিবাসীদের মতোই নানা কারণে সংখ্যায় খুব হ্রাস পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার নূতন রোগ দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে ইহাদের মৃত্যুহার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। ইহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া বনে-জঙ্গলে, মরুভূমিতে ও সমুদ্রের উপকূলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফল-মূল সংগ্রহ, পশুশিকার ও মৎস্যশিকার করিয়া ইহারা জীবিকানির্বাহ করে। তীর-ধনুক ও বর্শাজাতীয় অস্ত্র ইহারা ব্যবহার করিলেও, ইহাদের প্রধান অস্ত্র হইল 'বুমেরাং' নামে একপ্রকার ক্ষেপণাস্ত্র। বুমেরাং এমনভাবে নির্মিত একটি ক্ষেপণাস্ত্র যে, উহা নিক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে নিক্ষেপকারীর নিকটেই ফিরিয়া আসে। ইহারা প্রায় লেংটি-জাতীয় সামান্য কিছু পরে। পুরুষরা গোঁফ-দাড়ি কামায় না। এখন ইহাদের অনেকেই ইউরোপীয়দের অধীনে কাজ করিতেছে।

আদিবাসী

খনি আবিষ্কার।—নির্বাসিত ইংরেজ কয়েদীরাই এখানে প্রথমে বসবাস শুরু করিয়াছিল। পরে অন্যান্য বহু ইংরেজ আসিয়া এখানে বসবাস শুরু করে। তাহারা গোড়ার দিকে এখানে মেষপালন করিত। 1892 খ্রীষ্টাব্দে কুলগার্ডি ও কালগুর্লি অঞ্চলে স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়। ইংরেজরা এই সকল খনিতে কাজ শুরু করে এবং খনিতে কাজ করিবার জন্য দলে দলে লোক বাহির হইতে আসিতে থাকে। স্বর্ণ-খনি আবিষ্কারের অল্পকাল পরে নিকটবর্তী বানবেরি অঞ্চলে কয়লা-খনিও আবিষ্কৃত

হয়। পরে এই অঞ্চলে টিনের খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে বহু কল-কারখানা ও শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে অসংখ্য ইংরেজ আসিয়া উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। পূর্বে ইহা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য থাকিলেও, এখন ইহা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ইহা ভারতের ন্যায় বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য।

স্বর্ণ, কয়লা ও টিন

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় এখন কৃষি ও পশুপালনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সকল প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্তমানে এখানে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হইতেছে। এখানে ফলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশুপালনও যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছে। পশুপালনের ফলে এখানে দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস এবং চামড়াও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গম এবং ঐ সকল দ্রব্য বিদেশেও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কৃষি ও পশুপালন

খনি অঞ্চলে অসংখ্য লোক কাজ করিতেছে। কিন্তু এই মরু অঞ্চলে খাদ্য ও জলের একান্ত অভাব। খাদ্যাভাব ও জলাভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ শহরে বহু জলাধার নির্মাণ করিয়া সেগুলিতে জল সঞ্চয় করা হয় এবং মাটির তলা দিয়া পাইপের সাহায্যে এখান হইতে দুইশত মাইল দূরেও এই সকল জলাধার হইতে জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে খাদ্য-প্রেরণের জন্য বহু রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে।

খনি অঞ্চলে খাদ্য ও জল সরবরাহ

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় এখন বহু শহর ও বন্দর স্থাপিত হইয়াছে। সর্বত্র রেলপথ ও অন্যান্য স্থলপথ গড়িয়া তোলা হইয়াছে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াই সমগ্র অস্ট্রেলিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছে। এখানকার অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত। এখানে সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী, পথঘাট, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি বহুসংখ্যায় নির্মিত হইয়াছে।

রাইন নদীর তীরবর্তী একটি শিল্পপ্রধান লোকসমাজ

পশ্চিম ইউরোপের অন্যতম প্রধান নদী হইল রাইন। ইহা সুইজারল্যাণ্ডের একটি হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার মধ্যভাগ রহিয়াছে জার্মানি ও ফ্রান্সের সীমান্তে। সুইজারল্যাণ্ডে রাইন নদীর তীরে অসংখ্য বড় বড় কল-কারখানা ও শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে। রাইন নদী হইতে উৎপন্ন জল-বিদ্যুৎই এই সকল কল-কারখানা ও শিল্পনগরগুলিকে

প্রাণশক্তি যোগায়। এই অঞ্চলে কল-কারখানার সংখ্যা এতই বেশী যে, ইহাকে "ইউরোপের ওয়ার্কশপ" বলা হয়।

পশ্চিম জার্মানিতে রাইন নদীর অববাহিকা অঞ্চল পূর্বে আঙুর চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন এই অঞ্চল কয়লার খনি ও কল-কারখানার জন্যই সুবিখ্যাত হইয়াছে। রাইন নদীর পূর্বতীরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল জুড়িয়া রহিয়াছে কয়লার খনি এবং বহু বড় বড় কল-কারখানা। যেখানে মেইন নদী রাইন নদীর সহিত আসিয়া মিলিয়াছে, সেখানে ফ্রাঙ্কফুর্টের বিখ্যাত শিল্পনগরটি অবস্থিত। ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রাচীন শহর, ইহা যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য সমগ্র ইউরোপে তথা বিশ্বে সুপরিচিত। যেখানে রুহ্‌র নদী রাইনের সহিত আসিয়া মিলিয়াছে, সেখানে বিখ্যাত ডুইস্‌বার্গ বন্দরটি অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ডুইস্‌বার্গ বিশ্বের নদী-তীরবর্তী বন্দরগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল। রাইন ও রুহ্‌র নদীর অববাহিকা অঞ্চল কয়লা, লৌহ প্রভৃতি
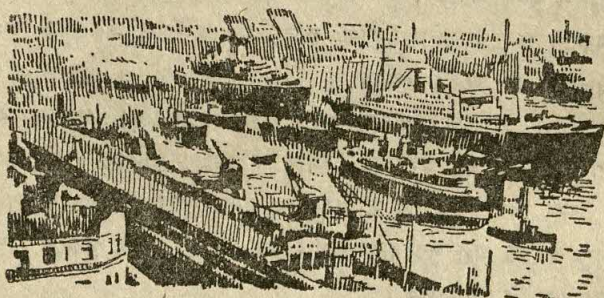
হাম্‌বুর্গ বন্দরের একটি দৃশ্য

খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলে বহু বৃহৎ কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইসেন শহরটি সমগ্র ইউরোপের ইস্পাত উৎপাদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিচিত। ইহা ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-কেন্দ্র।

বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল

রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ব্রেমেন হইতে হাগেন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বহু লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা রহিয়াছে। হাম্‌বুর্গ ও কিয়েল হইল জাহাজ-নির্মাণের দুইটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। লুডভিগ, শাভেন, লেজারকুশেন, কোলোন, বাভেরিয়া, মিউনিক প্রভৃতি শিল্পনগরগুলিও রাইন নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। রাইনের তীরবর্তী রুহ্‌র অঞ্চল বয়নশিল্পেও অত্যন্ত উন্নত। এখানে বহু কাপড়ের কল রহিয়াছে। নুরেম্‌বুর্গ শহরে পেন্সিল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা আছে। পাথার্ভয়ে গ্রাফাইটের খনি থাকায়, এখানে পেন্সিল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ গ্রাফাইট্‌ সহজেই পাওয়া যায়। এই সকল বৃহৎ বৃহৎ শিল্পনগর, কল-কারখানা ও খনির

কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তিও রাইন নদী হইতে উৎপন্ন জল-বিদ্যুৎ হইতে পাওয়া যায়। রাইন ও তাহার উপনদীগুলি বৎসরের সকল সময়ে নাব্য থাকায়, এই অঞ্চলে এই সকল কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য সহজেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইতে পারে। অন্যান্য যানবাহনের ও পথঘাটের সুব্যবস্থাও রহিয়াছে।

এই অঞ্চলে সুবিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল থাকায় অধিকাংশ লোকই শ্রমশিল্পে নিযুক্ত। তাই বলিয়া এই অঞ্চলে যে কৃষিকার্য হয় না, তাহা নহে। রাইন নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে যে কৃষিকার্য হয়, তাহাতে এই অঞ্চলের লোকসমাজের খাদ্যের সঙ্কুলান হয় না। তাই এই অঞ্চলে অন্যান্য স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে হয়। তাহার বিনিময়ে এই অঞ্চলের লোকসমাজ প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকে। তাই এই অঞ্চলের লোকসমাজকে শিল্পাশ্রয়ী লোকসমাজ না বলিয়া উপায় নাই।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know about the life of the people and their collective rein-deer farms in North Siberia ? [উত্তর সাইবেরিয়ার অধিবাসীদের জীবন ও তাহাদের যৌথ বল্গা-হরিণ পালন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

2. Give a description of the aboriginal Malayan Community. [মালয়ের আদিবাসী লোকসমাজের বর্ণনা দাও।]

3. Describe the rubber-plantation, mining and fishing which have so much influenced the life of the Malayan people. [রবারের চাষ, খনির কাজ ও মাছ ধরা—যাহা মালয়ীদের জীবনকে এতই প্রভাবিত করিয়াছে, সেগুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

4. Describe the community which live on the banks of the St. Lawrence. [সেন্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাসকারী লোকসমাজের বর্ণনা দাও।]

5. What do you know about the development of industry and agriculture on the banks of the St. Lawrence. [সেন্ট লরেন্স নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে শ্রমশিল্প ও কৃষির উন্নতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

6. "God created the world, but the Duch people created Holland."—Do you agree ? ["ভগবান্ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ওলন্দাজগণ হল্যাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে।"—এই উক্তির সহিত তুমি কি একমত ?]

7. Describe the new life which the people in the region near Zuyder Zee have built up. [জুইডার জী অঞ্চলের অধিবাসীরা যে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা বর্ণনা কর।]

8. Give an account of a North Chinese Community. [উত্তর চীনের লোক-সমাজের বিবরণ দাও।]

9. Describe the cattle and wheat farming community of the American Prairies. [আমেরিকার প্রেইরিগুলির পশুপালক ও গম-উৎপাদক লোকসমাজের বর্ণনা দাও।]

10. Describe the present life in the West Australia. [পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান জীবনযাত্রার বর্ণনা দাও।]

11. What do you know about the aboriginal people of the West Australia ? [পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

12. Describe the industrial development and the industrial people of the Rhine land. [রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের শ্রমশিল্পের বিকাশ ও শিল্পাশ্রয়ী লোকসমাজের বর্ণনা দাও।]

দ্বিতীয় খণ্ড

[ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ]

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের উপাদান—ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—অধিবাসী—বৈচিত্র্য ও ঐক্য

ইতিহাসের মূল উপাদান—মানুষ ও পরিবেশ।—মানুষের কীর্তি-কাহিনীর ধারাবাহিক বিবরণই হইল ইতিহাস। এই ইতিহাস দুইটি মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে—(1) মানুষ ও (2) তাহার পরিবেশ। ইতিহাসে যে কাহিনী বিবৃত হইয়া থাকে, তাহার প্রধান নায়ক মানুষ। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, গোষ্ঠীর সহিত গোষ্ঠীর, দলের সহিত দলের এবং জাতির সহিত জাতির সম্পর্ক, সংঘাত, সংঘর্ষ, মিলন ও মিশ্রণ এবং মানব-সমাজের বিভিন্ন অংশের তথা সমগ্র মানব-সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির ধারাবাহিক কাহিনীই হইল ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। মানুষ কখনই একক জীবন যাপন করে না, সে সর্বদা সমাজবদ্ধ বা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। তাই ইতিহাসে একদিকে যেমন মানুষের সমাজ বা দল একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনি অন্যদিকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও কার্যকলাপ। ইতিহাসের পাতায় আমরা অসংখ্য শ্রেষ্ঠ মানুষের—রাজা, বীর, জ্ঞানী, গুণী, ধর্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতির—নাম পাইয়া থাকি। মানব-সমাজের বিকাশের ধারায় ইঁহাদের দান অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যক্তিগত একক চেষ্টাতেই ইঁহারা কিছু করিতে পারেন না। ইঁহারা দেশ, জাতি ও সমাজকে গড়িয়া তুলিবার কাজে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিলেও দেশ, জাতি ও সমাজের কেবল বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ লগ্নেই ইঁহাদের জন্ম বা আবির্ভাব ঘটে। মানব-সমাজকে এই সকল শ্রেষ্ঠ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও কার্যকলাপ যেমন প্রভাবিত করে, তেমনই মানব-সমাজের বিশেষ অংশের বিশেষ অবস্থাতেই কেবল ইঁহাদের জন্ম, জীবন ও কার্যকলাপ সম্ভব হইতে পারে। আমরা কখনই মানুষকে তাহার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না, তাই আমরা মানুষ বলিতে মানুষ ও তাহার সমাজকেই বুঝিয়া থাকি। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রচেষ্টার ফলেই গ্রাম, নগর, জনপদ, রাজ্য, সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও অগ্রগতি ঘটিয়াছে। কিন্তু সকল মানুষের

ইতিহাসের দুই উপাদান —মানুষ ও পরিবেশ

ব্যক্তিগত মানুষের ভূমিকা

সমাজের গুরুত্ব

কর্ম-প্রচেষ্টা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতি একই পথে হয় নাই। মানুষের দৈহিক ও মানসিক গঠনে এবং তাহার চরিত্র, অভ্যাস ও মনোভাবের সংগঠনে পরিপার্শ্ব বা পরিবেশ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যকেই আমরা সাধারণতঃ পরিবেশ বলিয়া থাকি। পরিবেশ অনেক সময় মানব-সৃজিতও হইতে পারে। তবে এইরূপ পরিবেশও প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করে। মানবজাতি যে একদা ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, নিগ্রো জাতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বা শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক প্রভাব। এই সকল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও যে নানা জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলিও প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক প্রভাবেই প্রধানতঃ ঘটিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, মরুবাসী মানুষের সহিত তুষারাবৃত মেরু অঞ্চলের মানুষের, সমতলভূমির অধিবাসী মানুষের সহিত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী মানুষের, বিশাল ভূখণ্ডে বাসকারী মানুষের সহিত দ্বীপে বাসকারী মানুষের, নগরে বাসকারী মানুষের সহিত গ্রামাঞ্চলে বাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে, খাদ্যে, পরিচ্ছদে, বাসগৃহের নির্মাণে ও ব্যবহারে, চরিত্রে, মানসিক গঠনে ও শক্তিতে, রীতি-নীতিতে, আচার-ব্যবহারে অসংখ্য প্রকার পার্থক্য রহিয়াছে। তাই ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশে ও তাহার জাতীয় ইতিহাসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের প্রভাব

কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তু ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের নিকট যেভাবে দাসত্ব করে, মানুষ তাহা করে না। এই পার্থক্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে সত্য। কিন্তু মানুষ আপন বুদ্ধিবলে নিজেকে একদিকে যেমন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয়, সে অন্যদিকে তেমনি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বকে নিজের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিতও করে। মানুষ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিরোধিতাকে বুদ্ধিবলে পরাভূত করে, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক শক্তিকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিজের ইচ্ছামতো কাজে নিয়োজিত করে। এই ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সংগ্রামও মানব-সভ্যতা ও ইতিহাসের একটি প্রধান অংশ।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের প্রভুত্ব

ইতিহাসে পরিবেশের প্রভাব।—দেশ ও জাতির জীবনে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের এই প্রভাব এবং ঐ পরিবেশের বিরুদ্ধে মানুষের অবিরাম

সংগ্রামের প্রমাণ আমরা সকল দেশের ও জাতির ইতিহাসেই পাইয়া থাকি। গ্রীস ও ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে ইহার দৃষ্টান্ত সহজেই দেওয়া চলে। গ্রীসের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, গ্রীস দ্বীপময় ও পর্বতময়, তাহার ভূমি অনুর্বর, তাহার বহু অংশ সমুদ্রের মধ্যে বা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। গ্রীসদেশ পর্বতময় ও দ্বীপময় হওয়ায়, সেখানকার অধিকাংশ অঞ্চলই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে গ্রীসদেশে প্রাচীন কালে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী কোনও রাষ্ট্রের উদ্ভব না হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র হওয়ায় নাগরিকরা সহজেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশগ্রহণ করিতে পারিত। ফলে সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। গ্রীসদেশের ভূমি অনুর্বর হওয়ায়, গ্রীকদিগকে দৈহিক পরিশ্রম প্রচুর পরিমাণে করিতে হইত। ফলে গ্রীকজাতি অতিশয় বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহিষ্ণু হইতে পারিয়াছিল। ভূমির এই অনুর্বরতার জন্যই গ্রীকরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও উপনিবেশ-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিল। সমুদ্রের তীরে বা মধ্যে গ্রীসদেশের বহু অঞ্চল অবস্থিত হওয়ায়, তাহারা নৌবিদ্যাতেও অতিশয় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডের চারিদিক সমুদ্রবেষ্টিত, ইহার ভূমি অনুর্বর কিন্তু খনিজ সম্পদে পূর্ণ, ইহার জলবায়ু শীতপ্রধান। সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এবং ইহার ভূমি অনুর্বর হওয়ায়, ইংলণ্ড সামুদ্রিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে অতিশয় উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা নৌশক্তিতে বলীয়ান হইয়া সুদূর এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বহু দেশে ও দ্বীপে এবং অস্ট্রেলিয়ায় নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল ও বহু স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহা খনিজ সম্পদে অতিশয় সমৃদ্ধ হওয়ায় শ্রমশিল্পেও এত উন্নত হইতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও যে তাহার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রীস ও ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত

ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।—ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গেলে সর্বপ্রথম তাহার সীমার কথা বলিতে হয়। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তনশীল নহে, প্রকৃতিই তাহাকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ এবং উত্তর-পূর্বে লুসাই ও পাতকোই প্রভৃতি পর্বতমালা রহিয়াছে। বাকী তিনদিকে—দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে রহিয়াছে যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর। ভারতবর্ষের সীমারেখা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাইল। উত্তরের স্থলসীমা 1,600 মাইল, উত্তর-পশ্চিমের স্থলসীমা 1,200 মাইল, উত্তর-পূর্বের স্থলসীমা 500 মাইল এবং জলসীমা প্রায় 3,400 মাইল।

সীমা

ভারতবর্ষ সুবিশাল দেশ—ইহাকে উপমহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার আয়তন প্রায় 15,75,000 বর্গ-মাইল। ইহা রাশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপের সমান এবং গ্রেট বৃটেনের বিশগুণ। এই সুবিশাল ভূখণ্ডের ভূ-পৃষ্ঠ ও জলবায়ু সর্বত্র একরূপ নহে। ইহার কোথাও রহিয়াছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা ও গিরিশৃঙ্গ, কোথাও রহিয়াছে নদনদী-বিধৌত সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি, কোথাও রহিয়াছে উচ্চ মালভূমি, কোথাও রহিয়াছে মরুভূমি। ইহার কোথাও বৃষ্টিপাত হয় নাই বলিলেও চলে, আবার কোথাও পৃথিবীর সর্বাধিক বারিপাত হইয়া থাকে। ইহার কোথাও রহিয়াছে চিরতুষারাবৃত শীতপ্রধান অঞ্চল, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, কোথাও দুঃসহ গ্রীষ্ম, আবার কোথাও বা চিরবসন্ত। যাহাই হউক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ভারতবর্ষকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (1) হিমালয়াশ্রয়ী অঞ্চল। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই হইতে হিমালয়ের উচ্চতম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যময় ও চিরতুষারাবৃত অঞ্চল। এই অংশেই কাশ্মীর, কাংড়া, তেহ্‌রি, কুমায়ুন, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি অবস্থিত। (2) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদীগুলি দ্বারা বিধৌত অঞ্চল। ইহার মধ্যে সিন্ধু ও রাজপুতানা অঞ্চলের মরু অঞ্চলও রহিয়াছে। (3) বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত মালভূমি। (4) পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী দক্ষিণ ভারতের মালভূমি। (5) পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমে, পূর্বঘাট পর্বতমালার পূর্বে এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রোপকূলবর্তী উর্বর ভূমি

আয়তনের সুবিশালতা

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

পাঁচটি বিভাগ

ইতিহাসে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব।—ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্পর্কে বলিতে গেলে সীমারেখার কথা বলিতে হয়। উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত। ভারতীয় ইতিহাসে ইহার প্রভাব অসামান্য। হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালা ভারতবাসীকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে দিয়াছে স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা। মৌর্য, বাহ্লীক-গ্রীক, কুষাণ ও মুঘল শাসকগণের আমলে হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতীয় সাম্রাজ্য কখনও বিস্তারলাভ করিলেও, ভারতীয় বীরগণের সমর-অভিযান সাধারণতঃ হিমালয়ের দক্ষিণেই সীমাবদ্ধ থাকিত। কেবল তাহাই নহে, হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালা ভারতবর্ষকে স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা দেওয়ায়, ভারতীয়গণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন সম্পর্কে সচেতন থাকিতেন না। ফলে কোনও শক্তিশালী বহিঃশত্রু যখনই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, সে আক্রমণ প্রায়ই অতর্কিতভাবে আসিয়াছে এবং গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, তাতার,

হিমালয়ের প্রভাব

মুঘল প্রভৃতি জাতির আক্রমণ ভারতীয়গণ সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালা ভারতবর্ষকে স্বাতন্ত্র্য দিলেও, হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালায় গিরিপথসমূহ থাকায় ঐ সকল গিরিপথ দিয়া পারসিক, গ্রীক, মঙ্গোল, তাতার, মুঘল, আহোম, তিব্বতীয় প্রভৃতি জাতির আগমন ও আক্রমণ ঘটিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ঐ সকল পথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যও হইয়াছে। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদীগুলি হিমালয় ও তৎসংলগ্ন উচ্চভূমি হইতেই উৎসারিত হইয়া উত্তর ভারতকে উর্বর, শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয় পর্বতমালায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বর্ষার সৃষ্টি করিয়া উহাকে শস্যশ্যামল করিয়া রাখে। উত্তর হইতে আগত শুষ্ক বায়ু-প্রবাহ হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, ভারতবর্ষের ভূমিকে বিশুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং ভারতের উত্তর সীমারেখা—হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালা—যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে ভারতীয় ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের অপর তিনদিকে রহিয়াছে সমুদ্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ভারতীয়গণ সমুদ্রপথে বহির্জগতের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন। আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, চীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, বোর্নিও, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সহিত ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, বোর্নিও, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা উপনিবেশও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সমুদ্রপথেই ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতে ফরাসীগণ, পর্তুগীজগণ, ওলন্দাজগণ ও ইংরেজগণ প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের শতকরা 85 ভাগ আজও সমুদ্রপথেই হইয়া থাকে। ভারতের কৃষি-সম্পদও অনেকাংশে সমুদ্রের দান। কারণ, সমুদ্র হইতে আগত মৌসুমী বায়ুই ভারতে বর্ষার সৃষ্টি করে। তাই সমুদ্রও যে ভারত-ইতিহাসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমুদ্রের প্রভাব

ভারতের আয়তনও ভারতের ইতিহাসকে কম প্রভাবিত করে নাই। ভারতের আয়তন বিশাল হওয়ায়, উহা ভারতীয় ইতিহাসকে জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। সকল সময়ে ভারতবর্ষের সকল অংশ একই রাষ্ট্রশক্তির অধীন হয় নাই। সাধারণতঃ একই সময়ে বহু রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ অনিবার্য

আয়তনের প্রভাব

হইয়া উঠিয়াছে। তবে প্রাচীন কালে মৌর্যগণের সময়ে, মধ্যযুগে খলজি ও মুঘলগণের রাজত্বকালে ও সাম্প্রতিক কালে ইংরেজগণের অধীনে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চলই একই রাষ্ট্রশক্তির অধীন হইয়াছিল। ভারতের আয়তন সুবিশাল হওয়ায়, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিগুলি সমগ্র ভারত জয় করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই পোষণ করিত, ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। ফলে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিগুলিও কখনও সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠে নাই।

বিন্ধ্যের প্রভাব

ভারতের মধ্যস্থলে পূর্ব ও পশ্চিমে যে বিন্ধ্য পর্বতমালা বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাও ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করিয়াছে। বিন্ধ্যের উত্তরে অবস্থিত অংশকে সাধারণতঃ আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণে অবস্থিত অংশকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। বিন্ধ্য পর্বত প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান থাকিয়া উত্তরের রাজশক্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে দক্ষিণে বিস্তারলাভে বাধাপ্রাপ্ত করিয়াছে। তবে বিন্ধ্য পর্বত অনুচ্চ হওয়ায়, এই বাধা অনতিক্রম্য হয় নাই। তাই কি আর্য সভ্যতা, কি মুসলিম সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে বন্যার মতো দ্রুত বিস্তারলাভ না করিলেও, ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিয়াছে এবং এই বাধা অনেক সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সর্বভারতীয় রাজশক্তির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে।

ইতিহাসে বিভিন্ন অংশের গুরুত্ব

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতবর্ষকে যে কয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত উত্তর ভারতই ভারতীয় ইতিহাসে সর্বাধিক প্রাধান্য ও গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এই উত্তর ভারতের মধ্যে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলই ইতিহাসের পাতায় প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরই কেবল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিগুলি ভারতের অন্যান্য অংশে প্রভুত্ব-বিস্তারে অগ্রসর হইতেন। কি মৌর্যগণ, কি গুপ্তগণ, কি দিল্লীর সুলতানগণ, কি মুঘল সম্রাটগণ সকলেই উত্তর ভারতে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মৌর্যগণ, দিল্লীর সুলতানগণ ও মুঘল সম্রাটগণ যেরূপ সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতের কোনও রাজশক্তি তেমনটি করিতে পারেন নাই। সাতবাহনগণ, রাষ্ট্রকূটগণ, বিশেষতঃ মারাঠাগণ অবশ্য এ-বিষয়ে কিছুটা সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ অঞ্চল অধিকাংশ সময়ই ভারতীয় ইতিহাসের মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল।

ভারতের অধিবাসী ও বিভিন্ন জাতি।—ভারতবর্ষকে যে "নৃতত্ত্বের সংগ্রহশালা" বলা হয়, তাহা অত্যুক্তি নহে। পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে নিগ্রো, ভূমধ্যসাগরীয়, ককেশীয় ও মঙ্গোলীয়—এই চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা

হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর লোককেই ভারতের অধিবাসীরূপে লক্ষ্য করা যায়। পুরাপ্রস্তর যুগে ভারতে যে শ্রেণীর লোক বাস করিত, তাহার কিছু বংশধর এখনও আন্দামান দ্বীপে বাস করে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা ইহাদিগকে নিগ্রোব (Negrito) নাম দিয়াছেন। কাদির, ইরুলা, কুরুম্বা, পনিয়ন্, আঙ্গামী নাগা প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষের জাতিগত চিহ্ন ও জন্মগত প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। এই নিগ্রোবটু শ্রেণীর লোকরা হ্রস্বকায়, ইহাদের মাথা ছোট, ঠোঁট উঁচু ও পুরু, নাক থ্যাবড়া, গায়ের রঙ অত্যন্ত কালো এবং মাথার চুল খুবই কোঁকড়ানো। ইহাদের ভ্রূ উঁচু নয়, কপালের সহিত সমতল; চিবুক প্রায় নাই বলিলেই চলে। শরীরের তুলনায় হাত লম্বা।

নিগ্রোবটু শ্রেণীর লোক

পুরাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, নবপ্রস্তর যুগে অন্য এক শ্রেণীর লোক ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। ইহাদের সহিত অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের কিছুটা সাদৃশ্য থাকায়, পণ্ডিতরা ইহাদের নাম দিয়াছেন "আদি-অস্ত্রালরূপ" (Proto-Australoid)। হো, মুণ্ডা, কোল, ভীল, সাঁওতাল, ভূমিজ, অসুর, কোরকু, খাড়িয়া, গড়াবা প্রভৃতি উপজাতির লোকরা ইহাদের বংশধর। ইহারা নিগ্রোবটু মানুষদের মতোই বেঁটে ও কালো। তবে ইহাদের চুল নিগ্রোবটুদের অপেক্ষা কম কোঁকড়ানো।

আদি-অস্ত্রালরূপ

পরবর্তী কালে তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগে অপর এক শ্রেণীর মানুষ ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহারা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকরা এই শ্রেণীর লোকের বংশধর। পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে মানবজাতির ভূমধ্যসাগরীয় বা আইবেরীয় (Iberian) শাখার লোক বলিয়া মনে করেন। বালুচিস্তানের ব্রাহুই জাতির লোকরা যে ভাষায় কথা বলে, তাহার সহিত তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তাই পণ্ডিতগণ মনে করেন, দ্রাবিড়গণ এই পথেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁহারা সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরে আর্যগণের আগমনের ফলে সিন্ধু সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং ক্রম-অগ্রসরমাণ আর্যদের সহিত সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া দক্ষিণ ভারতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

দ্রাবিড়গণ

লৌহ যুগে ভারতে অপর এক শ্রেণীর লোক প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহারা আর্য নামে পরিচিত এবং মানবজাতির মূল ককেশীয় শাখার অন্তর্গত। পারসিক, গ্রীক, লাতিন, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী, রুশ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সহিত ভারতীয় আর্যদের ভাষার প্রচুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাই পণ্ডিতরা

মনে করেন, ককেশাস বা মধ্য-এশিয়ার কোন অঞ্চল হইতে আর্যরা পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই একটি শাখা পারস্যের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। আর্যগণ সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং আর্য সভ্যতাই পরবর্তী কালে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উপাদানে পরিণত হইয়াছিল।

আর্যগণ

ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় শাখার লোকরাও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছেন। ইঁহাদিগকে তিব্বত-ব্রহ্মীয় (Tibeto-Burman) বা চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) বলা হয়। নেপালী, ভুটিয়া, নাগা, কুকি, আহোম, সান প্রভৃতি জাতির লোকরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্মরণাতীত কাল হইতে এই জাতীয় লোকরা উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

মঙ্গোলীয়গণ

ইতিহাসের বিভিন্ন কালে ককেশীয়, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয় জাতির লোকরা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীক, শক, ইউ-চি (কুষাণ), হূণ, পারসিক, আরব, তাতার, আফগান, আহোম, হাবসী (নিগ্রো), মুঘল, ইংরেজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির লোকরাই তাহাদের মধ্যে প্রধান। বলাই বাহুল্য, এই সকল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর লোকে বিভিন্ন কালে ভারতে আসিয়া বসবাস করিলেও তাহাদের মধ্যে অবিরাম মিলন ও মিশ্রণের ফলে ভারতবাসিগণ এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। খাঁটি দ্রাবিড়, খাঁটি নিগ্রোবটু, খাঁটি আর্য, খাঁটি আদি-অস্ত্রালরূপ বলিয়া আজ আর কিছুই নাই। ভারতের অধিবাসী-দিগকে এখন জাতিগতভাবে (racially) বিভক্ত বা পৃথক করা কঠিন। এখন ভারতীয়গণ ভাষার, ধর্মের এবং অঞ্চলের বা প্রদেশের ভিত্তিতেই প্রধানতঃ বিভক্ত হইয়া সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের অংশরূপেই বিরাজ করিতেছে। ভারতীয়গণ সর্বপ্রথমে ভারতীয় এবং পরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন, বাঙ্গালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, বিহারী, মালয়ালী, কানাড়ী, গুজরাটী, সিন্ধী, আসামী, ওড়িয়া প্রভৃতি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে।

ভারতীয় মহাজাতি

বিভিন্ন ভাষা।—ভারতে মানবজাতির বিভিন্ন শাখার লোকরা ভারতে সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া বসবাস করায় এবং সেগুলির মধ্যে অবিরাম মিলন ও মিশ্রণ চলিতে থাকায়, ভারতে অসংখ্য ভাষা ও উপভাষার (dialects) সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের সকল ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা হইল 845; সেগুলির মধ্যে 14টি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই 14টি ভাষা হইল—হিন্দী, উর্দু, বাংলা, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্, ওড়িয়া,

আসামী, কাশ্মীরী ও সংস্কৃত। প্রধান ভাষাগুলিতে ভারতের শতকরা 91 জন লোক কথা বলে। অন্যান্য উপজাতীয় ভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলে বাকী শতকরা 9 জন লোক।

বিভিন্ন ধর্ম।—ভারতে যেমন বহু ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে, তেমনই প্রচলিত রহিয়াছে বহু ধর্ম। এত ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় নাই। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্শী ধর্ম এবং ঐ সকল ধর্মের বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী লোকে ভারতে বাস করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই সর্বাধিক। তারপরেই সংখ্যার দিক হইতে মুসলমানগণের স্থান। পাঞ্জাবেই শিখ ধর্মের প্রাধান্য থাকিলেও, শিখগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও বর্তমানে বসবাস করিতেছেন। গুজরাটে ও রাজপুতানায় জৈন ধর্ম প্রচলিত রহিলেও, ভারতের অন্যান্য স্থানেও তাঁহারা বসবাস করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের (পূর্বপাকিস্তানের) চট্টগ্রামে, কাশ্মীরে ও হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ রহিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা অধিক হইলেও; ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দেখা যায়। প্রধানতঃ বোম্বাই অঞ্চলেই পার্শীদের বাস হইলেও, ভারতের অন্যান্য বড় শহরেও তাঁহাদের অনেকেই বাস করেন।

জীবনযাত্রা-পদ্ধতি।—ভাষা ও ধর্মের মতোই ভারতীয়গণের মধ্যে খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারেও বিভিন্নতা ও পার্থক্য রহিয়াছে। এই সকল পার্থক্যের প্রধান কারণ আঞ্চলিক জলবায়ু ও পরিবেশ এবং বহিরাগতদের প্রভাব। ভারতীয়গণ চাউল, গমজাত খাদ্য ও জোয়ারকেই প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করেন। তবে চাউলের ব্যবহারই সর্বাধিক। ধুতি, পায়জামা, কামিজ, কোর্তা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের প্রধান পরিচ্ছদ। শহরাঞ্চলে আজকাল ইউরোপীয় পোশাকের প্রচলনও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবাসিগণের বাসগৃহ-গুলিও নানা উপকরণে ও নানা ঢংয়ে নির্মিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন ধর্মের লোকের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির মধ্যে বহুপ্রকার পার্থক্য রহিয়াছে। বিবাহ, পূজা-উপাসনা, উৎসব, মৃতের সৎকার ও পারলৌকিক অনুষ্ঠানসমূহে এই ভিন্নতা ও পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে।

বিভিন্নতার মধ্যে একতা—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।—ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ভারতের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষিত হইয়া থাকে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দিক হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চরম পার্থক্য ও বিভিন্নতা রহিয়াছে। ভারতের কোন অংশ সমতল ও উর্বর, অজস্র নদনদীতে পরিপূর্ণ। কোনও অংশ উচ্চ মালভূমিতে পূর্ণ। আবার কোনও অংশ পর্বতময়,

অনুর্বর। কোন অংশে বা মরুভূমি ধূ-ধূ করিতেছে, কোথাও বা দুর্গম অরণ্যভূমি সবুজ আস্ফালনে আকাশ স্পর্শ করিতেছে। ইহার কোনও অঞ্চলে শীতের প্রাধান্য —চিরতুষারের আবরণ, কোথাও বা দুঃসহ গ্রীষ্ম, কোথাও বা চিরবসন্ত। তবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলই বেশীর ভাগ। এখানে বারিপাতের পরিমাণের মধ্যেও অসংখ্য প্রকার পার্থক্য ও ভিন্নতা দেখা যায়। এখানকার চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সর্বাধিক বারিপাত হইয়া থাকে, আবার কোন কোন অঞ্চলে বারিপাতের অভাবে মরুভূমি ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতেছে। জলবায়ুর এইরূপ ভিন্নতা ও পার্থক্যের জন্য উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর রাজ্যেও অজস্র প্রকার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

সুপ্রাচীন কাল হইতেই আজ পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন জাতির লোক প্রবেশ ও বসবাস করিয়াছে ও করিতেছে। সুপ্রাচীন কালে ভারতে যে নিগ্রোবটু ও আদি-অস্ত্রালরূপ শ্রেণীর মানুষ বাস করিত, তাহাদের বংশধরগণ আজও উপজাতিরূপে ভারতে বাস করিতেছে। প্রাচীন কালে দ্রাবিড়, আর্য, পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ ও হূণগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। মধ্যযুগে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে আরবগণ, তুর্কীগণ, হাবসীগণ, আফগানগণ, মুঘলগণ। আধুনিক কালে ভারতে আসিয়াছে পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ। এইরূপে কালে কালে যুগে যুগে অসংখ্য মানব-প্রবাহ মহা-ভারতের সাগরে আসিয়া লীন হইয়া এক মহাজাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

নানা জাতির মানুষের মিলনক্ষেত্র

বহু জাতির মিলনক্ষেত্র হওয়ায়, ভারতে বহু ভাষা ও সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই বহুসংখ্যক ভাষা ও সাহিত্য ভারতে এক অনবদ্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের 2 শতাধিক ভাষার মধ্যে যে 14টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই উন্নতধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্মের দিক দিয়াই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সকল ধর্মের মিলনক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য

জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, পেশা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও অসংখ্য প্রকার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য রহিয়াছে।

কিন্তু এই সকল অসংখ্য ভিন্নতা ও পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতবাসিগণের চিত্তে এক অখণ্ড ঐক্যবোধ আবহমান কাল হইতে গভীরভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার

লইয়াই চিরকাল পরস্পরের পাশাপাশি বাস করিতেছে এবং এক অবিচ্ছেদ্য মিলন-গ্রন্থিতে গ্রথিত হইয়াছে। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যস্থাপনের আদর্শই হইল ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল আদর্শ। এমন সর্বসহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতা পৃথিবীর আর কোনও দেশে দৃষ্ট হয় না। সুপ্রাচীন কাল হইতেই হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের মানুষ নিজেদিগকে "ভারত-সন্ততি" এবং এই বিশাল ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ বলিয়াই পরিচিত করিয়া আসিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে এই অখণ্ড ভারতের কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। একই রাজা বা রাষ্ট্রশাসনের অধীনে সমগ্র ভারতভূমি ঐক্যবদ্ধ হউক বা না হউক, ভারতীয়গণের চিত্তে উহা চিরদিনই অখণ্ড ঐক্য লাভ করিয়াছে। সমুদ্র-পর্বত-বেষ্টিত ভারতের অবিচল সীমারেখা ভারতবাসিগণের মনে অখণ্ড ঐক্যবোধ সৃজনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে।

ভারতের সর্বগ্রাহী সহিষ্ণুতা

ভারতবর্ষ নামের প্রভাব

সীমার প্রভাব

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ রাজগণ সর্বদাই সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতে অখণ্ড ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ রাজগণ প্রাচীন কালে অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া একরাট্, সম্রাট, রাজচক্রবর্তী প্রভৃতি হইতেন। তাঁহাদের সকলের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন। পরবর্তী কালে মৌর্য সম্রাটগণ, গুপ্ত সম্রাটগণ, খলজি সুলতানগণ, মুঘল বাদশাহ্গণ, ইংরেজ শাসকগণ—সকলেই সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসকগণ ছাড়া অন্য সকল বহিরাগত আক্রমণকারীই ভারতের ভূমিকে আপন দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের অনন্ত মানব-সমুদ্রের মধ্যে নিজেদিগকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে বিদেশীগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ কালে কালে যুগে যুগে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন এবং সর্বভারতীয়তার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয়গণের এই ঐক্যবোধ শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বন্দে মাতরম্ ও জয় হিন্দ্ মন্ত্রে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পশ্চিমে আফগান সীমান্ত হইতে পূর্বে আসাম পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ভারতীয়গণ জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে এক ও অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক প্রভাব

এইভাবে ভারতীয় ইতিহাসে যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্নতার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং প্রভেদের মধ্যে ঐক্যকে আমরা সর্বকালেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পৃথিবীর আর

কোনও দেশে এমন অসংখ্য বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও অখণ্ডতার এক পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই।

প্রশ্নাবলী

1. Estimate the influence of the geographical and natural factors on Indian history. [ভারতীয় ইতিহাসে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পর্যালোচনা কর।]

2. Give an account of the physical features of India and estimate their political significance. [ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ ও সেগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

3. Write a short note on the people of India and languages, religions and diverse ways of life. [ভারতবর্ষের অধিবাসী এবং তাহাদের ভাষা, ধর্ম ও বিভিন্ন জীবনযাত্রা-পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

4. "India offers unity in diversity"—explain. ["ভারতে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য নিহিত আছে।"—ব্যাখ্যা কর।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

প্রধান যুগ-বিভাগ

প্রধান যুগ-বিভাগ।—প্রত্যেক দেশের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা যায়—(1) প্রাগৈতিহাসিক যুগ, (2) প্রাচীন যুগ, (3) মধ্য যুগ ও (4) আধুনিক যুগ। ভারতীয় ইতিহাসকেও ঐরূপ যুগ-বিভাগের দ্বারা সাধারণতঃ বিভক্ত করা হইয়া থাকে। আদিম কালে মানুষ যখন সবেমাত্র ভারতভূমিতে বাস বা বিচরণ করিতে শুরু করিয়াছিল, সেই সময় হইতে সিন্ধু সভ্যতার কাল পর্যন্ত সময়কে ইতিহাসকারগণ "প্রাগৈতিহাসিক যুগ" বলিয়া বর্ণনা করেন। বৈদিক যুগ হইতে ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসান ও দিল্লী সুলতানির প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে "প্রাচীন যুগ" বলা হইয়া থাকে। মুসলমান রাজত্বকালকে "মধ্য যুগ" এবং ইংরেজ শাসন ও তৎপরবর্তী কালকে "আধুনিক যুগ" বলা হয়। এই চারি যুগব্যাপী ইতিহাসের ধারা লক্ষাধিক বৎসর ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাপ্তি বা বিস্তার পরবর্তী তিন যুগের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। এই চারি যুগের ইতিহাস-রচনার জন্য ইতিহাসকারকে নানাবিধ উপাদান ও উপায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিভিন্ন যুগের ইতিহাস রচনায় প্রধানতঃ যে সকল উপাদান ও উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত হইতেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান ও উপায়।— প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত রচনার জন্য প্রত্নতত্ত্বের (archaeology) উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সেই যুগের মনুষ্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, ভূগর্ভ খনন করিয়া সুপ্রাচীন শহর ও সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও, তাঁহারা ভূগর্ভ হইতে অস্থি, কঙ্কাল, করোটি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যের অস্তিত্ব, জাতি ও বসবাসের নানা তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহারা সুপ্রাচীন লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার করিয়া সুপ্রাচীন যুগের সমাজ-সভ্যতা ও ইতিহাস-সংক্রান্ত বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপ্রাচীন কালে, পুরাপ্রস্তর যুগে ও নবপ্রস্তর যুগে, মানুষ যে ভারতবর্ষে বসবাস করিত এবং তাহারা যে পাথরের নানাপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করিত, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূগর্ভ খনন করিয়া সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার জন্যও প্রত্ন-তত্ত্বের সাহায্য প্রচুর পরিমাণে লওয়া হইলেও, লিখিত উপাদানই প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনায় প্রধানতঃ সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস-রচনায় প্রত্নতত্ত্বই একমাত্র ভরসা। 1863 খ্রীষ্টাব্দে ব্রুস্ ফুট্ (Bruce Foote) সর্বপ্রথম মাদ্রাজের নিকটবর্তী স্থানে পুরাপ্রস্তর যুগের মনুষ্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নিদর্শন আবিষ্কার করেন। 1884 খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাকেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সূচনা বলা যাইতে পারে। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স্ "এশিয়ার ইতিহাস, পুরাবস্তু, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য" বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য কলিকাতায় এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে জেনারেল কানিংহাম, স্যার জন মার্শাল, স্যার অরেল স্টাইন, ডঃ মর্টিমার হুইল প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী, এন্. সি. মজুমদার, কে. এল. দীক্ষিত প্রভৃতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের চেষ্টায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। প্রাগৈতি-হাসিক যুগের বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হয়। মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত সীলমোহরগুলিতে যে লিপি রহিয়াছে, আজও তাহার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। তাহা সম্ভব হইলে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস আরও বিস্তৃতভাবে উদ্ঘাটিত হইতে পারিবে। এ-বিষয়ে ল্যাংডন, হাণ্টার, গ্যাড, হেরাস্, হুজনি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন।

প্রত্নতত্ত্বের দান

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব

প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান।—প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে লিখিত উপাদানই সর্বপ্রধান। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে হেরোডটাস্, থুকিদিদিস্, জেনোফোন প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ ইতিহাস-রচনার কাজে হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে ভারতীয়গণও সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক হইতে গ্রীকগণের সমকক্ষ হইয়াও, ইতিহাস-রচনার ব্যাপারে আদৌ উৎসাহ বা আগ্রহ দেখান নাই। তাই প্রাচীন যুগের ভারতীয় ইতিহাস রচনার জন্য ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, জীবনী, পর্যটকদের বিবরণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসমূহ এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলিও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। পুরাণের শেষাংশে পুরাণকারগণ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে যে সকল রাজবংশের তালিকা দিয়াছেন, সেগুলিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিহিত রহিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, কল্পসূত্র প্রভৃতি হইলেও ইতিহাসের বহু তথ্য সংগৃহীত রহিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রগুলি হইতে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার কথা জানা গিয়াছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নানা তথ্যও সংগৃহীত হইয়াছে।

ধর্মশাস্ত্র

কালিদাস, বিশাখদত্ত, অশ্বঘোষ প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারগণের রচনা হইতে বহু ঐতিহাসিক কাহিনী ও তথ্য জানা গিয়াছে। কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র", বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস", অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত", বাণের "হর্ষচরিত", ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তা", হর্ষের "প্রিয়দর্শিকা" ও "রত্নাবলী", বিহ্লনের "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত", বাক্‌পতির "গৌড়বহো", হেমচন্দ্রের "কুমারকল্পচরিত" প্রভৃতি এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন রাজাদের বংশাবলীও কিছু পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। বংশাবলীর মধ্যে কহ্লণের "রাজতরঙ্গিণী"র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য

গ্রীক, রোমক, চীনা, তিব্বতীয় ও মুসলমান লেখক ও পর্যটকদের রচনা হইতেও ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে নানা তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাসের রচনা হইতে পারসিকগণ কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকারের কথা জানা যায়। গ্রীকগণের ভারত আক্রমণ ও আগমনের বিবরণ এবং তৎকালীন ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য মেগাস্থিনিস্, আরিয়ান্, কার্টিয়াস্ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রীক ও রোমক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায়। এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক কর্তৃক রচিত "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সী" (লোহিত সাগর পরিক্রমা) নামক গ্রন্থ হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়াছে। টলেমি-রচিত ভৌগোলিক বিবরণও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

বৈদেশিক বিবরণ

চীনদেশের ইতিহাস হইতে শক, পহ্লব, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি জাতিগুলির গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বহু বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং প্রভৃতি চীনা লেখকগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের অনেক উপাদান যোগাইয়াছেন। তিব্বতীয় লেখক তারানাথের রচনা হইতেও নানা তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। হিন্দু যুগের অবসানকালের ইতিহাস ঠিকমতো জানিতে হইলে আলবেরুনি, আলমাসুদি, সুলেমান প্রভৃতি মুসলিম লেখক ও পর্যটকদের রচনার সাহায্য লইতে হয়।

কিন্তু প্রাচীন যুগের লিখিত উপাদান সকল সময় নির্ভরযোগ্য নহে। ঐগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে কাল্পনিক কাহিনী স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন লেখকগণ প্রায়ই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতেন; ফলে, অপ্রকৃত বহু তথ্য তাঁহাদের রচনায় স্থান পাইয়াছে। লেখকগণ প্রায়ই নিজ সমাজ, সম্প্রদায় ও পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থনে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করিয়াছেন। বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা ভারতীয় ভাষা ঠিকমতো না জানায় এবং ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি ঠিকমতো বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায়, অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে, প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের জন্য ইতিহাসকারকে সতর্ক হইতে হয়। এ-বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ব সত্যাসত্য নিরূপণে ইতিহাসকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতির সন্ধান ও সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান যোগায়।

লিখিত বিবরণের দুর্বলতা

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি প্রায়ই স্তম্ভগাত্রে, পর্বতগাত্রে, তাম্রপটে লিখিত ছিল। গুপ্ত যুগের পূর্বে রচিত প্রায় দেড় হাজার লিপি পাওয়া গিয়াছে। তবে এই সকল লিপির অক্ষর আধুনিক কালে প্রচলিত অক্ষরমালা হইতে স্বতন্ত্র। সুদীর্ঘকাল এই সকল লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। আধুনিক কেন, মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণও এই সকল লিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন নাই। তুঘলক-বংশীয় সুলতান ফিরোজ শাহ্ চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি অশোকলিপির পাঠোদ্ধারের জন্য তৎকালীন পণ্ডিতদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে 1837 খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি-র তৎকালীন সম্পাদক জেম্‌স্ প্রিন্সেপ্ অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন এবং সুপ্রাচীন যুগের ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত তথ্য অকস্মাৎ মুখর হইয়া উঠে। লিপিগুলির বিষয়-বস্তু হইল অনুশাসন (উপদেশ ও নির্দেশ), প্রশস্তি, দানপত্র ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার। ফলে, এইসব লিপি হইতে কেবল রাজারাজড়ার নাম ও পরিচয় নহে, তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বহু বিষয় জানা গিয়াছে। অশোকের শিলালিপি ও

প্রাচীন লিপির গুরুত্ব

স্তম্ভলিপি হইতে অশোকের রাজত্বকালের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এলাহাবাদে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণের প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্ত হইতে গুপ্ত যুগের অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। মথুরায় ও সাঁচীতে আবিষ্কৃত লিপি হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল নির্ণীত হইয়াছে। মালবের এরণ নামক স্থানে প্রাপ্ত লিপি হইতে ভানুগুপ্তের সময়ে সংঘটিত একটি যুদ্ধের কথা জানা গিয়াছে। যশোধর্মণের একটি লিপি হইতে হূণরাজ মিহিরকুল সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়াছে। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

প্রাচীন লিপির মতো প্রাচীন মুদ্রাগুলিও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করিয়াছে। মুদ্রাগুলি মূল্যবান ধাতুতে নির্মিত হওয়ায় লোকে বহু মুদ্রা গালাইয়া ফেলিয়াছে। তবু হাজার হাজার প্রাচীন মুদ্রা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের হস্তগত হইয়াছে। মুদ্রাগুলি হইতে রাজার নাম, রাজত্বকাল, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা ও রাজার ধর্মাদি সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়াছে। কোন রাজার মুদ্রা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেলে, ঐ সকল অঞ্চল যে ঐ রাজার শাসনাধীন ছিল তাহা অনুমান করা যায় এবং ঐভাবে ঐ রাজার রাজ্যসীমা নির্ণয় করা চলে। বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গেলে, ঐ বিদেশের সহিত যে ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ছিল তাহাও জানা যায়। প্রায় কেবলমাত্র মুদ্রার সাহায্যেই ভারতীয় শক ও বাহ্লীক রাজগণের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইয়াছে। বিদেশীয় মুদ্রার সহিত এদেশীয় মুদ্রার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তৎকালীন বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে বহু তথ্য অনুমান করা গিয়াছে।

মুদ্রার গুরুত্ব

প্রাচীন মন্দির, চৈত্য, স্তূপ, প্রাসাদ, বিহার, স্মৃতিস্তম্ভ, মূর্তি প্রভৃতি এবং ঐ সকলের ধ্বংসাবশেষ হইতেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ, বিক্রমশীলা ও সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ, অজন্তা ও উদয়গিরি, খণ্ডগিরির গুহামন্দিরসমূহ, সাঁচীর স্তূপ প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে সহজেই উল্লেখযোগ্য। মথুরা, সারনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য জানা গিয়াছে।

প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন-সমূহের গুরুত্ব

মধ্য যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান।—মধ্য যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান প্রাচীন যুগের মতো এমন বিরল নহে। মধ্য যুগের ইতিহাস রচনার জন্য লিপি, মুদ্রা ও শিল্পকীর্তিসমূহের সাহায্য লওয়া হইলেও প্রধানতঃ লিখিত উপাদানের উপরই নির্ভর করা চলে। সমসাময়িক বা ঐ যুগের ঐতিহাসিকগণের রচনা, সুলতান ও বাদশাহগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও আমীর-ওমরাহগণের আত্মজীবনী ও

স্মৃতিকথা, সরকারী দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র এবং বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ হইতে তৎকালীন ইতিহাসের অসংখ্য তথ্য সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে। সমসাময়িক বা মধ্যযুগীয় ইতিহাসগুলির মধ্যে মিনহাজ-উদ্দিনের "তবকাত্-ই-নাসিরী", জিয়াউদ্দিন বরনির "তোয়ারিখ-ই-ফিরোজশাহী", আবুল ফজলের "আকবরনামা" ও "আইন-ই-আকবরী", বদাউনীর "মুন্তকাব" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলবেরুনির "তারিখ-ই-হিন্দ্" এবং কবি আমীর খসরুর "খাজাইন-উল্-ফুতু" প্রভৃতি গ্রন্থের নামও সহজেই করা চলে।

ইতিহাসগ্রন্থ

সুলতান ও বাদশাহ্গণ যে সকল স্মৃতিকথা রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক-রচিত "ফুতুহত্-ই-ফিরোজশাহী", বাদশাহ্ বাবর-রচিত "বাবরনামা" এবং জাহাঙ্গীর-রচিত "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলতান ও বাদশাহ্গণের আত্মীয়-স্বজন ও আমীর-ওমরাহ্গণের স্মৃতিকথাগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। হুমায়ুনের ভগিনী গুলবদন বেগম-রচিত "হুমায়ুননামা" গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান।

আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

মুসলমান আমলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা হইতেও তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে বিখ্যাত কবি আমীর খসরুর নাম সহজেই করা চলে। তাঁহার রচনা হইতে আলাউদ্দিন খলজির শাসনকাল সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ঐ যুগে হিন্দী, উর্দু, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষা-সমূহে রচিত সাহিত্যগুলি হইতেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

সাহিত্য

মধ্যযুগীয় ইতিহাস-রচনার জন্যও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ-বিষয়ে ইবনে বতুতা, আবদুর রজ্জাক, মা হুয়ান, আথানিসিয়াস্ নিকিতিন, নিকলো কন্তি, ফিচ, টেরি, রো, তাভের্নিয়ে, বের্নিয়ে, কারেরি, মানুচি প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণগুলি খুবই মূল্যবান।

বৈদেশিক বিবরণ

মুসলমান আমলের সরকারী দলিল-দস্তাবেজ, ইস্তাহার ও চিঠিপত্রও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী বণিক ও বণিক-প্রতিষ্ঠানসমূহের কারখানা ও কুঠির দলিল, বিবরণ ও চিঠিপত্রও এ-বিষয়ে খুবই সাহায্য করে।

দলিলপত্র

আধুনিক যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান।—আধুনিক যুগের, অর্থাৎ বৃটিশ আমল ও তৎপরবর্তী কালের, ইতিহাস-রচনার উপাদান এমন বিরল নহে। সেগুলি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, সরকারী বিবৃতি ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ, বিখ্যাত

ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী ও জীবনী, সমসাময়িক লেখকগণের প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি, ঐতিহাসিকগণের দ্বারা লিখিত ইতিহাস প্রভৃতি হইতে অপেক্ষাকৃত সহজেই সংগ্রহ করা যায়। পুলিশ ও আদালতের নথিপত্র, কোম্পানির আমলের বিভিন্ন কুঠির বিবরণ ও কাগজপত্র, সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতিও এ-বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করে। ইংরেজ আমলের ভারত সরকারের দলিলপত্র দিল্লীর ন্যাশনাল আরকাইভ্‌স্ (জাতীয় মহাফেজখানা) এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোরে অবস্থিত মহাফেজখানায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। লণ্ডনে অবস্থিত ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারেও ভারত-সংক্রান্ত বহু কাগজপত্র ও পুস্তকাদি রহিয়াছে। ভারতে ইংরেজ-শাসনের ইতিহাস-রচনায় এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক-সংস্থাসমূহের বাণিজ্যকুঠির কাগজপত্রগুলিও আধুনিক যুগের ইতিহাস-রচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলির মধ্যে মিল্‌-এর "বৃটিশ ভারতের ইতিহাস", ডাফ-এর "মারাঠাজাতির ইতিহাস", কানিংহামের "শিখজাতির ইতিহাস" এবং উইল্‌কিংস্‌-এর "মহীশূরের ইতিহাস" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নাবলী

1. Write in short the main sources of Indian history. [ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনার প্রধান উপাদানগুলি সংক্ষেপে লিখ।]

2. What are the sources of Ancient Indian History? [প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনার জন্য কি কি উপাদান ব্যবহৃত হইয়া থাকে?]

3. What are the sources of the Medieval Indian History? [ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাস-রচনার জন্য কি কি উপাদান ব্যবহৃত হইয়া থাকে?]

4. Discuss the importance of archaeological relics, inscriptions and coins, literary records, travel-accounts as source-materials of Indian history. [ভারত-ইতিহাসের উপাদানরূপে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, লিপিসমূহ, মুদ্রাসমূহ, সাহিত্য ও পর্যটকদের বিবরণের গুরুত্ব আলোচনা কর।]

তৃতীয় অধ্যায়

আমাদের প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ—সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা-সংস্কৃতি

মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ক্রীট প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কত প্রাগৈতিহাসিক প্রাসাদ, নগর, রাজা, রাজধানী, কত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্ন যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন যে সুরম্য শহরের অস্তিত্বের কথা মানুষ কল্পনাও করে নাই, এমন সব সুরম্য শহর হাজার হাজার বৎসরের অজ্ঞাত অতীত লইয়া অকস্মাৎ আজ মনুষ্য-চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূগর্ভ হইতে আজ এইভাবে কিশ, উর, লাগাশ, মোহেঞ্জো-দারো, অসুর, নিনেভে, ক্রসস প্রভৃতি নগর আবিষ্কৃত হইয়া মানব-সভ্যতার অতীত কত বিস্ময়কর কাহিনীই না আজ মানুষের শ্রুতিগোচর করাইয়াছে। কিন্তু সেদিন কে ভাবিত, ভারতের ভূগর্ভেও এমনই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির অতীত কীর্তিরাজিও প্রোথিত রহিয়াছে—কেবল প্রত্নতাত্ত্বিকের মায়ার কাঠির ছোঁয়া পাইলেই জাগিয়া উঠিবে!

সত্যই, প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের কাহিনীগুলি গল্প-উপন্যাসের মতোই রোমাঞ্চকর। আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ব্যাপারটিই ধরা যাউক্। জন ব্রান্টন ও উইলিয়াম ব্রান্টন নামে দুই ইংরেজ ভ্রাতা 1856 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের করাচী-লাহোর রাস্তাটি নির্মাণ করিতেছিলেন। জন ব্রান্টন চাকুরি হইতে অবসর লইয়া তাঁহার পৌত্রপৌত্রীদের জন্য একটি মজার স্মৃতিকথা লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, তিনি ঐ রাস্তা নির্মাণের সময়ে একটি প্রাচীন শহরের কথা শুনিয়াছিলেন এবং সেই শহরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তরাদি তিনি রাস্তা-নির্মাণের মালমশলারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই শহরটি অবশ্য খুব প্রাচীন ছিল না, ছিল মধ্যযুগীয় শহর ব্রাহ্মণাবাদ। জনের ভ্রাতা উইলিয়াম-ও অমনি একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষকে রাস্তা-নির্মাণের কাজে লাগাইয়াছিলেন। অবশ্য, ঐ শহর তখন উঁচু ঢিপি মাত্র পড়িয়াছিল! উইলিয়াম ব্রান্টন তাঁহার রাস্তা-নির্মাণের কাজে ঐ ধ্বংসস্তূপ হইতে ইচ্ছামতো ইট লইয়া ব্যবহার করিলেন। কিন্তু তিনি সেদিন কল্পনাও করেন নাই যে, ঐ ইট-পাটকেলগুলির বয়স পাঁচ হাজার বৎসরের বেশী! ইট-সংগ্রহের সময়ে বহু সুপ্রাচীন বস্তুর নিদর্শনও সংগৃহীত হইয়াছিল। সেগুলি কুলী ও ইঞ্জিনিয়াররা খুশিমতো লইয়া গেলেন। কেহই

জানিল না যে, ব্রান্টন সাহেব সেদিন সুপ্রাচীন হরপ্পা নগরের সুপ্রাচীন ইট-পাটকেল ও নানারূপ সভ্যতার নিদর্শনকে এমনভাবে রেলরাস্তা নির্মাণের কাজে লাগাইতেছেন! জেনারেল কানিংহাম বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বিভাগে চাকুরি করিতেন। 1861 খ্রীষ্টাব্দে তিনি সামরিক কার্য হইতে অবসর লইলে, তাঁহাকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব নর্দার্ন ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর-জেনারেলের পদে নিয়োগ করা হয়। 1856 খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম কর্মব্যপদেশে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন এবং হরপ্পা নগরের ইষ্টকাদি লুণ্ঠনকালে তিনি শ্রমিকদের নিকট হইতে কিছু কিছু সুপ্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ সকল নিদর্শনের মধ্যে কতিপয় সীলমোহরও ছিল। সীলমোহরে ছিল অজ্ঞাত কী অক্ষর এবং বৃষের মূর্তি। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির গণ্ডির মধ্যে যে এগুলি পড়ে না এবং এগুলি যে খুবই প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ, জেনারেল কানিংহাম তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুমান পর্যন্ত! তাহার বেশী আর কেহই অগ্রসর হন নাই। এইভাবে আরও সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইল। অবশেষে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের এক ভারতীয় কর্মচারী 1920 খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পার খননকার্য আরম্ভ করিলেন। ইঁহার নাম দয়ারাম সাহানী। দুই বৎসর পরে 1922 খ্রীষ্টাব্দে অন্য এক ভারতীয় কর্মচারী সিন্ধুনদের তীরে মহেন্-জো দড়ো শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিলেন। এই ভারতীয় কর্মচারীর নাম—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উভয় স্থানের খননকার্য এবং অনুসন্ধান ও আবিষ্কার কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন তৎকালীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল স্যার জন মার্শাল।

প্রত্নতত্ত্বের রোমান্স

কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ উভয় স্থানের খননকার্য চলিল। স্যার অরেল স্টাইন বেলুচিস্থান ও ভারতের প্রত্যন্তবর্তী অঞ্চলসমূহে অনুসন্ধানের দ্বারা সিন্ধু অঞ্চলে আবিষ্কৃত এই সভ্যতার সহিত সমকালীন ইরান ও মেসোপটেমিয়ার সম্পর্ক আবিষ্কার করিলেন। তরুণ বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক এন্. জি. মজুমদার ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালাইলেন। অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালে খিরথর পর্বতে তিনি দস্যুহস্তে নিহত হইলেন। স্যার আর্ডেস্ট ম্যাকে সিন্ধুপ্রদেশের চহ্নুদড়োতেও খননকার্য চালাইয়া মূল্যবান নিদর্শন ও অন্যান্য তথ্য আবিষ্কার করিলেন। মহেন্ জো-দড়ো ও হরপ্পার খননকার্যের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, এখন হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষ এক উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। গোড়ার দিকে অনেকে মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত সভ্যতাকে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সুপ্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রত্যন্ত শাখা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপক খননকার্যের ফলে সে

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার

ধারণার নিরসন হইয়াছে। সিন্ধু অঞ্চলের এই সভ্যতা যে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আজ আর সন্দেহমাত্র নাই। বর্তমানে প্রায় 60টি স্থানে খননকার্য চালানো হইয়াছে। তাহাতে হিমালয় পর্বতের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত প্রায় হাজার মাইল বিস্তৃত স্থানে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্বের নির্ভুল ও নিঃসংশয় প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধুনদ ও তাহার উপনদীসমূহের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাই ইহাকে সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের সভ্যতা (Indus Valley Civilization) বলা হয়।

বর্তমান সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধুনদের তীরে মহেন্-জো-দড়োয় এবং পশ্চিমপাঞ্জাব প্রদেশের মণ্টগোমারি জেলায় রাবী নদীর তীরে হরপ্পায় ভূগর্ভে প্রোথিত দুইটি শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুই স্থানের দূরত্ব কয়েক শত মাইল। কিন্তু এই দুই স্থানে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাদৃশ্য এতই অধিক যে, তাহা যে একই সভ্যতার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে এই দুই শহরকে একই রাজ্যের দুই রাজধানী বলিয়াও মনে করেন।

মহেন্-জো-দড়োয় প্রায় এক বর্গ-মাইল স্থান খনন করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে পর পর কয়েকটি স্তরে কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। হরপ্পাতেও এইরূপ কয়েকটি স্তরে কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, এখন ঐ সকল অঞ্চল শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন হইলেও পূর্বে এই পথেই মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইত। ফলে ঐ অঞ্চল বৃষ্টিপ্রধান ছিল। অত্যধিক বারিপাতের ফলে ঐ অঞ্চলের নদীসমূহে প্রায়ই বন্যা হইত। বন্যায় শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দীর্ঘকালের জন্য শহরটি পরিত্যক্ত হইত। ধীরে ধীরে পুরাতন শহরের উপর পলিমাটি ও ধূলাবালি জমিয়া উঠিত এবং পুরাতন শহরটি তাহাতে চাপা পড়িত। তাহার পর আবার নূতন করিয়া শহর নির্মিত হইত। এইভাবে বহু শত বৎসর ধরিয়া এক শহরের উপর আর একটি শহর গড়িয়া উঠিত।

মৃত্তিকা-গর্ভে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শহরের চিহ্ন

মহেন্ জো-দড়ো ও হরপ্পায় দুই-কক্ষযুক্ত ক্ষুদ্র গৃহ হইতে প্রাসাদোপম বহু গৃহেরও সন্ধান পাওয়া গিবাছে। অনেক গৃহে দ্বিতল ত্রিতলের চিহ্নও আছে। বহু সারি সারি ছোট ছোট বাড়ীর চিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলিকে আধুনিক কুলী-ধাওড়ার মতো ক্ষুদ্র গৃহশ্রেণী বা বস্তির চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। সুবৃহৎ স্তম্ভযুক্ত কতিপয় দালানও বাহির হইয়াছে। এইসব দালান দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় 80 ফুট। অনেকের অনুমান, গৃহগুলি আধুনিক কালের টাউন হল জাতীয় গৃহ বা সভাগৃহ ছিল। গৃহগুলি সবই রৌদ্রশুষ্ক বা অগ্নিদগ্ধ ইষ্টক

গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ

দিয়া নির্মিত। গৃহগুলিতে আধুনিক গৃহসমূহের মতো কেবল দরজা-জানালা, উঠান ও সিঁড়িই যে আছে, তাহা নহে। সেগুলিতে আধুনিক গৃহের মতো স্নানাগার এবং দ্বিতল ত্রিতল হইতে মলমূত্র-নির্গমের জন্য আবৃত খাড়া নর্দমাও রহিয়াছে। হরপ্পায় দুই সারিতে নির্মিত 12টি বৃহৎ বৃত্তাকার চত্বর বাহির হইয়াছে। চত্বরগুলি বৃত্তাকারে পর পর ইট গাঁথিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই চত্বরগুলি যে কি কাজে লাগিত, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। হরপ্পায় উল্লেখযোগ্য একটি গৃহের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা সুবৃহৎ শস্যাগার। এই গৃহটি দৈর্ঘ্যে 168 ফুট এবং প্রস্থে 135 ফুট। ইহা সমান ও সদৃশ দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং মধ্য-স্থলে 23 ফুট প্রশস্ত একটি পথ বা অলিন্দ দিয়া যুক্ত। সুপ্রাচীন ক্লসস (ক্রীট) প্রভৃতি স্থানে এইরূপ শস্যাগার ছিল। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহাকে শস্যাগারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বৃহৎ শস্যাগার

মহেন্-জো-দড়োতেও একটি বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেটি হইল সুবৃহৎ স্নানাগার। এই স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে 180 ফুট ও প্রস্থে 108 ফুট। উহার চারিদিকে 8 ফুট পুরু প্রাচীর ছিল। স্নানাগারের মধ্যস্থলে সন্তরণের উপযোগী একটি চৌবাচ্চা ছিল।

বৃহৎ স্নানাগার
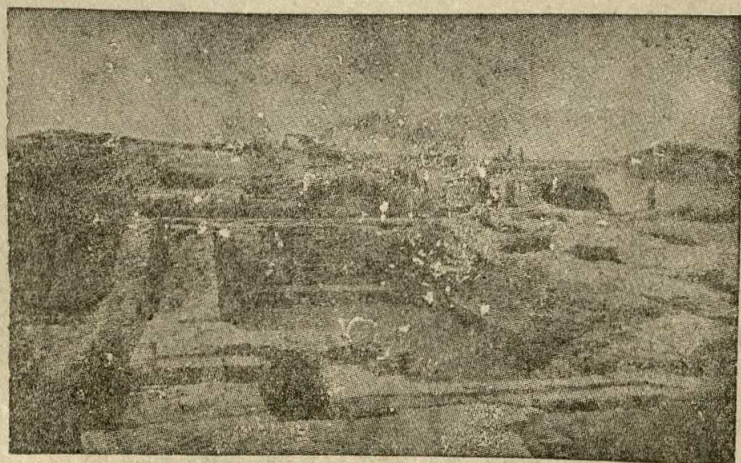
মহেন্-জো-দড়োয় আবিষ্কৃত স্নানাগার

চৌবাচ্চাটি 39 ফুট লম্বা, 23 ফুট চওড়া এবং 8 ফুট গভীর। চৌবাচ্চাটির তলা বেশ শক্ত করিয়া বাঁধানো। চৌবাচ্চায় নামিবার জন্য দুই দিকে সিঁড়ি রহিয়াছে। চৌবাচ্চার চারিদিকে রহিয়াছে ক্রমোন্নত আসন-শ্রেণী। আসন-শ্রেণীর পশ্চাতে আছে বহু কক্ষ এবং কক্ষের মধ্যে কূপ। কূপ হইতে চৌবাচ্চায় ইচ্ছামতো জল ভরিবার ব্যবস্থা

ছিল। হামাম বা বাষ্পস্নানের ব্যবস্থার চিহ্নও দেখা যায়। এই স্নানাগারটি যে অতিশয় উন্নত রুচি ও সভ্যতার উচ্চ মানের নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পথঘাট

মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার পথগুলি ঋজু, প্রশস্ত এবং সমান্তরাল। এই শহরগুলি যে কোন পৌর বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিশয় সুপরিকল্পিত-ভাবে নির্মিত হইয়াছিল, এই পথগুলি তাহার প্রমাণ। আধুনিক শহরের মতো পথের দুই দিকে ঢাকা নর্দমাও ছিল। এগুলি উন্নততর সভ্যতা ও জীবনযাত্রার উচ্চতর মানের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

মহেন্-জো-দড়োয় আবিষ্কৃত নর্দমা

খাদ্য ও বেশভূষা
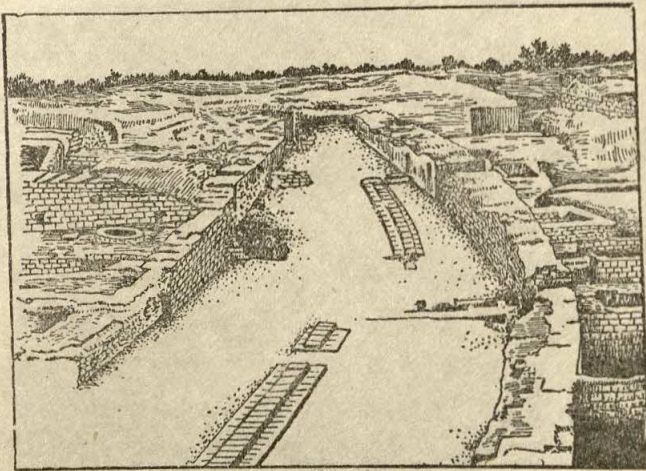
ভূগর্ভে যে সকল ভুক্তাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে জানা যায়, এখানকার লোকে গম, যব, খেজুর, মাছ, মাংস ইত্যাদি খাইতেন। সুতী ও পশমী কাপড়ের চিহ্নও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। মহেন্-জো-দড়োয় প্রাপ্ত একটি মূর্তি দেখিয়া মনে হয়, এখানকার লোকে শালের মতো বহুমূল্য চাদর গায়ে দিতেন। এখানকার লোকে সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, হাতীর দাঁত, ঝিনুক ও দামী পাথরের নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। ঐসব গহনার মধ্যে আধুনিক বালা, হার, আংটি, দুল, নাকছাবি, তোড়া ইত্যাদির মতো অলঙ্কারও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

এখানে অত্যন্ত উন্নতধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৃৎপাত্রগুলি গঠনের দিক হইতে যেমন সুন্দর, তেমনি এগুলি বর্ণবিচিত্র। তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও চীনামাটির পাত্রও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। হাড় ও হাতীর দাঁতের সূচ ও চিরুনি,

মাটির তৈয়ারী মাকু ও কাটিম, হাড়ের ও চীনামাটির তৈয়ারী মাকু ও কাটিম, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈয়ারী দা, ছুরি, কুড়াল, হাতিয়ার, ক্ষুর এবং ব্রোঞ্জের সুমসৃণ আয়নাও পাওয়া গিয়াছে। এখানে অসংখ্য খেলনা ও ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। খেলনার মধ্যে গরুর গাড়ি এবং চেয়ারও পাওয়া গিয়াছে। এখানে যানবাহনরূপে গোযান যে ব্যবহৃত হইত এবং লোকে যে আসনরূপে চেয়ার ব্যবহার করিতেন, এই খেলনাগুলি হইতে তাহা বুঝা যায়। জীবজন্তুর অসংখ্য ক্ষুদ্র মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাত্র, অলঙ্কার, খেলনা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

মহেন্-জো-দড়োয় আবিষ্কৃত অলঙ্কার

অনেকগুলি নৃত্যরতা নারীর প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি দেখিয়া বুঝা যায়, এখানকার স্ত্রীলোকরা নাচিতে জানিতেন এবং চুল ঘাড়ের উপর ফেলিতেন। অনেকগুলি ক্ষুদ্র মূর্তি দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করিয়াছেন, সেগুলি কোনও গৃহ-দেবতার মূর্তি। বিভিন্ন ওজনের পাথরের বহু চৌকা টুক্‌রাও এখানে পাওয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, সেগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাটখারারূপে ব্যবহৃত হইত।

সিন্ধু উপত্যকার এই সুপ্রাচীন সভ্যতা প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ক্রীটের মতোই নগরপ্রধান ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন না হইলে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নহে। তাই এখানকার লোকে যে কৃষিকার্যে অত্যন্ত উন্নত

ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ কৃষিজাত দ্রব্যই রাজস্বরূপে গৃহীত হইত। হরপ্পার সুবৃহৎ শস্যাগার তাহারই প্রমাণ দেয়। এখানকার লোকে শ্রমশিল্পে যে উন্নত ছিলেন, তাহা এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত মাকু, কাটিম, পাত্র, অলঙ্কার ও নিত্যব্যবহার্য অসংখ্য প্রকার দ্রব্য হইতে সহজেই বুঝা যায়। সিন্ধু অঞ্চলের শিল্পীগণ অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্মিত পাখীর আকারে বাঁশি, হাত-পা ও ঘাড়

কৃষি, শ্রমশিল্প ও পশুপালন

মহেন্-জো-দড়োয় আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র

নাড়াইতে পারে এমন বাঁদর ও ষাঁড়ের মূর্তি, মাটির ঝুনঝুনি প্রভৃতি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এখানকার উন্নত মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্প দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, এখানকার লোকে বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান তত্ত্বও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কেবল কৃষি ও শ্রমশিল্পে নহে, পশুপালনেও এখানকার লোকে অতিশয় উন্নত ছিলেন। এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত জীবজন্তুর অস্থি ও কঙ্কাল দেখিয়া বুঝা যায়, গরু, মহিষ, ভেড়া, হাতী ও উট এখানে গৃহপালিত পশুরূপে ব্যবহৃত হইত। ঘোড়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না। সম্ভবতঃ সুপ্রাচীন মিশরীয় ও সুমেরীয় জাতিগুলির মতোই ইহারাও অশ্বের ব্যবহার জানিতেন না। ইহারা গৃহপালিত পশুর মধ্যে বৃষকে (গাভীকে নহে) খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। সম্ভবতঃ কৃষিকার্যে ও গোযানে বৃষের ব্যাপক ব্যবহারই সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বৃষের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। খেলনা এবং কাঁচা ইটের উপর পায়ের ছাপ হইতে বুঝা যায়, এখানকার লোকে কুকুর-বিড়ালও পুষিতেন। সীলমোহরগুলিতে খোদিত মূর্তি হইতে এখানকার নানাপ্রকার বন্য জন্তুর পরিচয় পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থান হইতে দুই হাজারেরও বেশী সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এগুলির উপর মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তিসহ দুর্বোধ্য কী সব অক্ষর লিখিত রহিয়াছে। এই সকল সীলমোহর যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজেই ব্যবহৃত হইত,

তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অসংখ্য সীলমোহর হইতে বুঝা যায়, সিন্ধু অঞ্চলের লোকরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিলেন। এখানে ব্যবহৃত বহু ধাতু ও ঝিনুক প্রভৃতি যে বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই ধরনের সীলমোহর পারস্যের এলাম এবং মেসোপটেমিয়ার কিশ ও উর নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলের সহিত সিন্ধু অঞ্চলের লোকরা যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড্ বলিয়াছেন, "সিন্ধু অঞ্চলের শহরগুলি হইতে বহু দ্রব্য তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরবর্তী বাজারেও বিক্রয় হইত। অন্যপক্ষে, কিছু কিছু সুমেরীয় শিল্পসামগ্রী, প্রসাধন দ্রব্য ও বেলনাকৃতি সীলমোহর সিন্ধু অঞ্চলে অনুকৃত হইয়াছিল। আরব সমুদ্রের উপকূলভাগ হইতে আনীত মৎস্যও নিয়মিতভাবে সিন্ধু অঞ্চলে বিক্রীত হইত।" পাত্রাদির সাদৃশ্য হইতে এই অঞ্চলের সহিত মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্থান প্রভৃতির সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। সীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নাই। তাহা সম্ভব হইলে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো এই অঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা সম্ভব হইবে।

সীলমোহর ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

পশুপতি শিব

সীলমোহর

মূর্তি ও সীলমোহরে খোদিত চিত্র দেখিয়া মনে হয়, এখানকার লোকে শিব-দুর্গার মতো দেবদেবীর পূজা করিতেন। সীলমোহরে যে ত্রিমস্তকবিশিষ্ট এবং নানাপ্রকার পশু-পরিবেষ্টিত যোগীমূর্তি রহিয়াছে, তাঁহাকে পরবর্তী কালের হিন্দুর পঞ্চানন পশুপতি শিবের মতো কোন দেবতা বলিয়াই মনে হয়। শিবলিঙ্গের মতো বহু পাথরের টুকরাও পাওয়া গিয়াছে। এখানে যে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে তাহাও

অনুমান করা চলে। যোগীমূর্তি দেখিয়া বুঝা যায়, এখানকার লোকে যোগসাধনাতেও অভ্যস্ত ছিলেন। বহু সীলমোহরে বৃষ ও অশ্বত্থ-জাতীয় বৃক্ষের পাতা বা শাখার খোদিত চিত্র রহিয়াছে। পঞ্চানন পশুপতি শিবের সহিত বৃষের সম্পর্কটি হিন্দুদের নিকট সুপরিচিত। তবে মিশর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে যেরূপ দেবমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমন কিছুই এখানে পাওয়া যায় নাই। যাহাই হউক, পরবর্তী কালে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের বিকাশে সিন্ধু অঞ্চলের এই ধর্ম যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম

একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের কথা এতক্ষণ বলা হইল। কিন্তু কবে কাহারা এই উন্নত সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে। এই সুপ্রাচীন সভ্যতার কাল-নির্ণয়ের জন্য কতিপয় উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। (1) এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, তাম্র, ব্রোঞ্জ, রাং প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু দিয়া নির্মিত যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার ও পাত্রাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু লৌহ-নির্মিত কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাই এই সভ্যতা যে লৌহ যুগের পূর্বে তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা যে খ্রীষ্টপূর্ব 3000 অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। (2) সিন্ধু অঞ্চলে প্রাপ্ত সীল-মোহরের অনুরূপ কয়েকটি সীলমোহর সুমের (মেসোপটেমিয়া) অঞ্চলের উর ও কিশ নগরে পাওয়া গিয়াছে। কিশে আবিষ্কৃত সীলমোহরটি খ্রীষ্টপূর্ব 3000 অব্দের পূর্বেকার বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন। (3) মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র বা মৃৎপাত্রের টুক্‌রার তুলনামূলক বিচারের দ্বারা পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বেই বিকাশলাভ করিয়াছিল। (4) মহেন্-জো-দড়োয় ও হরপ্পায় পর পর কয়েকটি স্তরে কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। একটি শহর ধ্বংস হইয়া মৃত্তিকা-গর্ভে বিলীন হইতে এবং তাহার উপর অন্য একটি শহর নির্মিত হইতে যথেষ্ট সময় লাগে। তাহা হইতেও সিন্ধু সভ্যতার সুপ্রাচীনতাই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা এখন হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সমকালীন ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার কাল

পূর্বে অনেকে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতারই প্রত্যন্তবর্তী অংশমাত্র ছিল। কিন্তু ব্যাপক খননকার্যের ফলে সে ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। তবে সুমেরীয় সভ্যতা যে জাতির লোকরা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সিন্ধু অঞ্চলের সুপ্রাচীন অধিবাসীদের সহিত তাঁহাদের জাতিগত সাদৃশ্য ও সম্পর্ক

থাকা আদৌ অসম্ভব নহে। সুমেরীয় জাতির লোকরা ককেশীয় জাতির অন্তর্গত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরবর্তী কালের হিটাইট ও ক্যাসাইটগণের মতো আর্য ছিলেন না। সিন্ধু অঞ্চলের লোকরাও ককেশীয় জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আর্য ছিলেন না। তাঁহারা আধুনিক ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই দ্রাবিড়গণকে ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বৈদিক আর্যগণের সহিত সিন্ধু অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীরা নগরপ্রধান সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বৈদিক আর্যগণ গ্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক ছিলেন। সিন্ধুবাসীরা অশ্বের ও লৌহের ব্যবহার জানিতেন না। কিন্তু আর্যরা অশ্ব ও লৌহের ব্যবহার জানিতেন। সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীরা বৃষকে শ্রদ্ধা করিতেন, অন্যপক্ষে আর্যগণ গাভীকেই শ্রদ্ধা করিতেন। এই সকল নানা দিক হইতে বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, দ্রাবিড় জাতির লোকরা সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরে আর্যগণের আগমন ও আক্রমণের ফলেই সিন্ধু সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সিন্ধু অঞ্চলে ঐরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণের চিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত কঙ্কালের স্তূপগুলি যে যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের কঙ্কালের স্তূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতাগণ

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ

অপরাপর সুপ্রাচীন সভ্যতার সহিত সম্পর্ক ও তুলনা।—মিশর ও সুমেরীয় অঞ্চলে প্রচলিত লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারের ফলে ঐ সকল অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলে প্রচলিত অক্ষরসমূহের পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নাই। তাই তাহার রাজনৈতিক ইতিহাস জানা যায় নাই। কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা যে সমসাময়িক মিশরীয় ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু দিক হইতে সিন্ধু সভ্যতার সহিত মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। নগরপ্রধানতা, অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও পাত্রাদির নির্মাণে তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার, মৃৎশিল্পে চাকের ব্যবহার, চাকাবিহীন গাড়ির পরিবর্তে চাকাযুক্ত যানবাহনের ব্যবহার, রৌদ্রশুষ্ক ও অগ্নিদগ্ধ ইটের ব্যবহার, অক্ষরের ব্যবহার প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এলাম ও সুমের অঞ্চলে যে পাঁচটি সিন্ধু অঞ্চলের অনুরূপ সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ঐ অঞ্চলের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। সিন্ধু অঞ্চলে ব্যবহৃত পরিচ্ছদের সহিত সুমেরীয়গণের ব্যবহৃত পরিচ্ছদেরও সাদৃশ্য

অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সিন্ধু অঞ্চলের সীলমোহরে যে সকল শৃঙ্গযুক্ত মূর্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত স্থমেরীয় দেবতা ইয়াবানির সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। অন্যপক্ষে, অনেক দিক হইতে সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতাকে মিশরীয় ও স্থমেরীয় সভ্যতা হইতে উন্নততর মনে হয়। মিশরীয় ও স্থমেরীয়গণ স্থবৃহৎ প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির ও মন্দির নির্মাণ করিলেও, সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীরা উন্নতধরনের বাসগৃহসমূহ এবং স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবহারের দ্বারা যে জীবনযাত্রার উন্নততর মানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনটি মিশর বা মেসোপটেমিয়ায় দেখা যায় নাই। কার্পাসবস্ত্রের ব্যবহার মিশর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে পরবর্তী কালে প্রচলিত হইলেও, সিন্ধু অঞ্চলে তাহার ব্যবহার ব্যাপক ছিল। অলঙ্কার, খেলনা, মূর্তি প্রভৃতির নির্মাণে ও ব্যবহারে সিন্ধুবাসিগণ যে উন্নততর রুচির ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়াছিলেন, মিশর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে সচরাচর তেমনটি লক্ষিত হয় নাই। তাই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল স্যার জন মার্শাল যে বলিয়াছেন, "কতিপয় দিক হইতে মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতা হইতে উন্নততর ছিল"—তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নহে।

প্রশ্নাবলী

1. **Give a brief account of the Indus Valley Civilization.** [সিন্ধু সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

2. **Was there a civilization in India before the Aryans came ? State what you know about it.** [আর্যদের আগমনের পূর্বে কি ভারতে কোনও সভ্যতা ছিল ? ইহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

চতুর্থ অধ্যায়
বৈদিক আর্য সভ্যতা

আর্য যুগের সূচনা।—প্রাগৈতিহাসিক যুগে কি মিশরে, কি মেসোপটেমিয়ায়, কি ক্রীটে যে সভ্যতাসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির কোনটিই আর্যগণের কীর্তি ছিল না। ঐ সকল সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপরই পৃথিবীতে আর্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিটাইটগণ, ক্যাসাইটগণ, মিতান্নিগণ, গ্রীকগণ, পারসিকগণ, বৈদিক ভারতীয়গণ এবং পরে রোমকগণ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার এক স্থবিস্তৃত অঞ্চলে আর্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আর্য জাতিগুলি প্রথমদিকে যাযাবর ও পশুপালক ছিলেন। তাঁহারা অশ্ব ও লৌহের ব্যবহার জানিতেন। এই লৌহ ও

অশ্বের ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারা যে দুর্বার শক্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কি মিশরে, কি মেসোপটেমিয়ায়, কি ইরানে, কি গ্রীসে, কি ভারতে সর্বত্রই তাঁহারা আর্য জাতিসমূহের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে লৌহ যুগের সহিত আর্য যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ভারতে আর্যদের আগমন ও প্রভুত্ব স্থাপন।—পূর্বে বৈদিক আর্যগণকে ভারতের আদিম অধিবাসী মনে করা হইত। পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করিয়া ঐ ভাষার সহিত ইউরোপীয় গ্রীক, লাতিন ও এশীয় পারসিক ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলেন। ভারতীয় বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার সহিত আধুনিক ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি ভাষাগুলির সাদৃশ্য লক্ষিত হইল। ফলে এই সকল ভাষাভাষী জাতিগুলি যে একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে কাহারও সংশয় রহিল না। পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, রাশিয়ার দক্ষিণে ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে অবস্থিত কোন একটি অঞ্চলে আর্য জাতির লোকরা বাস করিতেন। অতঃপর সংখ্যাবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহারা মূল বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দলে দলে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কতিপয় দল উত্তর ও পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলি ছড়াইয়া পড়িল দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে। উত্তর ও পশ্চিমে যে দলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করিল। যাহারা দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা গ্রীসের দিকে অগ্রসর হইল। দক্ষিণ-পূর্বে যে দলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলি ভারত, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হইল। সম্প্রতি এশিয়া মাইনরে বোঘাজ-কোই নামক স্থানে যে সকল মৃৎফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলির কয়েকটিতে হিটাইট জাতির রাজার সহিত মিতান্নি জাতির রাজার সন্ধির শর্তাবলী লিখিত আছে। সন্ধিকালে মিতান্নি রাজা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি আর্য দেবতাগণকে স্মরণ করিতেছেন। এই সন্ধি খ্রীষ্টপূর্ব 1380 অব্দের কাছাকাছি সময়ে হইয়াছিল মনে হয়। প্রাচীন ইরানীদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাব-ভাষার সহিতও বেদের ভাব ও ভাষার বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, আর্যগণ তাঁহাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করিবার পর পারস্যে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কয়েকটি শাখা দক্ষিণে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের দিকে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অন্যতম শাখা পূর্বদিকে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভারতে প্রবেশকারী আর্যগণ ইণ্ডো-আরিয়ান (Indo-Aryan) বা ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। আর্যগণ ভারতে প্রবেশকালে প্রথমে সিন্ধু ও তাহার উপনদীসমূহের

আর্যগণের আগমন

তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন। পারসিকগণ 'স'-কে 'হ' উচ্চারণ করিতেন। তাই সিন্ধু বা নদীসমূহের তীরে বাসকারী আর্যগণকে তাঁহারা "হিন্দু" নামে অভিহিত করিতেন। এইরূপে ভারতীয় আর্যগণ "হিন্দু" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

আর্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে নগরপ্রধান সিন্ধু সভ্যতা বিরাজ করিতেছিল। বহিরাগত আর্যগণের সহিত সিন্ধুবাসিগণের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। বেদেও এইরূপ সংঘর্ষের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। ইহাদের সহিত যুদ্ধে যে আর্যগণকে বেগ পাইতে হইয়াছিল, ইন্দ্রের প্রতি আর্যগণের স্তবস্তুতি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের একটি কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র হরিয়ুপীয়ার অধিবাসিগণকে নিধন করিয়াছিলেন। অনেকে হরিয়ুপীয়াকে আধুনিক হরপ্পা বলিয়াই মনে করেন। আর্যগণকে অন্যান্য অনার্যদের সহিতও সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই সকল অনার্য শত্রুকে তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ, "অনাস" (নাসিকাহীন) এবং "দাস" ও "দস্যু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলে নানা স্থানে স্তূপীকৃত কঙ্কাল এবং নূতন ধরনের বহু অস্ত্রশস্ত্র ও মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। উহা বহিরাগত জাতির আগমন ও আক্রমণেরই সাক্ষ্য দেয়। যাহাই হউক, অনার্য ও দ্রাবিড়গণের সহিত যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আর্যগণ জয়ী হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের এই জয়লাভের ফলেই সিন্ধু সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বৎসরের কাছাকাছি সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া পুরাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করিয়াছেন।

আর্যগণের জয়লাভ

আর্যগণ ক্রমেই পূর্ব ও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে থাকেন। কারণ, ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় সিন্ধুনদ ও তাহার উপনদীসমূহ এবং সরস্বতী নদীর উল্লেখ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। গঙ্গা, যমুনা ও সরযু নদীর উল্লেখও কিছু পরিমাণে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ রচনার যুগে পশ্চিম অঞ্চলের অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং বিন্ধ্য ও গোদাবরী নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উল্লেখও পাওয়া যাইতে থাকে। বৈদিক সাহিত্যে ক্রমে শহরের নামোল্লেখ বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ, আর্য সভ্যতা গ্রামীণ বা যাযাবর অবস্থা হইতে ক্রমেই নগরপ্রধান হইতে থাকে। রাজা, রাজ্য ও জনপদের নামও ক্রমেই স্পষ্টতর হইতে থাকে।

আর্যগণের বসতি বিস্তার

বৈদিক সাহিত্য।—প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগকে বৈদিক সাহিত্যের উপরই নির্ভর করিতে হয়। বেদ ও বেদাঙ্গ লইয়াই বৈদিক সাহিত্য গঠিত। বেদ চারিটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বেদগুলিকে

আবার চারি ভাগে ভাগ করা যায়—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতাগুলিতে স্তবস্তুতি ও মন্ত্রতন্ত্র রহিয়াছে—ঐগুলিকে "সূক্ত" বলা হয়। ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় 1028টি সূক্ত রহিয়াছে। সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদের সংহিতাগুলির অধিকাংশ সূক্তই ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত। সামবেদ-সংহিতার সূক্তগুলি যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময় গীত হইত। যজুর্বেদ-সংহিতায় গদ্যও রহিয়াছে। অথর্ববেদ-সংহিতায় স্তবস্তুতি ছাড়া মন্ত্রতন্ত্র এবং ডাকিনীবিদ্যাও রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। এগুলিতে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ রহিয়াছে। বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন ব্রাহ্মণ রহিয়াছে। সেগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ এবং অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শেষে রহিয়াছে আরণ্যক। আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক নহে। যেমন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষে আছে ঐতরেয় আরণ্যক। আরণ্যক অংশগুলি সংসারত্যাগী অরণ্যবাসী আর্যদের জন্য রচিত। ঐগুলিতে সত্য, সৃষ্টি, স্রষ্টা প্রভৃতি সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন ও চিন্তা প্রভৃতি রহিয়াছে। বেদের সর্বশেষ অংশের নাম উপনিষদ্। তাই ইহার আর এক নাম "বেদান্ত"। উপনিষদ্‌গুলির সহিত আরণ্যকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এগুলিও সত্য, সৃষ্টি, স্রষ্টা, ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি চিন্তা ও আলোচনায় পূর্ণ। বর্তমানে শতাধিক রচনা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্বেদ

সংহিতা

ব্রাহ্মণ

আরণ্যক

উপনিষদ্

পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, ঋগ্‌বেদ-সংহিতা খ্রীষ্টপূর্ব 1500 অব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। আধুনিকতম উপনিষদ্‌গুলি বুদ্ধদেবের সমকালে বা তৎ-পরবর্তী কালেও রচিত হইয়াছিল। তাই সমগ্র বৈদিক সাহিত্য রচিত হইতে প্রায় হাজার বৎসর লাগিয়াছিল। কিন্তু বৈদিক আর্যগণের সমাজে ঐ হাজার বৎসরে নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করিলে ঐ পরিবর্তন ও বিকাশের ধারা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

বৈদিক সাহিত্যের কাল

প্রাচীন আর্যগণ অক্ষরের ব্যবহার জানিতেন না। এই বিশাল বৈদিক সাহিত্য তাঁহারা শুনিয়া স্মরণ রাখিতেন। তাই বেদের অপর নাম "শ্রুতি"। কিন্তু বিশাল বৈদিক সাহিত্যকে নির্ভুলভাবে স্মরণ রাখিবার জন্য শ্রবণ ও স্মরণ শক্তিই যথেষ্ট ছিল না। তাই আর্য ঋষিগণ ধ্বনি, ছন্দ, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব (নিরুক্ত) প্রভৃতি বিষয়ে নিখুঁত তত্ত্ব ও জ্ঞান অধিগত

বেদাঙ্গ

করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যা ও সমাজ-তত্ত্বেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সকল জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই বেদাঙ্গে বা সূত্র-সাহিত্যে। বেদাঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্পসূত্র। শিক্ষা হইল বিশুদ্ধ উচ্চারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী। নিরুক্ত হইল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিচার ও ব্যাখ্যা। কল্পসূত্র হইল সমাজ ও যাগযজ্ঞাদি সম্পর্কে বিধিনিষেধ।

আর্য ঋষিগণ আরণ্যক ও উপনিষদে সত্য, সৃষ্টি, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন ও চিন্তা করিয়াছিলেন, সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচীন ভারতীয় দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ছয় ভাগে বিভক্ত—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। এই দর্শনগুলিকে একত্রে "ষড়্‌দর্শন" বলা হয়। বিভিন্ন দর্শনের সহিত বিভিন্ন প্রাচীন ঋষির নাম জড়িত রহিয়াছে—যেমন, সাংখ্যের সহিত কপিলের, যোগের সহিত পতঞ্জলির, ন্যায়ের সহিত গোতমের, বৈশেষিকের সহিত কণাদের, পূর্বমীমাংসার সহিত জৈমিনির এবং উত্তরমীমাংসার সহিত বাদরায়ণ ব্যাসের।

ষড়্‌দর্শন

আর্যদের ধর্ম।—প্রথমের দিকে আর্যগণ দ্যৌস্ (আকাশ), মিত্র (সূর্য), বরুণ, ইন্দ্র, পৃথিবী, রুদ্র, মরুৎগণ, নাসত্য (অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়), অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবতার স্তবস্তুতি করিতেন। দ্যৌস্ যে আর্যগণের মূল দেবতা ছিলেন, সে-বিষয় নিঃসন্দেহ। গ্রীসদেশবাসী আর্যগণের ধর্মে এই দ্যৌস্-ই "জিউস্" (Zeus) হইয়াছেন। রোমকদের ধর্মে এই "দ্যৌস্-পিতর্"-ই জুপিটর (Jupiter) হইয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় আর্যগণের ধর্মে দ্যৌস্ প্রাধান্যলাভ না করিয়া, মিত্র এবং ইন্দ্রই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। মিত্র বা সূর্য আর্যগণের অন্যতম প্রধান দেবতা হইলেও, তিনি পরে বিষ্ণুর চক্রের মধ্যে বিলীন হন। অনার্যগণের সহিত যুদ্ধকালে আর্যগণ বিশেষভাবে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেন। তিনিই ছিলেন নগরপ্রধান সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসকারী দেবতা—"পুরন্দর" (নগর-ধ্বংসকারী)। পরবর্তী কালে বৈদিক আর্য ধর্মে ইন্দ্রের প্রভাবও হ্রাস পায়। যাহাই হউক, এই সকল দেবতা সকলেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক ছিলেন এবং এই সকল দেবতাকে আর্যগণ স্তবস্তুতি, যাগযজ্ঞ, বলিদান এবং অন্যান্য নানা ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা তুষ্ট করিতেন। ক্রমেই যাগযজ্ঞ, বলিদান ও ক্রিয়াকাণ্ড সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছিল এবং ব্রাহ্মণগণ সমাজে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ফলে যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ বৈদিক আর্য ধর্ম "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম" নামে পরিচিত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে, উপনিষদের ঋষিগণ ক্রমেই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর বা ব্রহ্মের চিন্তা করিতেছিলেন। ফলে বৈদিক যুগে যখন একদিকে

বিভিন্ন দেবতার প্রাধান্য

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

যাগযজ্ঞ, বলিদান ও ক্রিয়াকাণ্ডের উপর জোর দেওয়া হইতেছিল, তখন অন্যদিকে একেশ্বরবাদী ধর্মেরও পরিকল্পনা করা হইতেছিল। কেবল তাহাই নহে, নূতন নূতন দেবদেবীরও কল্পনা করা হইতেছিল। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-ই প্রধান। তবে তখনও মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ প্রচলিত ছিল না।

বৈদিক আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থা।—প্রাচীন আর্য সমাজ বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণী-বিভাগ ছিল না। পরে আর্যগণ যখন পরাভূত অনার্যগণকে আর্য সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান দিলেন, তখন নিজেদের সহিত কৃষ্ণকায় অনার্যদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বর্ণভেদের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু পরে আর্যগণ নিজেদের মধ্যেও গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। এইভাবে অনার্যগণ হইতে আর্যগণকে পৃথক করিবার জন্য যে বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আর্য সমাজেও বিস্তারলাভ করিল। আর্যগণ নিজদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন উচ্চবর্ণে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা বিদ্যাচর্চা, উপাসনা, পূজার্চনা ও যাগযজ্ঞাদি লইয়া ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহারা "ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত হইলেন। যাঁহারা যুদ্ধ ও রাজকার্যে নিযুক্ত রহিলেন, তাঁহারা পরিচিত হইলেন "ক্ষত্রিয়" নামে। যাঁহারা কৃষিকার্য, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিলেন, তাঁহারা হইলেন "বৈশ্য"।

বর্ণভেদ

আর আর্য সমাজভুক্ত অনার্যরা সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে "শূদ্র"রূপে স্থান পাইলেন। আর্যদের পরিচর্যা ও নানারূপ শ্রমশিল্পই তাঁহাদের প্রধান কার্য হইল। এইভাবে বৈদিক আর্য সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। কিন্তু এই বর্ণভেদ তখনও পরবর্তী কালের মতো কঠোর ও সংকীর্ণ ছিল না। এক শ্রেণীর লোক স্বীয় কর্মের দ্বারা অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিত। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তিনি কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদেরও ইষ্টমন্ত্র গায়ত্রী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমেই বর্ণভেদ কঠোরতর ও সংকীর্ণতর হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের লোকে তাঁহাদের সমগ্র জীবনকে প্রধান চারি ভাগে বিভক্ত করিতেন। এই ভাগগুলিকে এক-একটি আশ্রম বলা হয়। আর্য সন্তানগণ প্রথম জীবনে সংযম ও শুচিতার সহিত গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস

চতুরাশ্রম

করিতেন। জীবনের এই সময়টিকে "ব্রহ্মচর্য" বলা হয়। ব্রহ্মচর্য-শেষে আর্যকুমারগণ বিবাহ করিয়া সংসারী হইতেন। এই সংসার-যাত্রাকে বলা হয় "গার্হস্থ্য" আশ্রম। পরে প্রৌঢ় বয়সে তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিতেন। ইহার নাম "বানপ্রস্থ" আশ্রম। শেষ বয়সে তাঁহারা সন্ন্যাসী হইতেন। উহাকে বলা হয় "সন্ন্যাস" বা "যতি" আশ্রম।

"বর্ণভেদ" ও "আশ্রম" প্রাচীন আর্য সমাজের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এইগুলির সামাজিক গুরুত্ব এতই অধিক ছিল যে, এই দুইটি বিষয় একত্র "বর্ণাশ্রম ধর্ম" নামে পরিচিত হইয়াছে।

যাহাই হউক, আর্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পিতাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাই তাঁহাকে "গৃহপতি" বলা হইত। মাতা পিতার অধীন হইলেও তাঁহার সম্মান-মর্যাদা কম ছিল না। পিতামাতা পুত্রই কামনা করিতেন। কিন্তু কন্যার জন্ম হইলে তাহাকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করা হইত না। সংসারে দুগ্ধদোহনের ভার কুমারী কন্যাদের উপর ন্যস্ত থাকিত। তাই তাঁহারা "দুহিতৃ" নামে পরিচিতা ছিলেন। সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। তাঁহাদের উচ্চশিক্ষালাভের এবং বেদাভ্যাসের কোনও অন্তরায় ছিল না। বৈদিক যুগে নারী-ঋষির অভাব ছিল না। বৈদিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, বিশ্ববরা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি মহীয়সী রমণীদের নাম আজও অমর হইয়া আছে। নারীর দৈহিক উৎকর্ষের জন্য নানারূপ ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত বয়সের পূর্বে তাঁহাদের বিবাহ দেওয়া হইত না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে চিরকুমারীও থাকিতে পারিতেন। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। পুরুষরা সাধারণতঃ একপত্নীক ছিলেন। তবে বহুপত্নীক পুরুষেরও অভাব ছিল না।

বৈদিক পরিবার

নারীর স্থান

দুগ্ধ, ঘৃত, ফল-মূল, যব, গম ও মাংস আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল। পরে মাংসাহার সম্পর্কে ক্রমেই তাঁহারা সংযত হইতে থাকেন। উপনিষদে জীবহিংসা সম্পর্কে বহু নিন্দা রহিয়াছে। প্রাচীন আর্যরা সুরাপান করিতেন। তবে বৈদিক সাহিত্যে সুরাপানেরও নিন্দা রহিয়াছে। আর্যগণ যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে সোমরস নামে পানীয় পান করিতেন। সোমলতা নামে একপ্রকার উদ্ভিদ হইতে এই পানীয় প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু কোন্ উদ্ভিদকে যে সোমলতা বলা হইত, তাহা আজও স্থিরভাবে নিরূপিত হয় নাই।

খাদ্য

আর্যরা সূতা ও পশমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। ঋষিরা বৃক্ষত্বক্ বা বল্কল এবং পশুচর্মও ব্যবহার করিতেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। পুরুষরা কেশ ও গুম্ফশ্মশ্রু রাখিতেন। ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রথদৌড়, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া ও নৃত্যগীত খুবই প্রিয় ছিল। সঙ্গীত-বিদ্যায় আর্যগণ খুবই উন্নত ছিলেন। বীণা, বংশী, নাদী ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানারূপ বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল।

বেশভূষা ও আমোদ-প্রমোদ

অর্থনৈতিক অবস্থা।—বৈদিক যুগের আর্য সভ্যতা প্রথমে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রামীণ জীবনই ছিল তাঁহাদের নিকট আদর্শস্থানীয়। কৃষি ও পশুপালনই ছিল তাঁহাদের প্রধান জীবিকা। কৃষির জন্য সেচ-ব্যবস্থার এবং বন পোড়াইয়া নূতন কৃষিক্ষেত্র রচনার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। গোময় ও অন্যান্য প্রাণীর মল সাররূপে ব্যবহারের কথাও বৈদিক সাহিত্যে রহিয়াছে। কৃষিক্ষেত্রের সহিত পশুচারণের জন্য চারণভূমি বা গোষ্ঠ ছিল। গোষ্ঠগুলি সম্ভবতঃ এক-একটি বংশের বা কুলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উহা হইতেই গোষ্ঠী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। মৃগয়ালব্ধ মাংসেও খাদ্যের একাংশ সরবরাহ হইত।

কৃষি ও পশুপালন

বৈদিক যুগে শ্রম-বিভাগ বেশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন লোকে বংশানুক্রমে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করিত। তবে শ্রমশিল্পের বেশীর ভাগই অনার্যদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতিই প্রধান ছিল।

শ্রমশিল্প

দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ হইতেছিল। বৈদিক যুগে সমুদ্রপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত কিনা, সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। তবে বৈদিক যুগে সম্ভবতঃ কোনরূপ মুদ্রার প্রচলন ছিল না। সাধারণতঃ পণ্য-বিনিময়-ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। অনেক সময় গরু ও স্বর্ণালঙ্কারও মুদ্রার কাজ করিত। মুদ্রারূপে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার হইতেই সম্ভবতঃ "নিষ্ক" (কণ্ঠভূষণ) নামক মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। "মনা" নামে একপ্রকার স্বর্ণখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ঋগ্‌বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাকে বেবলনীয় "মানা" এবং রোমক "মিনা"-র অনুরূপ কিছু মনে করেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মুদ্রা

বৈদিক যুগে দাস-প্রথার প্রচলন ছিল। তবে স্বাধীন কৃষক, পশুপালক ও শ্রমশিল্পীর সংখ্যাই ছিল অধিক। অনার্যগণকে আর্যগণ "দাস" বলিতেন। পরাভূত অনার্যগণ যে প্রথম যুগে দাসরূপে গৃহীত হইতেন, উহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দাস-প্রথা

বৃষ ও অশ্ব সাধারণতঃ পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইত। গোযান ও অশ্ব-বাহিত রথ আর্যদের প্রধান পরিবহণ ছিল। জলপথে নৌকার ব্যবহারও ছিল। তবে সমুদ্রপথে তাঁহারা যাতায়াত করিতেন কিনা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

পরিবহণ

রাজনৈতিক অবস্থা।—আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার।

পিতা বা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাঁহাকে গৃহপতি বলা হইত। কতকগুলি পরিবার লইয়া গঠিত হইত এক-একটি কুল (clan)। কুলের কর্তাকে বলা হইত "কুলপতি"। অনেকগুলি পরিবার বা কুল লইয়া গঠিত হইত গ্রাম। কতকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত হইত "বিশ্" বা "জন"। বিশ্ বা জন-ই ছিল রাজ্য। রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন "বিশ্পতি" বা রাজন্।

রাজনৈতিক ভিত্তি

বৈদিক যুগে প্রধানতঃ রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। তবে রাজারা জনসাধারণের মতামত মানিয়া চলিতেন। রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য "সভা" ও "সমিতি" থাকিত। প্রজার রক্ষণ ও কল্যাণ-সাধনই রাজার কর্তব্য ছিল। তিনি নিজে যুদ্ধে যাইতেন। সৈন্য পরিচালনার জন্য তাঁহার সহিত "সেনানী" (সেনাপতি) থাকিতেন। পুরোহিতই ছিলেন রাজার প্রধান মন্ত্রী। আর্যগণকে কেবল অনার্যদের সহিতই যুদ্ধ করিতে হইত না। যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, পুরু, ভরত, সৃঞ্জয় প্রভৃতি বিভিন্ন আর্য উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ চলিত। উপজাতি-গুলি গোড়ার দিকে নিজ নিজ প্রাধান্য-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিত। রাজারাও ক্রমাগত তাঁহাদের অধিকার বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেন। এজন্য তাঁহারা কেবল যুদ্ধই করিতেন না, নিজ নিজ প্রাধান্য ঘোষণার জন্য তাঁহারা রাজসূত্র, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন এবং একরাট্, সম্রাট, বিরাট প্রভৃতি সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করিতেন।

রাজতন্ত্র

বৈদিক যুগে প্রজাতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে "গণ", "গণজ্যেষ্ঠ", "গণপতি" শব্দের উল্লেখ হইতে তাহা বুঝা যায়। নির্বাচনের দ্বারাই শাসক নির্বাচিত হইতেন। সাধারণতঃ কুলপতিগণের মধ্য হইতেই গণরাজ্যগুলির শাসক নির্বাচন করা হইত। তবে রাজতন্ত্রগুলি ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল এবং প্রজাতন্ত্রগুলির সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল।

প্রজাতন্ত্র

আর্য সভ্যতায় অনার্য প্রভাব।—ভারতে আসিয়া আর্যগণকে অনার্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশে অধিকার স্থাপন করিতে হইয়াছিল। অনার্যগণ ধীরে ধীরে আর্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। শক্তি দ্বারা আর্যগণ অনার্যগণকে পরাভূত করিলেও, আর্যগণের উন্নততর মনোভাবও অনার্যগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে আর্য সমাজের সহিত মিলিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু অনার্যগণ অসভ্য ছিলেন না। তাঁহারা সিন্ধু সভ্যতার মতো একটি উন্নতধরনের সভ্যতার স্রষ্টা ছিলেন। দেশে অনার্যগণের সংখ্যাও কম ছিল না। সুতরাং অনার্যগণ যে তাঁহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিবেন,

তাহাতে আশ্চর্য কি! আর্যগণও উদারমনে অনার্য সভ্যতা-সংস্কৃতির যাহা-কিছু গ্রহণীয় ও উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এইভাবে এক উন্নততর আর্য সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল।

আর্য সমাজ ও সভ্যতা গ্রামীণ ছিল। অন্যপক্ষে সিন্ধু অঞ্চলে অনার্য সভ্যতা ছিল নগরপ্রধান। তাই নাগরিক সভ্যতার দিক হইতে অনার্যগণ আর্যগণ অপেক্ষা সম্ভবতঃ উন্নততর ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, এদেশে আসিবার পূর্বে আর্যগণ প্রধানতঃ পশুপালক ছিলেন। উন্নততর কৃষি-ব্যবস্থার জন্য তাঁহারা সম্ভবতঃ অনার্যদের নিকট ঋণী ছিলেন। বিভিন্ন শ্রমশিল্পে দেখা যায়, অনার্যগণই প্রাধান্যলাভ করিতে থাকেন। তাহার প্রমাণ আজও মিলে। অধিকাংশ শ্রমশিল্পীই জাতি ও বর্ণের দিক হইতে শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত। নগর-নির্মাণে ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যে ভারতীয় অনার্যগণ নবাগত আর্যদের তুলনায় অধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। কারণ, অনার্যগণ সিন্ধু সভ্যতার মতো এক অত্যুন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিলেন, অন্যপক্ষে ভারতে প্রবেশকারী আর্যগণ সেরূপ কোনও ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন না। স্থতরাং আর্যগণ যে ভারতে আসিয়া নগর, প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণে এবং বিভিন্ন শিল্পকার্যে অনার্যদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও অনার্যগণ আর্যগণের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ছিলেন। ঋগ্‌বেদ হইতে জানা যায়, আর্যগণ ভারতে আসিয়া "পনি" নামে এক শ্রেণীর অনার্যদের সহিত কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নিরুক্তকার যাস্ক এই "পনি" শ্রেণীকে ব্যবসায়ী বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক কথায়, উন্নততর কৃষি এবং নাগরিক সভ্যতার বিকাশের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা আর্য সভ্যতায় অনার্য সভ্যতারই দান ছিল।

অর্থনৈতিক জীবনে অনার্য প্রভাব

ধর্মের দিক হইতেও অনার্যগণ আর্যগণের উপর প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনার্যগণ আর্য ধর্মকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অনার্য ধর্মও ধীরে ধীরে আর্য ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শিব ও দুর্গার মতো দেবদেবীর পূজা সম্ভবতঃ আর্যগণ অনার্যগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিন্ধু অঞ্চলের অনার্যগণ লিঙ্গপূজা ও মূর্তিপূজা করিতেন। আর্য সমাজে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল। আর্য সমাজে যোগসাধনা অনার্য সমাজ হইতেই আসিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। গোড়ার দিকে গোবধ আর্য ধর্মে নিন্দনীয় ছিল না। যজ্ঞকালে বা অতিথিসৎকারের জন্য গোবধ করা হইত। গোমাংসও খাদ্যরূপে নিষিদ্ধ ছিল না। সম্ভবতঃ অনার্য প্রভাবেই আর্যগণ ক্রমেই গোবধ-বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন।

ধর্মীয় প্রভাব

এইরূপে আর্য ও অনার্যগণের ঘনিষ্ঠ মিলনের ফলেই উন্নততর ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল।

মহাকাব্য রচনা ও পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুত্থান।—আর্য সভ্যতা ও অনার্য সভ্যতার মিলনের ফলেই পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। বৈদিক আর্য ধর্মের মূলকথা ছিল যাগযজ্ঞ ও ব্রহ্মচিন্তা। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা ও উপাসনা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। বৈদিক যুগে যে সকল দেবতা প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন, ক্রমেই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাধান্য হারাইয়াছিলেন এবং নূতন এক শ্রেণীর দেবতা ক্রমেই অধিকতর প্রাধান্যলাভ করিতেছিলেন। বৈদিক যুগের ইন্দ্র, মিত্র (সূর্য), বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি দেবতাগণ দেবসভায় এখন পিছনের সারিতে সরিয়া গিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে শিব মহেশ্বর বা মহাদেবরূপে আসন পাইলেন। সিন্ধু সভ্যতার যুগে আমরা সীলমোহরে যে জীবজন্তু-পরিবেষ্টিত ত্রিমস্তকযুক্ত যোগী দেবতাকে দেখিয়াছিলাম, বৈদিক রুদ্র দেবতার সহিত মিশিয়া তিনি পশুপতি পঞ্চানন হইলেন। বৈদিক মিত্র বা সূর্য দেবতা পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে বিষ্ণুতে পরিণত হইলেন। সূর্যের প্রতীকরূপে সুদর্শনচক্র তাঁহার হস্তে বিরাজিত হইল। উপনিষদের ব্রহ্ম পৌরাণিক ব্রহ্মায় পরিণত হইলেন। মহাদেবের পত্নী দুর্গাও আদ্যাশক্তিরূপে পূজিতা হইতে লাগিলেন। শিব ও দুর্গার দুই পুত্র কার্তিকেয় এবং গণেশও দুই প্রধান দেবতারূপে স্থান পাইলেন। বৈদিক আর্যগণ যাগযজ্ঞ দ্বারাই দেবার্চনা করিতেন। তাঁহারা মূর্তিপূজা করিতেন না। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা অনার্যগণ দেবমূর্তির পূজা করিতেন। অনার্য প্রভাবে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা প্রচলিত হইল। পরে গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাবে মূর্তিপূজা আরও প্রাধান্যলাভ করে এবং যাগযজ্ঞের পরিবর্তে মূর্তিপূজাই ভারতীয় হিন্দু ধর্মের প্রধানতম অংশে পরিণত হইল। এই সকল অসংখ্য নবাগত দেবতাদের উদ্ভব ও কার্যকলাপ লইয়া অসংখ্য কাহিনী রচিত হইল। সেই সকল কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিল ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি।

পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের উদ্ভব

দেবতাগণ এখন আর কেবল স্বর্গে, কৈলাসে ও বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিতে লাগিলেন না। তাঁহারা পৃথিবীতে ধর্ম, ন্যায় ও আদর্শ সংস্থাপনের জন্য নররূপে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হইলেন। এইরূপ দুই অবতারের জীবন লইয়া রচিত হইল দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত। বৈদিক যুগেই মহাকাব্যের বীজ রোপিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালেই তাহা বিশাল মহীরুহরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। প্রাচীন রাজারা যখন রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ

করিতেন, তখন সেই বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানে দশদিন ঐ রাজবংশের কীর্তিকথা গীত হইত। কুরু ও কোশল রাজগণের যজ্ঞানুষ্ঠানে গীত কীর্তি-কাহিনীই ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করিয়া "মহাভারত" ও "রামায়ণ" নামে ভারতের দুই প্রাচীনতম মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছিল। মহাকাব্যগুলি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল—(1) ইতিহাস ও পুরাণ এবং (2) কাব্য। এই দুই ভাগে কেবল প্রাচীন ইতিহাস, রাজারাজড়ার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্বের কাহিনী এবং সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ ও অবস্থার কথাই বর্ণিত হইত না। ইহাতে দেবদেবীর বিবরণ ও কীর্তিকথাও থাকিত। দেবদেবীগণ প্রায়ই মানবিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিতেন এবং মানবের ভাগ্যবিধায়ক হইয়া উঠিতেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে এবং রামায়ণে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছিল। রামায়ণে আর্য সভ্যতার আদর্শ এবং মহাভারতে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ ঘোষিত হইয়াছিল।

মহাকাব্যের উদ্ভব

প্রশ্নাবলী

1. **Briefly describe the social, economic, political and religious life of the Vedic Aryans.** [বৈদিক আর্যদের সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. **Trace the influence of Non-Aryan culture on the development of Hindu civilization.** [হিন্দু সভ্যতার বিকাশে অনার্য প্রভাবের গুরুত্ব আলোচনা কর।]

পঞ্চম অধ্যায়

দুই মহান্ নবধর্ম—বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম

নবধর্মের অভ্যুত্থানের কারণ।—বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে আর্য ধর্মে যে উদারতা ছিল, তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল এবং আর্য সমাজে অনুদার কঠোরতা ও অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিল। সমাজে বর্ণভেদ প্রচলিত থাকায় ব্রাহ্মণগণই সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ব্রাহ্মণদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে বৈদিক সমাজের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বর্ণভেদ, চতুরাশ্রম প্রভৃতি সামাজিক রীতি-নীতি "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম" নামে পরিচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যাগযজ্ঞ ও বলিদানকে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত। সমাজে বর্ণভেদের কঠোরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং

ব্রাহ্মণগণের চক্ষে অব্রাহ্মণগণ অপাঙ্‌ক্তেয় ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিংসা, জীবহত্যা ও মানুষের প্রতি মানুষের এই ঘৃণা কখনও প্রকৃত ধর্মের ভিত্তি হইতে পারে না, তৎকালীন সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। বহু দেবদেবী-অধ্যুষিত অনুষ্ঠানপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের শেষের দিকে হিন্দু মনীষিগণ তাই একেশ্বরবাদ সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলেন এবং একেশ্বর ব্রহ্মের আরাধনা ও ব্রহ্মলাভই যে হিন্দুগণের সাধনার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত, উপনিষদের ঋষিগণ তাহাও প্রচার করিতেছিলেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিষয়ের নেতৃত্ব হইতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের লোকদিগকে যে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলিতেছিল। এইভাবে বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ফলে দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে নানা ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল। জৈন শাস্ত্রমতে ঐ সময় 363টি এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে 62টি ধর্মীয় সম্প্রদায় দেশে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। এই অসংখ্য ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম সর্বপ্রধান। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ব্রাহ্মণগণই নেতৃত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়গণ। পার্শ্বনাথ, বর্ধমান ও সিদ্ধার্থ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়ারূপেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। উপনিষদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঘোর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে সাধারণতঃ বেদ-বিরোধী বলা হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বেদ-বিরোধী ছিল না। এই দুই মহান্ ধর্মের বীজ বেদের আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যেই সর্বপ্রথম লক্ষিত হয়। সুতরাং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে বেদ-বিরোধী না বলিয়া উপনিষদের মতোই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়া বলা চলে। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই হিন্দু জন্মান্তরবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়া

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল। এই শতাব্দীটি পৃথিবীর তৎকালীন অন্যান্য সভ্যদেশেও ধর্মান্দোলনের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে। ভারতবর্ষে, পারস্যে, গ্রীসে ও চীনদেশে এই সময় দার্শনিক চিন্তা ও ধর্মীয় আন্দোলনের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়।

এই যুগে রাজনৈতিক অবস্থা।—খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সুস্পষ্ট ছিল না। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। এই সময়ে উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে ষোড়শ মহাজনপদ বা রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। এই সকল

মহাজনপদগুলির কতকগুলিতে রাজতন্ত্র ও কতকগুলিতে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজতন্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কাশী, কোশল, বৎস, অবন্তী, মগধ, কুরু, পাঞ্চাল, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্য। আর প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বৃজি যুক্তরাষ্ট্র এবং মল্ল, শাক্য, ভার্গ, মগুর প্রভৃতি কুল বা গোষ্ঠী-শাসিত গণরাজ্য। বৃজি গণরাজ্যের রাজধানী বৈশালীর নিকটে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং শাক্য-শাসিত গণরাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তুতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হইয়াছিল। লক্ষণীয় যে, গণরাজ্যগুলিতেই এই দুই মহান্ ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, পরে তাহা রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্যগুলিতেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

জৈন ধর্ম।—মহাবীরই জৈন ধর্মের প্রবর্তক। তবে তাঁহার পূর্বে তেইশজন তীর্থঙ্কর এইরূপ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জৈনগণ মনে করেন। প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভদেব এবং ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্বনাথ। কথিত আছে, পার্শ্বনাথ কাশীর এক রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ নাকি অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহকেই তাঁহার ধর্মের মূলমন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর ঐ 'চতুর্যামের' বা চতুর্বিধ সংযমের সহিত নাকি দৈহিক সংযম বা ব্রহ্মচর্যকে যুক্ত করিয়াছিলেন।

পার্শ্বনাথ

মহাবীরের প্রকৃত নাম বর্ধমান। তিনি বৃজি গণরাজ্যের রাজধানী বৈশালীর নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জ্ঞাতৃক নামক ক্ষত্রিয়কুলের নেতা ছিলেন। তাঁহার মাতা লিচ্ছবিকুলের নেতা চেটকের ভগিনী ছিলেন। চেটকের কন্যাগণ তৎকালীন কতিপয় রাজ্যের রাজমহিষী ছিলেন। একজন ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসারের মহিষী। এইরূপে বর্ধমান তৎকালীন বহু শক্তিশালী রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। বৃজি গণরাজ্যে জ্ঞাতৃক ও লিচ্ছবিকুলের প্রাধান্য ছিল। এই রাজনৈতিক যোগাযোগ যে জৈন ধর্ম প্রচারের পক্ষে অনুকূল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। মহাবীর ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বৎসর পরিব্রজ্যা ও তপশ্চর্যা করিয়া "কৈবল্য" লাভ করেন। তিনি কঠোর সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়

মহাবীর

মহাবীর

করিয়াছিলেন। তাই তিনি "জিন" ও "মহাবীর" নামে পরিচিত হন। 'জিন' শব্দ হইতেই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত "জৈন ধর্ম" নামে পরিচিত হয়। ত্রিশ বৎসরকাল মহাবীর উত্তর ভারতের নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। 72 বৎসর বয়সে বর্তমান পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর কাল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তবে খ্রীষ্টপূর্ব 546 অব্দে তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছিল, এমন মনে করিবার বহু যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

জৈন ধর্মের মূলকথা

জৈন ধর্মের মূলকথা হইল, জন্মান্তর ও কর্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভই প্রকৃত ধর্ম। এইরূপ নিষ্কৃতিলাভের জন্য সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে হয়। এজন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, অপরিগ্রহ (ত্যাগ) ও ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য। মহাবীর বসনভূষণকেই গ্রন্থি বা বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি বসনভূষণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে বলেন। তাঁহার মতে, ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই; বস্তুমাত্রেরই আত্মা রহিয়াছে; মানবাত্মার মধ্যে নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশই ঈশ্বর। মহাবীর অহিংসাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেন। জৈনদের মতে, জীবহিংসার মতো মহাপাপ আর নাই। জৈনগণ বৈদিক যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিন্দা করেন। বেদকে ভগবানের স্বমুখের বাণী বলিয়াও তাঁহারা স্বীকার করেন না। কঠোর আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্রসাধন এবং অহিংসাপালন মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। অনশনে প্রাণত্যাগ জৈনমতে অতিশয় পুণ্য কর্ম।

জৈন ধর্মে মতবিরোধ

মহাবীর ও বুদ্ধদেব সমসাময়িক ছিলেন। গোড়ার দিকে জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের অপেক্ষাও অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছিল। মগধরাজগণের অনেকেই জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের প্রায় সমসময়েই জৈন ধর্মে মত-বিরোধ দেখা দেয়। ঐ সময় জৈন ধর্মে ভদ্রবাহু ও স্থূলভদ্র নামে দুইজন গুরু নেতৃত্ব করিতেছিলেন। মগধে দুর্ভিক্ষ হইলে ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল জৈন দক্ষিণ ভারতে চলিয়া যান। পরে ভদ্রবাহু সদলবলে মগধে প্রত্যাবর্তন করিলে মতবিরোধ দেখা দেয়। যাঁহারা মগধে ছিলেন, তাঁহারা নগ্নতা ত্যাগ করিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহারা "শ্বেতাম্বর" নামে পরিচিত হইলেন। যাঁহারা নগ্ন থাকাকে জৈন ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহারা "দিগম্বর" নামে পরিচিত হইলেন। এইরূপে জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেলেন। ইহা জৈন ধর্ম ও সম্প্রদায়কে যথেষ্ট দুর্বল করিয়া দিল। পরে জৈন ধর্মে হিন্দু ধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে পতিত হইল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণও নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে জৈন ধর্ম তাহার প্রভাব-

প্রতিপত্তি হারাইল। এখনও রাজপুতানা ও গুজরাট অঞ্চলে বহুসংখ্যক জৈন বাস করেন। তবে ভারতের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় তাহাকে নগণ্য বলিতে হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত এক জৈন মহাসভায় মহাবীরের উপদেশাবলী ও জৈন ধর্মের নিয়মসমূহ দ্বাদশ খণ্ডে সংকলন করা হয়। প্রতি খণ্ড "অঙ্গ" নামে পরিচিত। অঙ্গগুলি অর্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত। পরে সংস্কৃত ভাষাতেও বহু জৈন শাস্ত্র লিখিত হয়। দ্বাদশ অঙ্গ ছাড়া উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র প্রভৃতি নামে বহু জৈন ধর্মশাস্ত্র আছে।

জৈন শাস্ত্র

মহাবীর তাঁহার জীবদ্দশাতেই জৈন সন্ন্যাসীদের লইয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন। দেশে বহু জৈন বিহার বা সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাবীর গোড়া হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। ফলে জৈন ভিক্ষুণীদের জন্য বহু সংঘারাম গড়িয়া তোলা হয়। পরে দিগম্বর সম্প্রদায় স্ত্রীলোকদের এই অধিকার অস্বীকার করিলেও, শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভিক্ষুণীদিগকে সংঘে স্থান ও সমান অধিকার দেন। জৈন সন্ন্যাসীগণ জৈন ধর্মের সাধনার মূল ব্রতগুলিকে— অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, অপরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য—কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই তিনভাবে পালন করিতেন। এইরূপ সাধনাকে "মহাব্রত" বলা হইত।

জৈন সংঘ
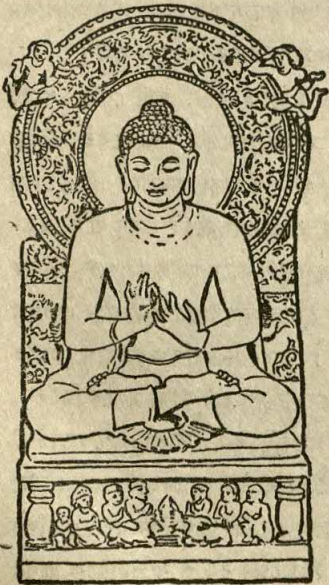
গৃহী জৈনগণও ঐ সব ব্রত আংশিকভাবে পালন করিতেন। উহা "অনুব্রত" নামে পরিচিত ছিল। গৃহী জৈনদের সহিত বিহার-বাসী জৈন সন্ন্যাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিত। জৈন বিহারগুলি কেবল জৈন সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল ছিল না, সেগুলি জৈন শিক্ষা-সংস্কৃতিরও কেন্দ্র ছিল।

বুদ্ধদেব

বৌদ্ধ ধর্ম।—মহাবীর যখন জৈন ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধদেবও তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ গৌতম। প্রাচীন কালে নেপালে তরাইয়ে কপিলাবস্তু নামে একটি গণরাজ্য ছিল। কপিলাবস্তুতে শাক্য নামে একটি ক্ষত্রিয়কুলের নায়ক ছিলেন শুদ্ধোদন। এক বৈশাখী পূর্ণিমায় মায়া দেবীর গর্ভে শুদ্ধোদনের এক পুত্র জন্মে—তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ। জন্মের সপ্তাহকাল পরে মাতার মৃত্যু হইলে,

সিদ্ধার্থ বিমাতা ও মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ক্রোড়ে লালিত হন। তিনি কৈশোরে ধনুর্বিদ্যা, মল্লবিদ্যা প্রভৃতি রাজকুমারোচিত সকল শিক্ষা-দীক্ষায় অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করেন। কৈশোরেই গোপা বা যশোধরা নাম্নী এক সুন্দরী আত্মীয়-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারের ভোগবিলাস বা রাজৈশ্বর্য তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু তাঁহাকে চিন্তাকুল ও বিচলিত করিল। তিনি সংসারত্যাগের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। সংসারের বন্ধন আরও দৃঢ় হইতেছে দেখিয়া, তিনি অচিরে মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে গোপনে সংসার ত্যাগ করিলেন। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি রাজগৃহে তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত আলাড় কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি নানা স্থানে জ্ঞানের সন্ধানে পর্যটন করেন এবং তপশ্চর্যা করিতে থাকেন। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয় এবং অবশেষে গয়ার নিকটে নৈরঞ্জনা নদীতীরে উরুবিল্ব নামক স্থানে "বোধি" বা পরমজ্ঞান লাভ করেন। তিনি এখন হইতে "বুদ্ধ" নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত "বৌদ্ধ ধর্ম" নামে পরিচিত হয়। তিনি কাশীর নিকটে সারনাথে সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন।

বুদ্ধদেব

বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা হইল, মানুষ কর্মফল অনুসারে বারবার জন্মলাভ করে এবং জন্মলাভ করিয়া অসীম দুঃখ পায়। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে জন্ম ও কর্মের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। এই মুক্তিলাভই "নির্বাণ"। নির্বাণলাভের জন্য বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা অষ্ট পন্থার নির্দেশ দিলেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হইল—সম্যক্ দৃষ্টি, সদ্‌বাক্য, সৎকর্ম, সৎসংকল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের তিনি নিন্দা করিলেন। বর্ণভেদ বা জাতিভেদ অস্বীকার করিলেন। ঈশ্বর আছেন কি নাই, সে সম্পর্কে নীরব রহিলেন। তিনি একদিকে বিলাস-ব্যসন ও ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া এবং অন্যদিকে অতিশয় আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্রসাধন বর্জন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিতে বলিলেন। তাই তাঁহার ধর্মমত "মধ্যপন্থা" নামে পরিচিত হইল।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা

বুদ্ধদেব 45 বৎসর উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। আশী বৎসর বয়সে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগরে (বর্তমান কুসিয়া) বুদ্ধদেবের মৃত্যু বা "মহানির্বাণ" ঘটে। তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কেও মতভেদ আছে। বিভিন্ন মত অনুসারে, খ্রীষ্টপূর্ব 544, 486 বা 483 অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর রাজগৃহে বৌদ্ধগণের যে সম্মেলন হয়, তাহা প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি

নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব জনসাধারণের কথ্য পালি ভাষাতেই উপদেশাবলী দিতেন। এই অধিবেশনে বুদ্ধদেবের বাণীগুলি সংকলন করা হয়। এই সংকলন তিন খণ্ডে রচিত। তাই এই সংকলনের নাম ত্রিপিটক (পিটক শব্দের অর্থ পেটিকা বা ঝুড়ি)। ত্রিপিটক সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক, এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। সূত্র-পিটকে বুদ্ধদেবের বাণী ও কার্যাবলীর বিবরণ আছে। ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় 'নিকায়'। সূত্রপিটকের পঞ্চম নিকায়ে জাতকের বিখ্যাত কাহিনীগুলি আছে। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাদি আছে। অভিধর্মপিটকে আছে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত তত্ত্বাদি। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয় অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে। চতুর্থ ও শেষ সঙ্গীতি হয় কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে বা জালন্ধরে। বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের দ্বারা নানা-ভাবে প্রভাবিত হইতেছিল। গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতিসমূহের আগমনও তাহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ফলে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম 'মহাযান' ও 'হীনযান' নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। চতুর্থ সঙ্গীতিতেই নাগার্জুন, অশ্বঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চেষ্টায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের দিক হইতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তাই সঙ্গীতিগুলি বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বৌদ্ধ সঙ্গীতি ও শাস্ত্র

জৈন ধর্ম মাত্র ভারতের কতকাংশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় সমগ্র এশিয়ার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। ইহার মূলে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের সাংগঠনিক শক্তি। বুদ্ধদেব নিজেই সংগঠনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। রাজগৃহ, কপিলাবস্তু ও শ্রাবস্তীতে প্রথমে তিনটি বৌদ্ধ মঠ গড়িয়া উঠে। পরে দেশে ও বিদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম গড়িয়া উঠে। বুদ্ধদেব সংঘ-জীবনের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বুদ্ধ, সংঘ ও ধম্ম—এই তিনটিই বৌদ্ধ ধর্মে 'ত্রিরত্ন' নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব তাঁহার বিমাতা মহাপ্রজাপতির অনুরোধক্রমে স্ত্রীলোকদিগকেও সন্ন্যাস-গ্রহণের ও ভিক্ষুণী হইবার অধিকার দেন। সংঘ-জীবন যাপনের জন্য কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। কোনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাসকারী সন্ন্যাসীগণ ভোটের দ্বারাই 'সংঘেশ্বর' বা 'সংঘপরিণায়ক' নির্বাচন করিতেন। সংঘের অন্যান্য কর্মীরাও ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। বলা চলে, বৌদ্ধ সংঘগুলি কতকটা সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত ছিল। অবশ্য, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের অধিকার ও মর্যাদা সমান ছিল না। ভিক্ষুণী-সংঘগুলি ভিক্ষু-সংঘের অধীন ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তিনখণ্ড পীতবস্ত্রকে পরিধানরূপে

বৌদ্ধ সংগঠন

ব্যবহার করিতেন। ভিক্ষা দ্বারা প্রধানতঃ খাদ্য সংগৃহীত হইত। তবে ভক্তের গৃহেও তাঁহারা খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। কতিপয় বিধিনিষেধ অনুসারে মঠের জন্য স্থান নির্বাচন ও ভবন নির্মাণ করা হইত। মঠ ছিল সংঘের সম্পত্তি। মঠগুলিকে বিহার বা সংঘারাম বলা হইত। ঐগুলি বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্নায়ুকেন্দ্র ছিল।

ভারতের ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব।—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়াই ভারতীয় ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম তাহার স্থায়ী স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভারতবর্ষে যে বর্ণভেদ ও জাতিভেদের কঠোরতার সৃষ্টি করিয়াছিল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তাহা বিশেষভাবে শিথিল করিয়া দিয়াছিল। সংযত ও সৎ জীবন যাপনের মধ্য দিয়াই মানুষ তাহার কর্মফল ও পুনর্জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, এই কথা ঘোষণা ও প্রচার করিয়া মানুষকে সৎ ও সংযত জীবন যাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই উভয় ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্মেও জীবহত্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইতেছিল এবং আমিষ আহার ঘৃণ্য কার্যরূপে পরিণত হইতেছিল। হিন্দু ধর্মে পরে যে ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহাও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ঘটিয়াছিল। দেশে ক্রীতদাস-প্রথা থাকিলেও, বৌদ্ধ ধর্মের মানবিক আদর্শ যে তাহাকে অনেক পরিমাণে সুসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজনীতি

রাজনৈতিক দিক হইতে বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতকে হিংসার পথ হইতে বিরত করায়, তাহার সাম্রাজ্যলিপ্সা হ্রাস পাইয়াছিল। এশিয়ার অধিকাংশ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারলাভ করায় ভারতবর্ষ এশিয়ার তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের সহিত ভারতের সৌহার্দ্য-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। বাহির হইতে যে সকল জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় মহাজাতির সহিত সহজেই অঙ্গীভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সম্রাট অশোক যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল এবং অশোককে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটে পরিণত করিয়াছিল।

ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ লৌকিক কথ্য ভাষায় ধর্মপ্রচার করিতেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্রগুলি ঐ সকল লৌকিক কথ্য ভাষাতেই লিখিত হইত। ফলে পালি, মাগধী, অর্ধ-মাগধী প্রভৃতি কথ্য ভাষায় শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতকের কাহিনীগুলি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। ফলে ঐ দুই ধর্ম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হয়। বৌদ্ধ ও জৈন লেখকগণ ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশাস্ত্র, অভিধান, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ ধর্মের কাহিনী লইয়া অসংখ্য কাব্য ও নাটকও রচিত হইয়াছিল। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষের রচনাগুলি এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অভূতপূর্ব বিকাশ ও উন্নতি ঘটিয়াছিল। অসংখ্য জৈন ও বৌদ্ধ সংঘারাম ও গুহাগৃহগুলির যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। কেবল বিহার ও গুহাগৃহগুলিই নহে, অসংখ্য স্তূপ এবং স্তম্ভও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ভারতে নির্মিত হইয়াছিল। ভারহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের স্তূপগুলি প্রাচীন ভারতীয় নির্মাণশিল্পের গৌরবময় উদাহরণ। কেবল নির্মাণশিল্প নহে, তক্ষণশিল্পেরও বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়াছিল। সাঁচী স্তূপের বেদিকা ও তোরণগুলিতে বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ কাহিনীগুলি যে অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত খোদাই করা হইয়াছে, তাহা হইতে ঐ যুগের তক্ষণশিল্পের বিস্ময়কর উৎকর্ষ সহজেই প্রমাণিত হয়। জৈন ধর্মের প্রভাবে স্থাপত্যশিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার সুন্দর নিদর্শন উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ে এবং ইলোরার গুহাগৃহগুলিতে বর্তমান রহিয়াছে। আবু পর্বতে অবস্থিত দিলওয়ারা মন্দির এবং জুনাগড়ের জৈন মন্দিরগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নহে।

স্থাপত্য

স্থাপত্যের মতোই ভারতীয় ভাস্কর্যেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। অশোক-স্তম্ভের শীর্ষে নির্মিত পশুমূর্তিগুলি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। গান্ধার, মথুরা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে যে সকল বুদ্ধ ও বোধি-সত্ত্বের মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি নৈপুণ্যের দিক হইতে মূর্তি-নির্মাণশিল্পে আজও অতুলনীয় হইয়া আছে। মহাবীর এবং জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলিও এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রাচীন কালে চিত্রকলারও বিস্ময়কর বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই সকল চিত্রের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও অজন্তার গুহাগৃহগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রাচীন কালে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, সেগুলি আজও কালজয়ী হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। অনেকের মতে, ভারতবর্ষে কাগজের উপর অঙ্কিত চিত্রশিল্পের মধ্যে জৈন চিত্রশিল্পই প্রাচীনতম।

চিত্রকলা

বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন ও বিদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারলাভ।—বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে শক্তিশালী হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি দীর্ঘকাল অবস্থান করায়, বৌদ্ধ ধর্মে হিন্দু ধর্মের প্রভাব পতিত হওয়া ছিল অনিবার্য। গ্রীক সভ্যতার সহিত সংস্পর্শে আসায় এদেশে মূর্তি-রচনাশিল্পের অতিশয় দ্রুত বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের সহিত গ্রীক মূর্তিশিল্পের সংমিশ্রণের ফলে গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত এক মূর্তি-শিল্পের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর উপাসনা ও তাঁহাদের মূর্তি-পূজা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ফলে তত্ত্বপ্রধান বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের নিকট নীরসবোধ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই বৌদ্ধ ধর্মকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্মের কিছু সংস্কারসাধন ও পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অনুকরণে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি রচনা করিয়া সেগুলির উপাসনার রীতিও প্রবর্তিত হইতেছিল। হিন্দু ধর্মে বুদ্ধদেব ভগবানের অন্যতম অবতাররূপে স্থান পাইয়াছিলেন এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অনুকরণে বহু দেবদেবীও বৌদ্ধ ধর্মে স্থান পাইয়াছিলেন। এদেশে গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতির আগমন ও তাহাদের ভারতীয় ধর্ম গ্রহণের ফলে বৌদ্ধ ধর্মের কিছুটা রূপান্তর দেখা দিয়াছিল। ফলে মৌর্যোত্তর যুগে বৌদ্ধ ধর্ম 'মহাযান' নামে এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল। অনেকে বৌদ্ধ ধর্মের পুরাতন রূপটিকে অপরিবর্তিত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের অনুসৃত বৌদ্ধ ধর্মমত 'হীনযান' নামে পরিচিত ছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত চীনদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। অন্যপক্ষে ভারতে ও সিংহলে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মই প্রাধান্যলাভ করে। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের বহু পূর্বে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম সিংহলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর

সিংহলের রাজা ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণ দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেন। এখানে বহু গুহাগৃহও নির্মিত হইয়াছিল। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বহু গ্রন্থও রচিত হয়। সেগুলির মধ্যে 'মহাবংশ' ও 'দীপাবংশ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিংহল

এশিয়ার অন্যান্য অংশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ কয়েক শতাব্দী পরে ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু পূর্বেই ভারতের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পারস্য ঐ সময় বৌদ্ধ ধর্মের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। পারস্যের 'আরসকিদীয়' রাজবংশের সন্তান ভিক্ষু লোকোত্তম চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কপিশা রাজ্যেও (বর্তমানে

পারস্য

কাফিরিস্থান) বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন সাং যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কপিশা রাজ্যের রাজধানীতে প্রায় একশত বৌদ্ধ বিহার এবং অন্যূন ছয় হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন। আফগানিস্থানেও বৌদ্ধ ধর্মের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। এখানকার হিন্দুকুশ পর্বতে অবস্থিত বামিয়েন গিরিপথে বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির বহু প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিউয়েন সাং ভারত আগমনকালে এখানে বহু বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। এখানে পর্বতগাত্র খোদিত করিয়া বিরাট বিরাট বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মূর্তির কয়েকটি প্রায় দেড়শত ফুট উচ্চ ছিল। অজন্তার অনুকরণে এই পর্বতগাত্রে বহু গুহাগৃহও নির্মিত হইয়াছিল। অজন্তার অনুকরণে গুহাগৃহগুলির প্রাচীরগুলি বহু অতুলনীয় চিত্রে সজ্জিত ছিল। বামিয়েন গিরিপথের অপর প্রান্তে বাহ্লীক দেশে বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, তখন ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল 'রাজগৃহপুর'। রাজগৃহপুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'নবসংঘারাম' নামে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার ছিল। এই নবসংঘারামের উত্তরে প্রায় দুই-শত ফুট উচ্চ একটি স্তূপ ছিল। ঐ বিহারে অসংখ্য অপরূপ বুদ্ধমূর্তি ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে আরবগণ যখন এই বিহার ধ্বংস করে, তখন ইহাতে তিনশত প্রকোষ্ঠ ছিল এবং উহার ভূ-সম্পত্তি প্রায় 400 বর্গ-মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল।

কাফিরিস্থান ও আফগানিস্থান

বল্‌খ্‌

খোটান, কাশগর, করাশর, কুচি প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন রাজ্যগুলিও বৌদ্ধ ধর্মের ও সভ্যতা-সংস্কৃতির শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। খোটানের গোমতী ও গোশৃঙ্গ বিহারে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন এবং মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থান ও চীনদেশ হইতে বহু বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসী সেখানে আসিতেন। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, গোমতী বিহারে তিন হাজারেরও বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। প্রতি বৎসর এখানে বুদ্ধদেবের রথযাত্রা উৎসব হইত। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, কুচি রাজ্যের রাজধানীতে শতাধিক বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সেগুলিতে পাঁচ হাজারের বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিহারটির নাম ছিল 'আশ্চর্য বিহার'। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, ইয়ারকন্দ বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল। মধ্য-এশিয়ার দান্দান উইলিক, মিরান, তুন্‌-হোয়াং প্রভৃতি অন্যান্য বহু স্থানেও বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তুন্‌-হোয়াংয়ে অন্যূন পাঁচশত গুহাগৃহ রহিয়াছে। এই গুহাগৃহগুলির প্রায় তিনশতটি অনুপম চিত্রে ও ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ। এখানে

মধ্য-এশিয়া

সর্বসমেত এক হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্থান ও কিরঘিজিয়াতেও বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব 217 অব্দে কতিপয় বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক চীনদেশে গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তবে আনুমানিক 75 খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সময় চীন-সম্রাট মিং-তির আমন্ত্রণে ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের পথেও সম্ভবতঃ চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল। চীনদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। চীনদেশ হইতে মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও তংকিনে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

চীনদেশ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপসমূহেও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কার-সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোকের সময়েই ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। কথিত আছে, অশোক শোণ ও উত্তর নামে দুইজন ধর্মপ্রচারককে সুবর্ণভূমিতে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপসমূহে ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য, পরবর্তী কালেই এইসব দেশ ও দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের আমলে সুমাত্রা, মালয় ও যবদ্বীপে যে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বৌদ্ধ ধর্মের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল যবদ্বীপে অবস্থিত বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরটি। এই মন্দিরটির আয়তন প্রায় 400 বর্গফুট। ইহার আয়তন, গঠনভঙ্গি ও শিল্পকর্ম বিস্ময়কর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

এইরূপে সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক বিস্তারলাভ ভারতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রশ্নাবলী

1. What led to the rise of Jainism and Buddhism? [জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের কারণ কি?]

2. What do you know about the main teachings of Mahavir? Trace the importance of Jainism in Indian history. [মহাবীরের প্রধান ধর্মীয় উপদেশাবলী কি? ভারতীয় ইতিহাসে জৈন ধর্মের গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

3. What do you know about the main teachings of Gautama Buddha? Trace the importance of Buddhism in Indian history. [গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত সম্পর্কে কি জান? ভারতীয় ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

4. Trace the evolution of Buddhism and its advance into foreign lands. [বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন এবং বহির্জগতে ইহার বিস্তারলাভ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য যুগ

মগধের অভ্যুত্থান।—বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সমসময়ে উত্তর ভারতে যে সকল শক্তিশালী রাজ্য ছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মগধ। মগধ রাজ্যটি বিহারের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ছিল। পার্শ্ববর্তী কাশী ও কোশল রাজ্য দুইটিও খুবই শক্তিশালী ছিল। পরে কাশী কোশলের পদানত হইলে কোশল আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। মগধরাজগণের মধ্যে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু ঐ যুগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য অধিকার করেন এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ কাশীরাজ্যের কতকাংশ লাভ করেন। তাঁহার সময়ে মগধ বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। তিনি রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র কোশলরাজকে পরাজিত করিয়া সমগ্র কাশীরাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার আমলে বৃজি গণরাজ্যের সহিত মগধের যুদ্ধ বাধে এবং অজাতশত্রু বৃজি গণরাজ্য অধিকার করেন। অজাতশত্রুর বংশধর উদয়ীভদ্র পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর শেষ বংশধরকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার মন্ত্রী শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ-বংশীয় শেষ রাজা কাকবর্ণীকে হত্যা করিয়া মহাপদ্ম নন্দ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। মহাপদ্ম নন্দ অতীব শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানও তিনি অধিকার করেন। মহাপদ্ম নন্দের আমলেই মগধ ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজ্য-রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। মহাপদ্ম নন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার আট পুত্র পর পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষ নন্দরাজ ধন নন্দের সময়েই গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করায় নন্দরাজের সহিত কোনও সংঘর্ষ হয় নাই। ধন নন্দকে পরাজিত করিয়াই মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ 324)।

বিম্বিসার ও অজাতশত্রু

নন্দবংশ

মৌর্য সাম্রাজ্য ঃ চন্দ্রগুপ্ত।—নন্দরাজগণ অত্যাচার ও কুশাসনের জন্য জনপ্রিয়তা হারাইয়াছিলেন। নন্দবংশের শেষ রাজা ধন নন্দকে পরাজিত করিয়া মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। অনেকে বলেন, তাঁহার মাতা মুরার নাম অনুসারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও রাজবংশের নাম মৌর্য হইয়াছিল। তবে সম্ভবতঃ এই মত ভ্রমাত্মক। অন্যান্য প্রমাণ অনুসারে জানা যায়, তিনি পিপ্পলিবন

গণরাজ্যের 'মোরীয়' নামক ক্ষত্রিয়কুলের সন্তান ছিলেন। এই 'মোরীয়' নাম হইতেই মৌর্য নামের উৎপত্তি। বাল্যকালে চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ সহায়হীন ও সম্পদ্‌হীন অবস্থায় প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নাতেই সৈন্যবল সংগ্রহ করেন এবং তক্ষশিলাবাসী বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে মগধরাজ ধন নন্দকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ 324)। সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার পদানত হয় এবং তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ ভারতের সুবিস্তৃত অঞ্চল তিনি অধিকার করেন। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এশিয়ার গ্রীক-বিজিত অঞ্চলসমূহ সেনাপতি সেলুকাস লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের গ্রীক-বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিলে সেলুকাসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে সেলুকাস পরাজিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, হীরাট, কান্দাহার ও বেলুচিস্থান ছাড়িয়া দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে অবশ্য 500 হস্তী উপহার দেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহগত সম্পর্কও স্থাপিত হয়। সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীক দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহার অনেকাংশ বিলুপ্ত হইলেও, তাহা হইতে তৎকালীন ভারত সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়। চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাসের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর গ্রীকগণের সহিত ভারতের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং ঐ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ 300 অব্দে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু ঘটে।

সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন

মহারাজ অশোক।—চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার রাজা হন। তিনি প্রায় 27 বৎসর (আঃ খ্রীঃ পূঃ 300—273) রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার পিতার সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক রাজা হন। অশোক পিতার জীবদ্দশায় তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুসীমকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং এজন্য কিছুদিন গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর চারি বৎসর বাদে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের সুবিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিলেও, কলিঙ্গ নামে পরিচিত গোদাবরী ও মহানদী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল তখনও স্বাধীন ছিল। অশোক তাঁহার রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর বাদে কলিঙ্গ অধিকারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করিলেও যুদ্ধের নৃশংসতা ও বীভৎসতা অশোকের মনে বিরাট পরিবর্তন ঘটাইল। তিনি উপগুপ্ত নামে

সিংহাসনলাভ

কলিঙ্গ যুদ্ধ

এক সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং যুদ্ধ ও হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া শান্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর পথেই মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইলেন। কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর স্বেচ্ছায় এইরূপ পথ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। অশোক তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসননীতি ও বৈদেশিক নীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। অশোক বুদ্ধের বাণীকেই তাঁহার রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ

মহারাজ অশোক

বুদ্ধ ও অশোকের মধ্যে প্রায় তিনশত বৎসরের ব্যবধান ছিল। তাই এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বৌদ্ধদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখা দিয়াছিল। তাই তিনি পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও রাজগুরু মৌদ্গল্যপুত্র তিষ্যের নেতৃত্বে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গতি-সাধন করিলেন।

তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি

জনসাধারণ যাহাতে বৌদ্ধ ধর্মের মূল বাণীগুলির সহিত পরিচিত হইয়া নৈতিক ও মানসিক দিক হইতে উন্নত হইতে পারে, সেজন্য তিনি বহু গিরিগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে নানাপ্রকার বাণী ও উপদেশ উৎকীর্ণ করিয়া দিলেন। এইগুলি "ধর্মলিপি" নামে

পরিচিত। ঐ সকল লিপিতে পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে তিনি নির্দেশ দেন। দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিনয়ী হইতে, জৈন ও শ্রমণদের ভক্তি করিতে, সদা সত্যকথা বলিতে, ইন্দ্রিয় দমন করিতে, জীবজন্তুর প্রতি সদয় হইতেও তিনি উপদেশ দেন। তিনি তাঁহার অন্যতম স্তম্ভলিপিতে বলেন, "ন্যূনতম অসৎকর্ম, প্রচুরতম সৎকর্ম, দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্যবাদিতা ও শুচিতা"-ই হইল ধর্মের মূলকথা। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন, শাসনকাল ও সমসাময়িক সমাজ সংক্রান্ত নানা তথ্যও এই সকল লিপি হইতে জানা গিয়াছে।

ধর্মলিপি
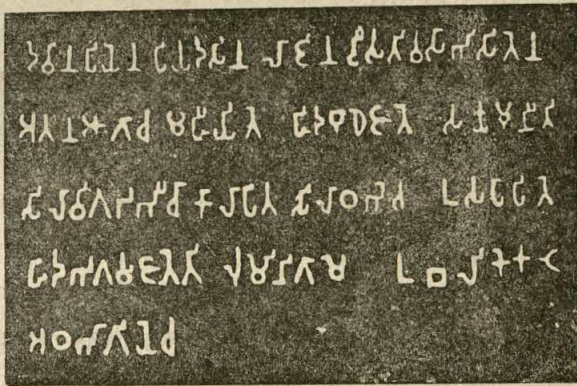
অশোকের শিলালিপি

অশোকের পূর্বে নৃপতিগণ মৃগয়ায় বা প্রমোদভ্রমণে বাহির হইতেন। অশোক তাহা বন্ধ করিয়া ধর্মপ্রচারের জন্য রাজ্যময় ভ্রমণ করিতে থাকেন। উহা "ধর্মযাত্রা" নামে পরিচিত। ধর্মযাত্রাকালে তিনি সাধারণ মানুষের সহিত আলাপ করিতেন এবং ধর্মের মূলকথা বুঝাইয়া বলিতেন।

ধর্মযাত্রা

পররাষ্ট্রনীতিতেও অশোক আমূল পরিবর্তন ঘটাইলেন। তিনি সকল রাজ্যের সহিত মৈত্রীর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেই সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেশে শান্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রেরণ করিয়া দূত পাঠাইলেন। তিনি দূর দক্ষিণ ভারতের কেরল, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলিতে, মিশর, মাসিডন, এপিরাস, সিরিয়া প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যগুলিতে এবং সিংহলে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিলেন। তিনি ইহার নাম দিলেন "ধর্মবিজয়"।

ধর্মবিজয়

অশোকের রাজত্বকালেই মৌর্য সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে বাসকারী অসংখ্য মানুষের যাহাতে মঙ্গলসাধন করা যায়,

সেদিকে অশোকের প্রখর দৃষ্টি ছিল। রাজকর্মচারীরা যাহাতে প্রজাদের উপর অবিচার বা উৎপীড়ন না করে, সে-বিষয়ে তিনি লক্ষ্য দেন। রাজুক, যুত, মহামাত্র, প্রাদেশিক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজ্যময় ঘুরিয়া শাসনকার্যের ত্রুটি ও অব্যবস্থা দূর করিতেন। অশোক অহিংস নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দণ্ডের কঠোরতাও অত্যন্ত হ্রাস করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র প্রজাদিগকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজ্যের সর্বত্র চিকিৎসালয় ও আরোগ্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল। রাজ্যের সর্বত্র কূপ খনন, পথঘাট ও সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পথের দুই দিকে ছায়া ও ফল দানের উপযোগী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। কেবল মানুষ নহে, অন্যান্য জীবজন্তুর দুঃখ দূর করিবার জন্যও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অশোক প্রায় 37 বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ 232 অব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শাসন-ব্যবস্থা

ইতিহাসে অশোকের স্থান।—পৃথিবীর ইতিহাসে অশোক একটি অনন্য-সাধারণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইংরেজ ইতিহাসকার এইচ্. জি. ওয়েল্স্ যে তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যুক্তি নহে। আজিকার এই যুগে যখন জগতে শান্তিরক্ষা সর্বাধিক প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়াছে, তখন অশোকের এই অসাধারণত্ব আরও সুস্পষ্টরূপে লোকচক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছে। কারণ, অশোকই সর্বপ্রথম দেশে দেশে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ-কলহ, যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধনের কথা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ ও হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অহিংসা ও শান্তির পূজারী ভারত-রাষ্ট্র তাই অশোকের দৃষ্টান্তে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং অশোক-চক্রকেই রাষ্ট্র-প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। সম্রাট অশোক উত্তরাধিকার-সূত্রে এক সুবিশাল সৈন্যবাহিনী ও সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি সহজেই দরায়ুস, জেরেকসেস, আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, এটিলা, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ বা নেপোলিয়নের মতো বিশ্বব্যাপী সমরাভিযান চালাইতে পারিতেন। কিন্তু অশোক সে পথে অগ্রসর না হইয়া অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর পথে বিশ্বব্যাপী এক প্রীতির সাম্রাজ্য গঠনে বহির্গত হইয়াছিলেন। ফলে এশিয়ায় ভারতের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই সত্য, কিন্তু সমগ্র এশিয়ায় ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং ভারতকে এশিয়ার তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে মনোনিবেশ

সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি

শান্তি ও মৈত্রীর নীতি

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে অন্য কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন নাই। অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককেও অকৃপণ হস্তে সাহায্য দান করিতেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্রাটগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মপ্রচারের জন্য যে অনুদার ও সংকীর্ণ, অনেকক্ষেত্রে নৃশংস ও হৃদয়হীন, মনোভাব দেখাইতেন, অশোকের সুমহান্ চরিত্রকে তাহা কখনও স্পর্শ করে নাই। মানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। তিনি বলিতেন, "সকল মানুষই আমার সন্তান।" আধুনিক পরিভাষায় যাহাকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare State) বলা হয়, অশোক সেই সুপ্রাচীন কালে অসীম দক্ষতা ও শক্তির সহিত তাহাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোক সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেন নাই এবং সামরিক শক্তির প্রতি অবহেলা করিয়াছিলেন, তাই অশোকের মৃত্যুর অল্পকালমধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু অশোক সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিলেও প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাহা একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িতই। আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, চেঙ্গিস খাঁ, নেপোলিয়ন যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলি সমস্তই আজ বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অশোক অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর মন্ত্র লইয়া যে ধর্মবিজয়ে অভিযান শুরু করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সমগ্র এশিয়ায় ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ধর্মীয় রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র

এশিয়ায় ভারতের স্থায়ী প্রভাব

মৌর্য যুগে শাসন-ব্যবস্থা।—মৌর্য যুগ সম্পর্কে বহু তথ্য গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ এবং 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' এবং সমসাময়িক অসংখ্য লিপি হইতে সংগ্রহ করা যায়।

মৌর্য সাম্রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত হইতে পুর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত করা হইত। সাধারণতঃ রাজকুমার ও রাজবংশীয় ব্যক্তিরাই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। প্রদেশগুলি জেলায় বিভক্ত থাকিত। জেলাগুলিকে 'আহার' বা 'বিষয়' বলা হইত। আহার ও বিষয়গুলি গ্রামে বিভক্ত থাকিত। আহার বা বিষয়ের শাসনভার 'স্থানিক' ও গ্রামের শাসনভার 'গ্রামিক' নামে রাজকর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত।

আঞ্চলিক বিভাগ

শাসন-বিষয়ে সম্রাটই ছিলেন সর্বময় কর্তা। তবে তিনি শাসন-বিষয়ে প্রায়ই মন্ত্রী ও অমাত্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তবে আইন-প্রবর্তন, বিচার, সমর ও শাসন, সকল বিষয়েই সম্রাটের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছিল। তবে এই সকল বিষয়ে সম্রাট প্রচলিত প্রথা, নিয়ম ও জনমতকে উপেক্ষা করিতেন না।

শক্তিশালী রাজতন্ত্র

কিন্তু এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার কাহারও একার পক্ষে পরিচালন সম্ভব ছিল না। তাই বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব এক-একজন 'অধ্যক্ষের' উপর ন্যস্ত থাকিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপ 28 জন অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিস-ও অধ্যক্ষদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, রাজুক, মহামাত্র, যুত প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। গুপ্তচরের সাহায্যে রাজ্যের সকল স্থান হইতে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্রাটকে জানাইবার জন্য প্রতিবেদক নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী থাকিতেন।

রাজকর্মচারী

সম্রাটের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীর ভার ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সংস্থার উপর ছিল। পাঁচজন করিয়া সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতি গঠিত হইত এবং সেগুলির উপর পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও নৌ বাহিনী এবং রসদ ও যানবাহনের ভার থাকিত। অশোকের সময় সৈন্যবাহিনীর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছিল।

সামরিক ব্যবস্থা

আইন-প্রণয়ন ও বিচার-বিভাগের শীর্ষে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তাঁহার আদেশই ছিল আইন। নগরে মহামাত্রগণ এবং গ্রামাঞ্চলে রাজুকগণের উপর বিচারের ভার ছিল। গ্রামিকগণ গ্রামবৃদ্ধদের সাহায্যে মামলার বিচার করিতেন। বিচারকার্যে যাহাতে অন্যায় বা স্বেচ্ছাচার না ঘটে, সে বিষয়ে সম্রাটের কঠোর দৃষ্টি ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্তের আমলে অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর ছিল। কেহ অপরের অঙ্গচ্ছেদ করিলে অপরাধীর সেই অঙ্গ এবং তৎসহ একটি হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। শুল্ক বা বিক্রয়কর সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দিলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। কেহ শ্রমিকের হস্ত বা চক্ষু নষ্ট করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইত। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হইত। শাস্তির কঠোরতার জন্য দেশে অনুষ্ঠিত অপরাধের সংখ্যা কম ছিল। অশোক তাঁহার অহিংস নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করিয়াছিলেন।

বিচার-ব্যবস্থা

রাজস্ব সাধারণতঃ 'বলি' ও 'ভাগ'—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জমির ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজার অংশরূপে গৃহীত হইত। উহা ভাগ নামে পরিচিত ছিল। 'ভাগ' অনেক সময় বৃদ্ধি করিয়া ফসলের এক-চতুর্থাংশ এবং হ্রাস করিয়া এক-অষ্টমাংশ করা হইত। 'ভাগ' ছাড়াও 'বলি' নামে একপ্রকার রাজস্ব গৃহীত হইত। গ্রীক লেখকদের মতে, সমগ্র সাম্রাজ্যের ভূমির মালিক ছিলেন রাজা; তাই 'ভাগ' ছাড়াও কৃষকগণকে 'বলি' নামে একটি রাজকর দিতে হইত। 'অগ্রনমই' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী ভূমির পরিমাপ ও সেচ-ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার উপরই কর-সংগ্রহের ভার থাকিত। অর্থশাস্ত্রে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত 'সমাহর্তৃ' ও 'সন্নিধাতৃ' নামে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উল্লেখ আছে।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

মৌর্য যুগে পৌর শাসন-ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। সাম্রাজ্যে বহু শহর ছিল। তবে রাজধানী পাটলিপুত্রই ছিল সাম্রাজ্যের বৃহত্তম শহর। উহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে নয় মাইল ও প্রস্থে পৌনে দুই মাইল ছিল। উহার চতুর্দিকে প্রশস্ত পরিখা ও প্রাচীর ছিল। প্রাচীরে 64টি তোরণ ও 570টি শিখর ছিল। রাজধানীর পৌর-ব্যবস্থা ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত ছিল। রাজধানীর শাসনকর্তা 'নগরাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত হইতেন। কৌশাম্বী, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতির মতো বড় শহরগুলির শাসনভার 'নগরক' নামে এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল।

পৌর-ব্যবস্থা

মৌর্য যুগে সমাজ-ব্যবস্থা।—মৌর্য যুগের সমাজ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়া মেগাস্থিনিস জনসাধারণের মধ্যে সাতটি শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন—(1) দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ), (2) কৃষক, (3) শিকারী ও পশুপালক, (4) শ্রমশিল্পী ও বণিক, (5) সৈনিক, (6) গুপ্তচর, (7) অমাত্য। পেশার দিক হইতে এই শ্রেণী-বিভাগকে অনেকটা নির্ভুল মনে করা যায়। দেশে কৃষকের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। তাহারা সাম্রাজ্যের অপরিহার্য অংশরূপে গণ্য হইত এবং যুদ্ধাদি কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিল। পশুপালন ও শিকারও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা বলিয়া গণ্য হইত। তবে অশোক জীবহত্যা নিবারণ করায় শিকার জীবিকারূপে অবহেলিত হইত। শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সমাজে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যে সকল শ্রমশিল্পী কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিত, সরকার হইতে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হইত। মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে বলিয়াছেন যে, ঐ সময় ভারতে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল না। তাঁহার এই উক্তি সত্য নহে। অশোক তাঁহার লিপিতে ক্রীতদাস-দাসীদের প্রতি সদয়

বিভিন্ন বৃত্তি

ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তবে গ্রীসদেশের মতো প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস-প্রথার তেমন ব্যাপকতা ছিল না এবং ক্রীতদাসদের প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করা হইত যে, ক্রীতদাস-প্রথার অস্তিত্ব সহজে চোখে পড়িত না। তাই সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

মৌর্য যুগে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্ম পাশাপাশি অবস্থিত ছিল এবং পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে হিন্দু সমাজে যাগযজ্ঞ, বলিদান, বর্ণভেদের কঠোরতা প্রভৃতি বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা, দেবমন্দির-নির্মাণ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, শিব, কার্তিক (স্কন্দ) প্রভৃতির মূর্তি প্রচুর পরিমাণে নির্মিত ও ক্রয়-বিক্রয় হইত। হিন্দু সমাজে প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রমের বিধিনিষেধ পালিত হইত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম ছাড়াও অজীবিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মমতও সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ধর্ম

মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে ভারতীয়দের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বরহীন ছিল। তাহারা যজ্ঞকালে ভিন্ন সুরা পান করিত না, মিথ্যা কথা বলিত না, চুরি-ডাকাতি করিত না। এই উক্তি কিছু পরিমাণে অতিরঞ্জিত হইলেও অনেকাংশে সত্য ছিল। ভারতীয় কৃষকগণ শ্রমসহিষ্ণু, সংযমী ও মিতব্যয়ী ছিল। ভারতবাসীরা অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। নাগরিকগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজপথে বাহির হইত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ছত্রধারী অনুচর থাকিত।

চরিত্র

অশোকের লিপি হইতে জানা যায়, জনসাধারণের মধ্যে 'সমাজ' নামে উৎসব প্রচলিত ছিল। সমাজগুলিতে ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এইসব উৎসবে নৃত্যগীত একটি প্রধান স্থান অধিকার করিত। কোন কোন সমাজে মানুষ ও জীবজন্তুর লড়াইয়ের ব্যবস্থাও থাকিত এবং তাহা দর্শকদের আনন্দ দিত। সেই কারণেই সম্ভবতঃ অশোক কয়েক প্রকার 'সমাজ' নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময় দেশে নাট্যাভিনয়ও প্রচলিত ছিল। অভিনেতারা 'শৌভিক' ও 'শৌভনিক' নামে পরিচিত ছিলেন। নানাপ্রকার খেলাধূলাও জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল। রথদৌড়, হাতীর লড়াই, পাশা খেলা, দাবা খেলা প্রভৃতি খেলাধূলা প্রচলিত ছিল।

উৎসব ও প্রমোদ

দেশে শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। কোনও কোনও গ্রীক লেখক বলিয়াছেন, ভারতীয় জনসাধারণ অক্ষরের ব্যবহার জানিত না। এই উক্তি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক।

জনসাধারণ যদি লিখিতে বা পড়িতে না পারিত, তবে জনসাধারণের প্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক অসংখ্য স্তম্ভলিপি ও শিলালিপির ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন?

শিক্ষা

মৌর্য যুগে শিল্পকলা।—মৌর্য যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ঐ সময়ে গৃহাদি প্রায়ই কাষ্ঠ-নির্মিত হইত, তাই সেগুলির উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ এখন আর নাই। কিন্তু মেগাস্থিনিস, স্ট্রাবো, আরিয়ান প্রভৃতি বৈদেশিক লেখকগণ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে ঐ যুগের স্থাপত্যের উন্নতির কথা সহজেই অনুমান করা যায়। পাটনার নিকটবর্তী কুমরাহরে যে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাকে অনেকে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদেরই ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করেন। ঐ ধ্বংসাবশেষ হইতে জানা যায়, ঐ প্রাসাদে সুউচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ-শ্রেণী ছিল এবং মেঝেগুলি কাঠ দিয়া নিমিত ছিল। অনেকে এই স্তম্ভময় মৌর্য প্রাসাদের সহিত প্রাচীন পারস্যের রাজধানী পার্সেপলিসের বিখ্যাত শতস্তম্ভ প্রাসাদের তুলনা করিয়াছেন। অশোকের সময়ে গৃহনির্মাণে প্রস্তরের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অশোকের প্রাসাদটি প্রস্তর-নির্মিত ছিল। প্রায় ছয় শত বৎসর পরেও চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ঐ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, ইহা মনুষ্য-নির্মিত নহে, ইহা দানবের সৃষ্টি। পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী প্রভৃতির মতো বৃহৎ শহরগুলি যে অসংখ্য রম্য ভবনে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্থাপত্য

মৌর্য যুগে নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী গৃহাদি কাষ্ঠ দিয়া নির্মাণ করা হইলেও দেশের অভ্যন্তরে ইষ্টক-নির্মিত গৃহের অভাব ছিল না। মৌর্য যুগে পর্বতে পর্বতে বহু গুহাগৃহও নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে বরাবর ও নাগার্জুন পর্বতে অশোক-নির্মিত গুহাগৃহগুলির উল্লেখ করা চলে। অশোক অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, চৈত্য ও স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেগুলিও মৌর্য যুগের স্থাপত্যের বিস্ময়কর উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে। অশোক কাশ্মীরের শ্রীনগর এবং নেপালের দেবপত্তন শহরও নির্মাণ করেন। অশোক যে ঐ সকল শহর নির্মাণ করিয়াছিলেন, উন্নত স্থাপত্যশিল্পের ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।
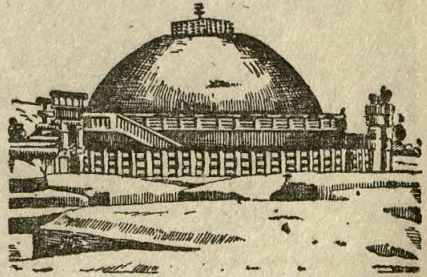
সাঁচী স্তূপ

অশোক-স্তম্ভগুলি ঐ যুগের নির্মাণশিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন। স্তম্ভগুলি এক-একটি
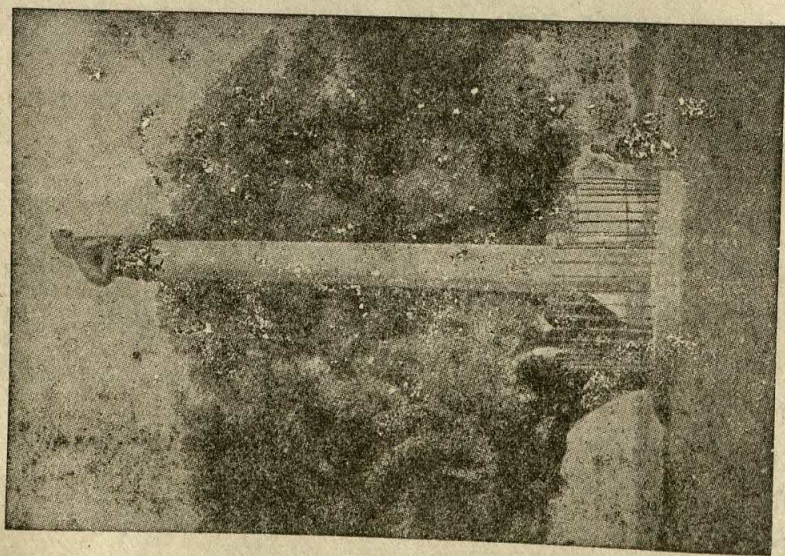
লৌরিয়া নন্দনগড়ের অশোক-স্তম্ভ
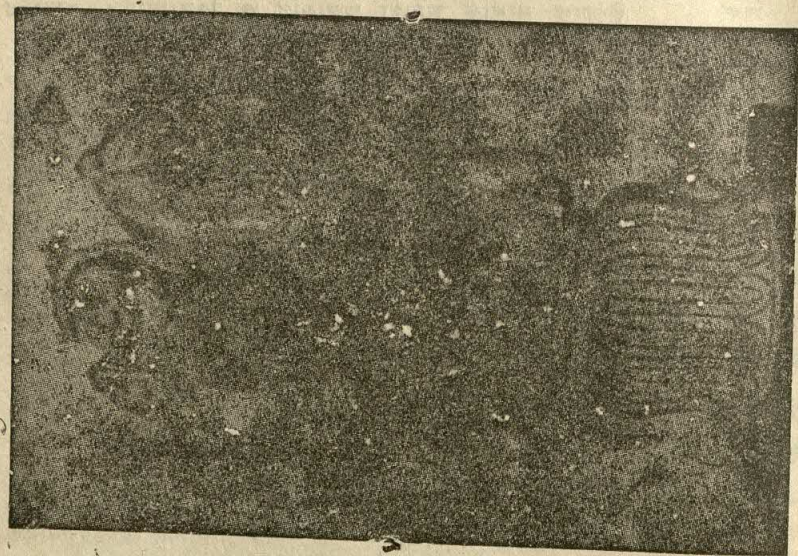
সারনাথের অশোক-স্তম্ভের চূড়া

অখণ্ড প্রস্তর দিয়া নির্মিত। ঐগুলির মসৃণতা এমন বিস্ময়কর ছিল যে, আধুনিক কালেও অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ঐগুলিকে প্রস্তর-নির্মিত বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে ঐরূপ বিশাল স্তম্ভগুলি যে কিভাবে নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করা হইত, তাহা আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। লৌরিয়া নন্দনগড়, এলাহাবাদ, সারনাথ, রুম্মিনদেই প্রভৃতি বহু স্থানে অশোক-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির উচ্চতা প্রায় 20 ফুট এবং ওজন প্রায় 50 টন। স্তম্ভ-শীর্ষে নির্মিত জীবজন্তুর মূর্তি এবং স্তম্ভগাত্রে অতুলনীয় অসংখ্য অলঙ্করণ ঐ যুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মৌর্য যুগে দেব-দেবীর সুন্দর মূর্তিও যে নির্মিত হইত, তাহা সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক দেশীয় ও বিদেশীয় বহু লেখকের রচনা হইতে জানা যায়।

ভাস্কর্য

মৌর্য যুগের শিল্পকলায় পারসীক ও গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the greatness of Asoka. [অশোকের অসাধারণত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

2. Give an account of the Maurya administration. [মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ দাও।]

3. Give an account of the Indian society under the Mauryas. [মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজের বিবরণ দাও।]

4. What do you know about the Indian art and culture under the Mauryas? [মৌর্য যুগে ভারতের কলাশিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে পারসীক ও গ্রীক প্রভাব-বিস্তার

ভারতে পারসীক অভিযান।—উত্তর ভারতে মগধ যখন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইতেছিল, তখন ভারতবর্ষের পশ্চিমে পারস্য অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্য-সম্রাট সাইরাস (খ্রীঃ পূঃ 558—30) এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্বদিকে ভারতের সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ভারতীয় সীমান্তে যুদ্ধকালে ভারতীয় সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে তিনি আহত হইয়াছিলেন এবং এই আঘাতের ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

পরবর্তী পরাক্রান্ত পারস্য-সম্রাট দরায়ুস (খ্রীঃ পূঃ 522—486) উত্তর-পশ্চিম ভারতের গঙ্গার ও সিন্ধু-তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা হইতে জানা যায়, গান্ধার অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের সপ্তম এবং সিন্ধু-তীরবর্তী অঞ্চল বিংশ প্রদেশ ছিল। সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নাকি এই দুই প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। পারসীক সৈন্যবাহিনীতে বহু ভারতীয় চাকুরি করিত, তাহারা পারস্যের বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করিত। দরায়ুসের পরবর্তী পরাক্রান্ত সম্রাট জেরেকসেসের আমল পর্যন্ত ভারতীয় অঞ্চলগুলি সম্ভবতঃ পারস্যের অধীন ছিল। গ্রীসদেশের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সুযোগে ভারতীয় ঐ অঞ্চলগুলি স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল।

সাইরাস, দরায়ুস ও জেরেকসেস

পারস্য ভারতের একাংশ অধিকার করায়, ভারতের সহিত তাহার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অবশ্য, পারস্য ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং পারস্যের সহিত ভারতের যোগাযোগ অতিশয় প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। পারস্য রাজ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা আঞ্চলিক সামন্তরাজগণ সত্রপ (Satrap) নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী কালে পারসীক প্রভাবে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও নৃপতিগণ নিজেদিগকে ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ আখ্যায় ভূষিত করিতেন। সাংস্কৃতিক দিক হইতেও ভারতে পারসীক প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্বেই চন্দ্রগুপ্তের রাজ-প্রাসাদের গঠন-কৌশলের উপর পারসীক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পারসীক সাম্রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় তাহা ঐ অঞ্চলে ভারতীয় বাণিজ্য-বিস্তারেও সহায়তা করিয়াছিল।

ভারতে পারসীক প্রভাব

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।—পারস্য সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, সেই সুযোগে মাসিডনের নেতৃত্বে গ্রীসদেশ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মাসিডনের রাজা ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাঁহার তরুণ পুত্র আলেকজাণ্ডার মাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন (খ্রীঃ পূঃ 336)। আলেকজাণ্ডার রাজা হইবার অল্পদিন বাদেই পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দরায়ুসকে দুইটি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পারস্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিলেন এবং দক্ষিণে মিশর হইতে উত্তরে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত এক সুবিশাল অঞ্চল গ্রীক অধিকারভুক্ত হইল। ঐ সময় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত ছিল। আলেকজাণ্ডার খ্রীঃ পূঃ 326 অব্দে হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া ভারত আক্রমণ করিলেন। ঐ অঞ্চলের রাজারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ

হইলেন না। অনেকে সহজেই বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আলেকজাণ্ডারের বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় বিতস্তা বা ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইল। ঝিলাম নদীর পূর্বতীরে ঐ সময় একটি শক্তিশালী দেশীয় রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের রাজা পুরু বীর বিক্রমে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিলেন। আলেকজাণ্ডার শেষ পর্যন্ত জয়ী হইলেও, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার দুঃসাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বন্দী পুরুকে মুক্তি দেন এবং তাঁহার হস্তেই গ্রীক-বিজিত ভারতীয় অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করেন। আলেকজাণ্ডার চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী (চেনাব ও রাবী) নদী পর্যন্ত পূর্বদিকে অগ্রসর হন। ঐ অঞ্চলের সকল ক্ষুদ্র রাজ্যই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সিন্ধু অঞ্চল পার হইয়া বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া বেবিলনে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে জ্বররোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় (খ্রীঃ পূঃ 325)। এইভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল গ্রীক অধিকারভুক্ত হয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল।—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল শুভ না হইলেও পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে বুকিফালা, নিকাইয়া ও আলেকজান্দ্রিয়া নামে তিনটি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শহরগুলি গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হইবে এবং এগুলি হইতে ভারতবর্ষে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিবে, তিনি এইরূপ সংকল্প ও আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলেও, তিনি ভারতের পশ্চিম দিকে যে বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসের সহিত ভারতীয় ইতিহাস ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত হইয়াছিল এবং ভারতে গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তারে বিশেষরূপে সহায়ক হইয়াছিল।

মৌর্য আমলে গ্রীক-ভারতীয় সম্পর্ক।—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। যুদ্ধশেষে তাঁহার তিনজন সেনাপতি—সেলুকাস, টলেমি ও এন্টিগোনস—আলেকজাণ্ডারের সুবিশাল সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। আলেকজাণ্ডারের মিশরীয় অংশ টলেমি, ইউরোপীয় অংশ এন্টিগোনস এবং এশীয় অংশ সেলুকাসের অধীন হয়। সিরিয়াতেই সেলুকাস তাঁহার শাসন-কেন্দ্র গড়িয়া তোলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ভারতের গ্রীক-বিজিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করিলে, সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন

এবং তাঁহার নিজ সাম্রাজ্যের এক সুবিস্তৃত অঞ্চল—কাবুল, কান্দাহার, হীরাট ও বেলুচিস্থান—চন্দ্রগুপ্তকে ছাড়িয়া দেন। এই সন্ধি যাহাতে স্থায়ী শান্তিতে পরিণত হয়, সেজন্য চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে 500 হস্তী উপহার দেন এবং সেলুকাসের সহিত বিবাহগত বন্ধনে আবদ্ধ হন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে একজন দূত প্রেরণ করেন। গ্রীকগণের সহিত ভারতীয়গণের প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র রাজা বিন্দুসার সেলুকাসের পুত্র প্রথম অ্যান্টিওকাস এবং মিশরের গ্রীক রাজা টলেমির সভায় দূত প্রেরণ করেন। ঐ সময় গ্রীকগণের সহায়তায় ও মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিন্দুসারের পুত্র রাজা অশোকের কালেও গ্রীকগণের সহিত এই প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। তিনি সিরিয়া, মিশর, এপিরাস, সাইরিনি প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যগুলিতে ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করেন।

মৌর্যোত্তর যুগে গ্রীক-ভারতীয় সম্পর্ক।—অশোকের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং দক্ষিণ ভারত মগধের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হইল। মগধ সাম্রাজ্যের আয়তন অনেক পরিমাণেই হ্রাস পাইল। অশোকের শেষ বংশধর রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা নদী ও পশ্চিমে জালন্ধর ও শিয়ালকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মগধে শুঙ্গবংশ

এই সময়ে এশীয় গ্রীক সাম্রাজ্যেও গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। অশোকের সময়ে সেলুকাসের পৌত্র দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস সিরিয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। সিরীয়-গ্রীক সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে পার্থিয়া এবং তাহার পূর্বদিকে বাকৃট্রিয়া বা বাহ্লীক রাজ্য (বল্‌খ্‌) অবস্থিত ছিল। সিরিয়ায় সেলুকাস-বংশীয়দের দুর্বলতার সুযোগে পার্থিয়া ও বাকৃট্রিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। সিরিয়ার গ্রীক রাজা দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাসের পৌত্র তৃতীয় অ্যান্টিওকাস পুনরায় ঐ সকল অঞ্চল অধিকার করিতে চেষ্টা করিলে পার্থিয়া তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু বাকৃট্রিয়ার স্বাধীন গ্রীক রাজা ইউথিডেমস তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তৃতীয় অ্যান্টিওকাস দুই বৎসর বল্‌খ্‌ অবরোধ করিয়া রাখিবার পরও ব্যর্থ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন এবং ইউথিডেমসের পুত্র ডিমিট্রিয়সের সহিত নিজকন্যার বিবাহ দিলেন। বল্‌খ্‌ হইতে ফিরিবার পথে তৃতীয় অ্যান্টিওকাস হিন্দুকুশ পার হইয়া সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং গান্ধার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের

সিরীয় ও বাহ্লীক গ্রীকগণ

ভারতীয় রাজা সুভাগসেনের নিকট হইতে 500 হস্তী আদায় করিয়া সিরিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। এইভাবে ভারতবর্ষ সিরীয়-গ্রীকগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু আক্রমণ আসিল বাহ্লীক গ্রীকগণের নিকট হইতে।

ইউথিডেমসের পুত্র ডিমিট্রিয়স আফগানিস্থানের কতকাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করিয়া লইলেন। ডিমিট্রিয়স যখন ভারতীয় অংশে তাঁহার নূতন রাজ্য-স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে বাক্‌ট্রিয়ার ইউক্রাটাইডিস নামে তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী বাহ্লীক গ্রীক রাজ্য অধিকার করিয়া লইল। ফলে ডিমিট্রিয়সকে এখন তাঁহার নব-বিজিত ভারতীয় রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট রহিতে হইল। তিনি শাকলে (শিয়ালকোটে) তাঁহার নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। অনেকের মতে, ডিমিট্রিয়সের বিজয়বাহিনীই মগধরাজ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের আমলে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মগধের যুবরাজ অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ডিমিট্রিয়সের রাজত্বকালেই তাঁহার মুদ্রায় গ্রীক ও ভারতীয় ভাষা একই সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ডিমিট্রিয়স

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাসমূহ হইতে বহু বাহ্লীক গ্রীক রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। বাহ্লীক গ্রীক রাজাদের মধ্যে সম্ভবতঃ মিনন্দর-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পূর্বে বুন্দেলখণ্ড হইতে পশ্চিমে কাবুল পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাই ঐ সকল অঞ্চল তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে, ডিমিট্রিয়স নহে, মিনন্দর-ই মগধরাজ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের শাসনকালে ভারতের অভ্যন্তরে অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক নাগসেন-রচিত যে 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' (মিলিন্দ-প্রশ্ন) নামে পালি গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাতে নাগসেন মিলিন্দ নামে জনৈক গ্রীক রাজার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর-রূপে বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকের মতে, বাহ্লীক গ্রীক রাজা মিনন্দর-ই উক্ত মিলিন্দ। তাহা সত্য হইলে, মিনন্দর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা চলে।

মিনন্দর

মিনন্দরের পর ভারতে আর কোনও শক্তিশালী গ্রীক রাজার উদয় হয় নাই। গ্রীকগণ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া, শক, পহ্লব ও কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলির আগমনের ফলে ভারতে গ্রীক প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রীক প্রভাব।—উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও তাহা যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার

করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহ্লীক গ্রীকগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাচীন গ্রীক জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষও প্রাচীন গ্রীসদেশের মতোই একটি উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। যে সকল বাহ্লীক গ্রীক ভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মূল গ্রীক জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিনন্দর সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুঙ্গরাজবংশের রাজত্বকালে তক্ষশিলার গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়াল্‌কিডাস তাঁহার দূতরূপে হেলিওডোরাস নামক এক গ্রীককে বিদিশার রাজসভায় পাঠাইয়াছিলেন। হেলিওডোরাস বিদিশায় (বর্তমান বেসনগরে) ভগবান্ বাসুদেবের উদ্দেশে একটি গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, গ্রীকগণ কেবল বৌদ্ধ ধর্ম নহে, অনেকে হিন্দু ধর্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীক ও ভারতীয়গণের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে ভারতীয় পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম ও মূর্তি-রচনাশিল্প বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন রোমকগণ সকলেই বহু দেবদেবীর উপাসক ছিলেন এবং দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মাণে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। ফলে ভারতীয়গণও এ-বিষয়ে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করায় মূর্তিশিল্পে দ্রুত বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং বাহ্লীক গ্রীকগণের আগমনের ফলে ভারতীয় মূর্তিশিল্পে গ্রীক রীতির প্রভাব অনিবার্য ছিল। ফলে ভারতে গ্রীক ও ভারতীয় মূর্তিশিল্পের মিলনে ও সমন্বয়ে মূর্তি-রচনাশিল্পে এক অভিনব ধারা প্রবর্তিত হইল। গান্ধার ও মথুরা অঞ্চলে এই রীতিতে নির্মিত মূর্তিসমূহ সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। তাই এই শিল্পধারা "গান্ধার শিল্প" নামে পরিচিত হইয়াছে।

ধর্ম ও মূর্তিশিল্পে প্রভাব

ভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতেই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ সকল মুদ্রা শিল্প-সৌকর্যের দিক হইতে যথেষ্ট উন্নত ছিল না। কিন্তু বাহ্লীক গ্রীকগণের আগমনের ফলে গ্রীক ও রোমক প্রভাবে ভারতীয় মুদ্রাগুলির গঠন ও শিল্প-সৌকর্য খুবই উন্নত হইয়া উঠিল। ভারতীয় গ্রীক রাজগণ যে সকল মুদ্রা প্রচলন করেন, সেগুলিতে তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের পিতা ও পূর্বপুরুষগণের নাম এবং বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত থাকিত। উহা প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ণয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। পরবর্তী ভারতীয় মুদ্রা-সমূহেও গ্রীক ও রোমক প্রভাব সুস্পষ্ট।

মুদ্রা

গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, জোতির্বিদ্যা প্রভৃতিও যে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও

জ্যোতির্বিদ্যার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ-কথা অনেকেই অনুমান করিয়াছেন। গ্রীক মহাকাব্য ও নাটক ভারতীয় মহাকাব্য ও নাটক রচনায় অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভারতীয় নাটকের 'যবনিকা' শব্দটি যবন (গ্রীক) শব্দ হইতেই উদ্ভূত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। ক্রাইসোস্টোমের রচনা হইতে জানা যায়, গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডেসি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছিল মনে হয়।

সাহিত্য-দর্শন

গ্রীকগণ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করায় ভারতীয় রাজনীতিতে গ্রীক প্রভাবও ছিল অনিবার্য। স্ট্রাটেগো, মেরিডার্ক প্রভৃতি গ্রীক আখ্যাগুলি ভারতীয় রাজকর্মচারীদের ক্ষেত্রেও চালু হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসদেশের স্পার্টায় দ্বৈরাজ্য ব্যবস্থা—একই সঙ্গে দুই রাজার শাসন—প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় একজন প্রধান রাজা ও একজন সহকারী রাজা থাকিতেন এবং প্রধান রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার সহকারী রাজা অনেক সময় প্রধান রাজা হইতেন ও অপর কাহাকেও সহকারীরূপে গ্রহণ করিতেন। ভারতীয় রাজগণও অনেকক্ষেত্রে এই প্রথা অনুসরণ করিতে শুরু করেন। প্রথম অজেস ও অজিলিসিস, আজিলিসিস ও দ্বিতীয় অজেস, গণ্ডফার্নেস ও গ্যাড, চষ্টন ও রুদ্রদামন, দ্বিতীয় কণিষ্ক ও হুবিষ্ক প্রভৃতি রাজারা একই সঙ্গে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক প্রভাব

রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যোগাযোগ।—জল ও স্থল উভয় পথেই রোমের সহিত ভারতের সংযোগ ঘটিয়াছিল। অশোক যখন ভারতে তাঁহার রাজত্ব শুরু করিয়াছিলেন, তখন রোম তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ শুরু করিয়াছিল (খ্রীঃ পূঃ 264)। পর পর তিনটি দীর্ঘকালীন যুদ্ধে সমগ্র ভূমধ্যসাগর রোমান হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। সিরিয়ার সেলুকাস-বংশীয় গ্রীক রাজা তৃতীয় অ্যান্টিওকাস রোমক সেনাপতি লাসিয়াস সিপিও-র হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন (খ্রীঃ পূঃ 190)। মিশরও গ্রীসের পদানত হইয়াছিল। পহ্লবগণের হস্তে রোমক সেনাপতি ক্রোসাস পরাজিত হইলেও, রোম সাম্রাজ্য পহ্লব রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এইভাবে মৌর্যোত্তর যুগে যে সকল বৈদেশিক জাতি ভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের রাজ্যসীমার সহিত রোম সাম্রাজ্যের সীমা সংলগ্ন ছিল। ফলে, স্থলপথে ভারতের সহিত রোম সাম্রাজ্যের যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরীয় গ্রীক নাবিক হিপলাস মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করায় সোজা ভারত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সহজ হইয়াছিল এবং

স্থলপথ ও জলপথে যোগাযোগ

মিশর রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় ও ভূমধ্যসাগর রোমান হ্রদে পরিণত হওয়ায় জলপথেও ভারতের সহিত রোম সাম্রাজ্যের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল প্রধানতঃ বাণিজ্যিক। বাণিজ্য-সূত্রে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও স্বাভাবিক ছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত এবং পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে, কুষাণ আমলে ভারতীয় বাণিজ্যের সহিত চীন-রোম বাণিজ্যও এই পথে চলিত। রোম সাম্রাজ্যে ভারতীয় বিলাসদ্রব্যের চাহিদা অত্যধিক ছিল, তৎকালীন বহু বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। ভারতের সূক্ষ্মবস্ত্র, নানাবিধ প্রসাধন ও বিলাসদ্রব্য ও মসলা ভারতবর্ষ হইতে রোম সাম্রাজ্যে রপ্তানি হইত। রোমের সহিত বাণিজ্যে ভারতেরই লাভ হইত, ভারত কোটি কোটি রোমক মুদ্রা অর্জন করিত। বিখ্যাত রোমক লেখক প্লিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রোমকগণের সৌখিন জীবনযাত্রার ফলে কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ভারতে চলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষেও অসংখ্য রোমক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের এই ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অনেক ভারতীয় নৃপতি রোমক মুদ্রার অনুকরণে তাঁহাদের মুদ্রাগুলি নির্মাণ করিতেন। শকরাজ প্রথম কদফিসিসের মুদ্রাগুলিতে রোমক প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রভাব পরবর্তী কালে আরও বৃদ্ধি পায়। গুপ্ত যুগেও এই প্রভাব সুস্পষ্ট। রোমক মুদ্রা 'দিনার' হইতে ভারতীয় মুদ্রাও 'দিনার' নামে অভিহিত হইতে থাকে। কতখানি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক থাকিলে যে ইহা সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাণিজ্য সম্পর্ক

প্রাচীন গ্রীসদেশে যেমন বহু দেবদেবীর পূজা প্রচালত ছিল, রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যেও তেমনি বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। এই বহু দেবদেবীর পূজা এবং মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ-পদ্ধতি যে ভারতীয় পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা অনুমান করা চলে। রোমক রাজতন্ত্রের ধারণাও ভারতীয় রাজতন্ত্রের ধারণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল মনে হয়। রোমক সম্রাটগণ দেবতারূপে গণ্য হইতেন। সম্রাট অগাস্টাসের মূর্তি রোম সাম্রাজ্যের দেবমন্দিরেও প্রতিষ্ঠিত হইত। মৌর্য যুগে রাজারা নিজেদিগকে "দেবতার প্রিয়" (দেবানাম্ পিয়) বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু মৌর্যোত্তর যুগে রোমের সহিত যোগাযোগ ও সংস্পর্শের ফলেই সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজগণ নিজেদিগকে "দেবপুত্র" আখ্যায় ভূষিত করেন। পরে তাঁহারা ভগবানের অবতাররূপেও বর্ণিত হইতে

ধর্মীয় প্রভাব

রাজনৈতিক প্রভাব

থাকেন। কেবল তাহাই নহে, মৌর্যোত্তর যুগে পরলোকগত নৃপতিগণকে দেবতা বলিয়া গণ্য করা হইত। ঐ যুগে মৃত রাজাদের মূর্তি সংরক্ষণের জন্য 'দেবকুল' নামে পরিচিত বিশেষ মন্দির থাকিত। মথুরা-লিপিতে বর্ণিত হুবিষ্কের পিতামহের দেবকুলটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত রাজাদের মূর্তি-স্থাপনের জন্য বিশেষ মন্দিরও নির্মিত হইত।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জগতে ভারতীয় প্রভাব।—ভারতবর্ষ এক সমুন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। ফলে, ভারতের সহিত গ্রীক ও রোমক-গণের সংস্পর্শ যে গ্রীক ও রোমক জগৎকে প্রভাবিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি! অশোক মিশর, সাইরিনি, এপিরাস, সিরিয়া প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যগুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে গ্রীক রাজ্যগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। গ্রীক রাজগণ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র গ্রীক চিকিৎসা-শাস্ত্রকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল মনে হয়। গ্রীক ও রোমক শিল্পেও ভারতীয় শিল্পধারার প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারতীয় রীতিতে নির্মিত মূর্তির নিদর্শন গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম খ্রীষ্ট ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। খ্রীষ্টানগণ মঠ-নির্মাণ ও সংঘজীবন যাপনের আদর্শ ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের নিকট পাইয়াছিলেন, এমন অনুমান করিবার কারণ আছে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know about the Persian impact on India before the Christian Era? [খ্রীষ্টপূর্ব যুগে ভারতের সহিত পারসীকগণের সংঘাত ও সংস্পর্শের কাহিনী লিখ।]

2. What do you know about the Greek impact and influence on the ancient India? [প্রাচীন ভারতের সহিত গ্রীকগণের সংঘাত ও প্রাচীন ভারতের উপর গ্রীক প্রভাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

3. Trace the relationship between ancient India and the Roman Empire. [প্রাচীন ভারত ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর

অষ্টম অধ্যায়

যুগ-সন্ধি—মৌর্যোত্তর ভারত

মৌর্যোত্তর খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত।—অশোকের মৃত্যুর পর হইতে মগধে গুপ্ত রাজগণের অভ্যুদয়ের কাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ে ভারতে কোনও শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয় নাই এবং কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে ভারতে বহু ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র কুনাল পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্য এক পুত্র জলৌক কাশ্মীরে তথা উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে শুরু করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে কলিঙ্গে চেত-বংশীয় এবং মহারাষ্ট্রে অন্ধ্র-সাতবাহন-বংশীয় রাজগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদর্ভও স্বাধীন হইয়াছিল। এইভাবে মগধ রাজ্য আয়তনে অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর 45 বৎসর পরে অশোকের শেষ বংশধর বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ 187 অব্দ)। শুঙ্গগণের রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা নদী ও পশ্চিমে পাঞ্জাবের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও, ঐ সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাহ্লীকগণ তাঁহাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উত্তর ভারতের অভ্যন্তরেও হানা দিতেছিলেন। শুঙ্গবংশের শেষ রাজা দেবভূতিকে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ব মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ 75)। কাণ্ববংশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। দক্ষিণ ভারতে অশোকের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই (আঃ খ্রীঃ পূঃ 200) মহারাষ্ট্রে গোদাবরী নদীর তীরবর্তী প্রতিষ্ঠাননগরকে কেন্দ্র করিয়া সাতবাহনগণ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সাতবাহনগণের আক্রমণের ফলে মগধের কাণ্ববংশও লোপ পাইয়াছিল (আঃ খ্রীঃ পূঃ 30)। সাতবাহনগণের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইলেও তাহা কখনই শক্তিশালী সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

দেশীয় রাজ্যসমূহ

আঃ খ্রীঃ পূঃ 75 অব্দের পূর্বে দক্ষিণ ভারতে শক জাতি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। শকগণের সহিত সাতবাহনগণকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে হয়। সাতবাহন-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি (আঃ 106—130 খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার হস্তে ক্ষহরাট-বংশীয় বিখ্যাত শকরাজ নহপান পরাজিত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র, কোঙ্কণ, নর্মদার তীরবর্তী অঞ্চল, সুরাষ্ট্র, বিদর্ভ, মালব ও রাজপুতানার কতকাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

উজ্জয়িনীতে রুদ্রদামনের নেতৃত্বে শকগণের অভ্যুত্থানের ফলে সাতবাহনগণ দুর্বল হইয়া পড়েন।

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতে শুঙ্গ, সাতবাহন প্রভৃতি দেশীয় রাজবংশ রাজত্ব করিলেও, প্রধানতঃ ঐ যুগকে বৈদেশিক আক্রমণ ও আধিপত্যের যুগ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। এই যুগেই বাহ্লীক গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতে প্রবেশ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। এই যুগের বৈদেশিক আক্রমণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতকেই নিজ নিজ দেশরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ভারতীয় মহাজাতির সহিত অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ভাবধারা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করিলেও, তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাবধারা ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহির্জগতে তাহার বিস্তার-সাধনে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিলেন।

এই যুগে বৈদেশিক আক্রমণের বৈশিষ্ট্য

বাহ্লীক গ্রীকগণ।—আঃ খ্রীঃ পূঃ 206 অব্দে সিরীয়-গ্রীকরাজ সেলুকাসের বংশধর তৃতীয় অ্যান্টিওকাস হিন্দুকুশ পার হইয়া ভারতীয় সীমান্ত রাজ্য আক্রমণের দ্বারা পুনরায় ভারতে গ্রীক আক্রমণের সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা বাহ্লীক গ্রীকরাজ ডিমিট্রিয়স-ই ভারতে পুনরায় গ্রীক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পার্শ্ববর্তী সীমান্ত অঞ্চলে আরও প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীক রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল। এই সকল গ্রীক রাজবংশের মধ্যে বিবাদ-কলহ ক্রমাগত চলিতেছিল। এই রাজবংশগুলির মধ্যে ইউথিডেমসের (ডিমিট্রিয়সের পিতার) বংশ ও ডিমিট্রিয়সের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউক্রাটাইডিসের বংশই প্রধান। অনেকের মতে, রাজা মিনন্দর ও অ্যান্টিয়াল্‌কিডাস ইউক্রাটাইডিসের বংশে জন্মিয়াছিলেন। এই দুই পরিবারের ক্রমাগত কলহ ভারতীয় গ্রীক শাসনকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল এবং ভারতীয় গ্রীক রাজ্যগুলি পহ্লব ও শক আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ বাহ্লীক রাজগণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।)

শকগণ।—মধ্য-এশিয়ার সির-দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে শক জাতির লোকরা বাস করিত। ইউয়ে-চি জাতির লোকরা হিউং-নু (হূণ) জাতির দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং শকগণকে তাহাদের বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করে। শকগণ কাবুল নদীর উত্তর তীরবর্তী অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করে। পরে তাহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে

সকল শকরাজ রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে মৌয়েস, অজেস, অজিলিসিস ও দ্বিতীয় অজেসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক রাজগণের অধীনে প্রাদেশিক শাসক বা সামন্তগণ পারসীকদের অনুকরণে 'ক্ষত্রপ' নামে পরিচিত হইতেন। অনেক স্বাধীন রাজাও 'ক্ষত্রপ' বা 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিতেন। অনেক সময় প্রাদেশিক শাসকগণ গ্রীকদের অনুকরণে 'স্ট্রাটেগো' নামেও পরিচিত হইতেন। শকগণ পারসীক ও গ্রীক শাসন-ব্যবস্থাকে অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বৈরাজ্য ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। প্রথম অজেস ও অজিলিসিস, অজিলিসিস ও দ্বিতীয় অজেস সহ-রাজরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে শকগণ

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও শক রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শক রাজগণ ক্ষহরাট ও কার্দমক শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভৃগু-কচ্ছের ক্ষহরাট শাখার ক্ষত্রপগণ পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে কিছু অঞ্চল সাতবাহন-বংশীয় রাজগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ক্ষহরাট শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। তিনি এক শক্তিশালী শক রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি 119 হইতে 124 খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজত্ব করিতেন মনে হয়। তিনি সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

নহপান

মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক ক্ষত্রপগণ কার্দমক শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বংশীয় রাজা চষ্টন 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পৌত্র রুদ্রদামনের সহিত যুগ্মভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। চষ্টনের পর রুদ্রদামন রাজা হন। তিনি 130 হইতে 150 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। রুদ্রদামন সাতবাহনরাজকে দুইবার পরাজিত করিয়াছিলেন এবং সাতবাহন-রাজকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে তাঁহার রাজ্য যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রুদ্রদামনের পর তাঁহার বংশধরগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। তবে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত শকগণ উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতে থাকেন।

রুদ্রদামন

পহ্লবগণ।—পহ্লব বা পার্থিয়ার রাজা মিথ্রাডেটিস (আঃ খ্রীঃ পূঃ 118—17) সম্ভবতঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের কিছু অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। শকরাজ মৌয়েসের রাজত্বকালে পহ্লব পরিবার উত্তর ভারতে ক্ষত্রপরূপেও রাজ্য শাসন করিতে থাকে। অতঃপর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পহ্লবগণ শকগণকে বিতাড়িত করিয়া গান্ধার অধিকার করেন ও পূর্বদিকে তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়।

শক রাজগণের মধ্যে গণ্ডফার্নেস-ই প্রধান। গণ্ডফার্নেস ও তাঁহার ভ্রাতা গ্যাড যুগ্ম রাজারূপে রাজ্যশাসন করিতেন। খ্রীষ্টীয় কিংবদন্তী অনুসারে যিশুখ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সেন্ট টমাস তাঁহার রাজসভায় আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী পহ্লব রাজগণের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ কুষাণগণের আগমনের ফলেই পহ্লবগণের পতন ঘটিয়াছিল।

গণ্ডফার্নেস ও গ্যাড

কুষাণগন।—খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইউয়ে-চি নামে এক জাতি হিউং-নু (হূণ) জাতির দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা শকগণকে বিতাড়িত করিয়া সির-দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে এবং পরে বাহ্লীক অঞ্চল অধিকার করে। ঐ সময়ে ইউয়ে-চি-রা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিল। কুষাণ নামে উহাদের একটি শাখা শক্তিশালী হইয়া উ উহাদের নেতা প্রথম কদফিসিস বাহ্লীক গ্রীকা বিতাড়িত করিয়া কাবুল নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার ক পহ্লবগণও তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। সম্ভবতঃ গা দক্ষিণ আফগানিস্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। প্রথম কদফিসিস তাঁহার নিজেকে 'বুদ্ধের চির-অনুরক্ত ভক্ত' বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রথম কদফি তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কদফিসিস রাজা হন। তাঁহার মুদ্রায় বৃষবাহন মূর্তি দেখা যায়। সম্ভবতঃ তিনি শৈব ছিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিসিস

কিন্তু কুষাণ রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কণিষ্ক। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন মনে হয়। কণিষ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর হইতে পূর্বে বারাণসী এবং উত্তরে সির-দরিয়া নদী ও দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার)। তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল মথুরায়। তাঁহার এই সুবিশাল সাম্রাজ্য বহু ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ দ্বারা শাসিত হইত। কণিষ্ক কেবল বৌদ্ধ ছিলেন না, তিনি বৌদ্ধ ধর্মের একজন ইতিহাসখ্যাত পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই কাশ্মীরে, গান্ধারে বা জালন্ধরে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মকে একটি তাত্ত্বিক পরিপূর্ণতা দিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার বহু মুদ্রায় হিন্দু, গ্রীক, ইরানীয় প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তিও দেখা যায়। তিনি শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক

কণিষ্ক

ছিলেন। বৌদ্ধ কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন ও বসুমিত্র এবং বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চরক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। কুষাণরাজ কণিষ্ক ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের অন্যতম। তিনি তেইশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি মস্তকহীন মূর্তি মথুরার নিকট পাওয়া গিয়াছে।

কণিষ্কের পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও দ্বিতীয় কণিষ্ক প্রভৃতি কুষাণ রাজগণ রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষাণগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। পারস্যে সাসানীয় ও ভারতে গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে কুষাণ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

মৌর্যোত্তর যুগে শিল্পকলা।—মৌর্যোত্তর যুগে শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য বিকাশ করা যায়। এই যুগে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সহিত ভারতবর্ষ বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিল। বাহ্লীকগণ ভারতের একাংশে রাজ্যও স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলে ভারতীয় শিল্পকলায় গ্রীক ও রোমক প্রভাব অনিবার্যভাবে পতিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমক প্রভাবে ভারতীয়-বৌদ্ধ ভাস্কর্যে যে অভিনব রীতির প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা "গান্ধার শিল্প" নামে আখ্যাত হইয়াছে। গান্ধার অঞ্চলে এই শিল্পধারায় নির্মিত মূর্তি অধিক সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই এইরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তবে মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্রগুলিতে এই শিল্পধারার নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয়-গ্রীক রাজগণের রাজত্বকালেই এই শিল্পধারার প্রবর্তন হইলেও, কুষাণরাজ কণিষ্কের আমলেই উহা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশলাভের পশ্চাতে ছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক বিস্তারলাভ। পূর্বে বুদ্ধদেবের মূর্তি-নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার পদচিহ্ন, ছত্র, পাদুকা ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব সূচিত করা হইত। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রভাবে গঠিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে সেরূপ কোন বাধা রহিল না। এখন গ্রীক দেবতা অ্যাপলো, জিউস্ প্রভৃতির মূর্তির অনুকরণে ভারতীয় দৈহিক ভঙ্গি ও পরিচ্ছদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি নির্মিত হইতে লাগিল। কেবল বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি-নির্মাণেই নহে, অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি-নির্মাণেও গ্রীক ও রোমক প্রভাব পতিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতে গ্রীক-রোমক-প্রভাবিত শিল্পধারা প্রাধান্যলাভ করিলেও, অমরাবতী ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে বিদেশী প্রভাবমুক্ত ভারতীয় রীতি বিকাশলাভ করিয়াছিল। ভাস্কর্যশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল মথুরা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এই যুগে কেবল বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নহে, নৃপতিদেরও বহু মূর্তি রচিত

গান্ধার শিল্প

গান্ধার শিল্পধারায় নির্মিত বোধিসত্ত্বের মূর্তি

হইয়াছিল। পুরুষপুরের চৈত্য, সাঁচী স্তূপের বিখ্যাত তোরণ, ভারহুতের অতুলনীয় প্রস্তরবেষ্টনী, মথুরা, অমরাবতী, নাগার্জুনীকোণ্ড প্রভৃতি স্থানের চৈত্য ও গুহাগৃহ এই যুগের শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই যুগে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীদের বহু মন্দিরও নির্মিত হয়। মৃত রাজাদের মূর্তি-স্থাপনের জন্য মন্দির নির্মিত হইত। ফলে মন্দির-নির্মাণশিল্পেও বিকাশ ঘটাই ছিল স্বাভাবিক।

বিভিন্ন স্থানের শিল্প-নিদর্শন

মৌর্যোত্তর যুগে সাহিত্য।—মৌর্যোত্তর যুগে সাহিত্যের, বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের, যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে পতঞ্জলি জীবিত ছিলেন। পতঞ্জলি বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি ও কাত্যায়ন-রচিত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা, আলোচনা ও টীকা প্রণয়ন করেন। পতঞ্জলি-লিখিত এই বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'মহাভাষ্য'। পতঞ্জলি 'পাণ্ডুকাব্য' (মহাভারত) এবং 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' (বামনাবতার) কাহিনীর নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মৌর্যোত্তর যুগের গোড়ার দিকে মহাভারত ও রামায়ণের বহু অংশ রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, উহাতে অপরাজেয় অশোক এবং সিন্ধু অঞ্চলের যবন রাজগণের উল্লেখ আছে। মহাভারতে উল্লিখিত দণ্ডামিত্রকে অনেকে যবনরাজ ডিমিট্রিয়স বলিয়া মনে করেন। রামায়ণেও যবন ও শকগণের উল্লেখ রহিয়াছে। সাতবাহনগণের শাসনকালেই শর্ববর্মণ-রচিত বিখ্যাত ব্যাকরণ 'কলাবাক' ও গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' রচিত হইয়াছিল। 'বৃহৎকথা' পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। মূল 'বৃহৎকথা' গ্রন্থটি এখন পাওয়া না গেলেও ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব সংস্কৃত ভাষায় উহার যে সকল অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেগুলি হইতে বুঝা যায়, 'বৃহৎকথা'য় অসংখ্য সুন্দর কাহিনী ছিল। সাতবাহনরাজ হাল-রচিত 'গাথা সপ্তশতী'-ও এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' নামে দুইখানি কাব্য ও কতিপয় নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'সারিপুত্র-প্রকরণ' নাটকখানিকে অনেকে প্রাপ্ত ভারতীয় নাটকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম মনে করেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক নাগসেন ও নাগার্জুন মৌর্যোত্তর যুগেই জীবিত ছিলেন। গ্রীকরাজ মিনন্দরের প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন পালি ভাষায় তাঁহার বিখ্যাত 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' গ্রন্থ রচনা করেন। নাগার্জুন ছিলেন কণিষ্কের সমসাময়িক। তাঁহাকেই সাধারণতঃ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রবর্তক বলা হয়। তাঁহার বিখ্যাত 'মধ্যমককারিকা' গ্রন্থে তিনি মহাযান মতবাদকে তত্ত্বের দিক হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চরক তাঁহার

ব্যাকরণ

কাব্য-কাহিনী, নাটক

দর্শন-বিজ্ঞান

'চরক-সংহিতা' এই যুগেই রচনা করিয়াছিলেন। গর্গ-প্রণীত প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ 'গর্গ-সংহিতা'ও এই যুগে রচিত হয়। সুশ্রুত, আর্যদেব প্রভৃতি মনীষিগণও এই যুগে জীবিত ছিলেন।

মৌর্যোত্তর যুগে সমাজ।—মৌর্যোত্তর যুগে বাহ্লীক গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকরা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদেশী হইলেও তাঁহারা ক্রমেই ভারতবর্ষকে তাঁহাদের স্বদেশ এবং ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে তাঁহাদের ধর্ম ও সভ্যতারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে সোৎসাহে গ্রহণ করায় ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। বৈদেশিক জাতিগুলির অনেকেই ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয়রূপে স্থানলাভ করিয়াছিলেন। মনু-সংহিতা গ্রন্থে যবন (গ্রীক), শক, পারদ (পহ্লব) প্রভৃতি জাতিকে ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই যুগে হিন্দু সমাজে চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগের স্থলে বহু উপবিভাগেরও সৃষ্টি হইতেছিল। দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজগণ হিন্দু সমাজে চাতুর্বর্ণ্যের বিধিনিষেধকে কঠোর করিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই, তাঁহারাও বহিরাগত শকগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথাকে বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া দিয়াছিল। তবে স্ত্রীজাতির প্রতি কঠোরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজকুলবধূগণের ক্ষেত্রে অবরোধ-প্রথা কঠোর করা হইয়াছিল। তাহার অনুকরণে সাধারণ লোকেও নিজ নিজ পরিবারে অবরোধ-প্রথা কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে নারী সম্মানের অধিকারী হইলেও স্বাধীনতার অধিকারী নহে, এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইতেছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে উহা নিষিদ্ধ ছিল। ফলে বিধবাবিবাহ নিন্দনীয় ছিল। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে ধর্ম।—অশোকের চেষ্টায় মৌর্য যুগে বৌদ্ধ ধর্ম সর্বভারতীয় ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু মৌর্যবংশের পতনের পর শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র পর পর দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুগে হিন্দু ধর্মে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই। এই যুগে গ্রীক ও রোমক প্রভাবে বহু দেবদেবীর পূজা এবং মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ সুপ্রচলিত হইয়াছিল এবং বৈদিক যুগের ইন্দ্র, মিত্র (সূর্য), বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি দেবতাদের পিছনে হটাইয়া দিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ (কার্তিকেয়), লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবী পুরোভাগে আসীন হইয়াছিলেন। এই সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা

করিয়া পুরাণ ও মহাকাব্যগুলিতে অসংখ্য আখ্যান রচিত হইয়াছিল। ফলে, হিন্দু ধর্মের এই নবরূপ পৌরাণিক হিন্দু ধর্মরূপে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। এই পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া তত্ত্বসর্বস্ব বৌদ্ধ ধর্মকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া 'মহাযান' বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মেও গৃহীত হইয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অসংখ্য দেবদেবী ও অবতারের মহাসভায় বুদ্ধদেবকে অন্যতম অবতাররূপে সহজেই স্থান দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং হিন্দু ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ লোপ পাইয়াছিল। দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতা দেখা দিয়াছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি ধর্মমত ও সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। তবে এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম যতখানি প্রভাবশালী হইয়াছিল, তেমনটি আর কোনও ধর্ম হইতে পারে নাই। এই যুগেই পারস্য, আফগানিস্থান, কাফিরিস্থান, বল্‌খ্, খোটান, কুচি, কাশগর, করাশর ও মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য অংশে এবং চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাহা সমগ্র এশিয়ার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য।—মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলি হইতে সেলুকাস-বংশীয় গ্রীক রাজাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পণ্য রপ্তানি করা হইত। মৌসুমী বায়ু আবিষ্কারের ফলে জলপথেও পাশ্চাত্যের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মিশরের সহিত ভারতের বাণিজ্য জলপথেই চলিতে থাকে। গ্রীস ও রোমের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের একাংশ মিশরের পথেও হইত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে মিশরীয় বন্দর হইতে কয়েক মাসেই 120 খানি বাণিজ্যপোত ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল বলিয়া প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায়। এইভাবে সারা বৎসরই যে বাণিজ্য চলিত, সন্দেহ নাই। ভারতীয় বণিকগণও মিশরে বাণিজ্যপোত প্রেরণ করিতেন।

মিশর

রোম সাম্রাজ্য সিরীয়-গ্রীক রাজ্য ও পহ্লব রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুষাণ সাম্রাজ্য কণিষ্কের কালে রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে, স্থলপথে রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। জলপথেও রোম সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য চলিত। রোম সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের জন্য ভারতীয় বণিকগণ আরব সাগর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও বহু বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় পণ্য কিনিবার জন্য রোমকগণও ভারতে আসিয়া বাণিজ্য-

রোম সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য

কুঠি স্থাপন করিতেন। পন্দিচেরীর নিকটে আরিকেমেডু নামক স্থানে রোমক বাণিজ্য-কুঠির একটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শক ও কুষাণ সম্রাটগণ অনেকেই রোমক মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা নির্মাণ করিতেন। তাহা রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যের প্রাধান্য সূচিত করে।

ভারত চীন ও মধ্য-এশিয়ার সহিতও যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কুষাণ সাম্রাজ্য উত্তরে মধ্য-এশিয়া ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অবস্থিত হওয়ায় ঐ সকল অঞ্চলে ভারতের বিস্তৃতিলাভ স্বাভাবিক ছিল। মধ্য-এশিয়ায় যে বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, অরেল স্টাইন প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে তাহা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপসমূহের সহিতও ভারতের বাণিজ্য চলিত।

চীন, মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য ঐ যুগে দক্ষিণ ভারতে বহু বন্দর ছিল। "পেরিপ্লাস অব দি এরিথিয়ান সী" গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক (আঃ 74 খ্রীঃ) তাঁহার বিবরণে এবং টলেমি তাঁহার ভৌগোলিক বিবরণে বহু বন্দরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে নৌরা, নেলসিন্দা, মুজিরিস, পড়ুসা, বারিগাজা, সোপারা প্রভৃতি প্রধান।

ভারতীয় বন্দর

প্রশ্নাবলী

1. **What do you know about Art, Literature, Society and Religion of India in the Post-Mauryan Era ?** [মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের শিল্প-সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

2. **What do you know about Kaniska ?** [কণিষ্ক সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

3. **What do you know about the foreign trade of India in the Post-Mauryan Era ?** [মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

নবম অধ্যায়

গুপ্ত যুগ ও গুপ্তোত্তর ভারত

গুপ্ত রাজগণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্য।—মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় পাঁচ শত বৎসরকাল ভারতে কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। সময়ে সময়ে দেশীয় ও বিদেশী রাজগণ শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিলেও তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ফলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ও খণ্ড রাজ্যে প্রায়ই বিভক্ত থাকিত। অবশেষে গুপ্ত রাজগণ ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন। গুপ্তবংশ বিহার বা পশ্চিম-বঙ্গের কোনও অংশে রাজত্ব করিত। এই বংশের চন্দ্রগুপ্তই 320 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করায়, লিচ্ছবিদের রাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত যে বর্তমান বিহারের অধিকাংশে ও উত্তর প্রদেশের কতকাংশে রাজত্ব করিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রেই তাঁহার রাজধানী ছিল।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

তিনি মৃত্যুকালে কুমারদেবীর গর্ভজাত পুত্র সমুদ্রগুপ্তকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভগাত্রে সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ-রচিত একটি প্রশস্তি খোদিত রহিয়াছে। উহা হইতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য-বিস্তারের কাহিনী অনেকাংশে জানা যায়। ঐ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়, রুদ্রদেব, মতিলা, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ, গণপতি নাগ, অচ্যুত নন্দী, বলবর্মণ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বহু রাজা তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্তম্ভলিপিতে ঐ সকল রাজার রাজ্যগুলির উল্লেখ না থাকায় সমুদ্রগুপ্ত কোন্ কোন্ অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে পশ্চিমে শতদ্রু হইতে পূর্বে ভাগীরথী পর্যন্ত অঞ্চল যে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ ভারতেও তাঁহার বিজয়বাহিনী কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তবে দক্ষিণ ভারতের পরাজিত রাজারা তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি তাঁহাদের রাজ্য সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের শক রাজগণ সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ-ও তাঁহার সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়শেষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুকাল জানা যায় নাই।

সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। 380 খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি তাঁহার পিতা সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যকে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখেন নাই, বর্ধিতও করিয়াছিলেন। তিনি গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের শক রাজ্যগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। পশ্চিম মালবও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি উজ্জয়িনীতে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। শকগণকে পরাজিত করিয়া তিনি 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তবে পরধর্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন শৈব ও তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ। কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয়, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন বা শ্রেষ্ঠ নয়জন কবি ও মনীষী উপস্থিত ছিলেন। ঐ সকল কবি ও মনীষিগণ সকলে সমসাময়িক ছিলেন না, সুতরাং ঐরূপ কিংবদন্তীর কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। তবে মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসিয়াছিলেন। 413 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কোন সময়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত এবং কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত রাজা হন। স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী রাজগণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। এই বংশের পরবর্তী রাজগণের মধ্যে বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, বলাদিত্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গুপ্ত যুগে শাসন-ব্যবস্থা।—গুপ্ত যুগে রাজতন্ত্রই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। তবে রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণাটি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' হইতে জানা যায়, মৌর্য যুগে রাজা নিজেকে প্রজার অনুগত ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। গুপ্ত যুগে তাঁহাকে ভগবানের অবতার মনে করা হইত। এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে সমুদ্রগুপ্তকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা হইতেন। কিন্তু গুপ্ত যুগে রাজা তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে যোগ্যতমকেই পরবর্তী রাজা নির্বাচন করিয়া যাইতেন।

রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা

গুপ্ত সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। ঐ অংশগুলিকে 'দেশ' বা 'ভুক্তি' বলা হইত। 'দেশ' ও 'ভুক্তি'র শাসনভার 'উপরিক', 'উপরিক মহারাজ' ও গোপ্তৃগণের উপর ন্যস্ত থাকিত। ঐ সকল পদে অনেক সময় রাজকুমারগণ নিযুক্ত

হইতেন। দেশ ও ভুক্তিগুলিকে 'প্রদেশ' ও 'বিষয়' বলা হইত। এইগুলির শাসনকার্য সম্রাটের বা দেশ ও ভুক্তির শাসনকর্তাদের অধীনে রাজকর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। প্রদেশ ও বিষয়গুলি গ্রামে বিভক্ত থাকিত। গ্রামের শাসনকার্য গ্রামিকের উপর ন্যস্ত থাকিত।

প্রশাসনগত বিভাগ

সম্রাট শাসন, সমর ও বিচার বিষয়ে সর্বময় কর্তা ছিলেন। তবে এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী সাহায্য করিতেন। এই সকল পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 'মন্ত্রী', 'সান্ধিবিগ্রহিক', 'অক্ষপটলাধিকৃত', 'মহাবলাধিকৃত', 'মহাদণ্ডনায়ক', 'কুমারামাত্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত রাজগণ সামরিক শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। তাই রাজকর্মচারীদের সকলকেই প্রয়োজন হইলে সামরিক কার্য করিতে হইত।

রাজকর্মচারী

গুপ্ত রাজগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী থাকিত। সৈন্যদল হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী—এই প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। রথের ব্যবহার বেশ হ্রাস পাইয়াছিল। যুদ্ধকালে সম্রাট নিজেই সৈন্য পরিচালনা করিতেন। 'মহাবলাধিকৃত' ও 'মহাদণ্ডনায়ক' নামে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাঁহাকে সামরিক বিষয়ে সাহায্য করিতেন।

সামরিক ব্যবস্থা

চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। রাজকর্মচারীরা নির্দিষ্ট মাহিনা পাইতেন। তাঁহারা প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেন না। রাজদণ্ডের কঠোরতা ছিল না। কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত না। অপরাধীদের সাধারণতঃ অর্থদণ্ড হইত। কেহ বার বার রাজদ্রোহ করিলে তাহার কেবল দক্ষিণ-হস্তটি কাটিয়া দেওয়া হইত। শাসকগণ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন করও ধার্য করিতেন। সম্রাটের খাস জমি, খনি ও সামন্তগণের দেয় কর হইতে রাজকোষে প্রচুর অর্থ আসিত। রাজা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে পাইতেন।

বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থা

গুপ্ত যুগে সামাজিক অবস্থা ও ধর্ম।—ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, দেশে অসংখ্য লোক বাস করিত। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। তাহারা আইনের আশ্রয় লইত না। দেশে দাতব্যশালা ও চিকিৎসালয়ের অভাব ছিল না। ধনীরা সেগুলির ব্যয়ভার বহন করিতেন। অতিথিসংকারকে সকলেই অতিশয় পুণ্যকার্য মনে করিত। সকল সম্প্রদায়ের লোকই খাদ্য, পানীয় ও শয্যা দিয়া অতিথিসংকার করিত। ঐ সময়ে দেশে বহু ধর্ম ও ধর্মমত প্রচলিত থাকিলেও, ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ ছিল না।

সাধারণ অবস্থা

হিন্দু সমাজে বর্ণভেদের কড়াকড়ি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিলেও সে চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্ররাও সৈন্যদলে কাজ করিত। ক্ষত্রিয়রাও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। সমাজে নারীর স্থান ক্রমেই সংকুচিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তবে তখনও তাঁহারা অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইয়া পড়েন নাই। উচ্চবংশীয়া রমণীরা প্রায়ই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন। তবে পুরুষের তুলনায় তাঁহাদের অধিকার অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও বিধবাদের বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সম্ভ্রান্তবংশীয়দের মধ্যে সহমরণ ও সতীদাহ প্রচলিত হইতেছিল।

বর্ণভেদ

নারীর স্থান

গুপ্ত রাজগণ হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও, দেশে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না। সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত সম্রাটগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও, পুরাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর পূর্বের মতো শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মে জীবহিংসাকে ঘৃণা করা হইত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। বিষ্ণুর এই উপাসনা 'ভাগবত ধর্ম' নামে পরিচিত ছিল। ভাগবত ধর্মেও জীবহিংসাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, ঐ সময় বাংলা দেশে, পাঞ্জাবে ও মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল। তবে হিন্দু ধর্ম ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতেছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, মধ্য-ভারতের লোকরা নিরামিষাশী ছিল। সমাজে বর্ণভেদের তেমন কঠোরতা না থাকিলেও চণ্ডালরা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহারা শহরে প্রবেশ করিলে কাঠের দ্বারা শব্দ করিত এবং সেই শব্দ শুনিয়া লোকে দূরে সরিয়া যাইত। সমাজে বহু ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও সর্বত্রই পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় উদারতা বিরাজ করিত।

ধর্ম

গুপ্ত যুগে অর্থনৈতিক অবস্থা।—গুপ্ত যুগেও কৃষিই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি। গুপ্ত যুগে কৃষি যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। রাজাই ভূমির প্রকৃত মালিক হইলেও, গ্রামবাসী স্বাধীন কৃষকগণই ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য হইত। গ্রামবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘবদ্ধভাবে ভূমি ভোগ করিত। উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে দেওয়া হইত। কৃষিকার্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হইত। তাই কৃষির যন্ত্রপাতি চুরি করিলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। দশ কুম্ভের অধিক শস্য অপহরণ করিলে প্রাণদণ্ড হইত। বাঁধ নষ্ট করিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। পশু শস্য বা কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি করিলে পশুর মালিক ক্ষতিপূরণ ও অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হইত।

কৃষি

কৃষির সহিত ব্যাপক পশুপালনেরও ব্যবস্থা ছিল। কৃষিকার্য এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধ-জাত খাদ্য সরবরাহের জন্য গোজাতিকে অতিশয় পবিত্র মনে করা হইত। গোপালনের জন্য রাখালরা প্রতি আটদিনে একদিনের সবটুকু দুধ পারিশ্রমিকরূপে পাইত। গো-বধ ও গো-হরণের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দভ, উষ্ট্র, অশ্বতর, কুক্কুর, হস্তী প্রভৃতিও গৃহপালিত প্রাণীরূপে ব্যবহৃত হইত। অশ্ব প্রধানতঃ আরব ও পারস্য হইতে আমদানি হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অশ্ব পাওয়া যাইত।

পশুপালন

শ্রমশিল্পেও গুপ্ত যুগ খুবই উন্নত ছিল। বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প ও চর্মশিল্প খুবই বিকাশলাভ করিয়াছিল। এই সময় নানাপ্রকার প্রসাধনদ্রব্যও উৎপন্ন হইত। দেশে স্বাধীন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তবে বাধ্যতামূলক শ্রম-নিয়োগ ও ক্রীতদাস-প্রথাও যে একেবারে ছিল না, এমন নহে। শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্য দেশে সুব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন শ্রমশিল্প সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিত। ঐ সকল সংঘ 'শ্রেণী', 'নিগম' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। 'সমূহ', 'বর্গ' প্রভৃতি নামে পরিচিত বৃহত্তর সংঘও দেশে প্রচলিত ছিল। সংঘের ক্ষতি হইতে পারে, এমন কোনও কার্যের জন্য সংঘের সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হইত।

শ্রমশিল্প

খনিজ সম্পদেও গুপ্ত যুগে ভারত অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ ও অভ্রের খনি ছিল। সম্ভবতঃ কোন রৌপ্যখনি ছিল না। রৌপ্য খুব সম্ভব সিংহল ও আফগানিস্থান হইতে আমদানি করা হইত। খনিগুলির মালিক ছিলেন রাজা ; খনিগুলিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করিত। গুপ্ত যুগে খনির কাজ ও ধাতুশিল্প অত্যন্ত উন্নত ছিল। ধাতু-শিল্প 64 কলার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইত। খনি হইতে লবণও সংগৃহীত হইত।

খনি

সমুদ্র হইতেও লবণ সংগৃহীত হইত। দক্ষিণ ভারতে নদী ও সমুদ্র হইতে ব্যাপক-ভাবে মুক্তা সংগৃহীত হইত। সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে শঙ্খ সংগ্রহ করা হইত। শঙ্খ ভারতীয়গণের ধর্মীয়, সামাজিক এমন কি সামরিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইত। সমুদ্র হইতে শঙ্খ-সংগ্রহ এবং শঙ্খ দিয়া অলঙ্কার ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য নির্মাণে বহু লোক নিযুক্ত থাকিত।

সামুদ্রিক দ্রব্য

গুপ্ত যুগে দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অতিশয় উন্নত ছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ভারতীয়গণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ও জলপথ উভয়ই ব্যবহৃত হইত। ধনী ব্যবসায়িগণ প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—শ্রেষ্ঠী বা নগরশ্রেষ্ঠী এবং স্বার্থবাহ। শ্রেষ্ঠীগণ সাধারণতঃ শহরের বাণিজ্যেই প্রধান অংশগ্রহণ করিতেন। শ্রেষ্ঠীরাই ছিলেন সেকালের ব্যাঙ্কার।

আর স্বার্থবাহগণ দলবদ্ধভাবে পণ্যসম্ভার লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ও দেশ হইতে দেশান্তরে যাত্রা করিতেন। তাঁহারা অনেক সময় দস্যু-তস্কর ও নৈসর্গিক বিপদের সম্মুখীন হইতেন। কিন্তু সে সকল বিপদ্ তাঁহারা হাসিমুখে উপেক্ষা করিতেন। গুপ্ত যুগে ভারতীয়গণ মিশর, গ্রীস, রোম সাম্রাজ্য, পারস্য, আরব, সিরিয়া, সিংহল, কাম্বোডিয়া, সিয়াম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয়, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন। ভারতীয়গণ সমুদ্রযাত্রায় এই সময় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। ঐ সময়ে তাম্রলিপ্ত, ভৃগুকচ্ছ, কল্যাণ, চৌল, মালে (মালাবার), সলপত্তন, নলপত্তন, পাণ্ডোপত্তন প্রভৃতি স্থানে উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল। সিংহল ছিল ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটি। নানারূপ উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্র, মসলা ও বিলাসদ্রব্য ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল। এই যুগে রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের ব্যাপক বাণিজ্য চলিত। বাইজান্তাইন সম্রাট জাষ্টিনিয়ান তাঁহার বিধিসংকলনে শুল্ক সম্পর্কে নির্দেশদান প্রসঙ্গে বহু ভারতীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহারা এই যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে ও দ্বীপে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যও স্থাপন করিয়াছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত আমদানির অপেক্ষা অধিক রপ্তানি করিত। ফলে বাহির হইতে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারতে আসিত। তাহার ফলে দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। স্বর্ণমুদ্রাগুলি 'সুবর্ণ' এবং রোমক মুদ্রার অনুকরণে 'দিনার' নামেও অভিহিত হইত। লিঙ্ক নামেও স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। 4 সুবর্ণ বা দিনারে এক লিঙ্ক হইত। গুপ্ত যুগের প্রায় 2,600 স্বর্ণমুদ্রা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গঠনের দিক দিয়া গুপ্ত যুগের মুদ্রাগুলি খুবই উন্নত ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

মুদ্রা

গুপ্ত যুগে শিল্প-সাহিত্য।—গুপ্ত যুগে শিল্প-সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই সময়ে কেবল হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নহে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত। মহাকবি কালিদাস এই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' প্রভৃতি নাটক এবং 'রঘুবংশম্', 'মেঘদূতম্' প্রভৃতি কাব্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্মান দিয়াছে। 'মুদ্রারাক্ষসম্'-রচয়িতা বিশাখদত্ত, 'মৃচ্ছকটিকম্'-রচয়িতা শূদ্রক প্রভৃতি নাট্যকারগণও এই যুগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির রচনা বহু পূর্বে আরম্ভ হইলেও, গুপ্ত যুগেই সেগুলি বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে

সাহিত্য

করেন। বহু স্মৃতিশাস্ত্রও এই যুগে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত অভিধান 'অমরকোষ'ও এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। এই যুগেই দিঙ্‌নাগ ও বসুবন্ধুর মতো শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের উদয় হইয়াছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান
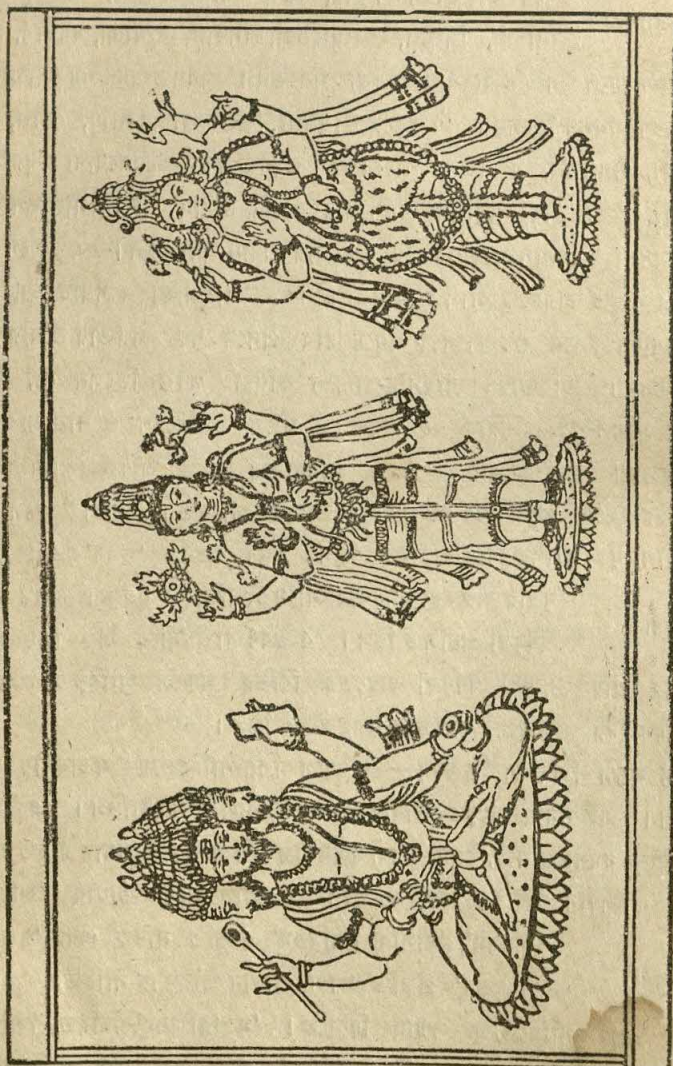
গুপ্ত যুগের দেবদেবী

এই যুগে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতবর্ষ খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইউরোপে কপারনিকাস, কেপলার বা গ্যালিলিও গ্যালিলাইয়ের জন্মের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে আর্যভট্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সূর্য স্থির রহিয়াছে এবং পৃথিবী তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে।

গুপ্ত যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়াছিল। ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলি উত্তর ভারতেই অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উত্তর ভারতেই মুসলমান আক্রমণকারীরা ব্যাপকভাবে ধ্বংসকার্য চালাইয়াছিল। তাই গুপ্ত যুগের অধিকাংশ শিল্পকীর্তিই বিনষ্ট হইয়াছে। তাই গুপ্ত যুগের শিল্পকলার

অজন্তার চিত্রে বাদকদল

অজন্তার চিত্রে মা ও ছেলে

উৎকর্ষ সম্পর্কে অনুমান করিতে গেলে, আমাদিগকে তৎকালের বা তৎপরবর্তী কালের দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার সাহায্য লইতে হয়। কারণ, সেগুলির উপর গুপ্ত যুগের প্রভাব সুস্পষ্ট। উত্তর ভারতে গুপ্ত যুগের যে সকল স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন ধ্বংসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, সেগুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশের দেওগড়ের প্রস্তর-নির্মিত মন্দির এবং কানপুর জেলার ভিতরগাঁওয়ের ইষ্টক-নির্মিত মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্য

দেওগড়ের মন্দির-গাত্রে হিন্দু দেবদেবীর যে সকল মূর্তি রহিয়াছে, সেগুলি বিস্ময়কর। মূর্তি-শিল্পের দিক হইতে গুপ্ত যুগ খুবই উন্নত ছিল। এই যুগে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবী, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি রচিত হইয়াছিল। সারনাথে ঐ যুগে

ভাস্কর্য
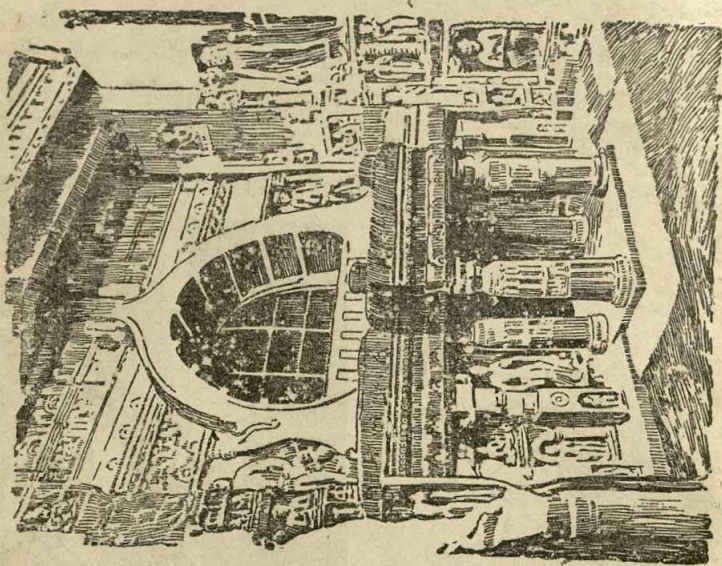
নরনারায়ণ—দেওগড় মন্দির

অজন্তার একটি গুহামন্দির

নির্মিত বহু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির একটিকে ভারতে আবিষ্কৃত সকল বুদ্ধমূর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। মথুরা ও অন্যান্য অনেক স্থানেও বহু প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সুষমা ও শিল্পনৈপুণ্যের দিক হইতে সেগুলি অতুলনীয়।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ

চিত্রকলা

উত্তর ভারতে গুপ্ত যুগের চিত্রকলার নিদর্শন সমস্তই লোপ পাইয়াছে। তবে দক্ষিণ ভারতের ঔরঙ্গাবাদের নিকট অজন্তার গুহাগৃহগুলির প্রাচীর-গাত্রে যে সকল চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই যে গুপ্ত যুগে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্য ও শিল্প-সুষমা আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময় উদ্রেক করে।

ধাতুশিল্প

গুপ্ত যুগে ধাতুশিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। গুপ্ত যুগের মুদ্রাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দিল্লীর কুতবমিনারের নিকটে চন্দ্ররাজ-নামাঙ্কিত যে লৌহস্তম্ভটি রহিয়াছে, তাহা গুপ্ত যুগেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এখনও, উহার নির্মাণের প্রায় ষোল-সতের শতাব্দী পরেও, উহাতে একটুও মরিচা পড়ে নাই। একশত বৎসর পূর্বেও ইউরোপে এই ধরনের লৌহস্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন হইতে ষোল-সতের শত বৎসর পূর্বেও যে ঐ ধরনের লৌহস্তম্ভ কিভাবে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ধাতুশিল্পের দিক হইতে তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধমূর্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
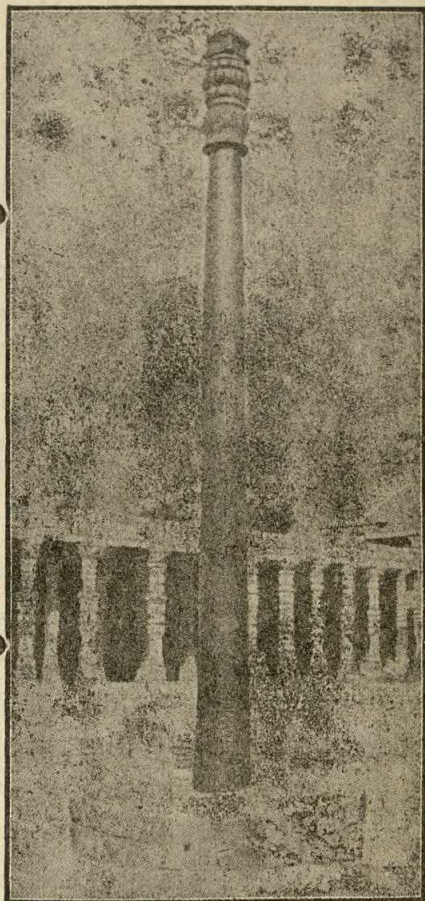
জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সকল দিক হইতেই গুপ্ত যুগে অসামান্য উন্নতি হইয়াছিল। তাই গুপ্ত যুগকে ভারতের "সুবর্ণ যুগ" বলা হয়।

হূণ আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (455—467) হূণজাতির লোকরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। যে হিউং-নু জাতি দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ইউয়ে-চি (কুষাণ) ও শক জাতির লোকরা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছিল, সেই হিউং-নু জাতিই হূণ নামে পরিচিত। হূণ জাতিও ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের একটি শাখা ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এবং এটিলার নেতৃত্বে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিল (451)। তাহাদের অপর একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য তখনও দুর্বল হয় নাই। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (506)। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়িল। অন্যপক্ষে, হূণগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কাবুল ও পারস্য অধিকার করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তাহাদের রাজা তোরমান পুনরায় গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সম্ভবতঃ তোরমানের বিজয়বাহিনী মধ্য-মালব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, গুপ্তরাজ ভানুগুপ্তের সহিত তোরমানের যুদ্ধ হইয়াছিল। যাহাই হউক, তোরমানের ভারতীয় অধিকার সম্ভবতঃ বর্তমান উত্তর প্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে বিস্তৃত ছিল। তোরমানের পর তাঁহার পুত্র মিহিরকুল রাজা হন। 533 খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে দশপুরের রাজা যশোধর্মণ এবং মগধের রাজা বলাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। মিহিরকুল যশোধর্মণের হস্তে পরাজিত হন এবং বলাদিত্য তাঁহাকে বন্দী করেন। বলাদিত্য তাঁহাকে মুক্তি দিলে, তিনি কাশ্মীরে পলাইয়া যান। কিন্তু তাহার পরেও হূণগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করে। পরে ঈশানবর্মণ, প্রভাকরবর্ধন প্রভৃতি ভারতীয় রাজগণকেও হূণদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। হূণগণ ধীরে ধীরে ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে, তোরমান বৌদ্ধ এবং মিহিরকুল শৈব ছিলেন। ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করায় অন্যান্য বৈদেশিক জাতিগুলির ন্যায় তাঁহাদের পক্ষেও ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। অনেকে মনে করেন, বর্তমান রাজপুতগণের একাংশ এই হূণজাতির বংশধর। হূণগণ যোদ্ধার জাতি হওয়ায় তাহারা ক্ষত্রিয়রূপে হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিল। হূণগণের পরাজয়ের পরও গুপ্ত রাজগণ ভারতের বিভিন্ন অংশে কিছুদিন রাজত্ব করেন। তাঁহারা ইতিহাসে 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে খ্যাত হইয়াছেন।

গুপ্তোত্তর ভারত—হর্ষবর্ধন।—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ও খণ্ড রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। প্রায় এক শতাব্দীকাল

ভারতে আর কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে হূণগণ, থানেশ্বরে পুষ্যভূতি-বংশ, মালবে গুপ্ত-বংশ, কনৌজে মৌখরীবংশ, বল্লভীতে মৈত্রকবংশ, আসামে বর্মণ-বংশ, গৌড়ে শশাঙ্ক, কাঞ্চীতে পল্লববংশ এবং বাতাপিতে চালুক্য-বংশ রাজত্ব করিতেছিল। এই সকল রাজবংশের মধ্যে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি ক্রমেই প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিল এবং এই বংশের ইতিহাসই উত্তর ভারতের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধান ইতিহাসে পরিণত হইয়াছিল।

গুপ্তোত্তর ভারত

বর্তমান দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থানেশ্বর রাজ্যে পুষ্যভূতিগণ রাজত্ব করিতে-ছিলেন। এই বংশের প্রভাকরবর্ধন ছিলেন প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি হূণদের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আধিপত্য গুজরাট ও সুরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তিনি কনৌজের মৌখরী-বংশীয় রাজা গ্রহবর্মার সহিত নিজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। মালবের গুপ্তবংশীয় রাজার সহিত মৌখরীগণের শত্রুতা ছিল। ফলে থানেশ্বরের সহিতও তাঁহার শত্রুতা ঘটে এবং তিনি থানেশ্বর ও কনৌজের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সহিত বন্ধুত্ব করেন। প্রভাকরবর্ধনের রাজ্যের পশ্চিমে হূণগণ রাজত্ব করিত। তাহাদের সহিতও তাঁহার যুদ্ধ বাধে। এই প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন একটি যুদ্ধে হূণদিগকে পরাজিত করেন। এই সময়ে প্রভাকরের মৃত্যু ঘটিলে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। তাঁহার রাজা হইবার অনতিবিলম্বে মালবরাজ গৌড়রাজ শশাঙ্কের সাহায্যে কনৌজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মা নিহত ও রাজ্যবর্ধনের ভগিনী কনৌজের রাজ্ঞী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। এই দুঃসংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করিয়া মালবরাজকে পরাজিত করেন, কিন্তু গৌড়রাজ শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন। রাজ্যশ্রী ইতিমধ্যে মালবের কারাগার হইতে বিন্ধ্যপর্বতে পলায়ন করেন।

প্রভাকরবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। তিনি বিন্ধ্যারণ্য হইতে ভগিনী রাজ্যশ্রীকে ফিরাইয়া আনেন এবং কনৌজের সিংহাসনেও আরোহণ করেন। ফলে, থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্য মিলিত হয় এবং এখন এই যুক্ত রাজ্যের রাজধানী হয় কনৌজ। এই ঘটনা সম্ভবতঃ 606 খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কারণ, ঐ বৎসর হইতে হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। হর্ষবর্ধন তাঁহার ভ্রাতৃহন্তা গৌড়রাজ শশাঙ্ককে সমুচিত দণ্ডদানের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি কামরূপের (আসামের) রাজা ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতা করেন। হর্ষ ও ভাস্করবর্মার মিলিত বাহিনী গৌড় আক্রমণ করে। শশাঙ্কের জীবদ্দশায় তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও শশাঙ্কের মৃত্যুর পর

তাঁহারা গৌড় অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। এইভাবে উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন একটি বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। 641 খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মগধ রাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। 643 খ্রীষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার কোঙ্গদ রাজ্যও অধিকার করেন। এইভাবে হর্ষবর্ধনের রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে বঙ্গদেশ এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হর্ষবর্ধন যে সপ্তম শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হর্ষবর্ধন সুশাসক, দানশীল, কবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে শিব ও সূর্যের উপাসক ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পরও শিব ও সূর্যের উপাসনা করিতেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাজধানী কনৌজে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের লইয়া 'মহামোক্ষ পরিষদ্' নামে একটি ধর্মমহাসম্মেলন করিতেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগেও একটি মহামেলার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কনৌজে যে মহামোক্ষ পরিষদ্ হইত, তাহাতে তিনি তাঁহার রাজকোষে সঞ্চিত সকল অর্থ মুক্তহস্তে দান করিতেন, এমন কি নিজের বসনভূষণও বিলাইয়া দিতে কার্পণ্য করিতেন না। তিনি নিজে কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'নাগানন্দম্', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী' সংস্কৃত নাটকগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ্ হইয়াছে। বাণভট্ট, ময়ূর, ভর্তৃহরি প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ আয় তিনি কবি ও পণ্ডিতগণকে দান করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। হর্ষবর্ধন ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় নৃপতিগণের অন্যতম। 646 বা 647 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হর্ষের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তাই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাপিত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

হর্ষবর্ধন

চীনা পরিব্রাজকগণ—ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং।—প্রাচীন ভারত এশিয়ার তীর্থস্থান ছিল। এশিয়ার বহু দেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীগণ ভারত-ভ্রমণে আসিতেন। তাঁহাদের প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—এক, বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে তীর্থযাত্রা করা ; দুই, বৌদ্ধ পুঁথিপত্র সংগ্রহ করা এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া। চীনদেশ হইতেও এইরূপ বহু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন—ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং—ভারতীয় ইতিহাসে অমরত্বলাভ

করিয়াছেন। ফা-হিয়েন আসিয়াছিলেন গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এবং হিউয়েন সাং আসিয়াছিলেন হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে। তাঁহাদের আগমনের মধ্যে প্রায় দুইশত বৎসরের ব্যবধান। তাঁহারা উভয়েই সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা বিবরণ তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি মধ্য-এশিয়ার দুর্গম পথ পার হইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর পাটলিপুত্রের একটি বৌদ্ধ বিহারে অধ্যয়ন করেন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাম্রলিপ্ত, বারাণসী, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, কনৌজ, মথুরা, পুরুষপুর প্রভৃতি বহু স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি পনের বৎসর (399 হইতে 414 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ভারতে ছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সমুদ্রপথে সিংহল হইয়া চীনদেশে যাত্রা করেন। তিনি অশোকের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, পাটলিপুত্রে মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধ বিহার ছিল। এই বিহারে প্রায় সাত হাজার ভিক্ষু বাস করিত। মধ্যদেশের বৃহত্তম নগরী ছিল পাটলিপুত্র। এখানে প্রতি বৎসর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি লইয়া রথযাত্রা উৎসব হইত। তিনি পাটলিপুত্রে সে সময় দাতব্য-চিকিৎসালয় ছিল বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে গুপ্ত যুগের জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ ও সৎ জীবনের কথা জানা যায়। দান ও অতিথিসেবায় ভারতীয়গণ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত। ভারতীয়গণের নৈতিক চরিত্র খুবই উন্নত ছিল। তাহারা মিথ্যা কথা কহিত না, বঞ্চনা ও প্রতারণার আশ্রয় লইত না। দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল না, দণ্ড-ব্যবস্থাও কঠোর ছিল না। মৃত্যুদণ্ড ও দৈহিক দণ্ডের প্রচলন ছিল না। অপরাধীদের অর্থদণ্ড হইত। কেবল বার বার রাজদ্রোহ করিলে তাহার দক্ষিণ-হস্তটি কাটিয়া দেওয়া হইত। মধ্য-ভারতে চণ্ডাল ভিন্ন অন্য সকল জাতির লোকই নিরামিষাশী ছিল। চণ্ডালরা অস্পৃশ্য বিবেচিত হইত। প্রজাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। রাজা ও তাঁহার কর্মচারীরা প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিতেন না। তাঁহারা অনেকেই নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাইতেন। ফা-হিয়েন বলিয়াছেন, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে ঐ সময় বৌদ্ধ ধর্ম বেশ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। মথুরাতেও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তবে মধ্য-ভারতে হিন্দু ধর্মই প্রবল ছিল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ-বিদ্বেষ ছিল না। সকলেই শান্তিতে ও প্রীতিতে বসবাস করিত। ফা-হিয়েনের রচনা হইতে তৎকালীন সমুদ্রযাত্রার বিপজ্জনক অবস্থার কথা জানিতে পারা যায়। ফা-হিয়েন দেশে ফিরিবার পথে সমুদ্রযাত্রাকালে নিজে ঐ কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন ও তাঁহার বিবরণ

হিউয়েন সাং 28-29 বৎসর বয়সে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি 14 বৎসর (630 হইতে 644 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি কনৌজ, কাঞ্চী, গৌড়, কামরূপ, বাতাপি প্রভৃতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি মধ্য-এশিয়ার পথেই বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সঙ্গে লইয়া চীনদেশে ফিরিয়াছিলেন। তিনি হর্ষবর্ধনের জীবন ও রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি 643 খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের মহামোক্ষ পরিষদ্ ও প্রয়াগের মহামেলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, ঐ বৎসর কনৌজের মহামোক্ষ পরিষদে 20 জন রাজা ও বহু হাজার বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন পণ্ডিত যোগ দিয়াছিলেন। প্রয়াগের মহামেলায় প্রায় 5 লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। 20 জন রাজা ও হিউয়েন সাং সহ রাজা হর্ষবর্ধন এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রথম দিনে বুদ্ধের, দ্বিতীয় দিনে শিবের ও তৃতীয় দিনে সূর্যের উপাসনা করা হইত। হর্ষবর্ধন কয়েকদিন ধরিয়া বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। হর্ষবর্ধন তাঁহার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পর্যন্ত দান করিতেন। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, কনৌজ ঐ সময় ভারতবর্ষে পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐ সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছিল এবং বৌদ্ধগণ আঠারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ চলিত। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা বেশ কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, অস্পৃশ্যতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে তিনি খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ মিথ্যাভাষী ও প্রবঞ্চক ছিলেন না। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তবে দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। হিউয়েন সাং-ও নিজে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। অপরাধের জন্য নাক, কান ও পা কাটিয়া দেওয়া হইত। কৃষকগণ শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিত। রাজ্যের অধিকাংশ ব্যয় রাজার নামে সম্পত্তি হইতে নির্বাহ হইত। হিউয়েন সাং বলিয়াছেন, ভারতীয়রা ঐ সময় সেলাই-করা পোশাক পরিতেন না। তাঁহারা সাদা রঙের পোশাকই বেশী পছন্দ করিতেন। মাথার উপরের চুলগুলিকে চূড়ার মতো করিয়া বাঁধিতেন, পাশের চুলগুলি কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িত। পুরুষরাও অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। ফুল তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় ছিল। অনেকেই মাথার উপর ফুলের মালা জড়াইয়া পরিতেন। হিউয়েন সাং দুই বৎসর নালন্দায় ছিলেন। নালন্দার বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি সুন্দর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতে ঐ সময় বহু বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কিন্তু নালন্দা ছিল সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেখানে দেশ-

হিউয়েন সাং ও তাঁহার বিবরণ

বিদেশ হইতে বহু ছাত্র পড়িতে আসিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়াশুনা করিত। সেখানে ধর্মতত্ত্ব, বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদান করা হইত। ছাত্রদের বাসস্থান ও আহারের সুব্যবস্থা ছিল। 180টি গ্রামের আয় হইতে ঐ বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। তিনি নালন্দায় 80 ফুট উচ্চ একটি তাম্র-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি
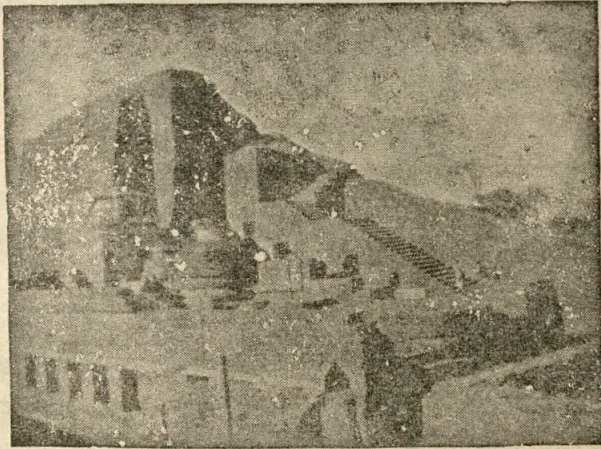
নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ

দক্ষিণ ভারতেও পর্যটন করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও, হিউয়েন সাং সেখানে প্রায় একশত বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। পল্লবগণের রাজধানী কাঞ্চীতেও তিনি প্রায় একশত বৌদ্ধ বিহার ও এক হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই মহাযান বৌদ্ধ মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রশ্নাবলী

1. Why is the Gupta Age called the Golden Age of India? Briefly describe India's cultural achievements during the Gupta Age. [গুপ্ত যুগকে ভারতের 'সুবর্ণ যুগ' বলা হয় কেন? সংক্ষেপে গুপ্ত যুগে ভারতের সাংস্কৃতিক কীর্তি বর্ণনা কর।]

2. Write a note on the Hun invasion of India. [ভারতে হূণ আক্রমণ সম্পর্কে একটি টীকা লিখ।]

3. Write a brief essay on the economic condition of India under the Guptas. [গুপ্ত যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখ।]

4. What do you know about the Gupta administration? [গুপ্ত যুগের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

5. Write a short note on the social condition in India during the Gupta Age. [গুপ্ত যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।]

6. Briefly give the political history of the Guptas. [গুপ্তগণের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

7. Who was the greatest monarch in India during the 7th Century A. D.? [খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কে ছিলেন ?]

8. Write what you know about Fa-hien and Huien Tsang and their accounts about India. [ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং এবং তাঁহাদের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিবরণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

দশম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস—সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রাচীন বাংলা।—প্রাচীন কালে বাংলা দেশ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। তখন সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গ 'পুণ্ড্রদেশ' বা 'বরেন্দ্র', পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ', দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ 'রাঢ়' বা 'সুহ্ম', দক্ষিণবঙ্গ 'সমতট' এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ 'গৌড়' নামে পরিচিত ছিল। গৌড়ই প্রাচীন ইতিহাসে সর্বাধিক প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। তাই অনেক সময় 'গৌড়' বলিতে সমগ্র বাংলা দেশকেই বুঝাইত।

গৌড়ের অভ্যুত্থান ও শশাঙ্ক।—গুপ্তপূর্ব যুগের বাংলা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মৌর্য যুগে সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গুপ্ত যুগে সমগ্র বঙ্গদেশ যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলা দেশে সম্ভবতঃ কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐ সময় শশাঙ্ক নামে এক রাজা গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ এবং রাজ্য পশ্চিমে বারাণসী হইতে দক্ষিণে কোঙ্গদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার হস্তেই রাজ্যবর্ধন নিহত হইয়াছিলেন। তাই হর্ষবর্ধন তাঁহাকে দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। তবে শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা তাঁহার কোনও ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার অধীন হইয়াছিল। ইহার পর বাংলার ইতিহাস প্রায় শতাব্দীকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল।

পালবংশ।—অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কনৌজরাজ যশোবর্মণ এবং কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অতঃপর দেশে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অবস্থা এমন দুঃসহ ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া গোপাল নামে এক বীরকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করেন। এইভাবে বাংলা দেশে পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবতঃ সমগ্র বঙ্গদেশ গোপালের শাসনাধীন ছিল। পাল রাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। পাল রাজগণের আমলে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

গোপাল

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল বাংলার রাজা হন (আঃ 770 খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সহিত গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি 'বিক্রমশীল' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী হইলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন।

ধর্মপাল

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবপাল রাজা হন (আঃ 810)। তাঁহার সময়েই পাল রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি উড়িষ্যার কতকাংশ ও কাশ্মীরের নিকটবর্তী কাম্বোজ রাজ্য অধিকার করিয়া পাল সাম্রাজ্যকে বর্ধিত করিয়াছিলেন। গুর্জর-প্রতিহাররাজ ভোজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের রাজগণের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ভারতের বাহিরেও তাঁহার প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল।

দেবপাল

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল রাজগণ আরও তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তবে ক্রমেই তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে। গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট, কলচুরি, চোল প্রভৃতি বহিঃশত্রুগণের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ পাল রাজ্যকে হীনবল করিয়া দেয়। এই বংশের মহীপাল অন্যতম বিখ্যাত নরপতি ছিলেন (আঃ 988—1038)। মহীপালের প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গে বিখ্যাত 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় মহীপালের পুত্র রামপাল

এই বিদ্রোহ দমন করেন। রাজা রামপালের রাজত্বকালে পাল রাজ্যের হৃত গৌরব সাময়িকভাবে ফিরিয়া আসে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পাল রাজ্যের গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হয়। পাল রাজগণ আরও কিছুদিন উত্তরবঙ্গ, গৌড় ও মগধে রাজত্ব করিলেও পাল শাসনের অবসান ঘটে।

সেনবংশ।—পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গদেশে সেনবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। সেনগণ দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে যুদ্ধাদি কর্মে লিপ্ত থাকায় 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেন বাংলা দেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয় সেনের আমলে এই রাজ্যসীমা বর্ধিত হয় এবং প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ ও মিথিলা তাঁহার শাসনাধীন হয়। বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন (1158—79) রাজা হন। বল্লাস সেন সম্ভবতঃ মগধের পাল-বংশীয় রাজা গোবিন্দপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পাল রাজগণের আমলে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্লাবন আসিয়াছিল, তাহার গতিরোধ করিয়া বল্লাল সেন বাংলা দেশে পুনরায় হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হন। তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেন। বল্লাল সেন কবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' সমধিক প্রসিদ্ধ।

বল্লাল সেন

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন রাজা হন (1179—1205)। তিনি যুবরাজরূপে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কামরূপ, মিথিলা ও কলিঙ্গ জয়ের কৃতিত্ব তাঁহারই ছিল। গৌড় তখনও সম্ভবতঃ পাল-বংশীয় কোন রাজার শাসনাধীন ছিল। লক্ষ্মণ সেন তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গৌড় অধিকার করেন এবং তথায় লক্ষ্মণাবতী নামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে মুসলমানগণ বিহার অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। মুসলমানগণ ঐ সময় নদীয়া অধিকার করিলেও, অবশিষ্ট বঙ্গদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি তথায় আরও চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন কবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার অসমাপ্ত অদ্ভুতসাগরের রচনা শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় বহু বিখ্যাত কবি ও মনীষী উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কবি জয়দেব। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর সেনবংশীয়গণ দুর্বল হইয়া পড়েন এবং বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকারে যায়।

লক্ষ্মণ সেন

প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।—আর্য সভ্যতা বাংলা দেশে বিলম্বে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রে বঙ্গবাসীদিগকে

'ব্রাত্য' ও 'পক্ষীভাষী' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহাই হউক, আর্য সভ্যতা যে বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহাতে আর্যপূর্ব সভ্যতার কিছু কিছু যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। খাদ্য ও বেশভূষার দিক হইতে এই স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এখনকার মতোই প্রাচীন বাঙ্গালীরা ভাত, মাছ-মাংস, শাক-সব্‌জি, ফল-মূল, দুধ-ঘি, পিঠা-পায়স ইত্যাদি খাইতেন। ব্রাহ্মণরাও আমিষ ভোজন করিতেন। সুরাপান নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইলেও বাঙ্গালীরা সুরা পান করিতেন। পাহাড়পুরে যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি হইতে প্রাচীন বাঙ্গালীদের বেশভূষা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা যায়। তাঁহারা মালকোচা দিয়া খাটো ধুতি পরিতেন। মেয়েরা গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত করিয়া শাড়ি পারিতেন। তবে নাভির উপরের অংশ অনাবৃত থাকিত। পুরুষরা উত্তরীয় ও স্ত্রীলোকরা ওড়না ব্যবহার করিতেন। পুরুষদের মাথার কুঞ্চিত কেশদাম ঘাড়ের উপর ঝুলিয়া থাকিত এবং স্ত্রীলোকরা নানা ছাঁদে সুন্দর সুন্দর খোঁপা বাঁধিতেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকদের শঙ্খবলয় খুবই প্রিয় ছিল। বাঙ্গালীরা চর্ম পাদুকা ও কাষ্ঠ পাদুকা এবং ছাতা ব্যবহার করিতেন।

খাদ্য ও বেশভূষা

বাঙ্গালীদের জাতীয় চরিত্র অতিশয় প্রশংসনীয় ছিল। হিউয়েন সাং বলিয়াছেন, সমতটের লোকরা শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির লোকরা দৃঢ়চেতা ও দুঃসাহসী, কর্ণ-সুবর্ণের লোকরা সৎ ও অমায়িক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী রমণীদের মৃদুভাষিণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীদের বিদ্যোৎসাহের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা মল্লবিদ্যায়, মৃগয়া ও নৃত্যগীতে বিশেষ নিপুণ ছিল। নৌবিদ্যায় তাহাদের নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। কালিদাস তাঁহার কাব্যে বাঙ্গালীকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাশা ও দাবা খেলার খুবই চল ছিল বাঙ্গালী সমাজে।

রুচি ও চরিত্র

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। হিউয়েন সাং বলিয়াছেন, তিনি বাংলা দেশে বহুসংখ্যক জৈন সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন। তবে পরে জৈন ধর্মের প্রভাব লোপ পাইয়াছিল। পাল রাজগণের আমলে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তবে পূর্বেও বাংলা দেশে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য ছিল, তাহা ফা-হিয়েনের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার আগমনকালে (গুপ্ত যুগে) বাংলা দেশ, পাঞ্জাব ও মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মও প্রচলিত ছিল। শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন এবং সেন রাজগণ হিন্দু

ধর্ম

ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হস্তে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। সেগুলির মধ্যে সহজযান ও বজ্রযান মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষি

প্রাচীন বাংলা এখনকার মতোই কৃষিপ্রধান ছিল। কৃষিজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ধান্য ও ইক্ষু। বাংলা দেশে গুড় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। অনেকের মতে, গুড় হইতেই গৌড় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। সরিষা, কার্পাস ও পানের চাষও প্রচুর পরিমাণে হইত।

শ্রমশিল্প

শ্রমশিল্পের দিক হইতে প্রাচীন বাংলার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। সুপ্রাচীন কাল হইতেই সূক্ষ্মবস্ত্র দেশ-বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। মাটি, সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, কাঁসা, শাঁখ ও হাতীর দাঁতের কাজে বাংলা দেশ খুবই উন্নত ছিল।

ব্যবসায় ও মুদ্রা

ব্যবসায়-বাণিজ্যেও প্রাচীন কালে বাঙ্গালীরা পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। গুপ্ত যুগেও বাংলা দেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে বহু পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিত। বাংলা দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য পরিবহণরূপে নৌকা ও গোযান ব্যবহৃত হইত। বাংলা দেশে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবে ক্ষুদ্র মুদ্রারূপে কপর্দক বা কড়ি ব্যবহৃত হইত।

নগর ও বন্দর

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের উন্নতির ফলে দেশে উন্নতধরনের শহর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। গৌড়, রামাবতী প্রভৃতির ন্যায় শহর এবং তাম্রলিপ্তের মতো বন্দর বাংলা দেশে বর্তমান ছিল।

সাহিত্য

প্রাচীন কালে বাংলা দেশে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে নাই। তাই বাংলা দেশের সাহিত্য প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হইত। প্রাচীন কালে সংস্কৃত কাব্যে 'গৌড়ী' ও 'বৈদর্ভী' রীতি প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ভামহের মতে গৌড়ী রীতিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। কবি জয়দেব-রচিত কাব্য 'গীতগোবিন্দম্‌' ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে 'পবনদূত' রচনা করিয়া কবি ধোয়ী অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'দায়ভাগ' নামক উত্তরাধিকার বিধি-বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা জীমূতবাহন বাঙ্গালী ছিলেন। নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র ও বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালী ছিলেন। শীলভদ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাত্র একখানি গ্রন্থের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ তিব্বতে পাওয়া গিয়াছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 168 খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন বাংলা চিত্রকলাতেও যথেষ্ট উন্নত ছিল। ঐ যুগের চিত্র কিছু পাওয়া না গেলেও, তিব্বতী গ্রন্থ হইতে পাল যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ধীমান ও বিটপালের নাম জানা গিয়াছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে হস্তলিখিত কয়েকখানি পুঁথিতে বজ্রযান তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর কয়েকটি ছবি পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল চিত্র অজন্তার চিত্রগুলির কথা সহজেই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাঙ্গালী চিত্রকর যে কি ধরনের ছবি আঁকিতেন, তাহার একটি নিদর্শন সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের তাম্রশাসনের অপর পৃষ্ঠে অঙ্কিত বিষ্ণুমূর্তিটি হইতে সহজে অনুমান করা যায়।

চিত্রকলা

প্রাচীন বাংলার বিষ্ণুমূর্তি

প্রাচীন বাংলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও খুবই উন্নত ছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভ হইতে যে সকল মন্দির ও নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে সোমপুর বৌদ্ধ বিহারের, মহাস্থানগড়ে পৌণ্ড্রনগরীর, বাণগড়ে কোটিবর্ষের ও বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন বাংলার উন্নত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন সহজেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ মন্দিরই ইষ্টক ও কাষ্ঠ-নির্মিত ছিল। তাই সেগুলি সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরগুলি ধ্বংসের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পায় নাই। ভূগর্ভ হইতে যে সকল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষ কিছুটা অনুমান করা যায়। ব্রোঞ্জ-নির্মিত যে সকল ছোট মন্দির পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলির গঠনভঙ্গি সহজেই অনুমান করা যায় পোড়া

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
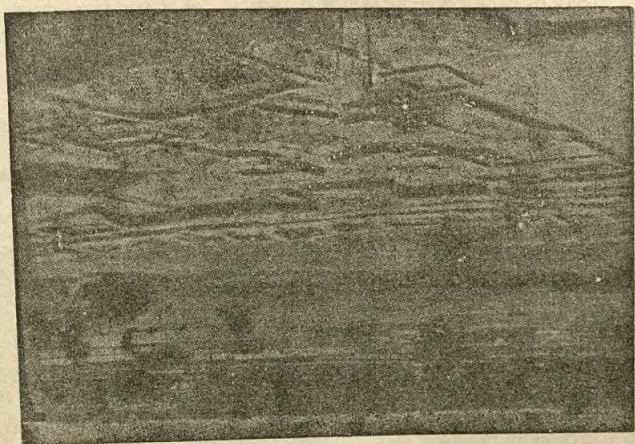
পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ

প্রাচীন বাংলায় আবিষ্কৃত পোড়া মাটির ফলক—কিন্নরমূর্তি (ময়নামতী)

মাটির শিল্পেও প্রাচীন বাংলা খুবই উন্নত ছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পোড়া মাটির বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৈদেশিক যোগাযোগ।—ব্যবসায়-বাণিজ্যের সূত্রে প্রাচীন কাল হইতেই বাংলা দেশ বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বহির্বিশ্বের সহিত প্রাচীন বাংলার যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মকে বহির্বিশ্বে প্রচারের কার্যে বাঙ্গালীগণ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারে শান্তিরক্ষিত, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুমার ঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ অগ্রণী ছিলেন। কুমার ঘোষ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের বিখ্যাত শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী-রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার মূর্তিশিল্পের প্রভাব যবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মূর্তিশিল্পে সুস্পষ্ট। প্রাচীন বাংলায় এক বিশেষ ধরনের মন্দির-শিখর রচনা করা হইত। এই ধরনের মন্দির-শিখর এখনও ব্রহ্মদেশের বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। উহা হইতে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ মেলে।

প্রশ্নাবলী

1. Give in brief the early history of Bengal. [প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ।]

2. Briefly describe the social, economic and cultural life in ancient Bengal. [প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

একাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারত

গুপ্তপূর্ব দক্ষিণ ভারত।—প্রাচীন কালে উত্তর ভারত যেমন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য-বিস্তারের কার্যে অগ্রণী হইয়াছিল, দক্ষিণ ভারত তেমন কিছু করে নাই। তবে এ-কথাও সত্য যে,উত্তর ভারতের যে মৌর্য রাজগণ দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দূর দক্ষিণের ভারতীয় অঞ্চল অধিকার করিতে পারেন নাই। মৌর্য রাজগণের আমলে দূর দক্ষিণ ভারতে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র নামে চারিটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বর্তমান তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী ও পুডুকোট্টাইয়ের কিছু অংশ লইয়া প্রাচীন চোল রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। বর্তমান মাদুরা, রামগড়, তিনেভেল্লী

ও ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশে ছিল পাণ্ড্য রাজ্য, আর মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশে ছিল কেরলপুত্র বা চের রাজ্য। পরবর্তী কালে সত্যপুত্র রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন পাণ্ড্য রাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাণ্ড্যদেশের মুক্তা ও সূক্ষ্ম-বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, ঐ সময় জনৈক স্ত্রীলোক পাণ্ড্য রাজ্য শাসন করিতেন। জনৈক পাণ্ড্যরাজ রোম সম্রাট অগাস্টাসের সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। প্রাচীন চের ও চোল রাজ্য দুইটিও বেশ উন্নত ছিল। পরবর্তী কালের দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চোল রাজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

মৌর্য যুগে

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের ফলে দক্ষিণ ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। তবে এই সকল রাজ্যের মধ্যে সাতবাহন রাজ্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গোদাবরী-তীরবর্তী প্রতিষ্ঠাননগরকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাতবাহনগণ প্রায় চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে শকগণের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই বংশের রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির হস্তে শকরাজ নহপান পরাজিত হন। তিনি উত্তর ভারতে কোনও কোনও অংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে মালবে রুদ্রদামনের নেতৃত্বে শকগণের অভ্যুত্থানের ফলে সাতবাহনগণ দুর্বল হইয়া পড়েন।

মৌর্যোত্তর যুগে

গুপ্ত যুগে দক্ষিণ ভারত।—গুপ্ত যুগে দক্ষিণ ভারতে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত ছিল। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাহিনী কাঞ্চী রাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সাতবাহনগণের পতনের ফলে যে কয়টি রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে বাকাটক রাজ্য প্রধান। সমুদ্রগুপ্ত ব্যাঘ্ররাজ নামে যে রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ বাকাটকরাজের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজ কন্যার সহিত জনৈক বাকাটকরাজের বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে চালুক্যগণের অভ্যুত্থানের ফলে এই রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বাকাটকগণের সমসময়ে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে কদম্ব-বংশীয় রাজগণের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই রাজ্য কুণ্ডলদেশ বা বনবাসী রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল। ইহারা প্রায় দেড়শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। চালুক্যগণের অভ্যুত্থানের ফলে এই রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং চালুক্যগণ ও গঙ্গগণ ইহা অধিকার করেন।

বাকাটক রাজ্য

বনবাসী রাজ্য

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত।—গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতে কতিপয় শক্তিশালী রাজ্য ও রাজবংশের উদয় হয়। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে বাতাপির চালুক্য রাজ্য ও কাঞ্চীর পল্লব রাজ্য খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য-বংশীয় রাজা প্রথম পুলকেশী বাতাপিনগরে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র কীর্তিবর্মণ ও মঙ্গলেশের অধীনে এই রাজ্য খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। কীর্তিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীই (609—642) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁহার রাজ্য উত্তরে নর্মদা হইতে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার হস্তে কাঞ্চীর পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ পরাজিত হন। চোল, চের ও পাণ্ড্য রাজ্যগুলিও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়াই হর্ষবর্ধনকে দক্ষিণ ভারত-বিজয়ের আশা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র রাজা নরসিংহবর্মণের হস্তে পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্যগণ প্রায় শতাধিক বৎসর বাতাপিতে রাজত্ব করেন। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুইজন নৃপতি ছিলেন প্রথম বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর এই বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্রকূট-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণকে সিংহাসনচ্যুত করিলে চালুক্য শাসনের অবসান হয় (আঃ 753 খ্রীষ্টাব্দ)।

বাতাপির চালুক্যগণ

বাতাপির চালুক্যগণের সমসময়ে কাঞ্চীর পল্লবগণও খুবই শক্তিশালী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে এই বংশ কাঞ্চীতে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু একটি ঐক্যবদ্ধ তামিল রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ড্য, চের, চোল ও সিংহলের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বাতাপির চালুক্যগণের সহিত পল্লবগণের দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা ছিল। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণের হস্তে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে পল্লব রাজ্য শক্তি ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে। কিন্তু তাঁহার পর গৃহবিবাহ ও চালুক্যগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে পল্লবগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। চোলগণের আক্রমণের ফলে পল্লব রাজ্য বিধ্বস্ত হয়।

পল্লবগণ

চালুক্যগণের পতনের সুযোগে রাষ্ট্রকূট-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণ রাষ্ট্রকূট রাজ্যের রাজা হন (আঃ 756)। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজ্যকে খুবই শক্তিশালী করিয়া তোলেন। এই

বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তৃতীয় গোবিন্দ (793—814)। তিনি উত্তর ভারতে অভিযান করিয়া গুর্জর-প্রতিহাররাজ নাগভট ও গৌড়েশ্বর ধর্মপালকে পরাজিত করেন। পল্লবরাজ দন্তিদুর্গও তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। রাষ্ট্রকূটগণের সহিত আরবদের সৌহার্দ্য ছিল। আরবগণের সহায়তায় রাষ্ট্রকূটগণ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ (939—68)। তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূটগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। এই বংশের শেষ রাজা চতুর্থ অমোঘবর্ষ কল্যাণীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈলপের হস্তে পরাজিত হন (973)। এইভাবে রাষ্ট্রকূট শাসনের অবসান ঘটে।

রাষ্ট্রকূটগণ

চালুক্য-বংশীয় দ্বিতীয় তৈলপ রাষ্ট্রকূটরাজকে পরাজিত করিয়া কল্যাণীতে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কল্যাণীতে ইহাদের রাজধানী হওয়ায় এই বংশ কল্যাণীর চালুক্য নামে পরিচিত। এই বংশের সোমেশ্বর আহবমল্লের (1042—68) রাজত্বকালে কল্যাণী রাজ্য খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার বিজয়বাহিনী উত্তর ভারতেও অভিযান করে। চোলরাজ প্রথম রাজাধিরাজ তাঁহার হস্তে নিহত হন। তিনি পল্লবগণের রাজধানী কাঞ্চী বিধ্বস্ত করেন। তবে তিনি চোলরাজ বীর রাজেন্দ্রের হস্তে পরাজিত হন। তাঁহার পুত্র ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য (1076—1172) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চালুক্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

কল্যাণীর চালুক্যগণ

চোলগণ পল্লব রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে তাঞ্জোরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। চোলরাজ পরান্তক (907—53) পল্লব রাজ্যের উচ্ছেদ করেন। চোলরাজ প্রথম রাজরাজের সময়ে (আঃ 985—1016) চোলগণ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠেন। রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোলের (আঃ 1016—1044) অধীনে চোল রাজ্য সর্বাধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার বিজয়বাহিনী উত্তর ভারতেও অভিযান করে। সমগ্র সিংহল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার নৌবাহিনী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, মালয় ও ব্রহ্মের কতকাংশ জয় করে। রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজাধিরাজ রাজা হন। তিনি কল্যাণীর চালুক্যরাজ সোমেশ্বর আহবমল্লের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। চোলগণ ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়েন। তাঁহাদের রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয় এবং সমুদ্রপারের রাজ্যগুলি হস্তচ্যুত হয়। চোলগণের দুর্বলতার সুযোগে পাণ্ড্য, হোয়সল ও কাকতীয়গণ চোল রাজ্য অধিকার করে।

চোলগণ

দক্ষিণ ভারতের শিল্প-সাহিত্য।—দক্ষিণ ভারতে কলাশিল্প কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ তাহার মন্দিরগুলি। এই মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও

ভাস্কর্য শিল্পের এক-একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধ ও চৈত্য বিহারগুলিকেই দক্ষিণ ভারতের সর্বপ্রাচীন মন্দির বলা চলে। এগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের অভ্যন্তরে
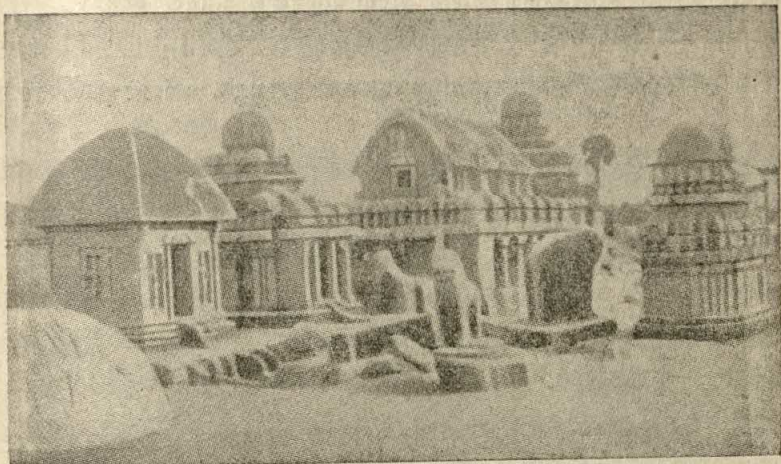
মামল্লপুরমের সপ্তরথ

পাথর কাটিয়া গুহার আকারে নির্মিত। বেদসা, নাসিক, কার্লে, কাহ্নেরি, অজন্তা
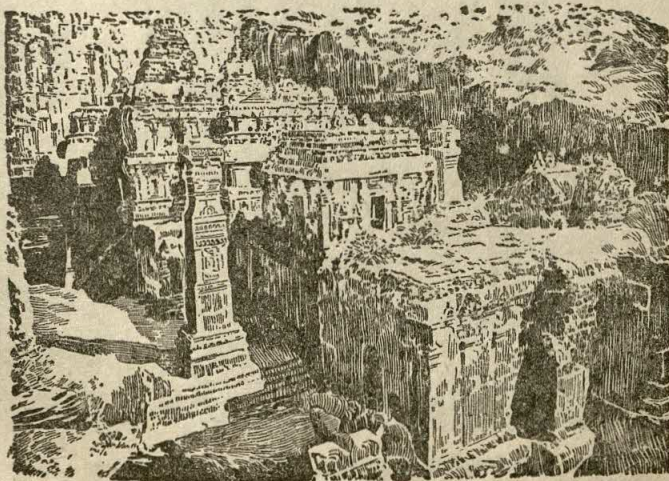
ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির

ও ইলোরার গুহামন্দিরগুলি এবং নাগার্জুনিকোণ্ড ও অমরাবতীর স্তূপগুলি এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চালুক্য রাজগণ এই ধরনের বহু গুহামন্দির নির্মাণ

করাইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে আর এক শ্রেণীর মন্দির নির্মিত হইতে থাকে। ইহাতে এক-একটি পাহাড়ের বিভিন্ন অংশকে প্রয়োজনমতো কাটিয়া-ছাঁটিয়া বাদ দিয়া এবং অভ্যন্তরভাগ ও পর্বত-গাত্র খোদাই করিয়া মন্দিরগুলি নির্মিত হইত। অর্থাৎ, মন্দিরগুলি বৃহৎ হইলেও ছিল এক-একটি অখণ্ড প্রস্তর। পল্লব রাজগণই এই ধরনের পাহাড় কাটিয়া মন্দির-নির্মাণের রীতির প্রচলন করেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণ
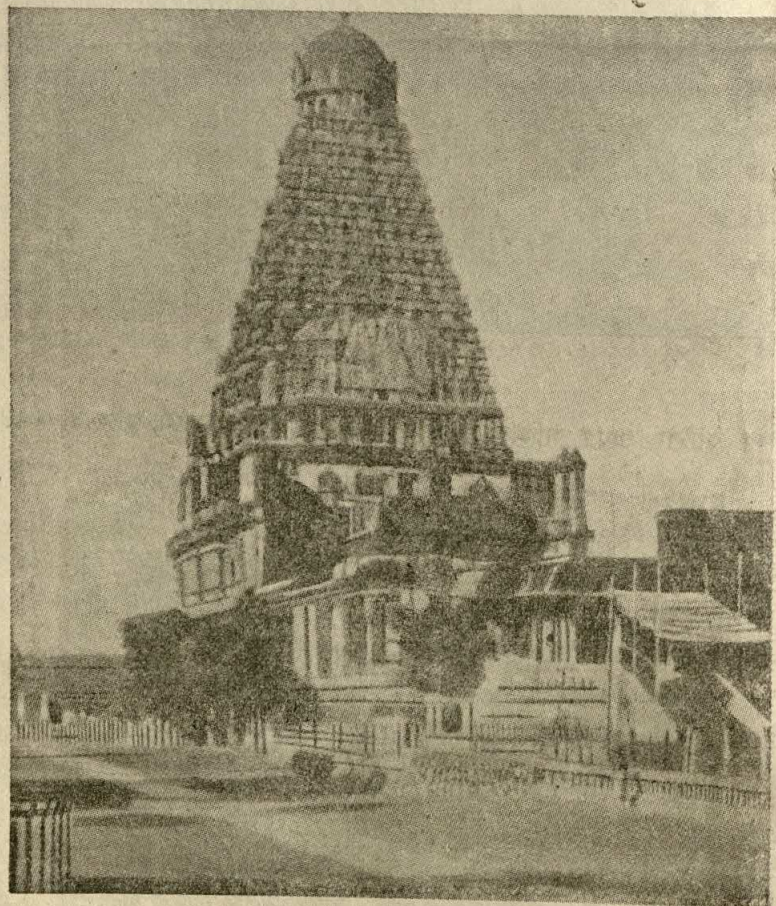
তাঞ্জোরের বিখ্যাত মহাদেব মন্দির

মামল্লপুরমে পাহাড় কাটিয়া কতকগুলি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। এই সকল মন্দির "রথ" নামে পরিচিত—যেমন, ধর্মরাজরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ ইত্যাদি। মামল্লপুরমের পর্বত-গাত্রে খোদিত শিল্পকার্যগুলিও অপূর্ব। আস্ত পাহাড় কাটিয়া

এইরূপ মন্দির-নির্মাণের কৌশল ক্রমেই উন্নত হইতে থাকে এবং রাষ্ট্রকূট রাজগণের আমলে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির। এই মন্দিরটি কেবল বিশাল নহে, ইহার পরিকল্পনা এবং কারুকার্যগুলিও তেমনি বিস্ময়কর। আস্ত পাহাড় কাটিয়া মন্দির-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ড খণ্ড প্রস্তর সাজাইয়া মন্দির-নির্মাণের শিল্পও দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এই ধরনের মন্দির-নির্মাণের কৌশল চোল রাজগণের আমলেই সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঞ্জোরে চোলরাজ রাজরাজ যে মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাই ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির। এই মন্দির চতুর্দশ তলে সমাপ্ত এবং ইহার উচ্চতা 190 ফুট। ইহার শীর্ষভাগ একটি বিরাট শিলাখণ্ড দিয়া নির্মিত। এই সুবিশাল শিলাখণ্ডটি যে কি কৌশলে সেই যুগে ঐরূপ উচ্চ স্থানে উত্তোলিত এবং নিখুঁতভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আজও স্থির করা সম্ভব হয় নাই। উহা ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম বিস্ময় হইয়া আছে। মহীশূরের হোয়সল-বংশীয় রাজগণও অনেক মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী দোরসমুদ্রে হোয়সলেশ্বরের মন্দিরটি সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প যে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এই সকল মন্দির তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

দক্ষিণ ভারতে সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজা সাহিত্যের কেবল উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তাঁহারা নিজেরাও উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সাতবাহন-বংশের আমলে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ও হালের 'গাথা সপ্তশতী' প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সম্পদ্ হইয়া আছে। 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যের রচয়িতা বিখ্যাত কবি ভারবি দক্ষিণ ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ নিজেও উচ্চশ্রেণীর লেখক ছিলেন। তাঁহার 'মত্তবিলাসপ্রহসন' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের সভায় বিখ্যাত আলঙ্কারিক দণ্ডী উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণীর চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্লের সভাকবি ছিলেন বিহ্লন। বিহ্লন ত্রিভুবনমল্লের জীবন অবলম্বনে তাঁহার 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কেবল সংস্কৃত ভাষায় যে দক্ষিণ ভারতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নহে। সেখানে প্রাচীন কালে তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীন কালে তামিল সাহিত্যিকগণ প্রায়ই এক-একটি সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। তাই খ্রীষ্টীয় 100 হইতে 300 অব্দকে সাধারণতঃ তামিল সাহিত্যের 'শংগম্' (সংঘম্) যুগ বলা হয়। শংগম্ যুগের 473 জন

সাহিত্য

কবির প্রায় তেইশ শত কবিতা পাওয়া গিয়াছে। এই কবিতাগুলি প্রাচীন তামিল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ও শৈব কবিগণও অসংখ্য গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলিও দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য।—দক্ষিণ ভারত প্রাচীন কাল হইতেই সুসমৃদ্ধ ছিল। দক্ষিণ ভারত ব্যবসায়-বাণিজ্যে, বিশেষতঃ বহির্বাণিজ্যে, খুবই উন্নত ছিল। দক্ষিণ ভারতের তিন দিক সমুদ্রবেষ্টিত। তাই অতি প্রাচীন কাল হইতেই দক্ষিণ ভারতীয়গণ সামুদ্রিক অভিযান ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। খ্রীষ্টপূর্ব বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই দক্ষিণ ভারত সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে মিশর, সুমের প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। ঐ সময় দক্ষিণ ভারতে বহুসংখ্যক বন্দর ছিল। "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সী" নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক (আঃ 74 খ্রীষ্টাব্দ) নৌর (কান্নানোর), টিণ্ডিম (পোন্নানি), মুজিরিস (ক্রাঙ্গানোর), নেলসিন্দা (কোট্টায়ামের নিকট), কলচি (কর্কই), কামারা (কাবেরীপত্তম্), পাডুসা (পন্দিচেরী) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমি তাঁহার ভৌগোলিক বিবরণে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী 'মৈসলিয়া' (অন্ধ্র) অঞ্চলের বহু বন্দরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতেই পাশ্চাত্যের সহিত বাণিজ্য করিত। খ্রীষ্টপূর্ব 26 অব্দের কাছাকাছি সময়ে জনৈক পাণ্ড্যরাজ রোম সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন। পাণ্ড্য রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল 'কায়ল'। অগাস্টাস হইতে নিরো পর্যন্ত বহু রোম সম্রাটের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পন্দিচেরীর নিকটে আরিকেমেডু নামক স্থানে রোমক বাণিজ্যকুঠির একটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিখ্যাত রোমক লেখক প্লিনি (আঃ 95 খ্রীষ্টাব্দ) প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ রোমক মুদ্রা ভারতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। ঐ সকল মুদ্রার অধিকাংশই যে দক্ষিণ ভারতে আসিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পেরিপ্লাস হইতে জানা যায়, সূক্ষ্মবস্ত্র, হস্তিদন্ত ও মসলা ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল। মুক্তা ও চন্দনও দক্ষিণ ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। মিশর, আরব ও পারস্যের সহিতও দক্ষিণ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত। দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ আরবগণের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সাতবাহনগণের সময়ে ভৃগুকচ্ছ (বারোচ) ও সুপরিক (সোপারা) ছিল বিখ্যাত বন্দর। দক্ষিণ ভারতীয় পোতগুলি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরেও পাড়ি দিত। নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত তাং-বংশ-শাসিত চীনদেশ ও শৈলেন্দ্রবংশ-শাসিত শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। চোল রাজগণের আমলে দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ার বহু দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য নহে, অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তারও করিয়াছিল। চোলগণের সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল কাবেরীপদ্দিনম্। দক্ষিণ ভারত কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল, তাহা উত্তর ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের অভিযান-কালীন ধনরত্ন-লুণ্ঠনের কাহিনী হইতেই অনুমান করা যায়। দক্ষিণ ভারতের অতুলনীয় মন্দিরগুলিও উন্নত দক্ষিণ ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচায়ক। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো দক্ষিণ ভারত পর্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বহু কথা জানা যায়।

হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণে দক্ষিণ ভারত।—প্রাচীন কালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দক্ষিণ ভারতেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মও বর্তমান ছিল। তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পাইতেছিল এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তবে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের স্থলে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। শিবের উপাসকগণ 'নায়নার' এবং বিষ্ণুর উপাসকগণ 'আলবার' নামে পরিচিত ছিলেন। পল্লব রাজগণ অনেকেই শৈব ছিলেন। তবে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিতাড়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন বেদান্তবাদিগণ। বেদান্তবাদী ধর্ম-প্রচারকগণের মধ্যে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্যের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কুমারিল ভট্ট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে বৈদিক হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং সে চেষ্টা দক্ষিণ ভারতে বিশেষরূপে ফলবতী হয়। তবে বৌদ্ধ ধর্মকে যিনি সর্বাপেক্ষা আঘাত হানিয়াছিলেন এবং বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া ভারতে হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন শঙ্করাচার্য। অষ্টম শতাব্দীতে মালাবার অঞ্চলে (বর্তমান কেরলে) কালডি গ্রামের এক নাম্বুদ্রি পরিবারে শঙ্করাচার্যের জন্ম হয় (আঃ 788)। তিনি গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য ও টীকা রচনা করেন। তিনি অল্পবয়সেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং তাঁহার ধর্মমত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করিয়া বেড়ান। তাঁহার মতে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। আর সমস্ত কিছুই মায়া মাত্র। স্থতরাং ব্রহ্মের উপাসনাই একমাত্র ধর্ম। তাই তাঁহার এই মতবাদ 'অদ্বৈতবাদ' ও 'মায়াবাদ' নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য

শৈব ও বৈষ্ণবগণ

কুমারিল ভট্ট

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করেন। এই সকল মঠের মধ্যে মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ এবং বদরিকাশ্রমের যোশী মঠ প্রধান। এই সকল মঠ শঙ্কর-মঠ নামে পরিচিত।

শঙ্করাচার্য

শঙ্করাচার্য মাত্র বত্রিশ (মতান্তরে, আটত্রিশ) বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে ভারতের ধর্মীয় জগতে তিনি যে আলোড়নের সৃষ্টি করেন, তাহা ভারতে হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভে বিশেষ সহায়ক হয়।

কয়েকজন বেদান্তবাদী পণ্ডিত বৈষ্ণব ধর্মেরও একনিষ্ঠ প্রচারক হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে রামানুজ ও মধ্বাচার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতাব্দীতে মাদ্রাজের নিকটবর্তী তিরুপাট গ্রামে রামানুজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্যের মতো তিনিও উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনিও ছিলেন অদ্বৈতবাদী। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সহিত তাঁহার অদ্বৈতবাদের কিছুটা পার্থক্য ছিল।

রামানুজ

শঙ্করাচার্য বলিতেন, কেবল ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মায়া। কিন্তু রামানুজ বলিতেন, ব্রহ্মও যেমন সত্য, এ জগৎও তেমনই সত্য। জগৎ মায়ামাত্র নহে, উহা ব্রহ্মেরই অংশ মাত্র। তাঁহার এই মত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। তাঁহার ধর্মে ভক্তি ও জীবে দয়া প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নিকট বিষ্ণু ও ব্রহ্ম অভেদ ছিলেন। পূজা-অনুষ্ঠান নহে, ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্ম লাভ করা যায়, এই মতও তিনি প্রচার করেন। শ্রীরঙ্গমে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য ও বসব

উত্তর ভারতের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক রামানন্দ তাঁহার মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের তুলনায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ জনসাধারণের মধ্যে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রামানুজের সমকালীন ছিলেন নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য। তিনিও ভক্তিবাদের প্রচারক ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তী কালের শৈবাচার্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন বসব। তিনি বিজাপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কল্যাণীর রাজা বিজ্জলের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার শিষ্যগণ 'বীর শৈব' ও 'লিঙ্গায়েৎ' নামে পরিচিত।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটায়, প্রাচীন হিন্দু রীতি-নীতিও পুনরায় কঠোরভাবে পুনঃপ্রবর্তিত হইয়াছিল। তাই দেখা যায়, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাদির কঠোরতা উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে কঠোরতর আকার ধারণ করিয়াছিল।

প্রশ্নাবলী

1. Give in brief the political history of ancient South India. [প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. What do you know of the art and culture of the ancient South India ? [প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

3. What do you know of the trade and maritime activities of the ancient South India ? [প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সামুদ্রিক কার্যকলাপ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

4. Give an idea of the Hindu revival in the South India. [দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

দ্বাদশ অধ্যায়

বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতি
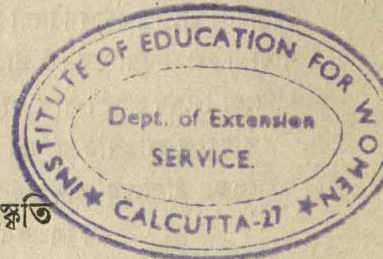
সূচনা।—ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও অন্য তিনদিকে দুস্তর সমুদ্র রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষ কখনও বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল না। স্থল ও জল উভয় পথে ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল হইতেই বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। এই যোগাযোগের ফলে প্রাচীন ভারতীয়গণ একদিকে যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বহির্জগতে বিস্তৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সমুদ্র-অভিযান ও বাণিজ্য-বিস্তার।—ভারতের তিন দিক সমুদ্রবেষ্টিত। ফলে, ভারতীয়গণ সুপ্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্র-অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ভারতীয়গণ সমুদ্রপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছিলেন। মিশর ও সুমের অঞ্চলের সহিত যে সমুদ্রপথে তাঁহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত, তাহার বহু প্রমাণ এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশরের পথে ভারতীয়গণ রোম সাম্রাজ্যের সহিতও বাণিজ্য করিতেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরীয়-গ্রীক নাবিক হিপলাস প্রথম মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করেন। তাহার ফলে সোজা ভারত সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয় এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। গুপ্ত যুগে সামুদ্রিক বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুপ্ত যুগে ভারতীয়গণ সমুদ্রপথে মিশর, গ্রীস, রোম সাম্রাজ্য, আরব, পারস্য, সিংহল, কাম্বোডিয়া, শ্যামদেশ,

সুমাত্রা, মালয়, এমন কি চীনদেশের সহিতও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন। ফা-হিয়েন সমুদ্রপথেই তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল হইয়া চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

সমুদ্র-অভিযান ও সামুদ্রিক বাণিজ্য

সিংহল ছিল ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটি। চোল রাজগণের সময়ে সামুদ্রিক অভিযানে ভারতবর্ষ বিশেষ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল। চোল রাজগণের আমলে সিংহল ভারতের পদানত হইয়াছিল। লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ ভারতের শাসনাধীন হইয়াছিল। মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী ও বোর্নিও-তে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল; তাহার সহিত সংঘর্ষে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের কতকাংশ চোল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। প্রাচীন কালে বাঙ্গালীগণও সমুদ্র-অভিযানে ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক অভিযান করিয়া ভারতীয়গণ সাম্রাজ্য বিস্তার বা উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, তাঁহাদের সামুদ্রিক-অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য-বিস্তার করা।

স্থলপথে বাণিজ্য

কেবল জলপথে নহে, স্থলপথেও তাঁহারা বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার যে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখন গোবী মরুভূমি ধূ-ধূ করিতেছে, সেখানে ভারতীয়গণ যে প্রাচীন কালে একদা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরব, পারস্য, রোম সাম্রাজ্য, মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ব্রহ্মদেশ, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের সহিত ভারত স্থলপথেও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। ভারতবর্ষ জলপথে ও স্থলপথে সূক্ষ্মবস্ত্র, হস্তিদন্ত ও হস্তিদন্ত-নির্মিত দ্রব্য, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন ও মসলা বিদেশে রপ্তানি করিত এবং বিদেশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিবিধ বিলাসদ্রব্য দেশে আনিত। ভারত আমদানির তুলনায় অধিক রপ্তানি করিত, ফলে বহির্জগৎ হইতে সে প্রচুর পরিমাণে অর্থ এবং স্বর্ণরৌপ্য দেশে আনিতে সমর্থ হইত।

বাণিজ্য-সূত্রে ভারত বহির্জগতে বহু উপনিবেশ, এমন কি সাম্রাজ্যও, স্থাপন করিয়াছিল। সেই সঙ্গে বহির্জগতে সে আপন ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও ছড়াইয়া দিয়াছিল।

ধর্ম-প্রচার।—ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম একদা সমগ্র এশিয়ার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। ভারতের বাহিরে এশিয়ার কোন কোন দেশ ও দ্বীপে হিন্দু ধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোক ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য বহু ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে তাঁহার সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম সর্বপ্রথম

বিস্তারলাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকভাবে এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিস্তারলাভ করিতে থাকে। পারস্য, আফগানিস্থান, কাফিরিস্থান, মধ্য-এশিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীন এবং চীন হইতে কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারলাভ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলিতেও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। এই সকল ধর্ম-প্রচারকগণের মধ্যে ভিক্ষু লোকোত্তম, কাশ্যপ মাতঙ্গ, ধর্মরত্ন, কুমারজীব, শঙ্খভূতি, গৌতম শঙ্খদেব, পরমার্থ, শান্তিরক্ষিত, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুমার ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের মতো ব্যাপকভাবে হিন্দু ধর্ম বহির্জগতে বিস্তারলাভ না করিলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপে তাহা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কম্বুজ ও চম্পা রাজ্য হিন্দু ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও, বলীদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু ধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কম্বুজ রাজ্যের (কাম্বোডিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত) এঙ্কোর ভাটের বিষ্ণুমন্দিরটি আজও হিন্দু স্থাপত্যকীর্তিরূপে অমর হইয়া আছে। পূর্ব বোর্নিও-র মহাকাম নদীর তীরবর্তী মুয়ারা কামানে যে সাতটি সংস্কৃত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, তথাকার হিন্দু রাজা মূলবর্মণ 'বহুসুবর্ণক' যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দুই লক্ষ গাভী দান করিয়াছিলেন। যবদ্বীপ হইতে সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি ও হিন্দু ধর্মের বহু পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যবদ্বীপে যে এক সময় বর্ণভেদ-প্রথা ও ভারতীয় পরিচ্ছদের প্রচলন ছিল, তাহারও অনেক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দু ধর্ম

উপনিবেশ স্থাপন।—প্রাচীন ভারতীয়গণ এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ মধ্য-এশিয়ায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বহু উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। হিন্দুকুশ পর্বতের অপর পারে অবস্থিত অঞ্চলে ও মধ্য-এশিয়ায় অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন পুঁথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, প্রাচীন কালে এই সকল অঞ্চলে অসংখ্য ভারতীয় নামে আখ্যাত স্থান ও নদনদী ছিল। রাজ্যগুলির রাজাদের নামও ছিল ভারতীয়। তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, এই সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ বা রাজ্য বিদ্যমান ছিল। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, মধ্য-এশিয়ার ইয়ারকন্দের কিজিল দরিয়া ও তারিম নদীর নাম ছিল সীতা নদী। মধ্য-এশিয়ার কুচী রাজ্যের (বর্তমান কুচা) রাজারা সকলেই সুবর্ণপুষ্প, হরিপুষ্প, হরদেব, সুবর্ণদেব প্রভৃতি ভারতীয় নাম বহন করিতেন।

হিন্দুকুশের পারে ও মধ্য-এশিয়া

তিব্বতীয় সাহিত্য হইতে জানা যায়, কাশগরের এক রাজার নাম ছিল বিজিতধর্ম। চোক্কুক (ইয়ারকন্দ) রাজ্যের দুই রাজকুমার সূর্যসোম ও সূর্যভদ্র বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীবের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে জানা যায়, অশোকের এক বংশধর খোটানে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খোটান ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই সকল প্রমাণ হইতে সহজেই বুঝা যায়, এই সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ ও ভারতীয় রাজ্য বর্তমান ছিল এবং এই সকল স্থান ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। অরেল স্টাইন, অ্যাকঁ্যা (Hackin) প্রভৃতি বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশের বহু চিহ্নও আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল উপনিবেশ ও রাজ্য খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল বা বর্তমান ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ভারতীয়গণ বহু উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কৌণ্ড্য নামে জনৈক ভারতীয় ব্রাহ্মণ আন্নাম ও কাম্বোডিয়ায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য 'ফু-নান্' নামে চীনা ইতিহাসে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে কৌণ্ডিণ্য নামক অপর এক রাজার অধীনে ভারতীয়গণ ফু-নানে ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কাম্বোডিয়ার উত্তর-পূর্ব

ফু-নান্
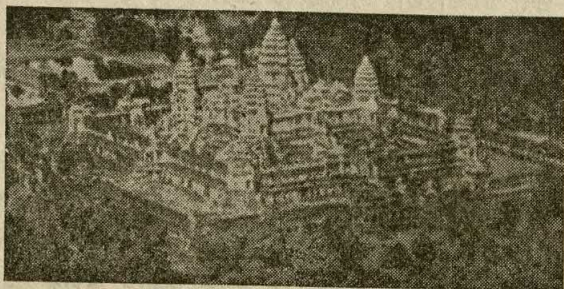
এঙ্কোর ভাটের বিষ্ণুমন্দির—কম্বুজ

অংশে কম্বুজ নামে একটি রাজ্য ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে কম্বু স্বায়ম্ভুব নামে জনৈক ভারতীয় ঐ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা শ্রেষ্ঠবর্মণ শ্রেষ্ঠপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভববর্মণ নামে এক ব্যক্তি কম্বুজের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ভবপুর। ভববর্মণের ভ্রাতা মহেন্দ্রবর্মণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশানবর্মণ সমগ্র ফু-নান্ রাজ্য

অধিকার করিয়াছিলেন। ঈশানপুর নামক স্থানে ঈশানবর্মণ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দীতে রাজা যশোবর্মণ এঙ্কোর ঠোমে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন ঐ রাজ্যের নাম ছিল যশোধরপুর। যশোধরপুর ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

কম্বুজ

কম্বুজ রাজ্যে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের বহু কীর্তি আজও বিদ্যমান আছে। সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত হইল বিষ্ণুমন্দির "এঙ্কোর ভাট"। মন্দিরের বিশালতা ও উচ্চতা, মন্দির-গাত্রে খোদিত মূর্তি ও বিচিত্র নকশা হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন হইয়া আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থাইগণের আক্রমণের ফলে কম্বুজ রাজ্যের পতন হইয়াছিল। কম্বুজের পূর্বদিকে ভারতীয়গণ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় দশকে চম্পা নামে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা ভদ্রবর্মণের অধীনে চম্পা রাজ্য খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ভদ্রবর্মণ শৈব ছিলেন। তিনি মাইসনে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র চম্পা রাজ্যের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। চম্পা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আন্নামীদের আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যের পতন ঘটে।

চম্পা

ভারতীয়গণ মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, বোর্নিও প্রভৃতি স্থানেও উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রায় যে শ্রীবিজয় বা পালেম্বং
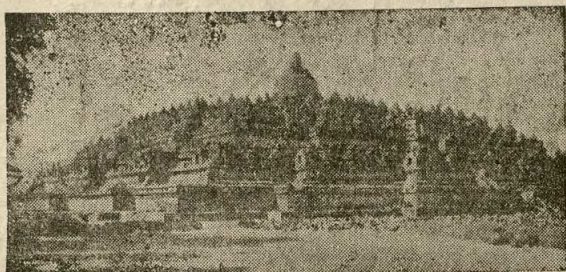
বরবুদুরের মন্দির—যবদ্বীপ

রাজ্যটি স্থাপিত হয়, তাহা অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠে। সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের আমলে সমগ্র মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী ও বোর্নিও শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধীন হয়। চম্পা ও কম্বুজেও তাঁহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। আরব বণিকগণ শৈলেন্দ্র সম্রাটগণের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের নানা বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। শৈলেন্দ্র রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজগণের কুলগুরু ছিলেন। যবদ্বীপের অপরূপ বৌদ্ধ স্তূপ ও মন্দির বরবুদুর শৈলেন্দ্র রাজগণেরই অপর কীর্তি। শৈলেন্দ্র

শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য

রাজগণের সহিত চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের সংঘর্ষ হইয়াছিল (1025)। এই সংঘর্ষে চোলরাজই বিজয়ী হইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজবংশের পতন ঘটে।

সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তার।—ব্যবসায়-বাণিজ্য, উপনিবেশ-স্থাপন, রাজ্য-স্থাপন এবং ধর্মপ্রচার—নানা কারণেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে
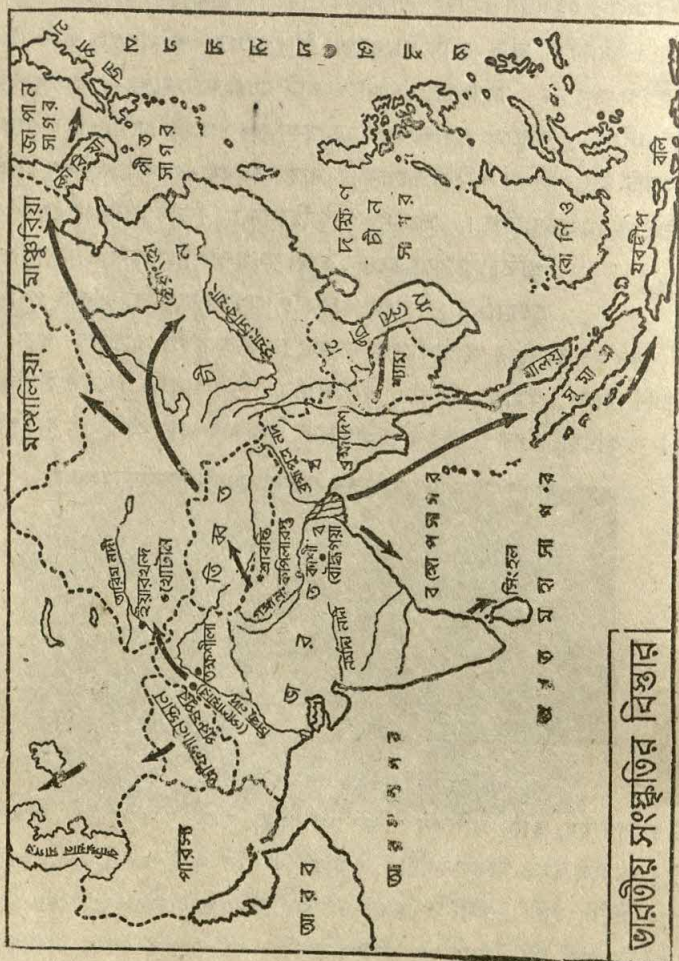
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। প্রাচীন কাল হইতে মিশর, গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগ থাকায়, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে বাগদাদের খলিফাগণের দরবারে বহু

ভারতীয় পণ্ডিত সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। মুসলিম-বিজিত দুনিয়ায় তাহা যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচারে সহায়ক হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা চলে। আরবগণ ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা যে আরবগণের মাধ্যমে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে সম্প্রসারিত হইয়াছিল, তাহাও অনুমান করা চলে। কিন্তু এগুলি পরোক্ষ ব্যাপার ছিল। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে এশিয়া মহাদেশের প্রায় সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আফগানিস্থান, কাফিরিস্থান, সমগ্র মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলিতে তাহার প্রভাব আজও বিদ্যমান। হিন্দুকুশ পর্বতের অপর পারে ও মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির এই ব্যাপক বিস্তারের চিহ্ন মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারের ফলে বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে আধুনিক কালে ইউরোপীয় ও সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সেগুলির ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন আবিষ্কার সম্ভব হইতেছে। হিন্দুকুশ পর্বতের বামিয়েন উপত্যকা যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা 1929-30 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ অ্যাক্যাঁ (Hackin) আবিষ্কার করেন। বামিয়েন উপত্যকায় পূর্ব হইতে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতের গাত্রে বিরাট বিরাট বৌদ্ধ মূর্তি প্রস্তর খোদিত করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই সকল মূর্তির কোন কোনটি প্রায় দেড়শত গজ উচ্চ ছিল। এই পর্বতের গাত্রে অজন্তার গুহাগৃহসমূহের অনুকরণে বহু গুহামন্দিরও নির্মিত হইয়াছিল। এইসব গুহামন্দিরের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় সেগুলি পুনরায় লোকচক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই সকল গুহামন্দিরে নানা যুগের সংস্কৃত পুঁথির খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। পর্বত-গাত্রে খোদিত বুদ্ধমূর্তিগুলি এখন হতশ্রী হইলেও, সেগুলি আজও দর্শকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মধ্য-এশিয়ায় দান্দান উইলিকে আবিষ্কৃত প্রাচীন চিত্রসমূহে যে সকল নারী ও বোধিসত্ত্বের রূপ দেখা যায়, সেগুলি অজন্তার প্রাচীর-চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে রেশমের উপর অঙ্কিত বজ্রপাণি-মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ার মিরানে যে সকল প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলিতে গান্ধার-শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। চীনদেশের সীমান্তে তুন্-হোয়াংয়ে ক্ষুদ্র নদী-তীরে অনুচ্চ পর্বতমালার গাত্রে অজন্তার অনুকরণে নির্মিত অসংখ্য গিরিগুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তুন্-হোয়াংয়ে প্রায় পাঁচশত গুহাগৃহ রহিয়াছে। সেগুলি অজন্তার মতোই অনুপম চিত্র ও ভাস্কর্যে সুশোভিত। এখানে সর্বসুদ্ধ এক হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। এখানে প্রায় বিশ হাজার পুঁথি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সেগুলিকে একটি গুহায়

নিক্ষেপ করিয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া চীনদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিরঘিজিয়া ও উজবেকিস্থানেও সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কিছু কিছু বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপনের ফলেই যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু চীন, তিব্বত, তংকিন, কোরিয়া ও জাপানে ধর্মের সহিত ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চীনদেশের প্রাচীন ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপনের ফলেই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know about the maritime and colonial enterprise of the ancient Indians? [প্রাচীন ভারতীয়গণের সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক উদ্যোগ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

2. How did the Indian culture spread abroad? [ভারতীয় সংস্কৃতি কিরূপে বহির্জগতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল?]

3. Write what you know about the colonial enterprise and cultural expansion of the ancient Indians. [প্রাচীন ভারতীয়গণের ঔপনিবেশিক সাফল্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তার-সাধন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজপুত জাতি ও মুসলিম আক্রমণ

রাজপুত জাতি।—অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজপুতগণ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে সুদীর্ঘকাল রাজপুতগণ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজপুত-বংশীয় রাজগণ নিজেদিগকে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। অনেক ঐতিহাসিক ইহাদিগকে প্রাচীন আর্য জাতির লোক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে, রাজপুতগণ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মধ্য-এশিয়া হইতে আগত শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি

রাজপুত জাতির পরিচয়

জাতিগুলির বংশধর। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধে নিপুণ হওয়ায় হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন।

গুর্জর-প্রতিহারগণের নেতৃত্বেই সর্বপ্রথম রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। গুর্জর-প্রতিহারগণ নিজেদিগকে সূর্য-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতেন। তাঁহারা নাকি রামচন্দ্রের অনুজ ও প্রতিহারী লক্ষ্মণের বংশধর ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকতার দিক হইতে ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া হইতে হূণদের সহিত গুর্জর নামে একটি জাতির লোক ভারতে আসিয়াছিলেন। ইহাদের একটি শাখা রাজপুতানার মাড়বার অঞ্চলে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় কোন রাজা মালবে যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞে জনৈক গুর্জররাজ প্রতিহার বা দ্বাররক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ রাজপুতানার গুর্জরগণ গুর্জর-প্রতিহার নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। গুর্জর-প্রতিহারগণ প্রায় দেড় শতাব্দীকাল উত্তর ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গুর্জর-প্রতিহারগণ

এই বংশের শক্তিশালী রাজগণের মধ্যে প্রথম নাগভট, বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট, মিহিরভোজ, প্রথম মহেন্দ্রপাল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহেন্দ্রপালের (আ: 885—910) সময়েই গুর্জর-শক্তি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। গুর্জর-প্রতিহারগণ মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আরবগণ সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়াছিল এবং ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। গুর্জর-প্রতিহারগণের বীরত্বেই তাহা সম্ভব হয় নাই। গুর্জর-প্রতিহার-রাজ মিহিরভোজকে তাঁহার সমসাময়িক মুসলিম পর্যটক সুলেমান "ইসলামের সর্বাধিক শক্তিমান্ শত্রু" এবং "আরবগণের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যকেই উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য বলা চলে।

গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলে উত্তর ভারতে চন্দেল্ল, কলচুরি, পরমার, চৌলুক্য (সোলাঙ্কী), গাহড়বাল, চৌহান প্রভৃতি বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। চন্দেল্লগণ জেজাকভুক্তিতে (বুন্দেলখণ্ডে), কলচুরিগণ ডহল বা ত্রিপুরীতে (জব্বলপুরের নিকটবর্তী তেওয়ার), পরমারগণ মালবে, চৌলুক্যগণ গুজরাট ও কাঠিয়াবাড়ে, চৌহানগণ সম্ভর, আজমীর ও দিল্লীতে এবং গাহড়বালগণ কাশীতে ও পরে কনৌজে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজপুতগণ নিজেদের মধ্যে বিবাদ-কলহে লিপ্ত থাকিলেও, তাঁহারা সকলেই মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণপাত করিয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

অন্যান্য রাজপুত রাজ্য

চন্দেল্লগণ গুর্জর-প্রতিহারগণের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহারা স্বাধীন হইয়া উঠেন। এই বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা ধঙ্গের (954—1002) আমলে চন্দেল্ল রাজ্য যথেষ্ট বিস্তারলাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশের রাজা পরমর্দীদেব চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের হস্তে পরাজিত হন। 1202 খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতবুদ্দিন কালঞ্জর অধিকার করিলে চন্দেল্লগণ দুর্বল হইয়া পড়েন।

চন্দেল্লগণ

চেদী বা কলচুরিগণ নিজেদিগকে পুরাণে বর্ণিত ক্ষত্রিয় রাজা হৈহয়ের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা লক্ষ্মণরাজের সময়ে চেদী রাজ্য যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চালুক্য ও চন্দেল্লগণের আক্রমণের ফলে চেদী রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। এই বংশের রাজা গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্য (1030—41) ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকর্ণের (1041—70) সময়ে চেদীগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠেন। তবে লক্ষ্মীকর্ণ গৌড়ের রাজা নরপালের হস্তে পরাজিত হন। মালবের পরমার, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল এবং গুজরাটের চৌলুক্য রাজগণের সহিতও চেদী রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতানগণের আক্রমণের ফলে অবশেষে চেদী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

চেদীগণ

মালবের পরমারগণ রাষ্ট্রকূটগণের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর-প্রতিহারগণের দ্বন্দ্বের সুযোগে স্বাধীনতালাভ করেন। এই বংশের রাজা মুঞ্জের সহিত কলচুরি, চের, চোল ও চৌলুক্যগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। কল্যাণীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈলপের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। পরমার-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ভোজ (1010—55)। বহু যুদ্ধে তিনি জয়ী হইলেও কল্যাণীর চালুক্যরাজ ও ত্রিপুরীর কলচুরিরাজের মিলিত আক্রমণের ফলে পরাজিত ও নিহত হন। ভোজ বীর, সুশাসক, বিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্প-সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভোজের মৃত্যুর পর পরমারগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চৌলুক্যগণ মালবের বৃহদংশ অধিকার করেন। অবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খলজি মালব অধিকার করিলে পরমার-বংশের উচ্ছেদ ঘটে।

পরমারগণ

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাট ও কাঠিয়াবাড়ে চৌলুক্যগণ একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা প্রথম ভীম (1022—64) পরমার-বংশীয় রাজা ভোজ ও চেদীরাজ লক্ষ্মীকর্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই গজনীর সুলতান মামুদ বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন। এই বংশের রাজা জয়সিংহ সিদ্ধরাজের (1094—1144)

চৌলুক্যগণ

সময়ে চৌলুক্য রাজ্য মধ্য-ভারত ও রাজপুতানাতেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় ভীমের (1178—1241) আমলে মহম্মদ ঘুরী ও কুতবুদ্দিন আইবক গুজরাট আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণ আলাউদ্দিন খলজির হস্তে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন (1296)।

চৌহানগণ পূর্বে গুর্জর-প্রতিহারগণের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। সম্ভর বা শকম্ভরীতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। তবে দিল্লী ও আজমীর তাঁহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হইয়া উঠে। এই বংশের রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ (1179—92) বহু কাব্য-কাহিনীর নায়ক হইয়া আছেন। তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চন্দেল্ল ও চেদী রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইঁহার হস্তে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী পরাজিত হন (1191)। কিন্তু পর বৎসর তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীর হস্তে ইনি পরাজিত ও নিহত হন এবং দিল্লীতে তথা ভারতে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

চৌহানগণ

গাহড়বালগণ কাশীতে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে কনৌজও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র (1114—54)। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র জয়চন্দ্র (1170—93) মহম্মদ ঘুরীর হস্তে চন্দাবারের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। যোধপুরের বিখ্যাত রাঠোরগণ সম্ভবতঃ ইঁহাদেরই বংশধর।

গাহড়বালগণ

ইসলামের অভ্যুত্থান।—570 খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশের মক্কা শহরে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহা ইসলাম নামে পরিচিত। এই ধর্মের মূলকথা হইল আল্লাহ্ বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরাকার এবং মহম্মদ হইলেন ঈশ্বর-প্রেরিত শেষ দূত বা পয়গম্বর। ইসলাম ধর্ম আরবগণের জীবনে এক নবজীবন সঞ্চার করে এবং অসংখ্য আরব উপজাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হয়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্মের অধিনায়কত্ব করেন খলিফাগণ। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবগণ শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাহারা পূর্বে পারস্য হইতে পশ্চিমে আফ্রিকার মধ্য দিয়া ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মিশর হইতে উত্তরে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দ, ফারঘনা ও কাশগর পর্যন্ত একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

ভারতে মুসলমান অভিযান।—খলিফাই ছিলেন ইসলাম জগতের সর্বোচ্চ শাসক। এই সময়ে খলিফার অধীনে ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হজ্জাজ। হজ্জাজ ভারতেও মুসলিম সাম্রাজ্য-বিস্তারের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। কিছুসংখ্যক আরব

পোত লুণ্ঠনের অভিযোগ তুলিয়া হজ্জাজ সিন্ধু রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বিন্ কাশিমকে প্রেরণ করেন। মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করেন (712)। মহম্মদ বিন্ কাশিমের মৃত্যুর পর ভারতে আরব সাম্রাজ্য-বিস্তারের কাজ অসমাপ্ত রহিয়া যায়। পরে খলিফাগণ হীনবল হইয়া পড়িলে সিন্ধুর আরব-অধিকৃত অঞ্চল আরব সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তথায় আরবগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকে। ভারতে রাষ্ট্রকূট, গুর্জর-প্রতিহার, পাল প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুত্থানের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে আরবগণের রাজ্য-বিস্তারের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

ভারতে আরব অধিকার

মুসলিম জগতে আরবগণ ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মধ্য-এশিয়ার তুর্কী জাতি মুসলিম দুনিয়ায় খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহারা সমরখন্দ হইতে মিশর পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রাধান্যলাভ করে। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আফগানিস্থানের গজনী নামক স্থানে একটি তুর্কী রাজ্য স্থাপিত হয়। গজনী ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যের সহিত তাহার সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে চেনাব হইতে লামঘান পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে হিন্দু শাহীয়-বংশীয় রাজা জয়পাল রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সহিত গজনীরাজ সবুক্তিগিনের (977—998) সংঘর্ষ বাধিল। যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত হইলে, লামঘান হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত অঞ্চল সবুক্তিগিনের রাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু তাহাতেও বিরোধের অবসান হইল না। সবুক্তিগিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মামুদ গজনীর সুলতান হন। সুলতান মামুদের মধ্যে ধর্মান্ধতা ও ধনলিপ্সার এক ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার এই ধর্মান্ধতা ও ধনলিপ্সা চরিতার্থ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ। তিনি একত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই একত্রিশ বৎসরের মধ্যে তিনি সতের বার (মতান্তরে, পনের বার) ভারত আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠন, হত্যা এবং হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও নগরাদি ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালান। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেও ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং হত্যা ও ধ্বংসকার্যই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ভারতে সাম্রাজ্য-বিস্তার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনরত্ন দিয়া গজনীকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বারংবার আক্রমণ এবং লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসকার্য উত্তর-পশ্চিম ভারতকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া অতিশয় দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। ফলে, পরবর্তী মুসলমান

তুর্কী আক্রমণ

গজনী-সুলতান মামুদ

আক্রমণকারীগণের পক্ষে ভারতে আধিপত্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য স্থাপন সহজ হইয়াছিল।

স্থলতান মামুদের বংশধরগণের আমলে গজনী দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মামুদের মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরে পার্শ্ববর্তী ঘুর রাজ্যটি শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অবশেষে ঘুররাজ গিয়াস্থদ্দিন মহম্মদ গজনী অধিকার করিয়া লইলেন (1173)। গিয়াস্থদ্দিন মহম্মদ তাঁহার ভ্রাতা মুইজুদ্দিন মহম্মদকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই মুইজুদ্দিন মহম্মদই ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত হইয়াছেন। মহম্মদ ঘুরী 1175 খ্রীষ্টাব্দে মূলতান ও উচ অধিকার করেন। 1186 খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থলতান মামুদের বংশধরকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করেন। এই সময়ে আজমীরে ও দিল্লীতে চৌহানরাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। মহম্মদ তাঁহার হস্তে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (1191) পরাজিত হইলেও, তিনি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (1192) পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। ফলে, আজমীর ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মহম্মদ ঘুরীর হস্তগত হইল। অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার তাঁহার ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবকের হস্তে দিয়া মহম্মদ ঘুরী দেশে ফিরিয়া গেলেন। কুতবুদ্দিন হানসী, মীরাট, দিল্লী ও রণথম্ভোর অধিকার করিলেন। পর বৎসর মহম্মদ ঘুরী কাশী ও কনৌজ অঞ্চলের গাহড়বাল-বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রকে চন্দাবারের যুদ্ধে পরাজিত করিলে, ঘুর সাম্রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। মহম্মদ ঘুরীর অন্যতম সেনাপতি বক্তিয়ার খলজি পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ অধিকার করিলেন। কুতবুদ্দিন কর্তৃক গুজরাট, কালঞ্জর, মহোবা ও বদাউন অধিকৃত হইল। এইভাবে আর্যাবর্তে এক সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

মহম্মদ ঘুরী

ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন

আলবেরুনী।—স্থলতান মামুদ যখন ভারত আক্রমণে আসিয়াছিলেন, তখন আলবেরুনী নামে জনৈক মুসলমান পণ্ডিত তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। আলবেরুনীর প্রকৃত নাম আবু রিহান। 973 খ্রীষ্টাব্দে তিনি খিবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদ্ ছিলেন। 1017 খ্রীষ্টাব্দে খিবা অধিকারকালে স্থলতান তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন এবং অনুচরদের মধ্যে স্থান দেন। ভারত-অভিযানকালে আলবেরুনী ভারতে আসিয়া এখানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান। হিন্দু আমলের শেষের দিকের ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস রচনায় সেই সকল তথ্য বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। উপনিষদের একেশ্বরবাদ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

তাঁহার রচনা হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে ভারতে সতীদাহ-প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। রাজস্ব ও করভার লঘু ছিল। দণ্ড লঘু ছিল। ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইত না। ভারতীয় সমাজে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। তৎকালে স্বাধীন ও শক্তিশালী ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে তিনি কাশ্মীর, সিন্ধু, মালয়, গুজরাট, বঙ্গদেশ ও কনৌজের উল্লেখ করেন।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know of the origin of the Rajputs? [রাজপুতগণের উৎপত্তি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

2. What do you know of the early Rajput dynasties? [প্রথম যুগের রাজপুত বংশগুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

3. Write what you know about the early Muslim invasion of India. [প্রথম দিকের মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

4. Write a short note on Alberuni. [আলবেরুনী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।]

চতুর্দশ অধ্যায়

সুলতানী আমলে সমাজ-সংস্কৃতি

দিল্লী-সুলতানি।—অপুত্রক অবস্থায় মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার অন্যতম ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবক মুসলিম-বিজিত ভারতীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। দিল্লী এই সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়। কুতবুদ্দিন-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'দাস'-বংশ নামে পরিচিত। ইলতুৎমিস, বলবন প্রভৃতি দাস-বংশীয় সুলতান ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস-বংশের (1206—90) পতনের পর দিল্লীর খলজি-বংশীয় সুলতানগণ রাজত্ব করেন (1290—1320)। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খলজি (1296—1316)। তাঁহার রাজত্বকালে পূর্বে আসাম ও দূর দক্ষিণে কিছু অঞ্চল ভিন্ন প্রায় সমগ্র ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খলজি-বংশের পতনের পর দিল্লীতে তুঘলক-বংশীয় সুলতানগণ রাজত্ব করেন (1320—1413)। তুঘলক-বংশীয় সুলতানগণের মধ্যে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক, মহম্মদ বিন্ তুঘলক ও ফিরোজ শাহ্ তুঘলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ তুঘলকের কুশাসনের ফলে

দাস-বংশ

খলজি-বংশ

দিল্লী-শাসিত মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বহু অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সময়ে উত্তর ভারতে বাংলার স্বাধীন মুসলিম রাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন মুসলিম বাহমনী রাজ্য ও স্বাধীন হিন্দু বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন ঘটে। তুঘলক-বংশীয় সুলতান মামুদ তুঘলকের রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়ার তাতার-বীর তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন এবং দিল্লীতে কয়েকদিনব্যাপী পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা চালাইয়া অগাধ ধনরত্ন লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। তৈমুরের আক্রমণের ফলে দিল্লী-সুলতানি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই দিল্লীর সুলতান-শাসিত রাজ্য সীমাবদ্ধ থাকে। তুঘলকগণের পর দিল্লীতে সৈয়দ-বংশীয় ও লোদী-বংশীয় সুলতানগণ রাজত্ব করেন। লোদী-বংশীয় শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী তৈমুরলঙ্গের বংশধর জহিরুদ্দিন বাবরের হস্তে পরাজিত হইলে দিল্লী-সুলতানির অবসান ঘটে (1526)।

তুঘলক-বংশ

সৈয়দ ও লোদী বংশ

স্বাধীন বাংলার সুলতানগণ।—দিল্লীর সুলতান মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বাংলা দেশে ইলিয়াস শাহী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় (আঃ 1345)। ইলিয়াস শাহ্ ও তৎপুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। অতঃপর ইলিয়াস শাহী-বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। ইলিয়াস শাহী-বংশের দুর্বলতার সুযোগে বাংলা দেশে হাবসী শাসনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু হাবসী সুলতান শামসুদ্দিন মুজফ্‌ফর শাহ্‌কে বিতাড়িত করিয়া আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং বাংলা দেশে হুসেন শাহী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। হুসেন শাহ্ যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ্-ও অন্যতম বিখ্যাত সুলতান ছিলেন। হুসেন শাহী-বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদকে বিতাড়িত করিয়া শের শাহ্ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

ইলিয়াস শাহী-বংশ

হুসেন শাহী-বংশ

বাহমনী রাজ্য।—মহম্মদ বিন্ তুঘলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া হাসান জাফর খাঁ আলাউদ্দিন 'বাহমন শাহ্' নাম গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা বাহমনী রাজ্য নামে খ্যাত। বাহমনী রাজ্যের সহিত ক্রমাগত পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। বাহমনী সুলতানগণের মধ্যে বাহমন শাহের পুত্র তাজুদ্দিন ফিরোজ শাহ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিরোজ একটি যুদ্ধে বিজয়-নগরের রাজা দেব রায়কে পরাজিত করেন। কিন্তু অন্য একটি যুদ্ধে তিনি দেব রায়ের হস্তে পরাজিত হন। ফিরোজ শাহের পর তাঁহার ভ্রাতা

ফিরোজ শাহ্ ও আহম্মদ শাহ্

আহম্মদ শাহ্ সুলতান হন। আহম্মদ শাহের হস্তে তেলেঙ্গনা ও বিজয়নগরের হিন্দু রাজগণ পরাজিত হন। মালবের সুলতান হুসং শাহ্‌কেও তিনি পরাজিত করেন। তিনি গুলবর্গা হইতে বিদরে বাহমনী রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে বাহমনী রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু মামুদ গাওয়ান নামে এক বিচক্ষণ মন্ত্রীর আমলে বাহমনী রাজ্য পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর (1482) পর বাহমনী রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটে। বাহমনী রাজ্য বিজাপুর, আহম্মদনগর, বেরার, বিদর ও গোলকুণ্ডা—এই পাঁচটি পৃথক মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সকল বিভিন্ন রাজ্য প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত থাকিত এবং পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ করিত। আহম্মদনগর বেরার এবং বিজাপুর বিদর অধিকার করিয়া লইলে বিজাপুর, আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডা, এই তিনটি রাজ্যই অবশিষ্ট থাকে। পরে মুঘল বাদশাহ্‌গণ এই রাজ্যগুলি অধিকার করেন।

মামুদ গাওয়ান

রাজ্যপঞ্চক

বিজয়নগর।—মহম্মদ বিন্ তুঘলকের আমলে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল বিজয়নগর রাজ্য। 1336 খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং পর পর এই রাজ্যে 'সঙ্গম', 'সালুব', 'তুলুব' ও 'আরবিডু' নামে 4টি পৃথক রাজবংশ রাজত্ব করে। সঙ্গম-বংশীয়গণ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল (1336—87) রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দেব রায় ও তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় দেব রায়। বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহের হস্তে দেব রায় পরাজিত হইয়াছিলেন এবং পরে দেব রায় ফিরোজ শাহ্‌কে পরাজিত করিয়াছিলেন। বাহমনী সুলতান দেব রায়ের পুত্র বিজয় রায়কে পরাজিত করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দেব রায়ের আমলে বিজয়নগর রাজ্য উড়িষ্যা হইতে মালাবার এবং গুলবর্গা হইতে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় দেব রায়ের সময়ে ইতালীয় ভ্রমণকারী নিকলো কন্তি এবং ইরানী রাজদূত আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দেব রায় বাহমনী সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। সালুব-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নরসিংহ সালুব। তিনি উড়িষ্যারাজের হস্তে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার সেনাপতি নরস নায়কের পুত্র নরসিংহ তুলুব-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তুলুব-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি উড়িষ্যারাজকে পরাজিত করেন এবং বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত

দ্বিতীয় দেব রায়

কৃষ্ণদেব রায়

করিয়া গুলবর্গা দুর্গ বিধ্বস্ত করেন। রায়চুর তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার রাজত্বকালেই পর্তুগীজ পর্যটক পায়েস বিজয়নগর পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই বিজয়নগর গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রায়ের আমলে বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের মিলিত বাহিনীর আক্রমণে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হয় (1565)। আরবিডু-বংশীয় রাজগণ বিজয়নগরের অতীত গৌরব আর ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। আরবিডু-বংশের রাজা দ্বিতীয় ভেঙ্কটের মৃত্যুর পর বিজয়নগর রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তথায় কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। কতকাংশ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ অধিকার করিয়া লন। এইভাবে বিজয়নগরের পতন ঘটে।

বিজয়নগরের পতন

দ্বিতীয় দেব রায়ের রাজত্বকালের বিজয়নগর সম্পর্কে পর্তুগীজ পর্যটক নিকলো কন্তি বলিয়াছিলেন যে, বিজয়নগরের রাজাই তৎকালে সমগ্র ভারতে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ইরানী রাজদূত আবদুর রজ্জাক বলিয়াছিলেন যে, বিজয়নগরের মতো আর কোনও নগর পৃথিবীতে আছে বলিয়া তিনি জানেন না।

গৌরবময় বিজয়নগর

ভারতীয় ও ইসলামীয় সভ্যতার সংঘাত ও সমন্বয়।—মুসলমানগণ যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, সে সকল দেশের প্রায় সবগুলিতেই তাঁহারা সহজেই ইসলাম ধর্ম ও ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে আসিয়া তাঁহারা এক সুপরিণত সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সমূলে গ্রাস করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অন্যপক্ষে, মুসলমানগণের পূর্বে যে সকল বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়াছিল, তাহারা ভারতীয় ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীরা নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচারের জন্যই বাহির হইয়াছিলেন। ফলে, ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘাত অনিবার্য ছিল। মুসলমানগণ ভারতীয়গণকে 'জিম্মি' ও 'কাফের' বলিয়া ঘৃণা করিতেন এবং হিন্দুগণ মুসলমানগণকে 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া ঘৃণা করিতেন।

সংঘাত ও বিরুদ্ধতা

কিন্তু মুসলমানগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করায় হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পর পাশাপাশি বাস করিতেছিলেন এবং পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইসলামের মূলকথা ছিল আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। হিন্দু ধর্মের

উপনিষদের বাণীও ছিল তাহাই—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ভারতীয় ধর্মের এই একেশ্বর-বাদ আলবেরুনীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পরস্পরের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার প্রবেশ করিয়াছিল। নানাভাবেই পারস্পরিক বিরোধিতা হ্রাস পাইতে-ছিল এবং পরধর্ম সম্পর্কে উদারতা ও পরস্পরের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছিল। মুসলমানগণ নানক ও চৈতন্যের মতো অমুসলমান সাধকদের বাণী শুনিতেছিলেন, আবার হিন্দুগণ কবীর, মুইনুদ্দিন চিশ্‌তির মতো মুসলমানদের বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। এমন কি, হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত পূজার জন্য সত্যপীর, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্ভব হইতেছিল। এইভাবে হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়-সাধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চলিতেছিল। এই সমন্বয় ও মৈত্রী সাধনের জন্য বহু শাসক ও সাধক সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শাসক-গণের মধ্যে বাংলার হুসেন শাহ্‌, কাশ্মীরের জয়নুল আবেদিন ও বিজাপুরের ইউসুফ আদিল শাহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার সুলতান হুসেন শাহের আমলেই চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হুসেন শাহের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মালাধর বসু সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় 'ভাগবত' অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ বাংলা ভাষায় 'মহাভারত' অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কাশ্মীরের জয়নুল আবেদিন-ও অনুরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার আমলে যে সকল ব্রাহ্মণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এবং হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর তুলিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় 'মহাভারত' এবং 'রাজতরঙ্গিণী' এবং ফারসী ও আরবী ভাষা হইতে বহু গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বিজাপুরের সুলতান ইউসুফ আদিল শাহ্‌ হিন্দু মারাঠা মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন তাঁহার ধর্মীয় উদারতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইউসুফ আদিল শাহ্‌ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উচ্চ রাজপদেও কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি বিদ্বান্‌ ব্যক্তি, কবি ও শিল্পীগণের সমাদর করিতেন। এই বংশের অন্যতম সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌-ও ধর্মীয় উদারতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা

হুসেন শাহ্‌

জয়নুল আবেদিন

ইউসুফ আদিল শাহ

সমন্বয়-সাধনের ক্ষেত্রে মুসলিম সুফীগণ এবং রামানন্দ, কবীর, নামদেব, নানক, চৈতন্যদেব, নরসিংহ মেহ্‌তা প্রভৃতি সাধকগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিক গ্রহণ

করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠায়, হিন্দু ও মুসলমান সাধকগণ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মেরই মূলকথা এক— ভগবানের সহিত মানবাত্মার মিলন এবং সকল মানুষই ভগবানের চক্ষে সমান। ফলে, হিন্দু-মুসলিম মিলনের ক্ষেত্রে মুসলিম সুফী ও হিন্দু ভক্তিবাদী সাধকগণ অগ্রণী হইয়াছিলেন। মুসলিম সুফীগণের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মুইনুদ্দিন চিশ্‌তি প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নিজামুদ্দিন আউলিয়া আফগানিস্থানের একটি গ্রাম হইতে আসিয়া দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই জাতিধর্ম-ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে তাঁহাকে ভক্তি করিত। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাঁহার সমাধিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। খাজা মুইনুদ্দিন চিশ্‌তি আজমীরে বাস করিতেন। তাঁহাকেও হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে ভক্তি করিত। ইঁহারা উভয়েই হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও মৈত্রীর বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া

মুইনুদ্দিন চিশ্‌তি

রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি হিন্দী ভাষায় ধর্মপ্রচার করেন। তিনি রামসীতার উপাসক ছিলেন, কিন্তু জাতি ও ধর্মের বৈষম্যে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে নাপিত, মুচি এবং মুসলমানও ছিলেন। বিখ্যাত মুসলমান সাধক কবীর ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য।

রামানন্দ

মহারাষ্ট্রের ভক্তিবাদী সাধক নামদেব ছিলেন দরজী। তিনিও ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তিনি মূর্তিপূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ভগবৎ-সাধনা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি জাতিভেদ ও ধর্মভেদ মানিতেন না। বহু মুসলমানও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নামদেব

কাশীর নিকটে এক মুসলমান দরিদ্র তন্তুবায়ের গৃহে কবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, মুসলমানের আল্লাহ্ ও হিন্দুর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যিনিই হিন্দুর রাম, তিনিই মুসলমানের রহিম। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কবীর

পাঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে গুরু নানকের জন্ম হয় (1469)। নানক ভারতের বহু তীর্থ এবং মক্কা ও বাগদাদ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার মতে, ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ ও বহু দেবদেবী মানিতেন না। হিন্দু-মুসলমান অনেকেই দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ 'শিখ' নামে পরিচিত হয়। এইরূপে ভারতে এক শক্তিশালী নবধর্মের অভ্যুদয় হয়।

নানক

1538 খ্রীষ্টাব্দে 69 বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নানকের প্রায় সমসময়েই (1485) বাংলা দেশের নদীয়ায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 24 বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে পর্যটন করেন। বাংলা দেশের স্থলতান হুসেন শাহ্ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। ঈশ্বরভক্তি ও জীবে দয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্মের মূলকথা। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করেন। মাত্র 48 বৎসর বয়সে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান হয়। নরসিংহ মেহ্‌তা 1414 খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার তীব্র বিরোধিতা করেন। ইহাতে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তাহাতেও ভক্তিধর্ম প্রচারে তিনি বিরত হন না। নরসিংহ মেহ্‌তা বহু ভক্তিপূর্ণ কবিতা ও গীত রচনা করেন। এইগুলি পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য

নরসিংহ মেহ্‌তা

সাহিত্য।—এই যুগের সাহিত্য কেবল আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষাগুলিতেই উন্নত-ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টি শুরু হইয়াছিল। এই যুগে ভারতে ফারসী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খসরু। ফারসী ভাষায় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে জিয়াউদ্দিন বরনি ও মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে যে সকল মাতৃভাষা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে হিন্দী, বাংলা, পাঞ্জাবী, মারাঠী প্রভৃতিই প্রধান। আমীর খসরু হিন্দী ভাষাতেও বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দী সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন কবিদের মধ্যে চাঁদ বরদাই, জগনায়ক, বাবা গোরখনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ, কবীর প্রভৃতির রচনাতে হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। উর্দু শব্দের অর্থ শিবিরের ভাষা। উর্দু ভাষা মূলতঃ হিন্দী। ইহাতে কেবল আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার খুব বেশী। সুলতানী আমলে বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বহু প্রতিভাধর কবি এই যুগে বাংলা দেশে জন্মিয়াছিলেন। হুসেন শাহ্, নসরত শাহ্ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানগণ বাংলা সাহিত্যের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলিকেও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

ফারসী সাহিত্য

এই যুগে সুলতান হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ভাগবতের', হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র নামে বা উপাধিকারী এক কবি 'মহাভারতের' এবং পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্বের' অনুবাদ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-ও এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। কবি বিজয়গুপ্ত তাঁহার 'পদ্মাপুরাণ' (মনসামঙ্গল) এই যুগেই রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগে বহু প্রতিভাধর বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। 'বৈষ্ণব পদাবলী' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক এবং তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় পাঞ্জাবী ভাষারও খুবই উন্নতি হইয়াছিল। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ প্রভৃতির রচনায় মারাঠী সাহিত্যেরও উন্নতি হইয়াছিল।

মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য

স্থাপত্য।—সুলতানী আমলে স্থাপত্যশিল্পের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগের স্থাপত্যশিল্পে ভারতীয় ও ইসলামীয় রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এই নূতন স্থাপত্য-শিল্পধারা ইন্দো-সারাসেনীয় (Indo-Saracenic) রীতি নামে পরিচিত। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংমিশ্রণের পরিমাণ বিভিন্ন রূপ ছিল। দিল্লীতে মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় বাস করায় এবং উহা ইসলামীয় ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায়, দিল্লীতে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তিগুলিতে ভারতীয় প্রভাবের অপেক্ষা সারাসেনীয় প্রভাব অনেক বেশী। স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-রূপে ইল্‌তুৎমিস-রচিত 'কুতবমিনার', আলাউদ্দিন খলজি কর্তৃক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় নির্মিত 'জমায়েতখানা মসজিদ' এবং কুতব মসজিদে সংযোজিত 'আলাই দরওয়াজা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজধানী দিল্লী হইতে দূরে জৌনপুর, বাংলা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে যে-সব স্থাপত্য-রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলিতে ভারতীয় প্রভাবই অধিক। এই সকল স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে জৌনপুরের 'অতাল মসজিদ', গুজরাটের 'জামি মসজিদ', 'মুহাফিজ খাঁ মসজিদ', বাংলা দেশের 'ছোট ও বড় সোনা মসজিদ', 'কদম রসুল মসজিদ' 'আদিনা মসজিদ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইন্দো-সারাসেনীয় রীতি

দিল্লী

অন্যান্য অঞ্চল

এই যুগে বিশুদ্ধ ভারতীয় স্থাপত্য-রীতিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বিজয়নগরের স্থাপত্যকীর্তিগুলি তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বৈদেশিক পর্যটকগণও বিজয়নগর শহরের স্থাপত্যকীর্তিগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তালিকোটের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুলতানগণের মিলিত সৈন্যবাহিনী বিজয়নগরে যে ব্যাপক ধ্বংসকার্য চালাইয়াছিল, তাহাতে অসংখ্য প্রাসাদ ও মন্দির

হিন্দু স্থাপত্য
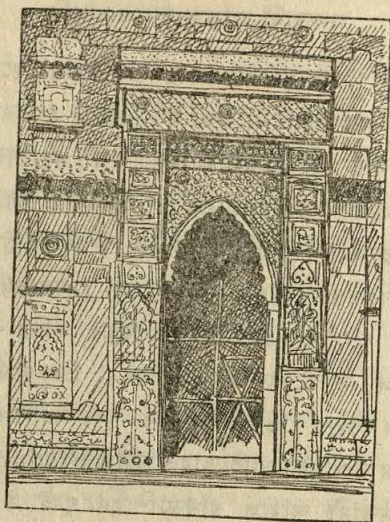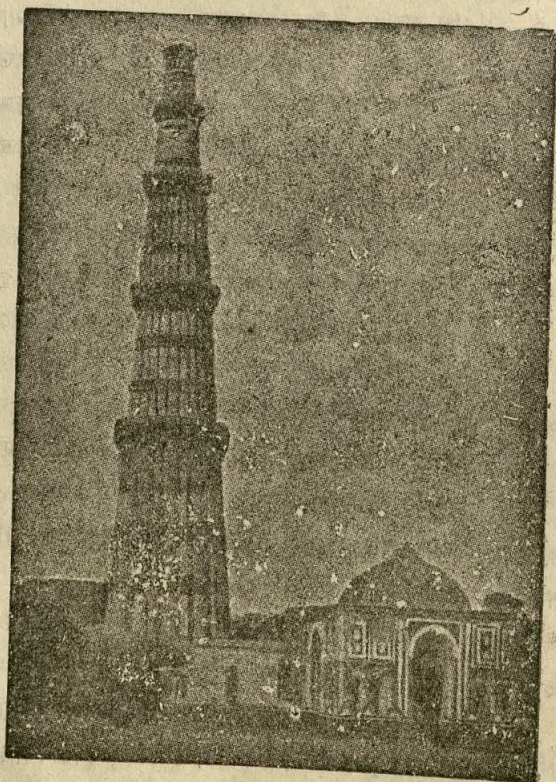
ছোট সোনা মসজিদ—বঙ্গদেশ

কুতবমিনার—দিল্লী
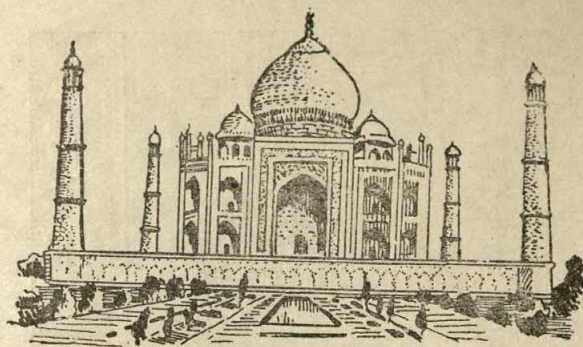
বড় সোনা মসজিদ—বঙ্গদেশ
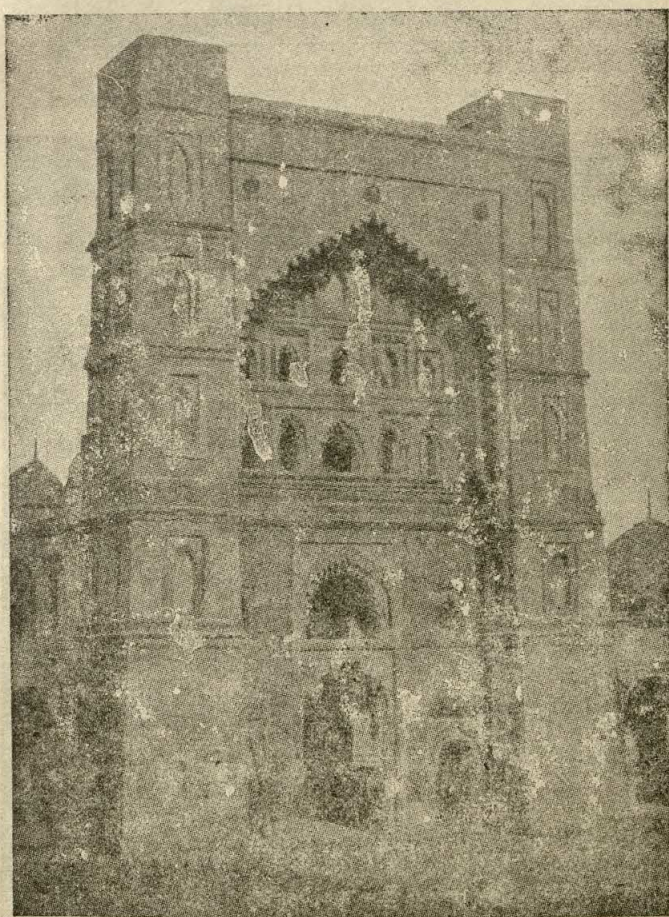
অতাল মসজিদের তোরণ—জৌনপুর
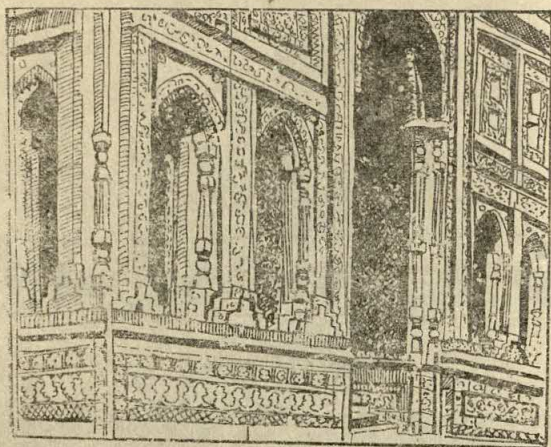
আলাই দরওয়াজা—দিল্লী
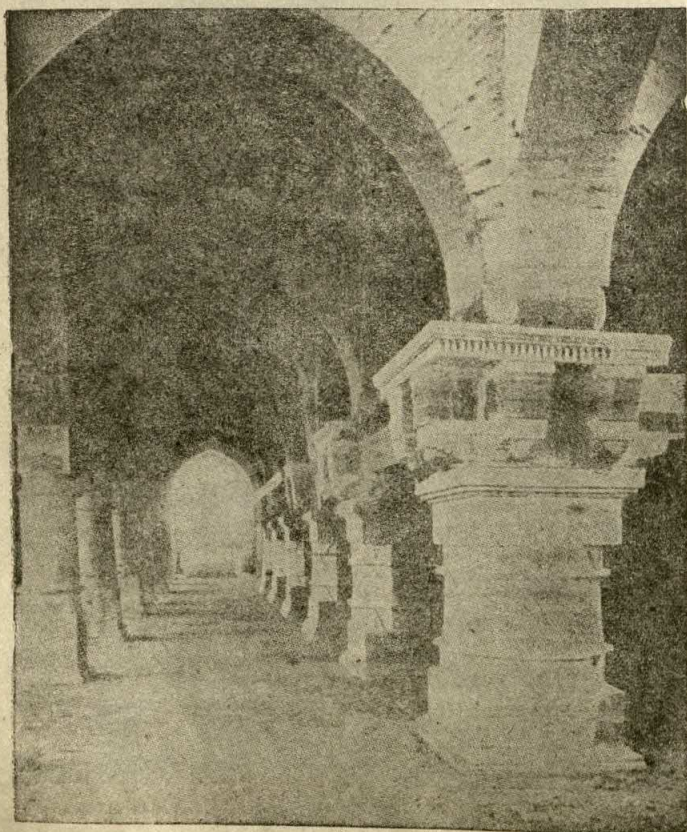
আদিনা মসজিদ—বঙ্গদেশ

বিনষ্ট হইয়াছিল। যেগুলি সেই ব্যাপক ধ্বংসলীলার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, সেগুলি আজও বিজয়নগরের অপূর্ব স্থাপত্যশিল্পের সাক্ষ্য দিতেছে। এই সকল স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল 'বিঠলস্বামীর মন্দির' ও 'হাজার মন্দির'।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা।—সুলতানী আমলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সমসাময়িক ইতিহাস, সাহিত্য ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের রচনা হইতে জানা যায়। সুলতানী আমলে ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে ধনদৌলত, স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমাণিক্যের অভাব ছিল না। ভারতের এই অতুলনীয় সমৃদ্ধির মূলে ছিল তাহার কৃষি, শ্রমশিল্প ও ব্যবস্থায়-বাণিজ্য। দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যে ব্যস্ত থাকিলেও গ্রামাঞ্চলে শ্রমশিল্পের অভাব ছিল না। দেশে আজকালকার মতো বড় কল-কারখানা ছিল না সত্য, তবে দেশ শ্রমশিল্পে খুবই উন্নত ছিল। শ্রমশিল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, প্রস্তরশিল্প, হস্তিদন্তশিল্প, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি। দেশে কাগজ, ইট, চিনি, অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন প্রকার পাত্র, পাদুকা, মদ্য ও গন্ধদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। বস্ত্রশিল্পের জন্য বঙ্গদেশ ও গুজরাট সর্বাধিক বিখ্যাত ছিল। 1405—06 খ্রীষ্টাব্দে চীনা পর্যটক মা হুয়ান বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, ঐ সময় বাংলা দেশে ছয় প্রকার সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র উৎপন্ন হইত। এই সকল বস্ত্র সাধারণতঃ প্রস্থে দুই হাত ও দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত হইত। দেশে রেশমের কীট পালন করা হইত। তাহা হইতে উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হইত। মা হুয়ান বলিয়াছেন, বাংলা দেশে নারিকেল, ধান ও তাল হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত।

কৃষি ও শ্রম শিল্প

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ খুবই উন্নত ছিল। এদেশ হইতে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য, বস্ত্র, চাউল, চিনি, লোহা, সোরা, মসলা, নীল ও আফিম বিদেশে রপ্তানি করা হইত। পারস্যোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলি ভারতীয় শস্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। বাহির হইতে এদেশে নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্য, ঘোড়া, খচ্চর ও ক্রীতদাস আমদানি করা হইত। দেশে সাধারণতঃ দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত কম ছিল। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে মরক্কো হইতে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, দ্রব্যের এমন অল্পমূল্য তিনি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দেখেন নাই। দেশে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল। স্বর্ণমুদ্রাকে তঙ্কা ও রৌপ্যমুদ্রাকে জিতল বলা হইত। মা হুয়ানের বিবরণ হইতে জানা যায়, বাংলা দেশে ছোট মুদ্রা হিসাবে কড়ির (কপর্দক) প্রচলন ছিল। এদেশে বহু বড় বড় বাজার ছিল। সুলতানী আমলে পর্তুগীজ

পর্যটক পায়েস বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিজয়নগর সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানকার ব্যাপক ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং বহু মূল্যবান্ মণিমাণিক্যের, বিশেষতঃ হীরকের, জন্য এখানে সকল জাতি ও দেশের লোককে আসিতে দেখা যায়।" দেশে দাস-ব্যবসায়ও প্রচলিত ছিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বক্তিরা প্রচুর সংখ্যক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রাখিতেন। সুলতান আলাউদ্দিনের 50,000 এবং ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের 2,000 ক্রীতদাস ছিল। শ্রম-শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের পৃথক পৃথক সংঘ (guild) ছিল। এই সময়ে বহির্বাণিজ্যের জন্য দেশে বহু বন্দর ছিল। আবদুর রজ্জাকের বিবরণ হইতে জানা যায়, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রায় তিনশত বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ঐ সকল বন্দর হইতে ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, পারস্য, আরব, আবিসিনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপের সহিত বাণিজ্য চলিত। দেশে জাহাজ-নির্মাণের ব্যবস্থা ছিল। বিজয়নগরের বাণিজ্যপোতগুলি মালদ্বীপে নির্মিত হইত।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

দেশে ধনদৌলতের অভাব ছিল না সত্য, তবে ধনী ও দরিদ্রের অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। জনসাধারণের অবস্থা ছিল শোচনীয়। করভার ছিল অত্যধিক। মুসলমান-শাসিত অঞ্চলে হিন্দু প্রজাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইত। হিন্দুরা অনেক সময় জিজিয়া কর দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহাদিগকে রাজস্বও অনেকক্ষেত্রে অধিক দিতে হইত। আলাউদ্দিন খলজির আমলে হিন্দু প্রজাদিগকে উৎপন্ন শস্যের অধিকাংশ রাজস্বরূপে দিতে হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রুশ পর্যটক আথানাসিয়াস নিকিতিন ভারত পর্যটনে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন বাহমনী রাজ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন, "দেশে ধনসম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও জনসাধারণের অবস্থা সুখের ছিল না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকরা প্রায়ই বিলাসব্যসনে মত্ত থাকিতেন। রাজ্যে কৃষি ও উৎপাদন ব্যবস্থা ভালো ছিল, কিন্তু কৃষক ও কারিগরের জীবন ছিল দুঃসহ।" এই বিবরণ সুলতানী আমলের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কেও সত্য ছিল।

জনসাধারণের অবস্থা

সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার খুবই সংকুচিত করা হইয়াছিল। অবরোধ বা পর্দা প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। তবে বিজয়নগর রাজ্যে স্ত্রীলোকদের অবস্থা অনেকখানি ভালো ছিল। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দু সমাজের মতো সেখানেও সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল সত্য, তবে স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং অবরোধ-প্রথা তেমন কঠোর ছিল না। স্ত্রীলোকরা কুস্তিগীর ও জ্যোতিষীর কাজও করিত। তাহারা রাজপ্রাসাদে কেরানীর কাজেও নিযুক্ত হইত। স্ত্রীলোকরা বিচারক, প্রহরী প্রভৃতির পদেও

স্ত্রীলোকদের অবস্থা

নিযুক্ত হইত। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহাতে স্ত্রীলোকদের অধিকার স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুণ্ণ হইত।

সমাজে নানারূপ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। সৌধ-নির্মাণকালে ভিত্তিমূলে নররক্ত দেওয়ার প্রথা ছিল।

স্থলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা।—স্থলতানী আমলে ভারতে একটি সুবৃহৎ ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান শাসকগণের অধিকাংশই পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন এবং মুসলিম শাসকগণ ও রাষ্ট্রের উপর মোল্লাদের প্রাধান্য ছিল। আলাউদ্দিন খলজি রাষ্ট্রের উপর মোল্লাদের প্রভাব হ্রাস করিয়া নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলতানই মোল্লা-মৌলবীদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই ইসলামীয় ভারতীয় রাষ্ট্রে দুই-একজন উদারমনা স্থলতানের আমলে ভিন্ন সকল সময়েই অমুসলমানদের উপর উৎপীড়নের নীতি গৃহীত হইত।

মোল্লাতন্ত্র

স্থলতানই ছিলেন রাজ্যের সকল রাজনৈতিক শক্তির মূর্ত প্রতীক। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বাগদাদের খলিফাগণ মুসলিম জগতের সর্বোচ্চ নায়ক বলিয়া স্বীকৃতি পাইলেও, কার্যতঃ দিল্লীর স্থলতানগণের ক্ষেত্রে ইহা নিতান্তই মৌখিক ছিল। স্থলতানের ইচ্ছা ও মুখের কথাই ছিল আইন। অবশ্য, কোরান-শরিয়তের বিধি-নিষেধ স্থলতানগণ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিতেন। প্রশাসন, সমর ও বিচার, সকল বিষয়েই স্থলতানগণই ছিলেন সর্বময় কর্তা। স্থলতানী শাসন সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার সামরিক শক্তি অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল রাষ্ট্রের শক্তিশালী জায়গিরদারদের সৈন্য-সরবরাহের উপর। ফলে, স্থলতানকে প্রায়ই প্রতিপত্তিশালী জায়গিরদারদের উপর নির্ভর করিতে হইত। প্রতিপত্তিশালী জায়গিরদারদের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য আলাউদ্দিন খলজি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে তাহাতে তিনি যে সর্বাংশে সফল হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। সামরিক শক্তির উপর রাষ্ট্র নির্ভরশীল হওয়ায়, শক্তিশালী সমর-নায়ক এবং সেনাপতিগণের উপরও স্থলতানকে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতে হইত। দিল্লীর স্থলতানী সাম্রাজ্য সুবৃহৎ হওয়ায়, উহা বহু প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রাদেশিক শাসকগণ প্রায়ই এক-একটি ক্ষুদে স্থলতান ছিলেন। ফলে স্থলতানকে রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রভাবশালী জায়গিরদার, প্রতাপশালী সমর-নায়ক ও নিপুণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সদিচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভরশীল হইতে হইত। ইহাদের চক্রান্তের ফলে স্থলতানী যুগে প্রায়ই রাজবংশগুলির উত্থান-পতন ঘটিত। স্থলতান-পদ

স্থলতানই সর্বময় কর্তা

স্থলতানের শক্তির সীমাবদ্ধতা

উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইলেও, সুলতানের অযোগ্যতার ফলে রাষ্ট্রের আমীর-ওমরাহ্ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ প্রায়ই সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়া নূতন সুলতান নির্বাচন করিতেন।

সুলতানী শাসন-ব্যবস্থা প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। সমগ্র সাম্রাজ্যের ও রাজধানীর শাসন-ব্যবস্থা সুলতানের উপর ন্যস্ত থাকিলেও প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসকগণ প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব করিতেন। প্রাদেশিক শাসকগণ 'নায়েব-সুলতান' (সুলতানের প্রতিনিধি) নামে অভিহিত হইতেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী ছিলেন। রাষ্ট্রের প্রধান কাজী বিচার-বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন। প্রদেশেও কাজীরা বিচার করিতেন। কোতয়ালের উপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল।

প্রাদেশিক শাসন

সুলতানী সেনাবাহিনীতে বহু জাতির লোক কাজ করিত—যেমন, তুর্কী, ইরানী, আরব, আফগান, ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু। বহু জাতির সমবায়ে গঠিত সৈন্য-বাহিনীগুলির মধ্যে রেষারেষি ও দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিল। ইহা সুলতানী বাহিনীর অন্যতম দুর্বলতা ছিল। সুলতানী আমলে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। অসি, ভল্ল ও তীর-ধনুক প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত।

সামরিক ব্যবস্থা

সুলতানী শাসন-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা দুর্বলতা ছিল এই যে, সুলতানের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, বুদ্ধি ও কার্যদক্ষতার উপরই উহার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল। সুলতান দুর্বল হইলে প্রায়ই কেন্দ্রে ও প্রদেশে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ঘটিত—কেন্দ্রে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইত এবং প্রদেশে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটিত। অবশ্য, এই দুর্বলতা কেবল সুলতানী আমলেরই নহে, এই দুর্বলতা ছিল রাজতন্ত্রের সহজাত।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know of the impact of Islam on India and its effect on Indian religion, culture and society? [ভারতে ইসলামের সংঘাত এবং ভারতীয় ধর্মে, সংস্কৃতিতে ও সমাজে উহার প্রভাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

2. Describe the economic condition of India during the Sultani Period. [সুলতানী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।]

3. What do you know of the development of Indian vernacular literature in the Sultani Period? [সুলতানী আমলে ভারতীয় মাতৃভাষাসমূহের বিকাশ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

4. Briefly describe the administrative system of the Sultani Period. [সুলতানী যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্য—মুঘল যুগে সমাজ-সংস্কৃতি

মুঘল সাম্রাজ্য।—1526 খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর দিল্লীর শেষ আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। পানিপথের যুদ্ধের আট মাসের মধ্যে পশ্চিমে আটক হইতে পূর্বে বিহার পর্যন্ত প্রায় সমস্ত অঞ্চল বাবরের অধিকারভুক্ত হয়। 1527 খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ খাহ্নুয়ার যুদ্ধে বাবরের হস্তে পরাজিত হইলে বাবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। পর বৎসর বাবর চন্দেরী দুর্গ অধিকার করেন। ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদী আফগানগণকে সংঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। 1529 খ্রীষ্টাব্দে বাবর তাঁহাকে গোগরার যুদ্ধে পরাজিত করেন। এইভাবে বাবর ভারতে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হইয়াছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

মুঘল শব্দটি মঙ্গোল শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু বাবর আসলে মঙ্গোল ছিলেন না। তাঁহার মাতা বিখ্যাত মঙ্গোল-বীর চিঙ্গিস খাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মঙ্গোলের সহিত বাবরের এই সম্পর্ক। বাবর ছিলেন তাতার। তিনি ও তাঁহার পিতা তাতার-বীর তৈমুরলঙ্গের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবর ছিলেন তৈমুরলঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা ফারঘনা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ওমর শেখ মির্জার মৃত্যুর পর বাবর ফারঘনার সিংহাসনলাভ করেন এবং তৈমুরের পুরাতন রাজধানী সমরখন্দও জয় করেন। কিন্তু তিনি ফারঘনা ও সমরখন্দ হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি কাবুল অধিকার করেন (1504)। তৈমুরলঙ্গ একদা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও দিল্লী জয় করিয়াছিলেন। ফলে, বাবর তৈমুর-বিজিত ভারতকে তাঁহার পূর্বপুরুষের হৃত রাজ্য বলিয়া গণ্য করিতেন। দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে তিনি দিল্লী অধিকার করেন। পরে উত্তর ভারতের এক সুবিশাল অঞ্চল তাঁহার পদানত হয়। এইভাবে ভারতে তথাকথিত মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। দিল্লীর পূর্ববর্তী তাতার ও আফগান শাসকগণ নিজেদিগকে সুলতান বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু বাবর ও তাঁহার বংশধরগণ নিজেদিগকে বাদশাহ্ বলিতেন। ফলে, বাবরের দিল্লী-জয়ের সহিত কেবল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল না, দিল্লীতে সুলতানির অবসান হইল এবং বাদশাহী যুগের সূত্রপাত ঘটিল।

বাবরের পরিচয়

বাদশাহী আমল

গোগরার যুদ্ধের অল্পকাল পরেই বাবরের মৃত্যু ঘটে। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন সম্রাট হন। বাবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা হুমায়ুনের ছিল না। তিনি ভ্রাতাদের সহিত কলহ-বিবাদ এড়াইবার জন্য মধ্যম ভ্রাতা কামরানকে কাবুল, কান্দাহার, পাঞ্জাব ও হিশার ফিরোজা ছাড়িয়া দেন; অন্য দুই ভ্রাতা হিন্দাল ও আশকারিকে যথাক্রমে মেওয়াট ও সম্ভল ছাড়িয়া দেন। এইভাবে বাবর-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা বিনষ্ট হয়। এই সময়ে গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহ্ এবং বিহারের আফগান-বীর শের খাঁ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহ্‌কে দমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু শের খাঁর হস্তে তিনি বক্সারের নিকটবর্তী চৌসায় এবং কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (1540)। হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় (1539) শের শাহ্ নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিলগ্রামের যুদ্ধের পর দিল্লীও তাঁহার হস্তগত হইল। হুমায়ুন রাজ্যহারা গৃহহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। দিল্লীতে পুনরায় আফগান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। শের শাহ্ প্রথম জীবনে ছিলেন সাসারামের জনৈক জায়গিরদারের পুত্র। তিনি বিহারের আফগান শাসনকর্তা বাহার খাঁ লোহানীর পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিহার এবং বাংলার হুসেন শাহী বংশীয় সুলতান মামুদ শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া বাংলা দেশ অধিকার করেন। দিল্লী অধিকারের পর তিনি পাঞ্জাব, মালব, সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করেন। আজমীর হইতে আবু পর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডও শের শাহের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু কালঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে অকস্মাৎ বারুদের গুদামে বিস্ফোরণের ফলে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে (1545)।

হুমায়ুন

শের শাহ্

শের শাহ্ তাঁহার শাসনকালের মাত্র এই পাঁচ বৎসরে সমগ্র সাম্রাজ্যের সুশাসনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। শের শাহ্ তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যকে 47টি সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি সরকার কতকগুলি পরগনায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক পরগনায় একজন আমিন, একজন শিকদার, একজন কোষাধ্যক্ষ ও দুইজন কারকুন (হিসাবরক্ষক কেরানী) থাকিত। পরগনার কর্মচারিগণের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক পরগনায় একজন 'শিকদার-ই-শিকদারান' ও একজন 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' থাকিতেন। শের শাহ্ সমগ্র সাম্রাজ্য জরিপ করিয়া প্রত্যেক প্রজার জমি পাট্টা-কবুলিয়তের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। জমিতে কৃষকদের স্থায়ী স্বত্ব ছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র রাজস্বরূপে গৃহীত

হইত। কোন কারণে শস্যহানি ঘটিলে রাজস্ব মকুব করা হইত। তিনি মুদ্রা-প্রচলন ও ডাক-ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ নিবারণের জন্য শের শাহ্ কতিপয় ব্যবস্থা করেন। গ্রামাঞ্চলে অপরাধী-নির্ণয় ও শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব 'মকদ্দম' বা গ্রাম-প্রধানদের উপর ন্যস্ত থাকিত। শের শাহ্ বিচার-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। পরগনায় আমিন, কাজী, মীর-ই-আদল ও মুনসিফ-ই-মুনসিফানদের উপর বিচারের ভার থাকিত। রাজধানীতে বিচারের জন্য প্রধান কাজী থাকিতেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র যোগাযোগ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি বহু পথ নির্মাণ করান ও ডাক-ব্যবস্থার উন্নতি করেন। পূর্ববঙ্গ হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ একটি রাজপথ তিনি নির্মাণ করেন। এখন উহাই "গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড" নামে পরিচিত হইয়াছে। তিনি আগ্রা হইতে বুরহানপুর, আগ্রা হইতে চিতোর ও যোধপুর, লাহোর হইতে মুলতান পর্যন্ত কতকগুলি সুদীর্ঘ পথ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পথিকদের সুবিধার জন্য তিনি পথিপার্শ্বে বহু বৃক্ষরোপণ ও বহু সরাইখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হইল তাঁহার হিন্দু-মুসলিমের প্রতি সমব্যবহার ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পথিপার্শ্বে তিনি হিন্দুদের জন্য পৃথক সরাইখানা নির্মাণ করাইয়া দেন এবং হিন্দুদের জন্য প্রত্যেক পরগনায় পৃথক হিন্দু কারকুন নিয়োগ করেন। উচ্চ রাজকর্মচারীর পদেও তিনি হিন্দুদিগকে নিয়োগ করেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষ যে একজন সুমহান্ সম্রাটের শাসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শের শাহ্ অতিশয় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। মধ্যযুগে তাহাও অসাধারণ ব্যাপার ছিল। শের শাহ্ দীর্ঘজীবী হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইতে পারিত। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়তো আর সম্ভব হইত না।

শের শাহের কৃতিত্ব ও শাসন-ব্যবস্থা

শের শাহের বংশধরগণের মধ্যে কেহই সুযোগ্য ছিলেন না। তাহা ছাড়া, তাঁহারা গৃহবিবাদে ব্যস্ত ছিলেন। হুমায়ুন পারস্য-সম্রাটের সহায়তায় তাঁহার ভ্রাতা কামরানকে পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়াছিলেন (1545)। শের শাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করিয়া পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন (1555)। ইহার অল্প কয়েকদিন বাদে সিঁড়ি হইতে পতনের ফলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

হুমায়ুনের দিল্লী-পুনরধিকার

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার বালকপুত্র আকবর দিল্লীর বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কিন্তু ঐ সময় আকবর লাহোরে ছিলেন। আফগান সুলতান মহম্মদ

আদিল শাহ্ আগ্রা ও মালবের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হিমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করিয়া পুনরায় দিল্লী ও আগ্রা উদ্ধার করিলেন (1556)। পর বৎসর বিভিন্ন যুদ্ধে আফগান নায়কগণ একে একে পরাজিত হইলেন। ফলে, ভারতে আফগান শক্তি প্রায় নির্মূল হইল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আকবর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাহার প্রতিষ্ঠার কার্যে মনোনিবেশ করেন। এই সুদীর্ঘকাল কোন-না-কোন যুদ্ধে তিনি লিপ্ত থাকিতেন। 1561 খ্রীষ্টাব্দে মালব মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। 1564 খ্রীষ্টাব্দে আকবর গণ্ডোয়ানার হিন্দু রাজ্য অধিকার করেন। 1568 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার হস্তে চিতোর বিধ্বস্ত হয়। 1569 ও 1570 খ্রীষ্টাব্দে তিনি রণথম্ভোর, কালঞ্জর, বিকানীর ও জয়সলমীর অধিকার করেন।

আকবরের সিংহাসন লাভ

1572 খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট ও 1573 খ্রীষ্টাব্দে সুরাট তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। 1576 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশ অধিকার করেন। 1585 খ্রীষ্টাব্দে কাবুল, 1586 খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর, 1590-91 খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু ও 1595 খ্রীষ্টাব্দে বালুচিস্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে 1595 খ্রীষ্টাব্দে আকবর উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুবিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হন। অতঃপর আকবর দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য-বিস্তারে মন দেন। তিনি আংশিক ভাবে আহম্মদনগর ও খান্দেশ জয় করেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম বিদ্রোহ করায় তিনি দ্রুত রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। 1605 খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু ঘটে।

আকবরের রাজ্য-বিস্তার

আকবর ভারতের মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি কেবল এক সুবিশাল সাম্রাজ্যই স্থাপন করেন নাই। তিনি চিত্তের প্রসারতা ও মহত্ত্বের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দুর্লভ। হিন্দুদের সহিত বিরোধ করিয়া ভারতে কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের স্থাপন ও রক্ষা যে সম্ভব নহে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে রাজপুতগণ যে শৌর্যে-বীর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাও তিনি জানিতেন। তাই তিনি হিন্দুদের তথা রাজপুতদের হৃদয় জয় করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলিম প্রজার মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, তাহা দূর করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের দেয় জিজিয়া কর, তীর্থকর প্রভৃতি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

হিন্দু ও রাজপুতগণের প্রতি নীতি

হিন্দু বন্দীদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার যে প্রথা ছিল, তাহা তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের শিক্ষালয় ও দেবালয় নির্মাণে সাহায্য দিতেছিলেন। তিনি রাজপুতগণের সহিত আত্মীয়তা করিবার জন্য নিজে রাজপুত রাজকুমারীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি বহু রাজপুত রাজ্যকে তাঁহার আত্মীয়রূপে পাইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও রক্ষার কার্যে রাজপুত বীরগণ অকাতরে রক্তদান করিয়াছিলেন। রাজপুতগণের মধ্যে মেবার তাঁহার বিরোধিতা করায়, মেবারের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অবশ্য, তাহাতেও মেবার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। যাহাই হউক, 'সুলহ্-ই-কুল' বা পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতিই ছিল তাঁহার মূলনীতি। তিনি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার জন্য একটি ইবাদতখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই ইবাদতখানায় ইসলাম, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, সকল ধর্মমতেরই ব্যাখ্যা ও আলোচনা শুনিতেন এবং শেষে নিজেই 'দীন্-ই-ইলাহি' (ভগবানের ধর্ম) নামে সকল ধর্মের সমন্বয়বাদী একটি ধর্মমত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়া জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ ও মেবার মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। আহম্মদনগরের সুলতানের মন্ত্রী মালিক অম্বরের পরিচালনাধীনে আহম্মদনগর পুনরায় শক্তিশালী হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুর্‌রম মালিক অম্বরকে পরাজিত করিয়া আহম্মদনগরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। আহম্মদনগরে বিজয়লাভের জন্য জাহাঙ্গীর খুর্‌রমকে 'শাহ্‌জাহান' বা পৃথিবীপতি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 1627 খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাহান সম্রাট হন। শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যের সুবাদার খান জাহান [illegible]দী ও বুন্দেলখণ্ডের রাজা জুঝার সিংহের বিদ্রোহ দমন করেন। ঐ সময়ে পর্তুগী[illegible]গণ খুবই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কঠোরহস্তে তাহাদিগকে দমন করেন। আহম্মদনগর পুনরায় বিদ্রোহ করিলে তিনি আহম্মদনগর সরাসরি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার শাসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য-সমারোহের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তবে দেশে ঐ সময় কতিপয়

ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষও হইয়াছিল। শাহ্জাহানের শেষজীবন সুখের হয় নাই। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার সিংহাসন লইয়া তাঁহার চারি পুত্র দারা, সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ফলে তিনি শেষজীবন কারাগারে কাটাইয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব অন্যান্য ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আট বৎসর বন্দী থাকিবার পর 74 বৎসর বয়সে কারাগারেই শাহ্জাহানের মৃত্যু হইয়াছিল (1666)।

শাহ্‌জাহান

1658 খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব সিংহাসন অধিকার করিলেও, তিনি 1659 খ্রীষ্টাব্দে 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঔরংজেবের শাসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ঔরংজেবের রাজ্যসীমা পশ্চিমে গজনী হইতে পূর্বে চট্টগ্রাম এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ঔরংজেবের পরধর্মবিদ্বেষী সংকীর্ণ নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল। তিনি নিজেকে 'গাজী' বা ধর্মযোদ্ধা বলিয়া জাহির করিতেন। তিনি ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। তিনি সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণকেও ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। অনেকে মনে করেন, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির সুলতানগণ সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে দর্-উল্-ইসলামে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি অমুসলমানদের উপর পুনরায় জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু দেবালয় ও শিক্ষালয়গুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। হিন্দুকে কেরানী ও হিসাবরক্ষকের পদ দেওয়া চলিবে না, এই মর্মেও তিনি আদেশ জারী করেন। হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে দ্বিগুণ শুল্ক দিতে তিনি বাধ্য করেন। তিনি রাজপুত ভিন্ন অন্য হিন্দুদের শিবিকারোহণ নিষিদ্ধ করেন। এই সকল ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের অমুসলমান প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বালাইয়া তুলে। ফলে, জাঠ, বুন্দেলা, মারাঠা, রাজপুত, শিখ প্রভৃতি জাতিগুলি বিদ্রোহ করে। ঔরংজেব জাঠ ও বুন্দেলাগণের বিদ্রোহকে কোন প্রকারে দমন করিতে সমর্থ হইলেও, তিনি নবজাগ্রত শিখ, মারাঠা ও রাজপুত জাতিকে দমন করিতে অসমর্থ হন। শিখগুরু তেগ বাহাদুর ঔরংজেবের ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরোধিতা করিলে, ঔরংজেব তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। তেগ বাহাদুর তাহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে ঔরংজেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পিতৃহত্যার এই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তেগ বাহাদুরের

ঔরংজেবের ধর্মীয় সংকীর্ণতা

তাহার কুফল

পুত্র গুরু গোবিন্দ শিখ সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ ও সামরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে শিখগণ ঔরংজেবের বিরোধিতা করিতে থাকে এবং শিখগণকে দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু ঔরংজেবের দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষরূপে দেখা দিয়াছিল রাজপুত ও মারাঠাগণ। নিঃসন্তান অবস্থায় যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে ঔরংজেব যোধপুর (মাড়বার) মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু যশোবন্তের মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী মহামায়া গর্ভবতী ছিলেন। তিনি পুত্রসন্তান প্রসব করিলে, তাঁহাকে যোধপুরের রাঠোর বীরগণ যোধপুরের সিংহাসনে বসাইয়া ঔরংজেবের সহিত যুদ্ধ শুরু করিলেন। রাঠোরগণের নেতৃত্ব করিলেন যশোবন্ত সিংহের মন্ত্রিপুত্র দুর্গাদাস। এই যুদ্ধে মেবারের রাণা রাজসিংহও যোগদান করিলেন। রাজপুতগণকে দমন করা ঔরংজেবের পক্ষে অসম্ভব হইল। রাণা রাজসিংহের মৃত্যুর পর মেবার ঔরংজেবের সহিত সন্ধি করিলেও, দুর্গাদাস সন্ধি করিলেন না। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন এবং মুঘল বাহিনীকে বহু যুদ্ধে পর্যুদস্ত করিলেন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ্ যশোবন্তের পুত্র অজিত সিংহকে যোধপুরের রাণা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন।

রাজপুতগণের সহিত ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ

মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মারাঠাবীর শিবাজী। তিনি সামান্য জায়গিরদারের পুত্র হইতে আপন বাহুবলে এক শক্তিশালী মারাঠা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার নবগঠিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তোরণা দুর্গ অধিকার করেন এবং তোরণার পাঁচ মাইল পূর্বে রাজগড় দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে উৎকোচ, প্রতারণা ও শক্তির সাহায্যে বহু দুর্গ হস্তগত করেন এবং বহু নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। 1656 খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাওলি অধিকার করেন। মুঘল বাহিনী বিজাপুরের সুলতানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়, সেই সুযোগে তিনি মুঘল-অধিকৃত জুন্নার ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করেন। তিনি মুঘল বাহিনীর হস্তে পরাজিত হওয়ায় সাময়িকভাবে মুঘলের সহিত সন্ধি করেন। 1659 খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কোঙ্কণ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। কৌশলে তিনি বিজাপুর-বাহিনীকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ কোঙ্কণ ও কোলাপুর অধিকার করেন। ঔরংজেব শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধিতে চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীকে দমন করিবার নির্দেশ দেন। কিন্তু সুকৌশলে শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে পরাজিত করেন (1663)। পর বৎসর তিনি সমৃদ্ধ বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করেন। ঔরংজেব তখন শিবাজীকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি

শিবাজী ও মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে প্রেরণ করেন। শিবাজী মুঘল বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া পুরন্দরে এক সন্ধি করেন। এই সন্ধি অনুসারে শিবাজী মুঘলদিগকে 23টি দুর্গ ও কতিপয় অঞ্চল ছাড়িয়া দেন। ঔরংজেব তাঁহাকে বিজাপুর রাজ্যে কয়েকটি জেলা হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দেন। ঔরংজেব মিত্রতার ভাণ করিয়া শিবাজীকে আগ্রায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান এবং শিবাজী পুত্র শম্ভুজীসহ আগ্রায় গেলে, তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। শিবাজী সুকৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করেন এবং স্বরাজ্যে ফিরিয়া তিন বৎসর নীরব থাকিবার পর মুঘলের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শিবাজী যে সকল দুর্গ মুঘল বাদশাহ্কে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি একে একে উদ্ধার করেন। তিনি পুনরায় সুরাট লুণ্ঠন করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যে হানা দিতে থাকেন। মুঘল সেনাপতিগণ বার বার তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। শিবাজীর রাজ্যসীমা সুরাটের নিকটবর্তী ধরমপুর হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলার কারোয়ার এবং পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে বাগনালা, নাসিক ও কোলাপুর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। 1680 খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। শিবাজীর মৃত্যুর পরও মারাঠাগণের সহিত মুঘল বাদশাহের যুদ্ধ চলিতে থাকে। ঔরংজেব শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে বন্দী ও হত্যা করিলে, শম্ভুজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। মারাঠা সৈন্য ও সেনাপতিগণ মুঘল বাহিনীতে ত্রাসের সঞ্চার করে। রাজারামের মৃত্যুর (1700) পর তাঁহার পত্নী তারাবাঈয়ের নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘল বাহিনীকে বিব্রত করিয়া তোলে। চতুর্দিকে হানা দিয়া মারাঠা বাহিনী প্রচুর ধনদৌলত সংগ্রহ করে এবং ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে। মারাঠাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালেই আহম্মদনগরে ঔরংজেবের মৃত্যু ঘটে।

মুঘল শাসন-ব্যবস্থা।—বাবর ও হুমায়ুন কেহই মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া যাইতে পারেন নাই। আকবরই মুঘল শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই শাসন-ব্যবস্থা নানা দিক হইতে শের শাহ্-প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকেই আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা মনে করা হইত। মুঘল সম্রাটগণও স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। বাদশাহ্-ই ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা। শাসন, সমর, বিচার ও বিধান, সকল বিষয়েই তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাই সম্রাটের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপরই সাম্রাজ্যের সুশাসন নির্ভর করিত। মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাটগণ সকলেই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কর্মপরায়ণ ছিলেন। রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতেন। অবশ্য, তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মন্ত্রী থাকিতেন। তবে সম্রাট ইচ্ছা করিলে তাঁহার পরামর্শ

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করিবার পূর্ণ অধিকার সম্রাটের ছিল।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার

মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল সুবিশাল। তাই শাসনের সুবিধার জন্য মুঘল সাম্রাজ্য বহু প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত থাকিত। আকবরের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য 15টি সুবায় এবং ঔরংজেবের আমলে 21টি সুবায় বিভক্ত ছিল। তাই মুঘল শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল।

কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ অধিকারী ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তবে কোনও অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন সম্রাটের পক্ষেও এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-পরিচালনা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে ভকিল বা উকিল (প্রধান মন্ত্রী), উজির (অর্থমন্ত্রী), দেওয়ান (রাজস্ব-মন্ত্রী), মীর বকশী (বেতন ও হিসাবরক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী), কাজী-উস্-কাজাত (প্রধান কাজী বা বিচার-পতি), খান-ই-সামান, সদর-উস্-সদর, মুহ্‌তাসিব প্রভৃতি। সম্রাটের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সকল বিষয়ের ভার থাকিত খান-ই-সামানের হস্তে। মীর বকশী কেবল বেতন ও হিসাবরক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সম্রাটের ব্যক্তিগত বাহিনীর কর্তা। দাতব্য-বিভাগের ভার থাকিত সদর-উস্-সদরের হস্তে। দুর্নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির তত্ত্বাবধান করিতেন মুহ্‌তাসিব। গোয়েন্দা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 'দারোগা-ই-ডাকচৌকি' বলা হইত।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা

সুবার বা প্রদেশের শাসনভার সুবাদারের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। সুবাদারগণ 'সিপাহ্‌শলার', 'সাহিব-সুবা', 'নাজিম' প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইতেন। সুবাগুলি 'সরকারে' ও সরকারগুলি 'পরগনা'য় বিভক্ত থাকিত। সুবাদার-গণও আপন আপন প্রদেশে অনেকখানি স্বৈরাচারী ছিলেন। সুবাদারের অধীনে বকশী, ফৌজদার, কোতয়াল, কাজী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারিগণ থাকিতেন। প্রত্যেক সুবায় একজন দেওয়ান বা রাজস্ব-বিষয়ক অধিকর্তা থাকিতেন। তিনি কতকটা সুবাদারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং সুবাদার যাহাতে নিজ সুবায় অত্যধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন।

মুঘল আমলে প্রত্যেক রাজকর্মচারীই অন্যূন দশজন করিয়া ফৌজ সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিতেন। এই ফৌজ সরবরাহের ভিত্তিতে মুঘল রাজকর্মচারিগণ সকলে বেতন বা মনসব পাইতেন। তাই মুঘল রাজকর্মচারিগণ 'মনসবদার' নামে পরিচিত হইতেন।

মনসবদারগণ কে কত সংখ্যক ফৌজ রাখেন বা সরবরাহ করেন, তাহার ভিত্তিতেই সকল রাজকর্মচারী তেত্রিশটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সর্বনিম্ন শ্রেণীর মনসবদার দশজন ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর মনসবদার দশ হাজার সৈন্য সরবরাহের মনসবদার পাইতেন। আকবরের আমলে দশ হইতে পাঁচ হাজারের মনসবগুলি রাজকর্মচারীরা পাইতেন এবং 7,000 হইতে 10,000-এর মনসবগুলি মুঘল রাজ-পরিবারের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত। পূর্বে পদস্থ রাজ-কর্মচারিগণ জায়গির পাইতেন। জায়গিরদারগণ অনেক সময় প্রয়োজনীয় সৈন্য রাখিতেন না ও যুদ্ধকালে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য সরবরাহ করিতে পারিতেন না। তাহা ছাড়া, তাঁহারা সুযোগ-সুবিধা পাইলে বিদ্রোহ করিতেন। তাই আকবর জায়গিরদারি প্রথা তুলিয়া দিয়া মনসবদারি প্রথার প্রবর্তন করেন।

মনসবদারি প্রথা

আকবর ও ঔরংজেব উভয়েই নানাভাবে রাজস্ব-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করেন। এ-বিষয়ে তোডরমল আকবরের ও মুর্শিদ কুলী খাঁ ঔরংজেবের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। পূর্বে প্রতি বৎসর উৎপাদন ও মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে রাজস্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিত, তাহাতে নানারূপ অসুবিধা দেখা দিত। তাই তোডরমল পূর্ববর্তী দশ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের ও তাহার মূল্যের গড় বাহির করিয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশকে স্থায়ী রাজস্বরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এ ছাড়া, মুঘল সাম্রাজ্যে নানাবিধ রাজস্ব-নীতি প্রচলিত ছিল। একটি নীতি অনুসারে লাঙল-পিছু রাজস্ব ধার্য করা হইত। অন্য একটি ব্যবস্থায় উৎপাদনের অর্ধাংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হইত। ইহা 'বাটাই' প্রথা নামে পরিচিত ছিল। অপর একটি ব্যবস্থায় জমির পরিমাণ অনুসারে রাজস্ব নির্ধারিত হইত, উহা 'জরিপ' প্রথা নামে পরিচিত ছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রত্যেক সুবায় দেওয়ান থাকিতেন। তাঁহার অধীনে 'আমালগুজার', 'কানুনগো' প্রভৃতি কর্মচারিগণ কাজ করিতেন।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

বিচার-বিষয়েও নানাপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আকবর নিজে প্রজাদের অভিযোগ শুনিতেন। প্রজারা যাহাতে তাঁহার নিকট আবেদন করিতে পারে, সেজন্য জাহাঙ্গীর একটা ঘণ্টা-বাঁধা শিকল প্রাসাদের বাহিরে ঝুলাইয়া রাখিতেন। রাজধানীতে বিচারের জন্য কাজী-উস্ কাজাত বা প্রধান বিচারপতি থাকিতেন। প্রদেশে কাজী ও মীর আদলের উপর বিচারের ভার থাকিত। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ও সালিসের দ্বারাই বিচার হইত। সম্রাটের আদেশে ভিন্ন প্রাণদণ্ড দেওয়া চলিত না।

বিচার-ব্যবস্থা

মুঘল যুগে সামরিক শক্তি প্রধান চারি ভাগে বিভক্ত ছিল—(1) অশ্বারোহী, (2) পদাতিক, (3) গোলন্দাজ ও (4) নৌবহর। অশ্বারোহী বাহিনী ও গোলন্দাজ

বাহিনীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইত। তবে মুঘল বাদশাহ্গণ নৌবাহিনীর প্রতি সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। মুঘল বাহিনীতে বহু দেশীয়, বহু জাতীয় ও বহু ধর্মীয় লোক থাকায় সৈন্যবাহিনীর একতা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হইত। রাজপুত সৈন্য ও সেনাপতিগণ মুঘল বাহিনীর স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। মুঘল বাহিনীর সেনাপতিগণের পরস্পর ঈর্ষা ও কলহ মুঘল বাহিনীর দুর্বলতার অন্যতম কারণ ছিল।

সামরিক বিভাগ

মুঘল যুগে কলাশিল্প।—মুঘল যুগে কলাশিল্পের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। এই সকল কলাশিল্পের মধ্যে স্থাপত্যের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। বাবর, হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর, ঔরংজেব সকলেই কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করিলেও, স্থাপত্যকীর্তি-সমূহের জন্য মুঘল যুগে আকবর ও শাহ্জাহানের শাসনকাল চিরস্মরণীয় হইয়াছে। আকবর অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ,
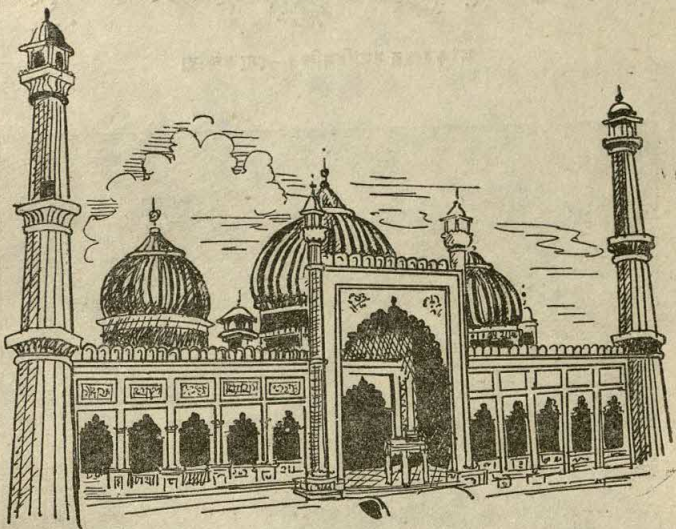
জুম্মা মসজিদ—দিল্লী

স্মৃতিমন্দির, সমাধিমন্দির, দুর্গ, বাগ (প্রমোদোদ্যান), মিনার, সরাই ও শিক্ষালয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দিল্লী, আগ্রা ও, ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তি বিরাজ করিতেছে। 1569 খ্রীষ্টাব্দ হইতে 1585 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফতেপুর সিক্রি আকবরের রাজধানী ছিল। ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদগুলির মধ্যে যোধবাঈয়ের প্রাসাদ, বুলন্দ্ দরওয়াজা (বিজয়তোরণ), জামি মসজিদ, সলিম চিশ্‌তির সমাধিমন্দির ও পাঁচমহল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগ্রার দুর্গ

তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। উহা নির্মাণ করিতে দীর্ঘ আট বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আগ্রা-দুর্গের মধ্যে অবস্থিত 'দেওয়ান-ই-খাস', 'দেওয়ান-ই-আম' ও জাহাঙ্গীরী-মহল নামে বাসভবনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবর শ্বেত
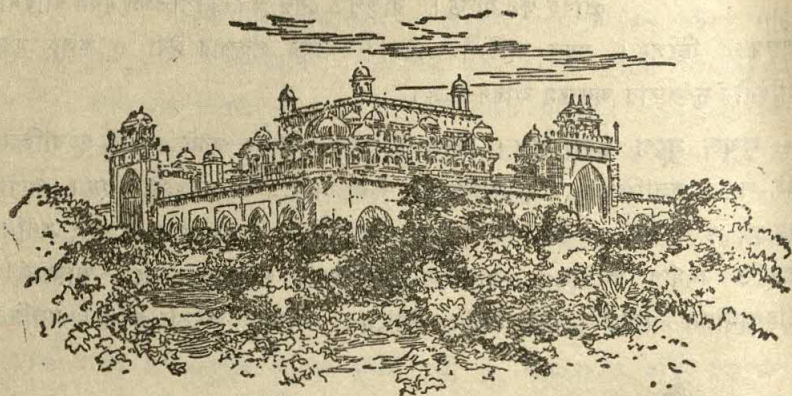
আকবরের সমাধিমন্দির—সেকেন্দারা
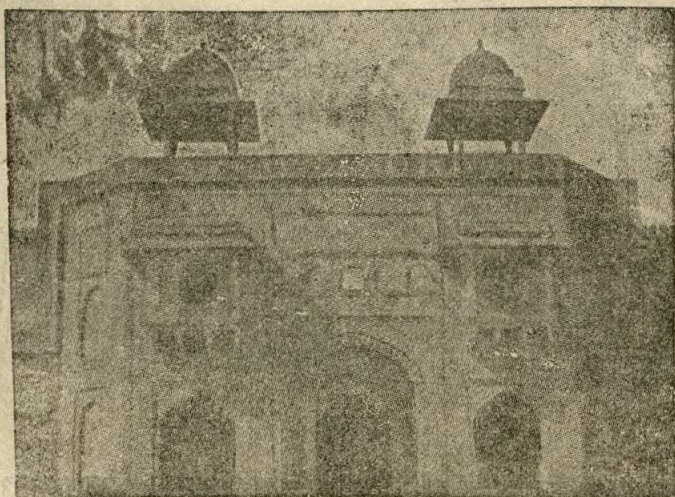
যোধবাঈয়ের প্রাসাদ—ফতেপুর সিক্রি

প্রস্তরের অপেক্ষা লোহিত প্রস্তরের অধিক অনুরাগী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে সেকেন্দারায় অবস্থিত সম্রাট আকবরের সমাধিমন্দির এবং আগ্রায় অবস্থিত নূরজাহানের পিতা ইতিমাদউদ্দৌলার

স্থাপত্য

সমাধিমন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান তাঁহার পিতামহ আকবরের মতো স্থাপত্যশিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-

তাজমহল
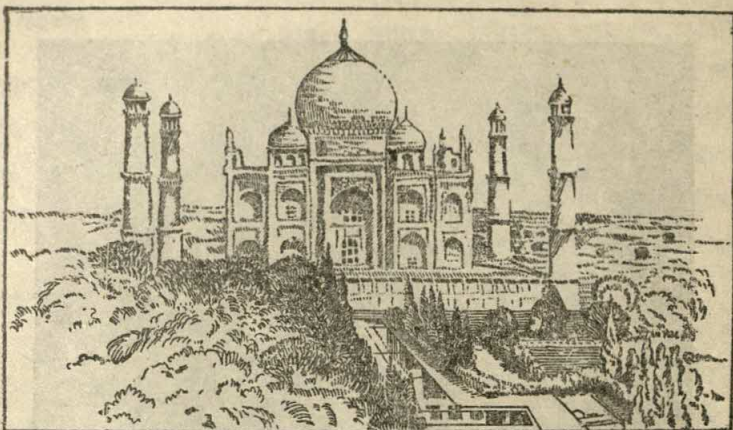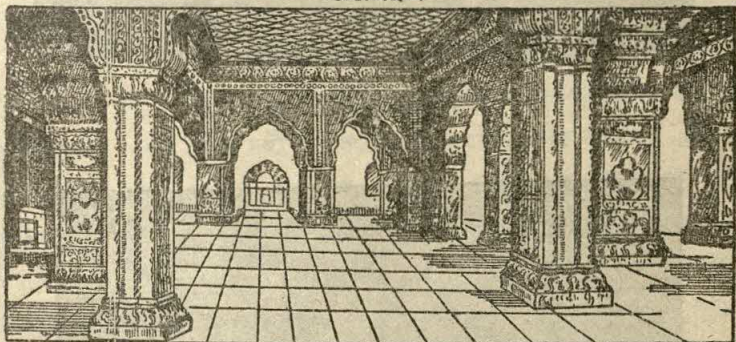
দেওয়ান-ই-খাস
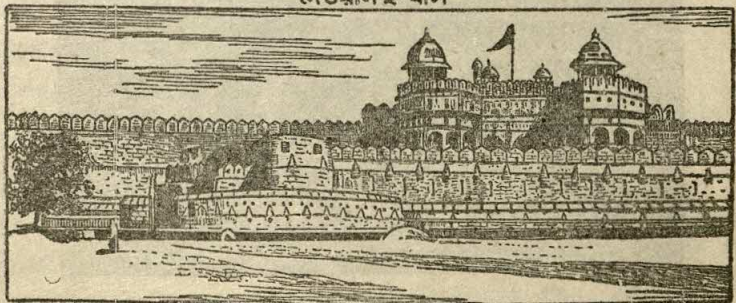
আগ্রাফোর্ট

কীর্তি সম্রাজ্ঞী মমতাজের জগদ্‌বিখ্যাত সমাধিমন্দির "তাজমহল"। দিল্লীতে তিনি যে দেওয়ান-ই-খাস ও দেওয়ান-ই-আম নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও অলঙ্করণের

দিক হইতে অতুলনীয় হইয়া আছে। তাঁহার অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল আগ্রার জামি মসজিদ, মোতি মসজিদ, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি।
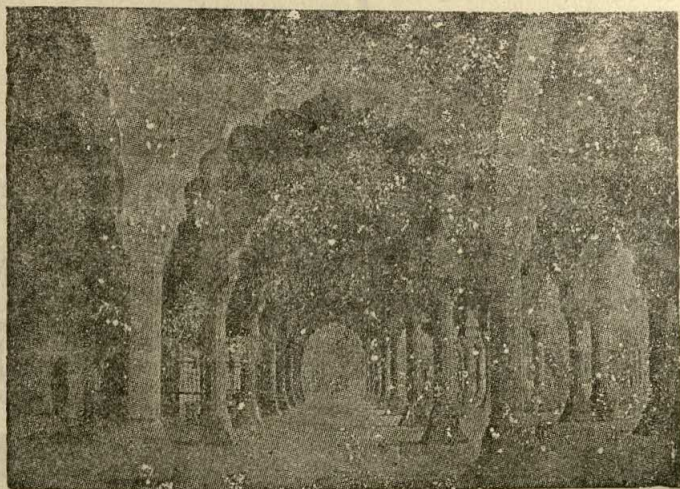
দেওয়ান-ই-আম—দিল্লী
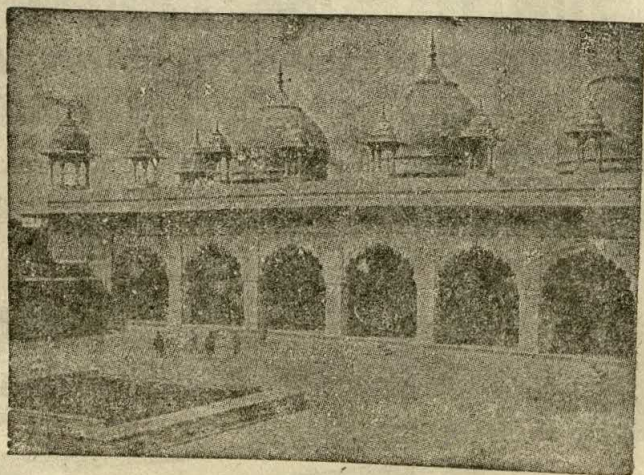
মোতি মসজিদ—আগ্রা

মুঘল যুগে চিত্রকলারও খুবই উন্নতি হইয়াছিল। আকবরের আমলে ভারতীয় চিত্রকলায় এক নূতন যুগের সূত্রপাত ঘটে। এই চিত্রশৈলী 'মুঘল চিত্রকলা' নামে

পরিচিত হইয়াছে। আকবরের দরবারে কয়েকজন ইরানী চিত্রশিল্পী ছিলেন। তবে কমপক্ষে তেরজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ছিলেন হিন্দু। আকবরের আমলের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের মধ্যে আবদুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলি, ফারুক বেগ, দশবন্ত, কাসবন্ত, লালকেস্থ, হরিবন্‌শ্‌, সানোয়াল, তারাচাঁদ, জগন্নাথ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীরের সময়ে মুঘল চিত্রকলার আরও উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার দরবারে বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আগা রেজা, আবুল হাসান, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ, বিষাণদাস, মনোহর, গোবর্ধন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে রাজপুত চিত্রকলা এবং কাংড়া অঞ্চলে পাহাড়ী চিত্রকলা নামে তুইটি পৃথক চিত্রশৈলীরও উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল।

চিত্রকলা

মুঘল সম্রাটগণ সঙ্গীতেরও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের সময়ে সঙ্গীতকলার খুবই উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার দরবারে শ্রেষ্ঠ ভারতীয়, ইরানী ও তুরানী গায়ক-গায়িকারা উপস্থিত থাকিতেন। আকবর নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সুন্দর নাকাড়া বাজাইতে পারিতেন। তিনি নিজে সুরকারও ছিলেন। তাঁহার দরবারে শ্রেষ্ঠ গায়কগণের মধ্যে গোয়ালিয়রের মিঞা তানসেন ও মালবের ভূতপূর্ব রাজা বাজবাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি ফৈজী সঙ্গীত সম্পর্কে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের সভাসদ্গণের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে ভারতীয় ও মুসলিম সঙ্গীতশৈলীর মিশ্রণে বহু নূতন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক বহু পুস্তক ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান উভয়েই সঙ্গীতের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঔরংজেব নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় সংকীর্ণতার জন্য সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। তিনি কবি, গীতিকার, সুরকার ও গায়কদিগকে তাঁহার দরবার হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

সঙ্গীত

সাহিত্য।—মুঘল যুগে ফারসী ও দেশীয় সাহিত্যের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। এ-যুগের ভারতীয়-ফারসী সাহিত্যকে প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—ইতিহাস, কাব্য ও অনুবাদ। এ-যুগের ইতিহাসকারগণের মধ্যে আবুল ফজল, বদাউনি, আবদুল হামিদ লাহোরী, খাফী খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা' তুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। বদাউনির সুবিখ্যাত গ্রন্থ হইল 'মন্তখব-উল্‌-তোয়ারিখ'। আবুল ফজল ও বদাউনি আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। শাহ্‌জাহানের সমসাময়িক আবদুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহ্‌নামা' একটি

সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ঔরংজেবের সমসাময়িক ছিলেন খাফী খাঁ। তাঁহাকে তাঁহার ইতিহাস গোপনে রচনা করিতে হইয়াছিল। আকবরের সময়ে ফারসী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন গিজলী। গিজলীর পরেই স্থান ছিল আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজীর। এই সময়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বিভিন্ন মুসলমান পণ্ডিত মহাভারতের বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করিয়া, সেগুলিকে 'রজমনামা' নামে সংকলিত করেন। বদাউনি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ফৈজী বিখ্যাত সংস্কৃত গণিত-গ্রন্থ লীলাবতী অনুবাদ করিয়াছিলেন। হাজী ইব্রাহিম শরহিন্দী অথর্ববেদ এবং দারা শুকো অথর্ববেদ ও উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের ভগিনী গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা' একটি উল্লেখ-যোগ্য জীবনী গ্রন্থ। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' ভারতীয়-ফারসী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্।

ফারসী সাহিত্য

এই যুগে হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগে মালিক মহম্মদ জয়সী, বীরবল, রাজা ভগবানদাস, রাজা মানসিংহ, তোডরমল, আবদুর রহিম খান-ই-খানান্, অন্ধ কবি সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির রচনায় হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল। মহম্মদ জয়সী মেবারের রানী পদ্মিনীর কাহিনী লইয়া তাঁহার 'পদ্মাবৎ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' নামে বিখ্যাত রামায়ণ-গ্রন্থখানি হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। মুঘল যুগে উত্তর ভারতে উর্দু ভাষার বিশেষ চর্চা হয় নাই। তবে দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য খুবই উন্নত হইয়া উঠে। দক্ষিণ ভারতের উর্দু কবিগণের মধ্যে ঔরঙ্গাবাদের ওয়ালি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এই যুগে বাংলা সাহিত্যেরও খুবই উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগে রচিত পদাবলী, কড়চা ও চৈতন্যজীবনীগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই যুগে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত বহু কাব্যও রচিত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাগণের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি কাশীরাম দাস তাঁহার বিখ্যাত 'মহাভারত' এই যুগেই রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের কাব্যগুলিও এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই যুগে বাংলা ভাষায় অসংখ্য লোকগীতি ও লোককাব্যও রচিত হয়। এই যুগে সন্ত কবি তুকারাম ও রামদাসের রচনায় মারাঠী সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

হিন্দী ও উর্দু সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য

মারাঠী সাহিত্য

বিদেশী পর্যটক।—মুঘল যুগে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সমসাময়িক ভারত সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল পর্যটকের মধ্যে মনসরেট, ফিচ্, হকিন্স, রো, টেরি, পেল্সায়ের্ট, বেনিয়ে,

তাভের্নিয়ে ও মানুচির নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মনসরেট ও র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ্ আকবরের আমলে এবং ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স, টমাস্ রো ও এডোয়ার্ড টেরি জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতে আসিয়াছিলেন। ফিচ্, হকিন্স, রো ও টেরি—ইঁহারা সকলেই ছিলেন ইংরেজ। মনসরেট আকবরের রাজ্যশাসন ও ন্যায়বিচারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফিচ্ আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি ঐ শহর দুইটি লণ্ডনের অপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাজদূতরূপে স্যার টমাস রো ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি মুঘল দরবারে চারি বৎসর ছিলেন। মুঘল দরবারের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য-সমারোহ তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল। ওলন্দাজ ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস্কো পেল্‌সায়েট জাহাঙ্গীরের আমলে আগ্রায় ওলন্দাজ-কুঠির কর্তা ছিলেন। ফরাসী ফ্রাঁসোয়া বেনিয়ে ও জাঁ তাভের্নিয়ে শাহ্‌জাহান ও ঔরংজেবের সময়ে ভারত ভ্রমণ করেন। তাঁহাদের বিবরণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেল্‌সায়েট তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এদেশে ধনী ও দরিদ্রের অবস্থার মধ্যে শোচনীয় পার্থক্য এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বেনিয়ের বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারত, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানা গিয়াছে। তাভের্নিয়ে মুঘল যুগে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ এবং ব্যবসায়ের অবস্থা ও রীতি-নীতি সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ইতালীয় ভ্রমণকারী মানুচি ঔরংজেবের আমলে ভারতে আসিয়াছিলেন।

মানুচি প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জায়গিরদারদের প্রজাপীড়নের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ঔরংজেবের আমলে এদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে শোচনীয় পার্থক্য ছিল, তিনি তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। ঔরংজেবের শিল্পকলার প্রতি বিরূপ মনোভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সেকেন্দারায় আকবরের সমাধিমন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিগুলি তিনি চুনকাম করিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিলেন।

মুঘল যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা।—মুঘল যুগে ভারতীয় সমাজ অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণীর শীর্ষে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। অভিজাতগণ প্রায়ই বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া ছিলেন। তাঁহারা পানভোজন ও সাজসজ্জায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহারা অসংখ্য দাসদাসী রাখিতেন। তাঁহারা প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী হইতেন। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর নীচেই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা এরূপ বিলাস-ব্যসনের সুযোগ পাইতেন না। তাঁহাদের উপার্জনের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না। ফলে, তাঁহাদের খাদ্যে ও পরিচ্ছদে

অভিজাত, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র শ্রেণী

প্রাচুর্য ছিল না। ব্যবসায়ীদের উপার্জন বেশী হইলে, তাহাদের সঞ্চিত অর্থ প্রায়ই সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। তাই তাহারা সর্বদা অভাব-অনটনের ভাণ করিত। টেরি ও বের্নিয়ে তাঁহাদের বিবরণীতে ব্যবসায়ীদের এইরূপ মনোভাবের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমাজে অভিজাত ও মধ্যবিত্তের সংখ্যা অল্প ছিল। সমাজের বৃহত্তম অংশ ছিল কৃষক, শ্রমিক, ছোট দোকানদার ইত্যাদি নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র জনসাধারণ। ইহাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। পেল্‌সায়ের্টের বিবরণ হইতে জানা যায়, ক্রীতদাসের জীবনের সহিত ইহাদের জীবনের প্রায় পার্থক্য ছিল না। দেশে বহু ক্রীতদাস ছিল। সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ থাকায়, দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশে শের শাহ্‌, আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতির উদার ধর্মনীতির ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন ও মৈত্রীর মনোভাব বিদ্যমান ছিল। ঔরংজেবের ধর্মীয় সংকীর্ণতার ফলে তাহা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইলেও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই পীর, ফকির, সন্ন্যাসী ও সাধুসন্তদের ভক্তি করিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কুসংস্কার বর্তমান ছিল। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই জ্যোতিষ ও ডাকিনী বিদ্যায় বিশ্বাস করিত। ডাকিনীবিদ্যায় সাফল্যলাভের জন্য অনেক সময় নরবলি দেওয়া হইত। হিন্দু সমাজে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, পণপ্রথা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে মুসলমান সমাজের তুলনায় হিন্দু সমাজে উহার কঠোরতা কম ছিল।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

কুসংস্কার

মুঘল যুগেও ভারত কৃষিপ্রধান ছিল। ধান, গম, দাল, আখ, নীল, কাপাস, তুঁত প্রভৃতি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ছিল। 1604-05 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হয়। তামাক-বিক্রয় হইতে প্রচুর শুল্ক আদায় হইত। দেশে সেচ ও জল-নিকাশের সুব্যবস্থা ছিল না। তাই অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে কৃষিকার্যের প্রায়ই ব্যাঘাত ঘটিত। যুদ্ধ ও সৈন্য-চলাচলের ফলেও কৃষিকার্যের ব্যাঘাত ও শস্যহানি হইত।

কৃষি

মুঘল যুগে শ্রমশিল্পের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে সুতী ও রেশমী বস্ত্রই ছিল প্রধান। ঢাকাই মসলিন সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হইত। পশমী বস্ত্রও ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। রঞ্জনশিল্পও খুবই উন্নত ছিল। নীল ও সোরা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। কিন্তু শ্রমশিল্পীদের অবস্থা ভালো ছিল না। অভিজাত ও রাজকর্মচারিগণ প্রায়ই

শ্রমশিল্প

নামমাত্র মূল্য দিয়া শ্রমশিল্পীদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। তাই শ্রমশিল্পীরা ভালো জিনিস উৎপন্ন করিতে উৎসাহ পাইত না। সম্রাট ও অভিজাতগণের অধীনে যে সকল শ্রমশিল্পী কাজ করিত, তাহারাই সাধারণতঃ শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতে উৎসাহ পাইত এবং দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জন করিত।

মুঘল যুগে ভারতে দ্রব্যমূল্য অত্যল্প ছিল। মুঘল যুগে দেড় টাকায় একটি ভেড়া ও দশ টাকায় একটি গরু পাওয়া যাইত। শস্যাদির মূল্যও অত্যল্প ছিল। দেশে দ্রব্যের এই অত্যল্প মূল্য জনসাধারণের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। কারণ, কৃষক ও কারিগরগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক পাইত না। মোহর, রুপাইয়া, জালালি, জিতল, দাম, পয়সা প্রভৃতি নানাপ্রকার বড়-ছোট স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা দেশে প্রচলিত ছিল।

দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রা

ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ ও মূল্যের অত্যল্পতা বৈদেশিক বণিকগণকে এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে উৎসাহিত করিত। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকগণ মুঘল আমলেই এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিয়াছিল। সূক্ষ্মবস্ত্র, পশম, নীল ও সোরা প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও খুব উন্নত ছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ফলেই দেশে বহু সমৃদ্ধ শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। র‍্যাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ বলিয়াছেন, আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটি লণ্ডনের অপেক্ষাও বড় ছিল এবং আগ্রা ও ফতেপুরের মধ্যবর্তী বারো মাইল পথের দুই ধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য দোকান ছিল। ফলে, সারা পথকেই শহর বলিয়া ভ্রম হইত। লাহোর, বুরহানপুর, আহম্মদাবাদ, বারাণসী, পাটনা, রাজমহল, বর্ধমান, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরগুলি অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় থাকিলেও, সম্রাট ও অভিজাতগণের ধনদৌলতের সীমা ছিল না। ভারত তৎকালে সম্ভবতঃ পৃথিবীর সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। ভারত-সম্রাট আকবর তৎকালীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

সমৃদ্ধি

প্রশ্নাবলী

1. Give a brief history of the great Mughals. [শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।]

2. What was the importance of Emperor Akbar in Indian history ? [ভারতীয় ইতিহাসে আকবরের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

3. Briefly describe the Mughal administrative system. [মুঘল শাসন-ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

4. What do you know of the Indian art and literature of the Mughal period? [মুঘল যুগের ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

5. Briefly describe the society and economic condition that prevailed in India during the Mughal period. [মুঘল যুগে ভারতের সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

ষোড়শ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন—ইউরোপীয়দের আগমন—কতিপয় ভারতীয় রাজ্যের অভ্যুত্থান

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন।—1707 খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় দেড়শত বৎসর, শেষের দিকে নিতান্ত নামেমাত্র হইলেও, মুঘল সাম্রাজ্য টিকিয়া ছিল। নানা কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল সম্রাটগণের অযোগ্যতা। তাহা ছাড়া, অন্যান্য যে সকল কারণ ছিল, সেগুলি হইল আমীর-ওমরাহ্‌দের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং নানাপ্রকার চক্রান্ত, মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রাধান্যলাভ ও অনেকক্ষেত্রে স্বাধীনতালাভ, মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান এবং বৈদেশিক আক্রমণ। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পর তাঁহার পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ সম্রাট হন। 1712 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুনরায় ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পর বাহাদুর শাহের পুত্র জাহান্দার শাহ্‌ সম্রাট হন। পর বৎসর তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুকশিয়র সম্রাট হন। ফারুকশিয়র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তবে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে তাঁহার দুই পিতৃব্য-পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু তাঁহারাও অচিরেই সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁহাদের স্থলে তাঁহাদের অন্যতম পিতৃব্য-পুত্র মহম্মদ শাহ্‌ সম্রাট হন। তিনি সুদীর্ঘকাল (1719—48) রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই পারস্যের রাজা নাদির শাহ্‌ এবং আফগানিস্থানের রাজা আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী (1748) ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আহম্মদ শাহ্‌, দ্বিতীয় আলমগীর, দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম, দ্বিতীয় আকবর,

পতনের কারণ

ঔরংজেবের বংশধরগণ

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ প্রভৃতি সম্রাটগণ মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হন এবং 1862 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হয়।

ইউরোপীয়গণের ভারত আগমন।—ভারতের সহিত ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্য সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিতেছিল। মধ্য-প্রাচ্যে মুসলিম শক্তির অভ্যুত্থানের পর হইতে এই বাণিজ্য আরবগণের হস্তে ছিল। আরবগণ ভারতীয় পণ্য ইতালিতে পৌছাইয়া দিত। ফলে, প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য আরব বণিকগণ ও ইতালীয় বণিকগণের হস্তেই ছিল। ইতালির এই একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি ঈর্ষান্বিত হয় এবং ভারত তথা প্রাচ্যের সহিত ব্যবসায়ের জন্য অন্য কোনও পথের সন্ধান করিতে চায়।

নূতন বাণিজ্য-পথ

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আটাশ বৎসর পূর্বে, 1498 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। এইভাবে ভারতের তথা প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি নূতন পথ আবিষ্কৃত হয়। এই নূতন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতে তথা প্রাচ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য পর্তুগীজগণ, ওলন্দাজগণ, দিনেমারগণ, ইংরেজগণ ও ফরাসীগণ ভারতে আসে। পর্তুগীজগণই ভারতে সর্বপ্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। কিছুদিন পর্তুগীজরা ভারত মহাসাগরে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যলাভ করে। আলবুকার্ক 1509 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পর্তুগীজ কুঠিসমূহের গভর্নর বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি গোয়া নামক বাণিজ্য-বন্দরটি অধিকার করেন। আলবুকার্ক ও তাঁহার পরবর্তিগণের চেষ্টায় কালিকট, কান্নানোর, গোয়া, দিউ, দমন, সলসেট, বেসিন, চৌল, বোম্বাই, মাদ্রাজের নিকটবর্তী স্থান টমে ও পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে পর্তুগীজদের বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তাহাদের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভারত ও ভারত মহাসাগরে তাহাদের প্রাধান্য লোপ পায় এবং কেবলমাত্র গোয়া, দমন ও দিউ তাহাদের অধিকারে থাকে।

পর্তুগীজগণ

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। তাহারা কালিকট, সুরাট, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালেশ্বর, নেগাপত্তন, কোচিন প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু শীঘ্রই ইংরেজগণ তাহাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। 1600 খ্রীষ্টাব্দের শেষ তারিখে ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পনের বৎসরের জন্য প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য চালাইবার

ওলন্দাজগণ

একচেটিয়া অধিকার দেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরেজগণ সুরাটে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। শীঘ্রই সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ ও বরোচে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়। কিছুদিনের মধ্যে তাহারা বোম্বাই, মাদ্রাজ, বালেশ্বর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার ও কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করে। ওলন্দাজদের সহিত তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওলন্দাজগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। 1759 খ্রীষ্টাব্দে বিদেরার যুদ্ধে ক্লাইভের হস্তে ওলন্দাজদের পরাজয় ঘটে। ফলে ভারতের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে বিদায় লইতে হয়।

ইংরেজগণ

কিন্তু ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সর্বশেষে আবির্ভূত হয় ফরাসীগণ। 1668 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণ সুরাটে এবং পর বৎসর মসুলিপত্তমে কুঠি স্থাপন করে। তাহারা পন্দিচেরি ও চন্দননগরে কুঠি স্থাপন করে। তাহারা কারিকল ও মাহে-ও অধিকার করে।

ফরাসীগণ

কিন্তু ফরাসীগণ ও ইংরেজগণ ভারতে কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না। তাহারা ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। ইউরোপে এই সময় অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহাদের এই যুদ্ধ ভারতেও বিস্তারলাভ করে। দক্ষিণ ভারতের কতিপয় যুদ্ধে ফরাসীগণ আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত ভারতে তাহাদের সকল প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

কিন্তু ইংরেজগণ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে 1757 খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে তাহারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা

মারাঠাগণের উত্থান ও পতন।—মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের জীবদ্দশাতেই মারাঠা-বীর শিবাজী একটি সুবৃহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র শম্ভুজীকে ঔরংজেব বন্দী ও হত্যা করিলেও তাঁহার অন্য পুত্র রাজারাম ও পুত্রবধূ তারাবাঈয়ের নেতৃত্বে মারাঠা বীরগণ ঔরংজেবের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়াছিলেন। ঔরংজেব শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হইয়া শাহুকে মুক্ত করিয়া দেন। এই মুক্তিদানের উদ্দেশ্য ছিল মারাঠাগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করা। শাহু রাজ্যে ফিরিয়া তারাবাঈয়ের নিকট তাঁহার পৈতৃক রাজ্য দাবি করিলে মারাঠাগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিল। 1708 খ্রীষ্টাব্দে শাহু মারাঠা রাজ্যের

মারাঠা রাজ্যে গৃহযুদ্ধ

রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কয়েক বৎসর গৃহবিবাদ চলিবার শেষ পর্যন্ত শাহু তাঁহার পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে জয়ী হইলেন।

শাহুর সময় হইতে পেশোয়াগণই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাজী রাও পেশোয়া হন। তাঁহার সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজী রাও পেশোয়া হন। বালাজী বাজী রাও-ও তাঁহার পিতার ন্যায় সাম্রাজ্য-বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়েই মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এমন কি দিল্লীর বাদশাহ্ নির্বাচনেও মারাঠাগণ হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। বালাজী বিশ্বনাথ, বাজীরাও এবং বালাজী বাজী রাও পর পর পেশোয়া হওয়ায় পেশোয়া-পদটি বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং শিবাজীর পৌত্র মারাঠারাজ শাহু তাঁহার মৃত্যুকালে উইল করিয়া পেশোয়ার হস্তেই মারাঠা রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়া গিয়াছিলেন। উত্তর ভারতেও মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। আফগানিস্থানের রাজা আহম্মদ শাহ্ আবদালী ভারত আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মারাঠাগণ পাঞ্জাব অধিকার করিলে, আহম্মদ শাহ্ আবদালীর সহিত মারাঠাগণের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িল। 1761 খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে মারাঠা বাহিনীর সহিত আহম্মদ শাহ্ আবদালীর যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল, তাহাতে মারাঠা বাহিনী পরাজিত হইল এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কম্পিত হইল। এই যুদ্ধ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। যুদ্ধকালে পেশোয়া বালাজী বাজী রাও অসুস্থ ছিলেন। পানিপথের যুদ্ধের কিছুদিন বাদে তাঁহার মৃত্যু হইল। বালাজী বাজী রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মাধব রাও পেশোয়া হন। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। তিনি বিতাড়িত মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মাধব রাওয়ের মৃত্যু ঘটে। ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যে পেশোয়া-পদ লইয়া গৃহবিবাদ দেখা দেয়।

পেশোয়াতন্ত্র

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

শিবাজী জায়গিরদারী প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজারাম তাহার পুনঃপ্রবর্তন করেন। ফলে, পরবর্তী কালে ঐ সকল জায়গির হইতে মারাঠা সাম্রাজ্যে পাঁচটি সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এইসব সামন্ত রাজ্যের মধ্যে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, কানপুরের ভোঁসলে ও বরোদার গায়কোয়াড় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পেশোয়াগণের দুর্বলতার সুযোগে এই সকল মারাঠা সামন্ত রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, মারাঠা রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

মারাঠা সামন্তগণ

মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া নিজে পেশোয়া হন। মারাঠা দলপতিগণ ইহাতে রুষ্ট হইলেন এবং নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রঘুনাথ রাও পেশোয়া-পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরেজদের সাহায্য লইলেন। ফলে ইংরেজদের সহিত মারাঠাগণের যুদ্ধ বাধিল। তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে মারাঠাগণ জয়লাভ করিলেও, পরে ইংরেজগণ সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করে। ফলে 1782 খ্রীষ্টাব্দে মহাদাজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ইংরেজদের সহিত মারাঠাগণের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি সলবইয়ের সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধি অনুসারে মাধব রাও নারায়ণ পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হন এবং রঘুনাথকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজগণ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সুবিস্তৃত অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের আমলে নানা ফড়নবীশ মারাঠা সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। 1800 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, মারাঠা সাম্রাজ্যে নিজ নিজ প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টায় গোয়ালিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও ইন্দোরের যশোবন্ত রাও হোলকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় রঘুনাথ রাওয়ের পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাও পেশোয়া হইয়াছিলেন। তিনি সিন্ধিয়াকে সমর্থন করিলেন। তখন দৌলত রাও সিন্ধিয়া রঘুনাথ রাও ভোঁসলের পোষ্যপুত্রের পুত্র বিনায়ক রাওকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই অবস্থায় বাজী রাও ইংরেজদের শরণাপন্ন হইয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লির বশ্যতামূলক মৈত্রীর নীতি মানিয়া লইলেন। বাজী রাওয়ের এই আত্ম-বিক্রয়ে মারাঠাগণ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে এবং পরে হোলকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। হোলকার ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল লর্ড ময়রার শাসনকালে মারাঠাগণ পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু পেশোয়া, ভোঁসলে ও হোলকার পর পর কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইলেন। ইংরেজগণ বাজী রাওকে পদচ্যুত করিয়া পেশোয়া-পদ তুলিয়া দিল। তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশই ইংরেজদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। অবশিষ্ট অংশে ইংরেজরা শিবাজীর এক বংশধরকে বসাইল। ভোঁসলে রাজ্যের উত্তরাংশও কোম্পানির অধিকারে গেল। বাকী অংশ ভোঁসলে-বংশীয় এক নাবালকের

মারাঠাগণের গৃহবিবাদ ও ইংরেজদের হস্তক্ষেপ

মারাঠা সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি

হস্তে অর্পিত হইল। হোলকার রাজপুতানায় তাঁহার সকল অধিকার ও নর্মদা নদীর দক্ষিণস্থ অঞ্চল ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে স্বাধীন মারাঠা রাজ্য বলিতে প্রকৃত আর কিছুই রহিল না। দেশে মারাঠা রাজ্যের ভস্মস্তূপের উপর বৃটিশ শাসনাধীন কতিপয় দেশীয় রাজ্যের উৎপত্তি হইল।

মহীশূর রাজ্যের উত্থান ও পতন।—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারকালে যে সকল ভারতীয় রাজ্য বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে মহীশূর অন্যতম। মহীশূরে হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল। কিন্তু মহীশূর তেমন শক্তিশালী ছিল না। হায়দর আলির শাসনাধীনেই মহীশূর শক্তিশালী হইয়া উঠে। হায়দর আলি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহীশূরের সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দেন এবং আপন প্রতিভাবলে রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। হায়দর আলি মহীশূরের রাজ্যসীমাকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া মারাঠাগণ ও হায়দরাবাদের নিজামের সহিত তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ হয়। কিন্তু তাঁহার প্রবল শত্রুরূপে দেখা দেয় ইংরেজগণ।

হায়দর আলি

পোর্টো নভোর যুদ্ধে হায়দর আলি ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইলেও, কাঞ্চী ও তাঞ্জোরের যুদ্ধে ইংরেজগণ যথাক্রমে তাঁহার ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের হস্তে পরাজিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই হায়দরের মৃত্যু ঘটে (1782)। টিপু ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। অবশেষে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি অনুসারে ইংরেজ ও টিপুর যুদ্ধ বন্ধ হয় (1784)। যুদ্ধ বন্ধ হইলেও টিপু নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ইংরেজগণ টিপুকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিত। ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস নিজামের নিকট লিখিত এক পত্রে ইংরেজের মিত্র রাজ্যগুলির যে তালিকা দিয়াছিলেন, তাহাতে মহীশূরের নাম ছিল না। 1789 খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুর ইংরেজদের আশ্রিত ছিল। তাই ইংরেজদের সহিত টিপুর যুদ্ধ বাধিল। হায়দরা-বাদের নিজাম ও মারাঠাগণও ইংরেজদের সহিত যোগ দিল। এই যুদ্ধ দুই বৎসর চলিয়াছিল। টিপু কতিপয় যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত শ্রীরঙ্গপত্তমে ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে অর্ধেকখানি রাজ্য টিপু ছাড়িয়া দেন এবং উহা ইংরেজগণ, নিজাম ও মারাঠাগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। এইভাবে মহীশূর রাজ্য অনেকখানি হীনবল হইয়া পড়ে। এই সময় ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্স খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইংরেজদের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতেছিল। টিপু বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করায়, ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি

টিপু সুলতান

মহীশূর আক্রমণ করেন। টিপু স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন (1799)। এইভাবে মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিল।

শিখ শক্তির উত্থান ও পতন।—জাহাঙ্গীরের আমল হইতেই শিখগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। ঔরংজেবের আমলে গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে তাহা একটি সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। 1767 খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্ আবদালী ভারতবর্ষ শেষবারের মতো ত্যাগ করিলে, শিখগণ আবদালী-অধিকৃত সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লয়। এই সময়ে শিখগণ বারোটি মিশলে বা দলে বিভক্ত ছিল। স্থকেরচকিয়া মিশলের নেতা মহাসিংহের পুত্র রণজিৎ সিংহ শিখ জাতিকে এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত করেন। শতদ্রু নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সমগ্র শিখ অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি শতদ্রুর পূর্বতীরেও অগ্রসর হইলেন। ঐ অঞ্চল ইংরেজ প্রভাবাধীন ছিল। তাই ঐ অঞ্চলে কোন কোন শিখ-নায়ক ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ইংরেজগণ শতদ্রুর পূর্বতীরে রণজিতের প্রভাববিস্তার ব্যাহত করিতে চাহিল। তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো যুদ্ধের পথে না গিয়া কূটনীতির আশ্রয় লইলেন। ফলে, অমৃতসরে ইংরেজদের সহিত রণজিৎ সিংহের এক সন্ধি হইল (1809)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজরা শতদ্রুর পশ্চিম পারে রণজিৎ সিংহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইল এবং রণজিৎ সিংহও শতদ্রুর পূর্বদিকে অগ্রসর হইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইংরেজ ও রণজিৎ সিংহ উভয়েই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলেন। রণজিৎ পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইয়া এখন উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজ্য-বিস্তারে মন দিলেন। কাংড়া, কাশ্মীর, পেশোয়ার ও মুলতান তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল। সম্রাট শাহ্জাহানের মুকুটস্থ কোহিনুর মণি পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ্ লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাও তিনি আফগানিস্থানের আশ্রয়প্রার্থী রাজা শাহ্ সুজার নিকট হইতে উদ্ধার করেন। 1839 খ্রীষ্টাব্দে 59 বৎসর বয়সে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

রণজিৎ সিংহ

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর কিন্তু ইংরেজদের সহিত শিখগণের বিবাদ বাধিল। 1845 খ্রীষ্টাব্দে শিখ বাহিনী শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করিল। মুদকি, ফিরোজ শাহ্, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁয়ের যুদ্ধে শিখ বাহিনী ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইল। শিখগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হইল এবং শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল ইংরেজ অধিকারভুক্ত হইল। শিখ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কমাইতে হইল, যুদ্ধে ব্যবহৃত শিখ বাহিনীর কামানগুলি ইংরেজরা হস্তগত করিল এবং লাহোরে একজন ইংরেজ

শিখ শক্তির পতন

রেসিডেন্ট রাখিবার ব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ, পাঞ্জাব প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের পদানত হইয়া পড়িল। কিন্তু শিখগণ এই অবস্থা সহজে স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। শীঘ্রই বিদ্রোহ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়ী হইল এবং সমগ্র পাঞ্জাবকে বৃটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। এইরূপে স্বাধীন শিখ রাজ্যের বিলোপ ঘটিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ-জীবন।—ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল একটি যুগসন্ধির কাল। মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, মারাঠাগণও অর্ধ-শতাব্দীকাল পরিপূর্ণ তেজের সহিত উদয় হইয়া অস্তমিত হইতে চলিয়াছে, ইংরেজগণ ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য-বিস্তার করিতেছে। কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমাজ-জীবনে সর্বত্রই অনিশ্চয়তা। বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও জয়-পরাজয় লাগিয়া আছেই। কোথাও কোন স্থিতিশীলতা ও নিশ্চয়তার ভাব নাই। কোথাও শক্তিশালী স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা না থাকায়, সর্বত্রই অরাজকতার ভাব বিরাজ করিতেছিল। লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, উৎপীড়ন যেন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। ফলে, সর্বত্রই জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হইতে আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। 1770 খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। দেশে তখনও ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। সমাজে সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন, কন্যাসন্তান হত্যা, নরবলি প্রভৃতি নানা কুৎসিত প্রথা প্রচলিত ছিল। দেশে তখনও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার হয় নাই।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know about the fall of the Mughal Empire? [মুঘল সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

2. Briefly describe the advent of the Europeans to India. [ভারতে ইউরোপীয়-গণের আগমন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

3. What do you know about the rise and fall of the Marathas? [মারাঠা শক্তির উত্থান-পতন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

4. Briefly describe the rise and fall of Mysore under Hydar Ali and Tipu Sultan. [হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের শাসনাধীন মহীশূরের উত্থান-পতন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

5. Briefly describe the rise and fall of the Sikh power. [শিখ শক্তির উত্থান-পতন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তার—সিপাহী বিদ্রোহ

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি-সাধন।—লর্ড ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ও লর্ড কর্নওয়ালিস তাহা কিছু পরিমাণে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন এবং তাহার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরবর্তী কয়েকজন গভর্নর-জেনারেল—প্রধানতঃ লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড হেষ্টিংস্ (ময়রা) ও লর্ড ডালহৌসী—সমগ্র ভারতে ও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বৃটিশ অধিকার সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের পর স্যার জন শোর কিছুকাল গভর্নর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্যার জন শোর "হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি" অনুসরণ করিয়াছিলেন। স্যার জন শোর অবসর গ্রহণ করিলে, লর্ড মর্নিংটন বা মার্ক্‌ইস্ অব ওয়েলেস্‌লি গভর্নর-জেনারেল হন (1798)। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার-সাধনের জন্য "বশ্যতামূলক মিত্রতার নীতি" (Policy of Subsidiary Alliance) অনুসরণ করেন। এই নীতির ফলে নিজাম-শাসিত হায়দরাবাদ রাজ্য ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে। এই নীতি প্রত্যাখ্যান করিবার ফলে মহীশূরের সহিত ইংরেজদের যে যুদ্ধ বাধে, তাহার ফলে মহীশূর রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পেশোয়া-পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজদের শরণাপন্ন হন এবং বেসিনের সন্ধি অনুসারে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে

সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা সামন্তরাজগণও একে একে ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হন এবং মারাঠা শক্তি প্রায় বিধ্বস্ত হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লি কেবল মহীশূর ও মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে সফল হন না। তিনি বিনা যুদ্ধে হায়দরাবাদ ছাড়াও কতিপয় ভারতীয় অঞ্চলকে বৃটিশ শাসনাধীন করেন। তিনি সুরাট ও তাঞ্জোরের রাজাকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া ঐ রাজ্য দুইটি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তিনি আর্কটের নবাবকে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে রাজ্যচ্যুত করেন এবং কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্যের একটি বিরাট অংশ বৃটিশ শাসনাধীন করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি 1805 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাঁহার পরবর্তী স্যার জর্জ বার্লো ও মিণ্টো উভয়েই হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অনুসরণ করেন। লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড হেষ্টিংস্ বা ময়রা গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন। লর্ড ময়রা পুনরায় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করেন। মারাঠাগণ

পুনরায় নিজ নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল। পেশোয়া খিরকি, কোরেগাঁও ও অষ্টিতে, ভোঁসলে সীতাবল্ডীতে এবং হোলকার মাহিদপুরে ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইলেন। লর্ড ময়রা পেশোয়া-পদ তুলিয়া দিয়া, তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশই সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ভোঁসলের রাজ্যের অন্তর্গত উড়িষ্যা লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। এখন তাঁহার অবশিষ্ট রাজ্যের উত্তরাংশও বৃটিশ শাসনাধীনে গেল। বাকী অংশে ভোঁসলে-বংশীয় এক নাবালক বৃটিশের তাঁবেদাররূপে সিংহাসনে বসিল। হোলকার রাজপুতানায় তাঁহার সমস্ত অধিকার ও নর্মদা নদীর দক্ষিণস্থ অঞ্চল ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। ইতিপূর্বে গোয়ালিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়া লর্ড ময়রার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। এইভাবে লর্ড ময়রা মারাঠাদের স্বাধীনতালাভের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ করিয়াছিলেন এবং ভারতের অভ্যন্তরে এক সুবিশাল অঞ্চলে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মারাঠাগণও ইংরেজদের অধীন দেশীয় রাজন্যে পরিণত হইয়াছিল। লর্ড ময়রা 1823 খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। ঐ বৎসর লর্ড আমহার্স্ট গভর্নর-জেনারেল হন। তিনি ভরতপুর অধিকার করেন। তাঁহার শাসনকালে প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে আসাম, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, মণিপুর, আরাকান ও তেনাসেরিম ইংরেজ শাসনাধীন হয়। 1828 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট পদত্যাগ করিলে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ গভর্নর-জেনাবেল হন। তিনি মহীশূর, কাছাড় ও কুর্গকে সরাসরি বৃটিশ অধিকারভুক্ত করেন। এইভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতের উপর বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ 1835 খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন।

লর্ড হেস্টিংস্, লর্ড আমহার্স্ট, লর্ড বেণ্টিঙ্ক্

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পরে স্যার চার্লস্ মেটকাফ (1835-36), লর্ড অকল্যাণ্ড (1836—41), লর্ড এলেনবরা (1841—44) ও লর্ড হার্ডিং (1844—48) ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন। লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্থানে বৃটিশ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। লর্ড এলেনবরা সিন্ধুর আমীরগণকে বিতাড়িত করিয়া সিন্ধু অঞ্চল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। লর্ড হার্ডিং প্রথম শিখ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যটি শিখগণের নিকট হইতে লইয়া গোলাপ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে পঁচাত্তর লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। শিখ বাহিনী হ্রাস করিয়া ও লাহোরে বৃটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিয়া তিনি অবশিষ্ট শিখ রাজ্যকে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

অকল্যাণ্ড, এলেনবরা ও হার্ডিং

লর্ড হার্ডিং 1848 খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলে, লর্ড ডালহৌসী ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন। লর্ড ডালহৌসী "স্বত্ববিলোপের নীতি" (Doctrine of Lapse) অনুসরণ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার-সাধন করেন। এই নীতি অনুসারে সাঁতারা, ঝান্সী, নাগপুর ও সম্বলপুরের রাজারা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে, তিনি ঐ সকল রাজ্য সরাসরি বৃটিশ শাসনাধীন করিয়া লন। কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের রাজারা দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তিনি পদচ্যুত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দেন। তিনি কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্যকে সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি সিকিম রাজ্যের কিয়দংশও বৃটিশ অধিকারভুক্ত করেন। হায়দরাবাদের নিজাম ইংরেজ বাহিনীর ব্যয় বাবদ দেয় টাকা দিতে না পারায়, তিনি বেরারও সরাসরি ইংরেজ অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি দক্ষিণ ব্রহ্ম বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার সময়েই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ হয় (1849)। লর্ড ডালহৌসী দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পাঞ্জাবকে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। এইভাবে সমগ্র ভারতে ও ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করে।

লর্ড ডালহৌসী

শাসন-ব্যবস্থার ক্রম-বিকাশ।—লর্ড ক্লাইভ মুঘল বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লইয়াছিলেন। এই ব্যবস্থানুসারে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব-সংগ্রহের ভার কোম্পানির হস্তে ও রাজ্যশাসনের ভার নবাবের হস্তে ছিল। এইরূপে দেশে যে দ্বৈরাজ্য (diarchy) প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে দেশে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিয়া প্রথমেই এই দ্বৈরাজ্য ব্যবস্থা রহিত করিলেন। এখন রাজস্ব আদায় ও রাজ্যের শাসনভার উভয়ই কোম্পানি স্বহস্তে গ্রহণ করিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি 'কালেক্টর' নামে এক শ্রেণীর ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। রাজস্ব বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য একটি রাজস্ব পরিষদ্ (Revenue Board) গঠিত হইল। যে জমিদার সর্বাধিক রাজস্ব দিতে রাজী হইল, তাহাকেই পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হইল। মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলিকাতা এখন রাজধানী হইল। হেষ্টিংস্ জমিদারী আদালতগুলির পরিবর্তে জেলায় একটি করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেওয়ানী বিচারের ভার ইংরেজ কালেক্টরগণের হস্তে ও ফৌজদারী বিচারের ভার দেশীয় বিচারকগণের হস্তে ন্যস্ত হইল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের জন্য যথাক্রমে কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত এবং

হেস্টিংসের আমলে

মুর্শিদাবাদে (পরে কলিকাতায়) সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালের দ্বিতীয় বৎসরে (1773) যে "রেগুলেটিং অ্যাক্ট" পাস হইয়াছিল, তদনুসারে বাংলার গভর্নর 'গভর্নর-জেনারেল' আখ্যা পাইয়াছিলেন। গভর্নর-জেনারেল এবং অন্য চারিজন সদস্য লইয়া গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল গঠিত ছিল। গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের উপর ফোর্ট উইলিয়ম (বাংলা) প্রেসিডেন্সির সামরিক ও অসামরিক শাসনভার ন্যস্ত ছিল। নববিজিত অঞ্চলগুলির শাসনভারও তাঁহাদের উপর ছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শাসনভার মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরগণের উপর ন্যস্ত ছিল। তবে যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ে
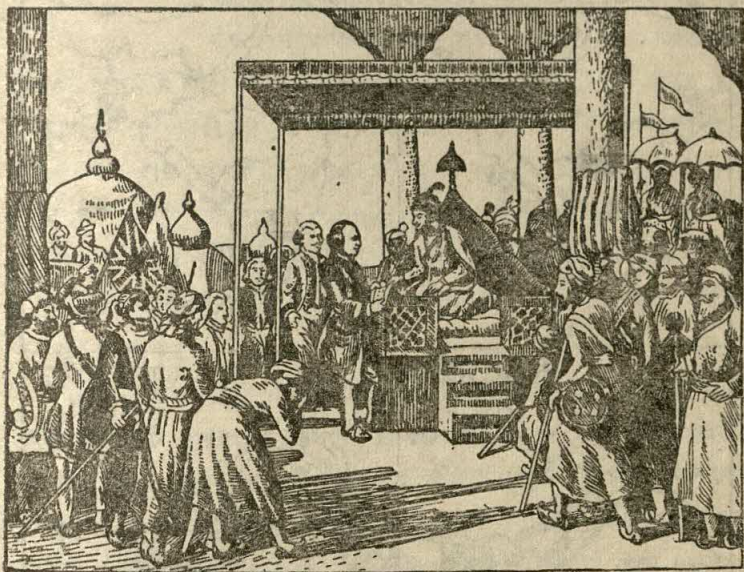
মুঘল বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে লর্ড ক্লাইভের দেওয়ানি লাভ

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিগুলির উপরও গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধিকার ছিল। একজন প্রধান ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া কলিকাতায় একটি 'সুপ্রীম কোর্ট' বা সর্বোচ্চ আদালত স্থাপিত হইয়াছিল।

হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল হন। ঐ সময় "ভারত আইন" অনুসারে গভর্নর-জেনারেলের সদস্য-সংখ্যা চার হইতে কমাইয়া তিন করা হয় এবং গভর্নর-জেনারেলের অতিরিক্ত একটি ভোট দেওয়ার অধিকার থাকায় তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের উপরও তাঁহার কর্তৃত্বাধিকার

বৃদ্ধি করা হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হন। কর্নওয়ালিস আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার অনেক সংস্কারসাধন করেন। কোম্পানির কর্মচারীরা অভাবের দায়েই দুর্নীতিপরায়ণ হয় মনে করিয়া তিনি তাহাদের বেতন
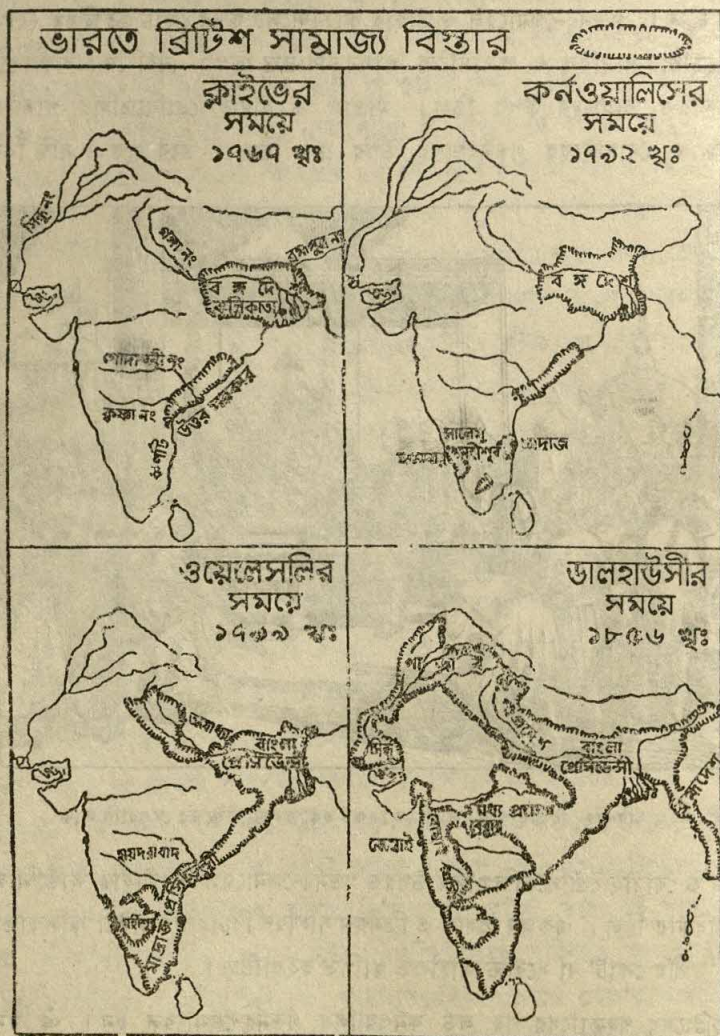
বৃদ্ধি করেন। কিন্তু তিনি ভারতীয়দিগকে দায়িত্বপুর্ণ পদে নিয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া মারাত্মক ভুল করেন। কারণ, এদেশে যোগ্য ইংরেজের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। ফলে, দায়িত্বপূর্ণ পদে বহু অযোগ্য ইংরেজ নিযুক্ত হইল। শাসনকার্যের

সুবিধার জন্য কর্নওয়ালিস প্রত্যেক জেলায় দুই শ্রেণীর উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন—(1) জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং (2) কালেক্টর। পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ জমিদারিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী রাখিত। কর্নওয়ালিস সে ব্যবস্থা রহিত করিয়া, প্রতি জেলাকে বহু থানায় বিভক্ত করিয়া দারোগার অধীনে আরক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেন। ফৌজদারী বিচারের জন্য কলিকাতায়, মুর্শিদাবাদে, পাটনায় ও ঢাকায় চারিটি ভ্রাম্যমাণ আদালত স্থাপিত হইল। তাঁহারা প্রত্যেক জেলায় বৎসরে দুইবার করিয়া ভ্রমণ করিতেন। পরে দেওয়ানী মামলার আপীল শুনিবার অধিকারও ঐ সকল আদালতের উপর ন্যস্ত হয়। অনধিক 50 টাকার মামলার বিচারের ভার ভারতীয় মুনসেফ ও সদর আমিনগণের উপর থাকে। কর্নওয়ালিস একটি আইনগ্রন্থ সংকলন করান। উহা 'কর্নওয়ালিস কোড' (Cornwallis Code) নামে পরিচিত। কর্নওয়ালিস ফৌজদারী বিধি হইতে কতকগুলি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা তুলিয়া দেন। কর্নওয়ালিস রাজস্ব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (Permanent Settlement) প্রবর্তন করেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারিতে জমিদারের স্থায়ী স্বত্ব রহিল, জমির রাজস্ব স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট করা হইল। পরে এই ব্যবস্থা মাদ্রাজের একাংশে এবং বারাণসীতেও প্রবর্তিত হইয়াছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ শাসন-ব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি জেলা লইয়া এক-একটি বিভাগ গঠন করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের উপর এক-একজন কমিশনার নিযুক্ত হন। বিভাগীয় কমিশনারদের হাতে জেলার কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট্ ও জজদের কাজের তত্ত্বাবধান করিবার ভার থাকে। পূর্বে জেলা জজ-ই ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিতেন। এখন প্রতি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাজের জন্য পৃথক পদ সৃষ্টি করা হয়। ভারতীয়গণকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইতে থাকে। বেন্টিঙ্ক্ প্রাদেশিক আদালতগুলি তুলিয়া দেন এবং ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার কালেক্টরদের হাতে থাকে। তিনি কতকগুলি সাব-জজের পদ সৃষ্টি করিয়া সেগুলিতে ভারতীয়গণের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় বিচারকদের বেতন ও বিচারাধিকার বৃদ্ধি করা হয়। এ পর্যন্ত ভারতীয় আদালতসমূহে ফারসী ভাষাই ব্যবহৃত হইত। বেন্টিঙ্ক্ ফারসী ভাষার বদলে আদালতে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন করেন। বেন্টিঙ্ক্ রাজকর্মচারীদের অনেকের বেতন কমাইয়া শাসন-কার্যের ব্যয় কমান। তিনি মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রাজস্ব-ব্যবস্থার

লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে

সংস্কার করেন। ঐ সকল অঞ্চলে জমিদারের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত না করিয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হয়।

লর্ড ডালহৌসী 1848 খ্রীষ্টাব্দ হইতে 1856 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও শাসন-ব্যবস্থায় নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারসাধন করেন। তাঁহার আমলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শাসন-ব্যবস্থাকে বিষয় অনুসারে কতিপয় বিভাগে (Department) বিভক্ত করা হয়। তিনি 1854 খ্রীষ্টাব্দে জনহিতকর কার্যের জন্য একটি পূর্ত-বিভাগ খোলেন এবং পথঘাট, সেচ, ডাক, তার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক-ভাবে সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তাঁহার আমলেই বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত এবং কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ খোলা হয়। তিনিই এদেশে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ প্রবর্তন করেন। তিনি একটি সরকারী শিক্ষা-বিভাগ খোলেন। তাঁহার সময়ে আইন-বিষয়ক কার্যের জন্য গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে আরও ছয়জন সদস্য লওয়া হয়। এইরূপে ভারতীয় আইনসভার সূত্রপাত ঘটে। তাঁহার শাসনকালে একটি আইন কমিশন বসে। ঐ কমিশন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালতগুলিকে সংযুক্ত করিয়া, হাইকোর্ট স্থাপন এবং বৃটিশ ভারতের সকল আদালতে ব্যবহারের উপযোগী একই ধরনের আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। ঐ সুপারিশ পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের আমলে কার্যকরী হয়।

লর্ড ডালহৌসীর আমলে

এইভাবে শতাব্দীকাল ধরিয়া বৃটিশ-অধিকৃত ভারতের একটি শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে।

বৃটিশ সরকারের সহিত কোম্পানি সরকারের সম্পর্ক।—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-ই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং শতাব্দীকাল কোম্পানির হস্তেই বৃটিশ ভারতের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার কোম্পানিকে ভারত শাসন-ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেন নাই। বৃটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সনন্দ দিতেন। এই সকল সনন্দে কোম্পানির অধিকার ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। তাহা ছাড়া, বৃটিশ সরকার আইন করিয়াও কোম্পানির কার্য-কলাপ ও অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বৃটিশ সরকার 1772 খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস করিয়া কোম্পানির পরিচালন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটান। স্থির হয়, কোম্পানির ডিরেক্টরগণ চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং 24 জন ডিরেক্টর থাকিবেন, প্রতি বৎসর এক-চতুর্থাংশ ডিরেক্টর পদত্যাগ করিবেন এবং নূতন ডিরেক্টরগণ ঐ সকল শূন্যস্থান পূরণ করিবেন। কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ভারতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত সকল চিঠিপত্র এবং সামরিক ও অসামরিক সকল

রেগুলেটিং অ্যাক্ট

বিষয় বৃটিশ সরকারকে জানাইতে বাধ্য থাকিবেন। এই আইন অনুসারেই ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সির গভর্নর বাংলার গভর্নর-জেনারেল আখ্যা পান, চারিজন সদস্য লইয়া তাঁহার একটি কাউন্সিল গঠিত হয় এবং একটি সুপ্রীম কোর্ট-ও স্থাপিত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্টে কতিপয় ত্রুটি ছিল, তাই বৃটিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিট একটি নূতন "ভারত আইন" পাস করেন (1784)। এই আইন অনুসারে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। তবে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুমোদন ব্যতীত গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের কোন ভারতীয় রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না। কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের-ও ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। ছয়জন সদস্য লইয়া একটি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ্ (Board of Control) গঠন করা হয়। ইংলণ্ডের একজন মন্ত্রী ঐ পরিষদের সভাপতি হইলেন। ঐ পরিষদের অধিকাংশ কর্ম-পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপরই ন্যস্ত থাকে। এইভাবে বৃটিশ সরকার কোম্পানির পরিচালনা তথা ভারত শাসন সম্পর্কে অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কোম্পানির অংশীদারদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য তিনজনের অনধিক সদস্য লইয়া একটি 'গুপ্ত সমিতি' (Secret Committee) গঠিত হয়।

ভারত আইন

বিশ বৎসর অন্তর কোম্পানিকে বৃটিশ সরকার যে সনন্দ (Charter) দিতেন, সেগুলিতে ক্রমেই কোম্পানির ক্ষমতা হ্রাস করা হইতেছিল। 1793 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানিকে যে সনন্দ দেওয়া হয়, তাহাতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকারের উপর বাংলা সরকারের প্রাধান্য আরও বৃদ্ধি পায়। 1813 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানিকে যে সনন্দ দেওয়া হয়, তাহাতে ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লোপ পায়। তবে তাহাদিগকে চীনদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই সনন্দ অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত স্থানের উপর ইংলণ্ডেশ্বরের সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হয়। 1833 খ্রীষ্টাব্দে যে নূতন সনন্দ দেওয়া হয়, তদনুসারে বণিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবার আর অধিকার থাকে না। চীনদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারও তাহার লোপ পায়। কোম্পানি এখন হইতে পরবর্তী বিশ বৎসরের জন্য ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে ভারত শাসনের কার্যে নিযুক্ত থাকে। এই সনন্দ অনুসারেই বাংলার গভর্নর-জেনারেল 'ভারতের গভর্নর-জেনারেল' হন। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা পুনরায় তিন হইতে চার করা হয়। এই নূতন সদস্য হইলেন আইন-সদস্য। এখন সমগ্র বৃটিশ ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার ও দায়িত্ব গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার

বিভিন্ন সনন্দ

কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হয়। 1853 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি তাহার শেষ সনন্দ লাভ করে। শাসনকার্যের জন্য এতদিন কোম্পানি-ই কর্মচারী নিয়োগ করিতেছিল। এই সনন্দ অনুসারে রাজকর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফলে, শাসন-ব্যবস্থায় কোম্পানির প্রাধান্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। 1857 খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

সিপাহী বিদ্রোহ।—সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাতে কতকগুলি কারণ ছিল। সেগুলিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক এবং সামরিক—এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক স্বত্ববিলোপের নীতি অনুসরণের ফলে দেশীয় রাজারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডালহৌসী দত্তকগ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং দত্তকগণের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। ফলে, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তিও বন্ধ হয়। ইহাতে হিন্দুগণ অসন্তুষ্ট হন।

তিনি অযোধ্যা রাজ্যকে কুশাসনের অজুহাতে অধিকার করেন এবং বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের বাসভবন হইতে দিল্লীর কুতবে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন। এই দুই কারণে মুসলমানরা খুবই অসন্তুষ্ট হন। অযোধ্যা কোম্পানির অধিকারভুক্ত হওয়ায়, সেখানকার তালুকদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সেখানকার সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় কর্মচ্যুত সৈন্যগণের দুর্দশার সীমা ছিল না। ফলে, অযোধ্যার তালুকদার ও কর্মচ্যুত সৈনিকদের অসন্তোষ এই বিদ্রোহের পশ্চাতে বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার সমাজ-সংস্কারেও নানাভাবে অংশগ্রহণ করায়, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে

বিদ্রোহের কারণ

এইরূপ একটি ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ইংরেজ সরকার এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে উৎসাহ দিতেছে। খ্রীষ্টান মিশনারিদের কার্যকলাপও এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিতেছিল। সৈন্যদের অবস্থাও এই সময়ে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ সৈন্য-বাহিনীতে শতকরা 19 জনের বেশী ইংরেজ সৈন্য ছিল না। এই অবস্থায় বিদ্রোহ ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। বিদ্রোহের আশু ও প্রত্যক্ষ কারণরূপে আসিল সৈন্যবাহিনীতে এন্ফীল্ড রাইফেলের প্রবর্তন। এই বন্দুকের টোটায় চর্বি মিশ্রিত থাকিত এবং টোটাগুলিকে দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে ভরিতে হইত। ইহা যে জাতি-নাশ করিবার জন্যই করা হইয়াছে, এইরূপ ধারণা হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ফলে, হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের 29শে মার্চ বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সৈনিক একজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করিল। এইভাবে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিল।

বিদ্রোহের সূত্রপাত

ইহার কয়েক মাস বাদে আম্বালায় ও মীরাটে বিদ্রোহ প্রবলভাবে দেখা দিল। মীরাটে সিপাহীদের হস্তে বহু ইংরেজ নিহত হইল। সিপাহীরা দিল্লী অধিকার করিয়া বৃদ্ধ বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিদ্রোহ উত্তর ভারতের বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। কানপুরে নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এখানেও বহু ইংরেজ নিহত হইল। কয়েকদিন বাদে ইংরেজগণ কানপুর অধিকার করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইল। শিখ সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজগণ দিল্লী অধিকার করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে তাঁহার পুত্র-পৌত্রসহ বন্দী করিল। বাহাদুর শাহ্ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হইলেন। তাঁহার বংশধরগণকে ইংরেজগণ হত্যা করিল। লক্ষ্ণৌয়ে বিদ্রোহীগণ দীর্ঘকাল ইংরেজদের অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়াছিল। 1858 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল বিদ্রোহীদের দমন করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইংরেজরা যখন লক্ষ্ণৌ রক্ষায় ব্যস্ত ছিল, তখন মধ্য-ভারতে বিদ্রোহীগণ তুমুল যুদ্ধ করিতেছিল। এই বিদ্রোহীগণের নেতৃত্ব করিতেছিলেন কানপুরের নানা সাহেব, ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ও মারাঠা-বীর তান্তিয়া টোপী। শেষ পর্যন্ত তাঁহারাও ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইলেন। রণক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাঈ নিহত হইলেন। তান্তিয়া টোপী বন্দী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং নানা সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করিলেন। এইভাবে এক বৎসর লড়াই চলিবার পর দারুণ ব্যর্থতার মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হইল।

বিদ্রোহের গতি

বিদ্রোহের অবসান

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল বলা যায় না। কারণ, ইহার ফলেই বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভারতে কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। 1858 খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারতে একটি নূতন শাসন-ব্যবস্থা চালু হইল। এখন ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন। ভারতের শাসন-পরিচালনা ভারত-সচিব নামে তাঁহার একজন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইল। ভারত-সচিবকে পরামর্শ দানের জন্য পনের জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি কাউন্সিল রহিল। ভারতের গভর্নর-জেনারেল এখন হইতে ভাইস্রয় বা রাজপ্রতিনিধি নামেও পরিচিত হইলেন। ভারতীয় জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়া একটি ঘোষণা জারী করিলেন। তাহাতে বলা হইল যে, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, যোগ্য ভারতীয়গণ জাতি-ধর্ম-বংশ নির্বিশেষে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে। কোম্পানির আমলের সন্ধিগুলির শর্ত কঠোরভাবে পালন করা হইবে এবং দেশীয় রাজ্য অধিকারের নীতি পরিত্যক্ত হইবে ও দত্তকগণ উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারিবেন।

বিদ্রোহের ফলাফল

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the building-up of the British Power in India. [ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. Briefly describe the Administrative Organisation in British India upto the Sepoy Mutiny. [সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত বৃটিশ ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।]

3. Briefly describe the relation between the Government of British India and the British Government. [বৃটিশ ভারতীয় সরকারের সহিত বৃটিশ সরকারের সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

4. Briefly describe the Revolt of 1857. What were its causes and results? [1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। উহার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতিতে বৃটিশ প্রভাব

প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান।—প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও, তাহার অর্থনীতিতে শ্রমশিল্প একটি প্রধান স্থান অধিকার করিত। মুসলমান আমলে যে সকল ইউরোপীয় পর্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতের শ্রমশিল্প এবং সমৃদ্ধ নগরসমূহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৃটিশ আমলে ভারতের শ্রমশিল্প বিপন্ন হইল। ইংলণ্ডের দুই প্রকার শোষণ-নীতির ফলে ভারতীয় শিল্প বিধ্বস্ত হইল। এই দুই প্রকার শোষণের পশ্চাতে ছিল বণিক-শ্রেণী এবং শিল্পপতি-শ্রেণী। প্রথম যুগে উপনিবেশ-স্থাপনে ও সাম্রাজ্য-বিস্তারে বণিক-শ্রেণীরই প্রাধান্য ছিল। প্রাচ্যের ব্যবসায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-ই এই বণিক-শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিত। এই বণিক-শ্রেণী ভারত হইতে বিভিন্ন পণ্য লইয়া গিয়া ইউরোপে প্রচুর মুনাফায় বিক্রয় করিত। ভারতে তাহারা সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নামমাত্র মূল্য দিয়া ক্রয়ের নামে বিভিন্ন পণ্যের লুণ্ঠন চালাইত। ফলে, ভারতীয় উৎপাদকরা এই ধরনের লুণ্ঠন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার আশায় উৎপাদন বন্ধ করিয়াছিল। ফলে, শ্রমশিল্পের সর্বনাশ হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্ত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। অল্পমূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায়, তাঁতীরা কাপড় তৈয়ারি বন্ধ করিয়াছিল। তাহাতেও তাহাদের অব্যাহতি ছিল না। কোম্পানির এজেন্টরা তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত, ধরিয়া লইয়া গিয়া কুঠিতে আটক রাখিত, অনেক সময় কুঠিতেই আটক অবস্থায় অনেক তাঁতীর মৃত্যু হইত। ইংরেজদের এই জুলুমের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু তাঁতী নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিত। লক্ষ লক্ষ তাঁতী অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যুবরণ করিত। ইংরেজ বণিক-শ্রেণী কেবল ভারতীয় শ্রমশিল্পেরই সর্বনাশ করে নাই, তাহারা ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও বহু ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। ফলে ভারতীয় বাণিজ্যেরও সর্বনাশ ঘটিয়াছিল। ইংরেজ বণিক-শ্রেণী ভারতে এইরূপ অবাধ লুণ্ঠন চালাইবার ফলে ইংলণ্ডে অপরিমিত ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, ইংলণ্ড বহুবিধ যন্ত্র উদ্ভাবন করায় ইংলণ্ডে বহু যন্ত্র-চালিত বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য ভারতবর্ষে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা করিবার জন্য ইংলণ্ডের শিল্পপতি-শ্রেণী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। এখন তাহারা ভারতকে ইংলণ্ডের বাজারে পরিণত করিবার জন্য ভারতের অবশিষ্ট শিল্পগুলিও ধ্বংস

দুই প্রকার শোষণ

করিল। ইংলণ্ডের কল কারখানাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের জন্যও ভারতের কৃষি-প্রাধান্য তাহারা বাড়াইয়া তুলিল। এইভাবে ভারত সম্পূর্ণরূপে কৃষিপ্রধান হইয়া পড়িল। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, তাহা না করায় কৃষিতেও অবনতি দেখা দিল। যে ভারত একদিন ধনদৌলতে ও ঐশ্বর্যে পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিল, তাহা শোচনীয় দারিদ্র্যের কবলিত হইল।

ভারত ধনী হইতে দরিদ্র দেশে পরিণত

ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন।—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এদেশে যে ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘন ঘন জমিদার ও ইজারাদারের পরিবর্তন ঘটিলেও তাহা মূলতঃ মুঘল আমলের ভূমি-ব্যবস্থারই অনুরূপ ছিল। সর্বাধিক রাজস্ব দেওয়ার শর্তে লোকে জমিদারি বা ইজারাদারি পাইত, কিন্তু জমির উপর তাহাদের কোনও স্থায়ী মালিকানা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা সরকার-নিযুক্ত রাজস্ব-আদায়কারী মাত্র ছিল। তাহারা সরকারকে দেয় রাজস্বের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিত এবং প্রজাদের জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিত। কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস যে ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তাহাতে জমিদার-শ্রেণীই জমির মালিক হইল, তাহারা জমি ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্ণ অধিকার পাইল। জমি এখন ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য হইয়া উঠিল। ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থায় ইহা সম্পূর্ণরূপে অভিনব ব্যাপার ছিল। এখন দেশের ধনীরা তাহাদের সঞ্চিত ধন (Capital) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও কল-কারখানায় বা শিল্পোন্নয়নে নিয়োগ না করিয়া জমি ও জমিদারি কিনিতে লাগিল। ইহাতে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের অবনতি ঘটিল। জমিতে তাহাদের স্থায়ী অধিকার থাকায়, জমির ও কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির দিকে লক্ষ্য না দিয়া প্রজাদের নিকট হইতে যথাসম্ভব উচ্চ হারে খাজনা আদায় করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইল। এইভাবে ভারতীয় অর্থনীতি আরও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল।

ভূমির উপর স্থায়ী মালিকানা সৃষ্টি

ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন।—ভারতবর্ষ বৃটেনের বাজারে পরিণত হওয়ায়, ইংরেজদের সহচর ও অনুচররূপে একদল ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে লাগিল। এই পথে তাহারা যথেষ্ট টাকাপয়সা সংগ্রহ করিল, ফলে এদেশীয় এক নূতন ধনিক-শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। জমিদার-শ্রেণীর লোকরাও এখন প্রচুর ধনসম্পদ্ সঞ্চয় করিল। ফলে, ভারতীয় ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর লোকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং কল-কারখানা-স্থাপনে বিনিয়োগ করিতে লাগিল। এইভাবে দেশীয় মালিকানায় এদেশে বহু কল-কারখানা ও ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটিল। দেশে শিল্পায়নের সূত্রপাত ঘটিল।

এদেশে ঠিকমতো ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার জন্য ইংরেজগণ দেশের অভ্যন্তরে বহু পথঘাট ও রেলপথ নির্মাণ করিয়াছিল। 1853 খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত এবং 1855 খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার তিনশত মাইল রেলপথ নির্মিত হইয়াছিল। রেলপথের সম্প্রসারণ ক্রমাগত চলিতে থাকে। কেবল রেলপথ নহে, এদেশে বিলাত হইতে পণ্য আমদানি এবং এখান হইতে কাঁচামাল বিলাতে রপ্তানির জন্য বাষ্পীয় পোতের চলাচলও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 1832 খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরের ডকে বাষ্পীয় পোত নির্মাণ শুরু হয়। দেশের অভ্যন্তরে পথঘাট বহু নির্মিত হওয়ায় যানবাহনের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটে। দেশে বাষ্পীয় যানের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। বিমান উদ্ভাবনের ফলে বিমানও যানবাহনরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

আধুনিক যানবাহন

দেশে রেলপথ ও বাষ্পীয় পোত এবং বহু কল-কারখানা চালু হওয়ায় কয়লার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ পুঁজিপতিদের উদ্যোগেই দেশে প্রথম কয়লার খনিগুলির খনন শুরু হয়। 1820 খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জের কয়লার খনিতে কাজ আরম্ভ হয় এবং কয়লার-খনির কাজ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 1880 খ্রীষ্টাব্দে কয়লা-খনির সংখ্যা দাঁড়ায় 60টি এবং ঐ বৎসর দশ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয়। কয়লা-খনির সংখ্যা ও কয়লার উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রেলপথ ও কল-কারখানার জন্য লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনে জেসপ অ্যাণ্ড কোম্পানি (1839), ম্যাকে অ্যাণ্ড কোম্পানি (1855), বার্ন কোম্পানি (1875), বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি (1875) এবং মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানির (1894) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে ভারতীয় শিল্পপতিগণও অগ্রণী হন। 1911 খ্রীষ্টাব্দে "টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস্" স্থাপিত হয়। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন এদেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কয়লা

লৌহ ও ইস্পাত

বৃটিশ শিল্পপতি ও ধনিকগণ ভারতের কাঁচামাল ও অল্প পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এদেশে বহু কল-কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছিল। এ-ব্যাপারে পাটের কলগুলির উল্লেখ সর্বাগ্রে করিতে হয়। বৃটিশ ধনিক ও শিল্পপতিদের সহযোগীরূপে এবং পরে স্বতন্ত্ররূপে ভারতীয় ধনিকগণও দেশে বহু কল-কারখানা স্থাপন করেন। এগুলির মধ্যে কাপড়ের কল, কাগজের কল ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হইতে কল-কারখানায় উৎপন্ন অসংখ্য প্রকারের জিনিস এদেশের বাজারে বিক্রয় হইতেছিল এবং এদেশের লোকের রুচিতে আমূল পরিবর্তন

দেখা দিয়াছিল। ফলে, দেশীয় শিল্পপতিগণ দেশে ছোট-বড় কল-কারখানা নির্মাণ করিয়া, জনসাধারণের চাহিদার একাংশ মিটাইতেছিলেন। বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ইঁহাদের অসুবিধা হইতেছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত ভারতীয়গণের যে সংগ্রাম শুরু হইল, তাহাতে ইঁহাদের খুবই সুবিধা হইল। স্বদেশী আন্দোলনে বৃটিশ পণ্য বর্জন ও দেশী পণ্য গ্রহণ প্রধান অস্ত্ররূপে গৃহীত হইল। এই আন্দোলনের ফলে দেশে কেবল কুটীরশিল্পেরই পুনরুজ্জীবন হইল না, ইহা দেশের শিল্পায়নেরও সহায়ক হইয়া উঠিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে পণ্য আমদানির অন্তরায় ঘটায় এদেশের শিল্পায়ন দ্রুততর হয়।

শিল্পের পুনরুজ্জীবন

অর্থনৈতিক জীবনের আধুনিকীকরণ।—এইভাবে বৃটিশ শাসন ভারতের প্রাচীন অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিলেও, সেই ধ্বংসস্তূপের উপর এক আধুনিক অর্থনীতির বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। দেশে ছোট-বড় কল-কারখানা স্থাপিত হয়, পথঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। মানুষের রুচি ও চাহিদাও আধুনিক যুগোপযোগী হইয়া উঠে। কৃষিতেও ইহার প্রভাব অনিবার্য হইয়া পড়ে। বৃটিশ আমলেই এদেশে চা ও আলুর চাষ প্রবর্তিত হয়। 1834 খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক্ ভারতে চা-চাষের বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। চীনদেশ হইতে চায়ের বীজ ও চারা আনিয়া, চীনা পদ্ধতি অনুসারে আসামে ও হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে চায়ের বাগানগুলি গড়িয়া তোলা হয়। 1859 খ্রীষ্টাব্দে সেখানে মাত্র 48টি চায়ের বাগান ছিল, 1871 খ্রীষ্টাব্দে সেখানে 259টি চায়ের বাগান খোলা হয়। চায়ের উৎপাদন দেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং ভারত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চা-উৎপাদক দেশে পরিণত হয়। মুসলিম আমলে এদেশে কফির চাষ শুরু হইলেই ইংলণ্ডে ইহার চাহিদা বাড়ায়, কফির চাষ দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান কৃষিকর্মে পরিণত হয়। যে আলু আজ ভারতীয়গণের অন্যতম প্রধান সহযোগী খাদ্যরূপে গণ্য, তাহা বৃটিশ আমলেই এদেশে প্রবর্তিত হয়। আলু এখন ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। পাটের চাষ এদেশে পূর্বে হইলেও, বৃটিশ আমলেই পাটের চাষ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায় এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান পাট-উৎপাদক দেশে পরিণত হয়। চটকলের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 1870 খ্রীষ্টাব্দে যেখানে বাংলা দেশে চটকলের সংখ্যা ছিল মাত্র 9টি, সেখানে 1926 খ্রীষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা দাঁড়ায় 90টি। 1926 খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। ভারতে তুলার চাষ পূর্বে প্রচুর পরিমাণে হইলেও, বস্ত্রশিল্পের অবনতির ফলে তাহাতেও অবনতি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ আমলে 1861 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায়

গৃহযুদ্ধ বাধায়, ঐ দেশ হইতে ইংলণ্ডে কাঁচা তুলা আমদানি বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, ইংলণ্ডকে ঐ সময় ভারতে উৎপন্ন তুলার উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ভারতে তুলার চাষ বৃদ্ধি পায়। 1862—65 খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী তুলার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বাড়ে। স্বদেশী আন্দোলন ও দেশে ব্যাপকভাবে খাদির প্রচলনের ফলেও তুলার চাষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশে বস্ত্রশিল্পেরও পুনরুজ্জীবন ঘটে। দেশে কাপড়ের কল-কারখানা গড়িয়া উঠিতে থাকে। 1862 খ্রীষ্টাব্দে যেখানে ভারতে মাত্র 12টি কাপড়ের কল ছিল, 1900 খ্রীষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় 190টি। এইভাবে কি শিল্পে, কি কৃষিতে, কি ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভারতে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. **Briefly describe the British impact on Indian economy.** [ভারতীয় অর্থনীতিতে বৃটিশ সংঘাত ও প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. **What do you know about the beginning of the economic revival of India under the British rule?** [বৃটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল, সে সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

উনবিংশ অধ্যায়

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার ও ভারতীয় সমাজ ও চিন্তাধারায় তাহার প্রভাব

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার।—ইংরেজগণ যেমন ভারতীয় সিপাহীর সাহায্যে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি ভারতে ইংরেজ শাসন পরিচালনার জন্যও ভারতীয়দের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। তাই ইংরেজগণ প্রথম হইতেই ভারতীয়দের সহিত যোগাযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা প্রথমযুগে এদেশীয় ভাষা শিখিয়াছিল এবং এদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিল, লেখ্য গদ্য-ভাষার উদ্ভাবন-অনুশীলনে ব্রতী হইয়াছিল। কলিকাতা ছিল ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। তাই এ-বিষয়ে তাহারা কলিকাতাতেই অধিকতর উদ্যোগী হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ 1781 খ্রীষ্টাব্দে ফারসী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই

স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইংরেজ কর্মচারিগণকে এদেশীয় ভাষাসমূহে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য লর্ড ওয়েলেস্‌লি 1800 খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহা বাংলা, উর্দু ও হিন্দী ভাষা শিক্ষার ও অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বহু দূরদর্শী ইংরেজ এদেশে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সরকারী কর্মচারী চার্ল্‌স্‌ গ্র্যান্ট ভারতীয়গণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের উপযোগিতার কথা বুঝাইয়াছিলেন। ইংরেজ মিশনারিরাও অনেকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেরী, মার্শম্যান, হেয়ার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদেশীয়গণও এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। হেয়ার ও রামমোহনের চেষ্টায় এদেশে অনেকগুলি ইংরেজী বিদ্যালয় ও হিন্দু কলেজ (পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্সী কলেজ) স্থাপিত হইয়াছিল। 1813 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানিকে যে সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রতি বৎসর ভারতীয়-গণের শিক্ষার জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার নির্দেশ ছিল। এই টাকা কোম্পানি এদেশীয় ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারেই ব্যয় করিত। কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা হইলে রামমোহন রায় প্রমুখ বহু ব্যক্তি উহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু সরকার তাহাতে কর্ণপাত করিল না। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সরকার সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী বই প্রকাশের জন্য টাকা খরচ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু-দিনের মধ্যে সরকারী মনোভাবে পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করিল।

প্রথমদিকের সরকারী নীতি

ডেভিড হেয়ার

সরকারী নীতির পরিবর্তন

মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফ সরকারী পাবলিক এডুকেশন কমিটিতে স্থান পাইলেন এবং বিখ্যাত ইংরেজ লেখক, ইতিহাসকার ও বাগ্মী মেকলে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য হইলেন। ইহারা উভয়েই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। 1833 খ্রীষ্টাব্দের নূতন সনন্দ অনুসারে উচ্চ রাজকর্মচারীরূপে ভারতীয়দিগকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল। ফলে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হইয়াছিল। 1835 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ কলিকাতায় বিজ্ঞান ও জীব-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিলেন। হার্ডিংয়ের আমলে সরকারী কার্যের জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে ইংরেজী শিক্ষার জ্ঞানকে যোগ্যতার অধিকতর পরিচায়ক বলিয়া ঘোষণা করায় ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। 1854 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি চার্ল্‌স্ উড ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা ছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পরবর্তী বিশ বৎসরে মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর ও এলাহাবাদেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। চার্ল্‌স্ উডের নির্দেশে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থারও কথা ছিল। বেথুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চেষ্টায় এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ঘটিল। ভারতীয় ধনী ব্যক্তিরাও এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী হইলেন। ফলে, প্রধানতঃ এদেশীয় চেষ্টায় দেশে বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা—স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

অবশ্য, এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ের তুলনায় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির উপরই অধিকতর জোর দেওয়া হইতেছিল। গোড়ার দিকে বিজ্ঞান ও গণিত অবহেলিত হইলেও, ক্রমেই তাহা আদৃত হইতে থাকে। দেশে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বহু কলেজ স্থাপিত হয়। ভারতীয়গণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অনেকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। ইহাদের মধ্যে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক সি. ভি. রমনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রমন্ 1930 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কার উদ্ভিদ-বিদ্যায় যুগান্তর আনে এবং পদার্থ-বিদ্যায় বহু মূল্যবান্ তথ্য সংযোগ করে।

বিজ্ঞানে উন্নতি

সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়ন।—ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও উদারনৈতিক চিন্তাধারা ভারতীয় সমাজের বহু যুক্তিহীন কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিল। ফলে, এদেশীয় মনীষীদের উৎসাহে ও চেষ্টায় এবং ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ-সংস্কারমূলক বহু ব্যবস্থা গৃহীত হইল। ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারসমূহের মধ্যে সতীদাহ, শিশুহত্যা, নরবলি, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। আকবর ও ঔরংজেব এই বীভৎস প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন,

কিন্তু সফল হন নাই। এই প্রথা বঙ্গদেশে খুবই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। গোঁড়া হিন্দুগণ এজন্য রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ এই ভয়ঙ্কর প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দেন এবং সতীদাহে অংশগ্রহণকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

সতীদাহ প্রথা লোপ

গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন এবং শিশুকন্যা-বধ—এই দুইটি বীভৎস প্রথাও ভারতীয় হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। অনেক স্ত্রীলোক সন্তান-কামনায় গঙ্গার নিকট এই বলিয়া মানত করিত যে, সে সন্তানের জননী হইলে তাহার প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিবে এবং এই মানত পূরণের জন্য মাতারা জীবন্ত শিশুকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিত। 1795 খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন প্রথা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন রাজপুত, জাঠ ও মেওয়াট সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু কন্যাসন্তানকে দীর্ঘদিন অল্পাহারে রাখিয়া মারিয়া ফেলা হইত। এই নৃশংস প্রথাও আইন করিয়া 1802 খ্রীষ্টাব্দে তুলিয়া দেওয়া হয়। উড়িয়্যার খোন্দ উপজাতির লোকরা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইবে এই ধারণায় নরবলি দিত। লর্ড হার্ডিং আইন করিয়া এই প্রথা তুলিয়া দেন।

শিশুহত্যা নিরোধ

নরবলি নিরোধ

সতীদাহ প্রথা তুলিয়া দেওয়ার ফলে বিধবাবিবাহের প্রচলনও অপরিহার্য ছিল। বিধবারা যাহাতে পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে, সেজন্য রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও প্রচলনের চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগকে গোঁড়া হিন্দুদের নিকট হইতে কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। শেষ পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসী একটি আইন করিয়া বিধবাবিবাহকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ প্রথা ভারতীয় সমাজে অন্যতম কুসংস্কাররূপে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। বাল্যবিবাহ প্রথা নিরোধ করিবার জন্য ভারতীয় মনীষিগণ চেষ্টা করিতে থাকেন। অবশেষে বিখ্যাত সমাজ-

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সংস্কারক পার্শী বেরহামজী মালাবারীর চেষ্টায় 1891 খ্রীষ্টাব্দে 'সম্মতির বয়স আইন' পাস হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও ক্রীতদাস প্রথা প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। মুসলমান আমলে ইহা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তবে মুসলমান আমলের পরে উহা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক্ ক্রীতদাসগণের অবস্থার উন্নতির জন্য আইন করেন। কয়েক বৎসর পরে লর্ড হার্ডিং আইন করিয়া ক্রীতদাস প্রথা তুলিয়া দেন।

বাল্যবিবাহ নিরোধ

ক্রীতদাস প্রথা লোপ

ধর্ম-সংস্কার।—পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবর্তনের ফলে মানুষের মন স্বভাবতঃই রক্ষণশীলতার বিরোধী ও যুক্তিবাদী হইয়া উঠিতেছিল। ইহার প্রভাব ভারতীয় ধর্মেও পতিত হইয়াছিল। ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায় কেবল বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য নহে, ধর্ম-সংস্কারেও অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে 1828 খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ব্রাহ্ম সমাজের' প্রতিষ্ঠা হয়। রামমোহন আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ফলে বেদান্ত, কোরান ও বাইবেলের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বেদান্তে, কোরানে ও বাইবেলে একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করা হইয়াছিল। ফলে রামমোহন বেদান্তের একেশ্বর পরমব্রহ্মের উপাসনাকেই ভারতীয় ধর্মের মূলকথা বলিয়া প্রচার করেন। এইরূপে একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী ব্রাহ্ম ধর্মের উৎপত্তি হয়। রামমোহনের মৃত্যুর পর 1843 খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সক্রিয়ভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। আরও পরে 1857 খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার চেষ্টায় ব্রাহ্ম ধর্ম বাংলা দেশের বাহিরে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশেও বিস্তারলাভ করে। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচররা জাতিভেদ প্রথা লোপ, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তন, উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রচার করিতে থাকেন। ফলে, ব্রাহ্ম সমাজে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুইটি দলের উদ্ভব

রাজা রামমোহন রায়

ব্রাহ্ম সমাজ

হয়। এইভাবে ব্রাহ্ম সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়। পরে কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলে, প্রগতিশীল দলটির মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং কেশবচন্দ্র-বিরোধীগণ 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গড়িয়া তুলেন। যাহাই হউক, ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন যে জাতিভেদ দূরীকরণ, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা-বিবাহের প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্তন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রার্থনা সমাজ

1867 খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম ধর্ম ও কেশবচন্দ্র সেনের নিকট হইতে তিনি এ-বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রার্থনা সমাজের দান অপরিমেয়। অস্পৃশ্যতা-বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তন, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্তন ও স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতিবিধান, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে প্রার্থনা সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

আর্য সমাজ

উত্তর ভারতে 'আর্য সমাজ' নামেও একটি শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী জানিতেন না। তাই তিনি তাঁহার মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বেদ ও বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিও রামমোহনের মতো একেশ্বরবাদী ছিলেন, পৌত্তলিকতা ও আচার-অনুষ্ঠান ঘৃণা করিতেন। তিনি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, সমুদ্রযাত্রার বিরোধিতা প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতির পক্ষে আন্দোলন করেন। তিনি অন্য ধর্মের লোককে "শুদ্ধির" দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন।
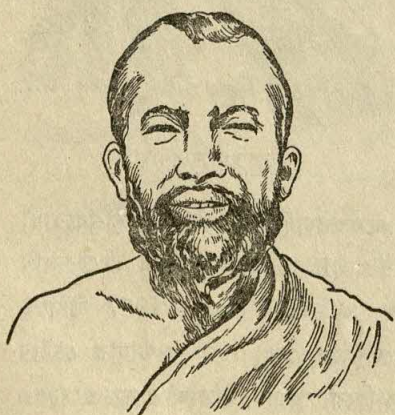
শ্রীরামকৃষ্ণ

এ-যুগে ধর্মান্দোলনে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু সমাজে পৌত্তলিকতা ও বহু-দেবদেবীপূর্ণ পৌরাণিক ধর্ম অতি গভীরে ও ব্যাপকভাবে তাহার মূল সঞ্চারিত করিয়া ছিল। ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ প্রভৃতির নিরাকার একেশ্বরের উপাসনা তাহাকে আঘাত দেওয়ায় হিন্দু সমাজে যে বিদ্বেষ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হইল, তাহা জাতীয় জীবনের সংহতির পক্ষে কিছুটা অনিষ্টকর

ছিল। সেদিক হইতে বিচার করিলে রামকৃষ্ণ জাতীয় সংস্কৃতির বাণীমূর্তি-রূপে দেখা দিলেন। তিনি বহু-দেবদেবীপূর্ণ পৌত্তলিক পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের সহিত নিরাকার-একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্মের সমন্বয় ঘটাইলেন। তিনি পৌত্তলিকতাকে পরমব্রহ্মে উপনীত হইবার সোপানরূপে গ্রহণ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যেও সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের সূত্র সন্ধান করিলেন। তিনি বলিলেন, "জল, পানি ও ওয়াটার্ যেমন একই বস্তুর বিভিন্ন নামমাত্র, তেমনি ব্রহ্ম, হরি, কৃষ্ণ, আল্লাহ্ ও গড্ একই ভগবানের বিভিন্ন নামমাত্র।" বহু ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে ধর্ম-সমন্বয়ের এই বাণী জাতীয় সংহতিসাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও আবশ্যক ছিল।

রামকৃষ্ণ

জাতীয় সংহতি ও জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে বিবেকানন্দের দান অপরিসীম। তিনি 1897 খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসভায় ভারতীয় ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। জাতীয়তার বিকাশের পক্ষে জাতির এই আপন শ্রেষ্ঠত্ববোধ অপরিহার্য ছিল। কেবল তাহাই নহে, দুঃখদৈন্য-প্রপীড়িত ভারতীয় সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, "তোমার দেশের একটি কুকুরও যখন অনাহারে থাকিবে, তখন তোমাদের নিজের মুক্তির জন্য ধর্মসাধনার কোনও অধিকার নাই।" তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবসাধনের কথাও চিন্তা করিতেন। তিনি সন্ন্যাসী হইলেও ধর্মসাধনার অপেক্ষা কর্মসাধনাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি দেশে-বিদেশে "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে যে সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেবা ও ত্রাণকার্য এবং ভারতীয় মহাজাতির পুনরুজ্জীবনই ছিল তাহার প্রধান আদর্শ।

বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

এদিকে মুসলমান সমাজেও বহু সমাজ-সংস্কারকের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে মৌলবী চিরাগ আলির (নবাব আজম ইয়ারজঙ্গ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মুসলিম নারীদের অধিকার এবং মুসলমান পুরুষদের একবিবাহের পক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন।

চিরাগ আলি

সৃজনধর্মী সাহিত্য ও শিল্প।—ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে এদেশে যে নবজাগণের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল, তাহা এদেশীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে সৃজনী-শক্তির প্লাবন আনিয়াছিল। কলিকাতা বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং এখানেই ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার বিস্তার সর্বাগ্রে ঘটিয়াছিল। তাই বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বহু প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কি কাব্যে, কি উপন্যাসে, কি নাটকে, কি নিবন্ধ-রচনায় বাংলা সাহিত্য সৃজন-গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির রচনায় অভাবনীয় বিকাশলাভ করে। বাংলা সাহিত্য কেবল ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্ব-সাহিত্যেও একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। 1913 খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এশিয়া মহাদেশের লেখকগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া সমগ্র ভারতের তথা এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করেন।

বাংলা সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলিতে সৃজনধর্মী সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। নাজির হোসেন, আলতাফ হোসেন আলি, পণ্ডিত রতননাথ সর্ষার, মৌলানা শিবলি নুমানি, আবদুল হালিম শারব, মহম্মদ ইকবাল প্রভৃতির রচনায় উর্দু সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। হিন্দী সাহিত্যও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী, প্রেমচন্দ্, সুমিত্রানন্দন পন্থ, জয়শঙ্কর প্রসাদ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা, মহাদেবী বর্মা, মাখনলাল চতুর্বেদী প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী, মালয়ালম্, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষাগুলিও এই যুগে যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশলাভ করিয়াছিল।

অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে চিত্রকলা এই যুগে বিশেষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য শিল্পধারার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, এই যুগে অজন্তার বিস্মৃত গুহামন্দিরগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতীয় চিত্রশিল্পীগণ

ভারতীয় রচনাশৈলী সম্পর্কেও উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে, এই যুগে ভারতীয় চিত্রকলায় দুইটি ধারা প্রভাবিত হইয়াছিল—একটি ধারায় ছিল পাশ্চাত্য চিত্রণ-রীতির প্রাধান্য এবং অন্যটিতে ছিল ভারতীয় চিত্রণ-রীতির প্রাধান্য। এই যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে রবি বর্মা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, অমৃতা শের গিল, নন্দলাল বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্রশিল্প

এই যুগের ভাস্কর্যশিল্পে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বি. রামকিঙ্কর, ডি. পি. কর্মকার, চিন্তামণি কর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই যুগের স্থাপত্য-শিল্পে পাশ্চাত্য রীতিরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যরীতির দৃষ্টান্তরূপে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, নিউ দিল্লীর

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য
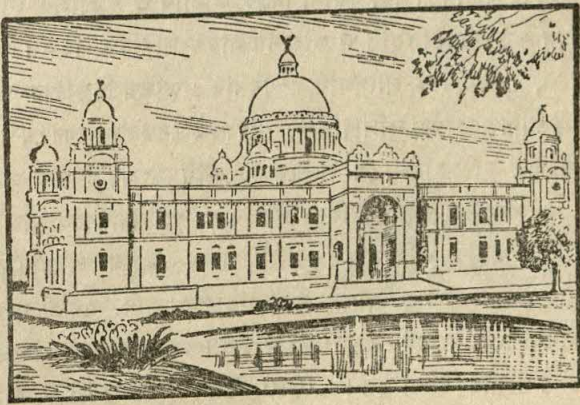
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

ভাইস্‌রয় হাউস (বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভবন) এবং বিভিন্ন কাউন্সিল ভবন ও লাট ভবনগুলির উল্লেখ করা চলে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know about the Western impact on Indian education and culture ? [ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

2. What do you know of the social and religious reforms of 19th Century India ? [উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে যে সকল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারসাধন ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর।]

3. Describe the revival of Indian art and literature under the British rule. [বৃটিশ শাসনকালে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর।]

বিংশ অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতালাভ

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।—দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগরূক হইতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দেশের নবজাত শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাতে অংশগ্রহণ করে নাই, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে অচিরে তাহারাই আসিয়া দাঁড়াইল। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ফলে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারানীর ঘোষণায় ভারতীয়গণকে উচ্চ রাজকর্মেও নিয়োগের যে ভরসা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কার্যতঃ প্রতিপালিত হয় নাই। তাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সীমা ছিল না। ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, জার্মানি ও ইতালির জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রভৃতির ইতিহাস ও আদর্শের সহিত পরিচিত ছিল। ম্যাট্‌সিনি, প্লেটো, এরিস্টটল, বেকন, লক্, ল্যাপলাস, স্পেনসার প্রভৃতির চিন্তাধারা তাহাদিগকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। দেশে ইংরেজ শাসকগণ যে সকল অন্যায় ও অবিচার অনুষ্ঠিত করিতেছিল, সে সম্পর্কে এদেশীয় সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সঞ্চার করিতেছিল এবং জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছিল। এই সময়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ বহু সংস্থাও স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সকল সংস্থা ইংরেজ শাসকগণের কার্যকলাপের প্রায়ই সমালোচনা করিত। দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। 1860 খ্রীষ্টাব্দ হইতে 1899 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে সাতবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছিল। তাহা ছাড়া, ভারতের শিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। জনসাধারণের দারিদ্র্য চরমে পৌঁছিয়াছিল। ভারতে যে নূতন ধনিক-শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও বৃটিশ শাসকদের নিকট হইতে নানারূপ অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতেছিল। ফলে, ধনিক-শ্রেণীও ক্রমেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে দেশে ব্যাপক জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

বিভিন্ন কারণ

ভারতবর্ষে যখন এইভাবে চেতনার উন্মেষ হইতেছিল, তখন লর্ড লিটন ভারতে ভাইসরয় হইয়া আসিলেন (1876)। তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিস্তার প্রতিরোধ করিবার জন্য "মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র আইন" পাস করিলেন।

ভারতীয়গণ যাহাতে পুনরায় সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করিতে না পারে, সেজন্য অস্ত্র আইন পাস করিয়া সরকারের বিনা অনুমতিতে ভারতীয়গণের অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। এই সময়ে ভারতে একটি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং অনাহারে অসংখ্য লোক মরিতেছিল। লিটন তাহা উপেক্ষা করিয়া দিল্লীতে মহাসমারোহে একটি দরবার করিলেন এবং রানী ভিক্টোরিয়াকে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' বা ভারত-সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ সরকারের এই সকল কার্যের বিরুদ্ধে দেশময় আন্দোলন শুরু হইল। এই সময়ে বৃটিশ সরকার আই. সি. এস্. পরীক্ষায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রার্থীর বয়স অনধিক একুশ হওয়া চাই, এই মর্মে আদেশ জারী করিল। ইহা ভারতীয়গণের উচ্চ রাজকার্যে

আন্দোলনের সূত্রপাত

নিয়োগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইহাতে বুদ্ধিজীবী সমাজ অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[1] আই. সি. এস্. পরীক্ষায় পাস করা সত্ত্বেও তাঁহাকে আই. সি. এস্.-এ গ্রহণ করিতে সরকার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সুরেন্দ্রনাথ বৃটিশ আদালতের রায়ের বলে চাকুরিতে গৃহীত হইলেও, অল্পকাল পরে চাকুরি হইতে বিতাড়িত হন। এখন সুরেন্দ্রনাথ 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন' বা 'ভারত-সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন এবং 'বেঙ্গলী' নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতে থাকেন। তিনি সমগ্র ভারতে বুদ্ধিজীবী ভারতীয়গণের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন।
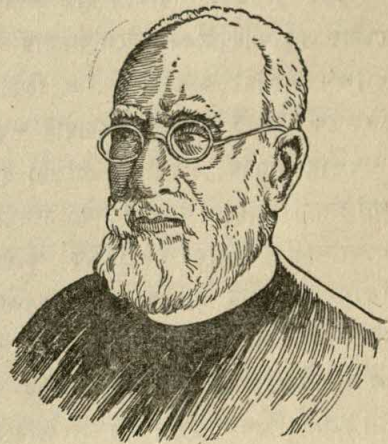
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সময়ে ইংলণ্ডে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায়, বৃটিশ শাসকগণ শাসন-রীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনিলেন। বড়লাট লর্ড রিপন "মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র আইনটি" তুলিয়া লইলেন। জনসাধারণের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করিবার জন্য তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয়গণকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলেন। তিনি জেলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডসমূহ স্থাপন করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনশীল সংস্থাগুলির সম্প্রসারণ করিলেন। ইউ-রোপীয়গণের অপরাধের বিচার যাহাতে ভারতীয় বিচারকগণও করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে একটি বিল আনিলেন। এই বিল তৎকালীন কাউন্সিলের

লর্ড রিপনের সহানুভূতিশীল নীতি

আইন-সদস্য সি. পি. ইলবার্ট আনিয়াছিলেন, তাই উহা 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত হইয়াছে। ইলবার্টের বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণ তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ফলে, লর্ড রিপন শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন যে, ইউরোপীয়গণের বিচারকালে ভারতীয় বিচারকগণকে ইউরোপীয় জুরি গ্রহণ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

কিন্তু লর্ড রিপনের পরবর্তী ভাইস্রয় লর্ড ডাফরিনের আমলে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিল—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে দেশে যে শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে যে-কোনও সময়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিতে পারে, এমন আশঙ্কা সরকারী মহল করিতেছিল। তাই ভারতের বুদ্ধিজীবী সমাজকে হাত করিবার চেষ্টায় লর্ড ডাফরিনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী এ. ও. হিউমের উদ্যোগে 1885 খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সভাপতিত্ব করেন। তিনিই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। প্রথম অধিবেশনে মাত্র 70 জন প্রতিনিধি যোগদান করিলেও, ক্রমেই এই প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ভারতের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধি-স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেস গোড়ার দিকে আবেদন-নিবেদনের পথই গ্রহণ করিয়াছিল এবং বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সদিচ্ছা ও সহানুভূতির উপর নির্ভরশীল ছিল। 1896 খ্রীষ্টাব্দ হইতে 1900 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ভয়াবহ খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তদুপরি 1896 খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ রোগের মহামারীতে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইল। সরকার এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় থাকায়, কংগ্রেসের একদল সদস্য আবেদন-নিবেদনের পথ ত্যাগ করিয়া সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। এইভাবে কংগ্রেসে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল—নরমপন্থী (Moderate) ও চরমপন্থী (Extremist)। ফিরোজ শাহ্ মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা নরমপন্থী দলের এবং লোকমান্য

কংগ্রেসে দুই দল

বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন।

ইংরেজ সরকার এদেশে বিভেদপন্থী-নীতি অনুসরণ করিতেছিল। তাহাদের প্ররোচনায় কিছুসংখ্যক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিম নেতা 1907 খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের মতোই মুসলিন লীগ আবেদন-নিবেদনের পথে মুসলমানদের জন্য কিছু দাবি-দাওয়া আদায়ের সিদ্ধান্ত করে।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

এ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একটি প্রদেশরূপেই শাসিত হইতেছিল। বঙ্গদেশ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ পাওয়ায়, বাঙ্গালীরা রাজনৈতিক আন্দোলন-গুলির পুরোভাগে ছিলেন। তাই বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল করিয়া দেওয়ার ইচ্ছায় বড়লাট লর্ড কার্জন বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া দুইটি প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। ইহাতে সারা বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে বিক্ষোভের ঝড় উঠিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাহাতে নির্বিকার রহিল এবং 1905 খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিল। বাঙ্গালী জাতি এই অবিচার নীরবে সহ্য করিল না, ভারতের অন্যত্রও এই অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইল। বৃটিশ জাতিকে কঠিন আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন চলিল। ইহাই "স্বদেশী আন্দোলন" নামে খ্যাত। অন্যান্য প্রদেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দও এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা বৃটিশের সহিত সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে 1908 খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছিল। চরমপন্থীগণ কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন এবং কংগ্রেস নরমপন্থীদের নেতৃত্বাধীনে গেল। স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য বৃটিশ সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ফলে আন্দোলন কেবল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না, রাজনীতিতে বোমার আমদানি হইল, বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী দল গড়িয়া উঠিল। ঐ সময় কিংসফোর্ড নামে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিতে গিয়া সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী দুইজন নিরীহ ইংরেজ মহিলাকে বোমার আঘাতে হত্যা করিয়া বসেন। ঘটনাস্থলেই প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরাম বন্দী হন ও বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

বঙ্গভঙ্গ

সুরাট কংগ্রেস

সন্ত্রাসবাদ

এই সময় লর্ড মিণ্টো ভাইসরয় হইয়া আসেন। তিনি একদিকে যেমন আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তেমনি অন্যদিকে ভারতীয়গণকে কিছুটা শান্ত করিবার জন্য কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসাধন করেন। ঐ সময় ভারত-সচিব ছিলেন লর্ড মর্লে। তাই এই সংস্কার-ব্যবস্থা 'মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার' নামে পরিচিত হয়। এই নূতন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কিছুসংখ্যক বেসরকারী ও কিছুসংখ্যক নির্বাচিত সদস্য আইনসভায় গৃহীত হন। ভাইসরয়ের আইনসভায় সরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য রহিলেও, প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মনোনীত বেসরকারী ও নির্বাচিত সদস্যদের তুলনায় সরকারী সদস্যের সংখ্যা হ্রাস করা হইল। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে একজন ভারতীয় সদস্য গৃহীত হইলেন। আইনসভার সদস্যদের আলোচনা করিবার ও প্রশ্ন তুলিবার অধিকার বৃদ্ধি করা হইলেও, আইনসভার প্রকৃত কোন ক্ষমতা রহিল না। নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষেত্রে মুসলিম সদস্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিল। এই ব্যবস্থা 1910 খ্রীষ্টাব্দ হইতে চালু হইল।

বঙ্গভঙ্গ রদ

1911 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী ভারত পরিদর্শনে আসেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য আয়োজিত দরবারে বঙ্গভঙ্গ-রদের কথা ঘোষণা করা হইল। এখন পশ্চিম ও পূর্ব বাংলাকে এক করা হইল। তবে বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হইল। আসামকেও একটি পৃথক প্রদেশ রাখা হইল। কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইল।

মুসলিম মনোভাবের পরিবর্তন

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার-ব্যবস্থায় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং সরকার মুসলমানদের খুশি রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু শিক্ষিত তরুণ মুসলমানের সংখ্যা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহারা প্রয়োজনানুরূপ চাকুরি পাইতেছিল না। কেবল আবেদন-নিবেদনের পথেই যে তাহারা তাহাদের দাবি আদায় করিতে পারিবে না, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। তাই তাহারাও সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইবার কথা চিন্তা করিতেছিল। আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলির প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। পারস্য ইংলণ্ড ও রাশিয়ার কুক্ষিগত হইয়াছিল। তুরস্ক ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধে এবং বলকান যুদ্ধে ইউরোপীয় জাতিগুলি তুরস্কের প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় মুসলিম সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাই ভারতীয় মুসলমানগণ বৃটিশ তোষণের পথ ত্যাগ করিল।

1914 খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধে একদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইতালি এবং অন্যদিকে জার্মানি, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্ক ছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষে পরে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল। তুরস্ক ইংলণ্ডের বিরোধী পক্ষ হওয়ায়, ভারতীয় মুসলমানগণ ইংলণ্ডের তথা ভারতীয় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। মুসলিম নেতৃবর্গ ইংলণ্ডের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিবার জন্য প্রচার করিতেছিলেন এবং মহম্মদ আলি, সওকত আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতা তিলক বৃটিশ সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত হইয়াছিলেন। 1914 খ্রীষ্টাব্দে তিনি দণ্ডভোগ শেষে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ও ইংরেজ মহিলা এনী বেসান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া হোম রুলের (Home Rule) জন্য সংগ্রামের প্রস্তাব করিলেন। এই ধরনের আন্দোলন বৃটিশ-শাসিত আয়ারল্যাণ্ডেও খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 1916 খ্রীষ্টাব্দে তিলক ও এনী বেসান্ত দুইটি পৃথক 'হোম রুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে হোম রুলের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। মর্লে-মিণ্টো সংস্কারকে প্রথমে কংগ্রেসের নরমপন্থীগণ স্বাগত জানাইলেও পরে তাঁহাদের মোহভঙ্গ হইয়াছিল। এখন কংগ্রেসের নরমপন্থীগণও হোম রুলের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। ঐ বৎসর (1916) ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীগণের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে। ঐ সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে মুসলিম লীগেরও বার্ষিক অধিবেশন হইতেছিল। মুসলিম লীগও হোম রুলের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একযোগে আন্দোলন চালাইবে এই মর্মে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ভারতের ভাবী নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও প্রথম অংশগ্রহণ করেন।

বালগঙ্গাধর তিলক

কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতা

যুদ্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবে, সে-বিষয়ে তিন প্রকার মতবাদ দেখা দিয়াছিল। একদল বলিতেছিলেন, এই যুদ্ধকে ইংরেজগণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার

যুদ্ধ আখ্যা দিলেও, ইহা আসলে সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার লড়াই মাত্র, সুতরাং যুদ্ধে বিপন্ন ইংরেজকে আঘাত করাই উচিত। দ্বিতীয় দল বলিতেছিলেন, তাঁহারা বিপন্ন বৃটিশকে আঘাত দিতে চান না সত্য, তবে যুদ্ধশেষে বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিবে, তাঁহারা এইরূপ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চান। এই দলের মুখপাত্র ছিলেন লোকমান্য তিলক। তৃতীয় দল বলিতেছিলেন, বিনা শর্তে বিপন্ন বৃটেনকে সাহায্য করা উচিত, ইহাতে তাহার হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে। এই দলের মুখপাত্র ছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। ভারতীয় জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের মনোভাব যাহাই হউক না কেন, বৃটেন এই যুদ্ধে ভারতীয় জনবল ও ধনবল পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করিল। ভারতীয় সৈন্যগণ বৃটেনের হইয়া যুদ্ধে দলে দলে প্রাণ দিল এবং যুদ্ধ বাবদ ব্যয়ের জন্য এক কোটি পাউণ্ড ঋণ ভারতের স্কন্ধে তুলিয়া দেওয়া হইল। যুদ্ধে ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণ জয়ী হইল।

যুদ্ধকালে ভারতীয়গণের মনোভাব

যুদ্ধশেষে ইংরেজগণ ভারতবাসীর দাবি মিটাইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। ভারত-সচিব ই. এস্. মণ্টেগু নিজে ভারতে আসিয়া নরমপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনাও করিলেন। কিন্তু 1918 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ভারতীয়গণের দাবি কিছুমাত্রও মিটানো হইল না। কংগ্রেস উহাকে "তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক" বলিয়া অগ্রাহ্য করিল। ঐ সময় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতের ভাইস্‌রয় ছিলেন। তাই নূতন সংস্কার মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ডের নাম অনুসারে 'মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার' নামে পরিচিত হইল। 1919 খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন দ্বারা নূতন সংস্কার চালু করা হয়। এই ব্যবস্থায় ভাইস্‌রয়ের শাসন-পরিষদে একজনের স্থলে তিনজন ভারতীয় সদস্য লওয়া হয়। একটি কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয় এবং উহাতে দুইটি পরিষদ্ থাকে। উর্ধ্বতন পরিষদের 60 জন সদস্যের মধ্যে 34 জন এবং নিম্নতন পরিষদের 145 জন সদস্যের মধ্যে 105 জন নির্বাচিত হইবে এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ সরকার মনোনীত হইবেন, স্থির হয়। আইন-প্রণয়ন ও আয়-ব্যয় নির্ধারণে উভয় পরিষদের সম্মতির প্রয়োজন হইলেও, প্রয়োজনবোধে বড়লাট অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন জারী করিতে পারিবেন। প্রদেশগুলিতে এক-একটি করিয়া গভর্নরের শাসন-পরিষদ্ ও ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্য হইতে গভর্নর তাঁহার মন্ত্রী নির্বাচন করিবেন। ফলে, শাসন-ব্যাপার একদিকে গভর্নর ও তাঁহার শাসন-পরিষদ্ এবং অন্যদিকে মন্ত্রিসভার মধ্যে বিভক্ত হইল। রাজস্ব, আইন, জেল, পুলিশ, বিচার প্রভৃতি 'সংরক্ষিত' বিষয়গুলি গভর্নর ও তাঁহার শাসন-পরিষদের হস্তে এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি

1919-এর শাসন-ব্যবস্থা

'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত হইল। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা রহিল।

এই শাসন-ব্যবস্থা ভারতীয়গণের মনঃপুত হইল না। কেবল তাহাই নহে, মণ্টেগু যখন শাসন-সংস্কারের জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখনই বিচারপতি রাউলাটের সভাপতিত্বে সরকার ভারতীয়গণের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও বিপ্লব প্রচেষ্টা দমনের জন্য একটি সুকঠোর আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করে। এই বিল সম্পর্কে তথ্যাদি প্রকাশিত হইলেই, সারা দেশে ইহার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সরকার 1919 খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ঐ বিলকে আইনে পরিণত করে। ইহার প্রতিবাদে গান্ধীজীর আহ্বানে সারা ভারতে ধর্মঘট শুরু হইল। 30শে মার্চ তারিখে দিল্লী অমৃতসর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে ধর্মঘট হইয়াছিল। দিল্লীতে ধর্মঘটকালে পুলিশের, গুলীতে কয়েকজন নিহত হইল। দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী বোম্বাই হইতে দিল্লী রওনা হইলে, সরকার তাঁহার দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিল। গান্ধীজী আদেশ অগ্রাহ্য করিলে, সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। দিল্লীর হত্যাকাণ্ড ও গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। অনেক স্থানে জনতা হিংসার আশ্রয় লইল। পাঞ্জাবের অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। অমৃতসরে পুলিশ গুলী চালাইল। গোলযোগ লাহোরেও ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশের গুলীতে বহু লোক নিহত ও আহত হইল। ইহার কয়েকদিন বাদেই অমৃতসরের জালিয়ান-ওয়ালাবাগ অঞ্চলে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এক শান্তিপূর্ণ মেলায় সমবেত জনতার উপর গুলী চালাইয়া প্রায় ছয়শত নরনারী-শিশুকে হত্যা ও বহু হাজার নরনারী-শিশুকে আহত করিল। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ চাপিবার জন্য সরকার প্রাণপণে চেষ্টা করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল, তখন সমগ্র দেশ বৃটিশের প্রতি ঘৃণায় ও আক্রোশে ফাটিয়া পড়িল।

রাউলাট আইন

দেশব্যাপী ধর্মঘট

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দিয়াছিল। যুদ্ধের পরে ইংরেজগণসহ অন্যান্য বিজয়ী শক্তিসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করিতেছিল। ইহাতে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হইল। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানগণের খলিফা। ফলে, ভারতে খলিফার সমর্থনে ভারতীয় মুসলিমগণ খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। ভারতীয় মুসলিমগণের আন্দোলনকে মহাত্মা গান্ধী ভারতের জাতীয় সংগ্রামের সহিত সংযুক্ত করিলেন। এইভাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-জৈন-

পার্শী জাতি নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ই বৃটিশ-ভারতীয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী তাঁহার অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করিলেন। ইহাতে সকল প্রকার সরকারী খেতাব বর্জন ও আইনসভা, আদালত ও সরকারী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিতে আহ্বান জানানো হইল। বিদেশী পণ্য বর্জন করিতে এবং ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটিতে ও তাঁতে কাপড় বুনিতে বলা হইল। এইভাবে সংগ্রামের সূচনা হইল।

1920 খ্রীষ্টাব্দের 1লা আগস্ট অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইল। ঐ দিন তিলকের মৃত্যু হয় এবং গান্ধীজীই অবিসংবাদী নেতা-রূপে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে থাকেন। 1921 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গান্ধীজী ব্যতীত সকল বিশিষ্ট নেতাই কারারুদ্ধ হইলেন। প্রায় বিশ হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিলেন। 1922 খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আন্দোলনের তীব্রতা যখন চরমে উঠিল, তখন কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ত্রিশ হাজার অতিক্রম করিল। সরকারী দমন-নীতি আন্দোলন প্রতিহত করিতে পারিল না। কিন্তু আন্দোলন অহিংস সত্যাগ্রহের পথ ত্যাগ করিয়া হিংসার পথ লইতেছে, এমন লক্ষণ দেখা গেল। গোরখপুরের নিকট চৌরিচৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত জনতার হস্তে 22 জন পুলিশ নিহত এবং থানা দগ্ধ হইল। ফলে, গান্ধীজী অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন (12ই ফেব্রুয়ারি)। এই সময়ে তুরস্কে কামাল পাশা খলিফাকে পদচ্যুত করিলে, খিলাফৎ আন্দোলনও বন্ধ হইল। অকস্মাৎ সংগ্রাম এইভাবে প্রত্যাহৃত হওয়ায় জনসাধারণ স্তম্ভিত হইল। সরকার এই সুযোগে দমন-নীতি তীব্রতর করিয়া তুলিল। 10ই মার্চ (1922) গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন এবং ছয় বৎসরের জন্য তাঁহার কারাদণ্ড হইল।

মহাত্মা গান্ধী

1920—22-এর অসহযোগ আন্দোলন

এইভাবে সংগ্রামে সাময়িকভাবে ছেদ পড়িল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'স্বরাজ্য দল' গঠন করিলেন। তাঁহারা মণ্ট-ফোর্ড শাসন-ব্যবস্থাকে ভিতর হইতে অচল করিবার জন্য আইনসভায় প্রবেশ করিলেন। সরকার

দমননীতি কঠোর করিলেও রাউলাট আইন রদ করিল এবং কলে তৈয়ারী কাপড়ের উপর হইতে কর তুলিয়া লইল। অসহযোগ আন্দোলন অকস্মাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ায় কংগ্রেসের মধ্যে যেমন মতানৈক্য দেখা দিল, তেমনি গান্ধীজী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকায়, বহু স্থলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিল এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া গেল। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল।

স্বরাজ্য দল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

মণ্ট-ফোর্ড শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় এইরূপ একটি নির্দেশ ছিল যে, এই শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ কার্যকর হইয়াছে, তাহা দশ বৎসর পরে বিচার করিয়া দেখা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করিল। এই কমিশনে কোনও ভারতীয়কে স্থান না দেওয়ায়, ভারতবাসী ঐ কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করিল এবং ঐ সময় ভারতীয় নেতৃবর্গ পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবাসীর কাম্য শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সুপারিশ রচনার জন্য কমিটি নিযুক্ত করিল। ঐ রিপোর্টে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবি করা হইল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি তরুণ নেতৃবর্গ ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির উপর গুরুত্ব দিলেন। 1929 খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে জওহরলালের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল, তাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতাকে কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

সাইমন কমিশন

নেহরু রিপোর্ট

1930 খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইল। গান্ধীজী তাঁহার দশজন শিষ্যসহ ডাণ্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করিলেন। এই আন্দোলনে আইন ভঙ্গ করিয়া গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে লবণ প্রস্তুতকরণ, মদ্য ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং, বিদেশী বস্ত্র জ্বালানো, স্কুল-কলেজ বর্জন, সরকারী চাকুরি ত্যাগ, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধন প্রভৃতি কর্মসূচীরূপে গৃহীত হইল। সরকার কঠোর দমননীতির আশ্রয় লইল। হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ হইল। বহু স্থানে লাঠি, এমন কি গুলীও চলিল। কংগ্রেস অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল।

আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতে যখন আন্দোলন চলিতেছিল, তখন কিছুসংখ্যক নরমপন্থী ও সাম্প্রদায়িক নেতাদের লইয়া লণ্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক বসিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস উহাতে যোগ না দেওয়ায় কোন ফল হইল না। সরকার কংগ্রেসের সহযোগিতা পাইবার জন্য কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মুক্তি দিল এবং কংগ্রেসও সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রাখিল। গান্ধীজী একাকী কংগ্রেসের প্রতিনিধি-রূপে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন। কিন্তু মুসলিম নেতারা নানাপ্রকার দাবি-দাওয়া তোলার ফলে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকও ব্যর্থ হইল। গান্ধীজী দেশে ফিরিয়া পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করিলেন (1932)। কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের দলে দলে গ্রেপ্তার করা হইল। গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হইলেন। সরকার লাঠিচালনা, গুলীচালনা, পাইকারী জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি সকল প্রকার দমনকার্য চালাইল। এই সময় বৃটিশ সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভেদ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" নামে একটি প্রস্তাব ঘোষণা করিল। উহাতে বর্ণ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের পৃথক করিয়া অনুন্নত হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিল। হিন্দুগণের সংহতি রক্ষার জন্য ইহার প্রতিবাদে গান্ধীজী আমরণ অনশন করিলেন। ফলে, বর্ণ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের নেতৃবর্গের মধ্যে একটি চুক্তি হইল। উহা 'পুনা চুক্তি' নামে পরিচিত। এই সময়ে দেশে পুনরায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। গান্ধীজী উহার প্রতিবাদেও অনশন করিলেন। সরকার তাঁহাকে বিনা শর্তে মুক্তি দিল। আইন অমান্য আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছিল। গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন (1934)।

গোল টেবিল বৈঠক

আন্দোলন প্রত্যাহার

1935 সালের ভারত শাসন আইন।—আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহৃত হইলেও উহা যে-কোন সময়ে পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে, এই ভয়ে বৃটিশ সরকার 1935 সালের 'ভারত শাসন আইন' পাস করিয়া ভারত শাসন-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে চাহিলেন। এই শাসন-ব্যবস্থায় বৃটিশ ভারতের প্রদেশ-সমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু গভর্নর-জেনারেলের হস্তে অত্যধিক ক্ষমতা থাকায়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রস্তাবটি স্বীকার করিয়া লইলেন না। তবে এই ভারত শাসন আইন অনুসারে যে প্রদেশগুলিতে এই নূতন শাসন-ব্যবস্থা চালু হইল, তাহাকে স্বীকৃতি দিলেন। এখন বৃটিশ ভারতকে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে 11টি প্রদেশে বিভক্ত করা হইল। প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব হইল। প্রত্যেক

প্রদেশের শাসনের জন্য একজন গভর্নর ও তাঁহার মন্ত্রিসভা থাকিবে। মন্ত্রিগণকে গভর্নর আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। গভর্নর সাধারণতঃ মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া চলিবেন। তবে প্রয়োজনবোধে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পারিবেন। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া আইনসভা থাকিবে। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামে আইনসভায় দুইটি পরিষদ্ থাকিবে। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ সকলেই নির্বাচিত হইবেন।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও ত্যাগ।—এই শাসন-ব্যবস্থা 1937 খ্রীষ্টাব্দের 1লা এপ্রিল চালু হইল। এই শাসন-ব্যবস্থাকে যথেষ্ট বিবেচনা না করিলেও, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিল। কংগ্রেস সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রদেশে হয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সর্বাধিক ভোট লাভ করিল। মুসলিম লীগ কোথাও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিল না, কেবল সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় সর্বাধিক ভোট পাইল। কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে অসম্মত হইলেও, পরে গভর্নর-জেনারেল তাঁহাদিগকে গভর্নর তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে স্বীকৃত হইল। কংগ্রেস বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। সিন্ধু ও আসামেও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিল। কেবল বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হইল। এই ব্যর্থতার ফলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নিন্দায় ও সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিল।

কংগ্রেসের বিপুল সাফল্য

মুসলিম লীগের ব্যর্থতা

কিন্তু কংগ্রেস অধিকদিন মন্ত্রিত্ব করিল না। 1939 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে, ভারত সরকার দেশীয় নেতৃবৃন্দের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া ভারতকে যুদ্ধ বাধিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল। জনমতের প্রতি এই উপেক্ষার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল এবং 1940 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা এবং কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের ভিত্তিতে যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে চাহিল। বৃটিশ সরকার তাহাতে কর্ণপাত না করায়, 1940 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস পুনরায় সত্যাগ্রহ শুরু করিল। মুসলিম লীগ কিন্তু ইংরেজ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ

মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি

লাগিল এবং 1940 খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান' অর্থাৎ মুসলিম-প্রধান প্রদেশ ও অঞ্চলসমূহ লইয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন করিল।

সংগ্রামের শেষ পর্যায়।—মুসলিম লীগের সহযোগিতা ছাড়াও, জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করিল। জাপানের ক্রমাগত জয়লাভ ও অগ্রগতির ফলে বৃটিশ সরকার ভীত হইল এবং ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সহিত আপস-মীমাংসার আলোচনার জন্য অন্যতম মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে প্রেরণ করিল। ক্রিপ্‌স্‌ ভারতকে স্বাধীনতা-দানের প্রসঙ্গ সম্পর্কে নীরব থাকিয়া কেবল যুদ্ধের পরে ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে লইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি পরিষদ্‌ গঠন করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। কেবল তাহাই নহে, ভারতের কোন অংশ নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক হইলে, তাহা ভারতীয় রাষ্ট্রের বাহিরে থাকিতে পারিবে, এরূপ প্রস্তাবও করা হইল। ইহা যে পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। ফলে কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। উহাতে পাকিস্তানের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়, মুসলিম লীগও ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। ক্রিপ্‌স্‌ ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

ক্রিপ্‌সের দৌত্য

ক্রিপ্‌স্‌ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায়, কংগ্রেস 1942 খ্রীষ্টাব্দের 8ই আগস্ট তারিখে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সংগ্রাম ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইলেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিল। জনসাধারণ দেশের নানা স্থানে যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিল, থানা, আদালত ভস্মীভূত করিল। ইহা 'আগস্ট বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। বিদ্রোহ দমনের জন্য পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনী বহু স্থানে গুলী চালাইল, প্রায় এক হাজার ভারতীয়ের মৃত্যু ঘটিল। কঠোরহস্তে সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিলেও, ভারতীয়গণের যুদ্ধ-বিরোধিতা বাড়িল বই কমিল না। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত নেতা সুভাষচন্দ্র বসু

'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও আগস্ট বিদ্রোহ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি গোপনে দেশত্যাগ করিয়া জার্মানি ও জাপানের সাহায্যে সিঙ্গাপুরে "আজাদ হিন্দ্ সরকার" ও "আজাদ হিন্দ্ বাহিনী" গঠন করিয়াছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধের মোড় ফিরিল। ইউরোপে জার্মানি পরাজিত হইল। জাপান কিছুদিন যুদ্ধ চালাইলেও, পারমাণবিক বোমার আঘাতে দ্রুত পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ব্যর্থ হইল। দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইল।

যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 1945 খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়ী হইয়া, ইংলণ্ডে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিল। ভারতেও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ আসনগুলির প্রায় সমস্তই অধিকার করিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ মুসলিম আসনও কংগ্রেস পাইল। ফলে, বাংলা দেশ ও সিন্ধু ছাড়া অবশিষ্ট নয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিল। এখন ভারতের সহিত আপস-মীমাংসার জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতে আসিলেন (1946)। লর্ড পেথিক লরেন্স এই মন্ত্রী মিশনের নেতৃত্ব করেন। ভারতীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পরে 13ই মার্চ তারিখে মন্ত্রী মিশন যে বিবৃতি দিল, তাহাতে পাকিস্তানের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইল। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা রহিল এবং শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ্ গঠিত হইল। গণ-পরিষদে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মুসলিম লীগ ভীত হইয়া মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের সম্মতি প্রত্যাহার করিল এবং 16ই আগস্ট তারিখকে পাকিস্তানের দাবিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' দিন বলিয়া ঘোষণা করিল। ফলে, মুসলিম লীগ 16ই আগস্ট তারিখে কলিকাতায় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করিল, তাহা পরবর্তী কয়েক মাস ধরিয়া বাংলা দেশ তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু ধনপ্রাণ-নাশের কারণ হইল।

মন্ত্রী মিশন

মুসলিম লীগের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি

ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস-মনোনীত সদস্যদের লইয়া কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী-কালীন একটি সরকার গঠন করিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ এই সরকারে যোগ দিতে প্রথমে অস্বীকার করিলেও পরে যোগ দিয়াছিল। সরকারে মুসলিম লীগ যোগ দিলেও গণ-পরিষদে যোগ দিল না। 1947 খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করিল যে, 1948 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায়, আসামে, পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে

মুসলিম লীগ দাঙ্গা বাধাইল। তৎকালীন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 1947 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির কথা ঘোষণা করিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া কংগ্রেসও ভারত-বিভাগে রাজী

ভারতবর্ষ-বিভাগ ও স্বাধীনতালাভ

হইল। 1947 খ্রীষ্টাব্দের 15ই আগস্ট হইতে ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমপাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর সীমান্ত প্রদেশ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইল। দেশীয় রাজ্যগুলি একে একে হয় ভারতে, নয় পাকিস্তানে যোগ দিল। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পরও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামিল না। গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক

জওহরলাল নেহরু
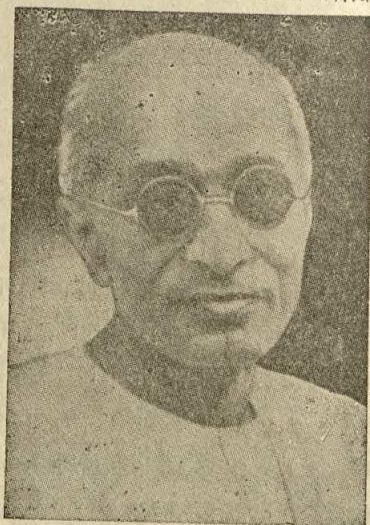
শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

ঐক্য স্থাপনের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন এবং জনৈক হিন্দু আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইলেন জওহরলাল নেহরু এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে গভর্নর-জেনারেল হইলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পর শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গভর্নর-জেনারেল হন। 1950 খ্রীষ্টাব্দের 26শে জানুয়ারি হইতে ভারতে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল। এখন গভর্নর-জেনারেলের স্থলে রাষ্ট্রপতি হইলেন রাষ্ট্রপ্রধান। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ 1950 খ্রীষ্টাব্দ হইতে 1962 খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। জওহরলাল নেহরু তাঁহার মৃত্যুকাল (1964) পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

উন্নতির পথে ভারত।—ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রায় দুই সতাব্দীকাল বৃটিশ শোষণে জর্জরিত হইয়া তাহার দৈন্য-দুর্দশার সীমা ছিল না। তাই

স্বাধীন ভারত অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হইল। সমস্যাগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের মধ্যে কঠিনতম হইল অর্থনৈতিক সমস্যা। বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে কৃষি-নির্ভর করিয়া তোলা হইয়াছিল। ভারত কৃষিনির্ভর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কৃষির কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। ভারতের কৃষির যে কিরূপ অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা এই একটি বিষয় হইতেই লক্ষণীয় যে, এখানে শতকরা 80 জন লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য দেশে উৎপন্ন হয় না। অথচ এদেশের কৃষিতে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় খাদ্যশস্যই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষির উন্নতি-সাধনের সমস্যাটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। দেশে বড় বড় কল-কারখানার যেমন অপ্রতুলতা ছিল, তেমনি কুটীরশিল্পেরও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। বড় বড় কল-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা সবই প্রায় বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত। কৃষির উন্নতির জন্যও দেশের কল-কারখানার উন্নতির প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সার উৎপাদনের কল-কারখানার উল্লেখ করা চলে। দেশে কল-কারখানার উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে চাই লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজনমতো সরবরাহ। দেশে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি তাই আশু প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়াছিল। কল-কারখানার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজনও কম নহে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহন, পথঘাট প্রভৃতিরও সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। এককথায় বলিতে গেলে, বৃটিশ শাসন ও শোষণের ফলে ভারত অতিশয় অনগ্রসর ও পশ্চাদ্‌পদ দেশে পরিণত হইয়াছিল। তাহাকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব ছিল জনপ্রতিনিধিগণের—অর্থাৎ সরকারের।

অসংখ্য সমস্যা-জর্জরিত ভারত

এই সকল অসংখ্য সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহাও দরিদ্র ভারতের নাই। বৈদেশিক ঋণও সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। অথচ সকল সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধানের প্রয়োজন একই সঙ্গে। তাই সরকার দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির প্রবর্তন করেন। 1952 খ্রীষ্টাব্দ হইতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হয়। পরিকল্পনাগুলিতে একই সঙ্গে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতির দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনাগুলি সীমিত অর্থসাহায্য সত্ত্বেও দেশের দুরূহ সমস্যাসমূহের সমাধানে সমর্থ হইতেছে। দেশে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও হইবে, সেচ ও বন্যানিবারণের ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বহু ব্যবস্থা হইয়াছে, দেশে পথঘাট ও পরিবহণ-ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি

আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

হইয়াছে, দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধন হইতেছে, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার জন্য শত শত চিকিৎসা-কেন্দ্র ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।

স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র হইল একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র। ধনীকে আরও ধনী করা এবং গরীবকে আরও গরীব করা ইহার লক্ষ্য নহে। ইহার লক্ষ্য জাতীয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন—জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। তাই কংগ্রেস তাহার আবাদি অধিবেশনে ভারতের জন্য সমাজতন্ত্রী ধাঁচের (Socialist pattern) সমাজ-ব্যবস্থাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

স্বাধীন বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভারত স্বাধীনতা, শান্তি ও সহাবস্থানের নীতিকেই গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান বিশ্বে সাম্যবাদী ও সাম্যবাদ-বিরোধী যে সকল সংস্থা ও জোটের উদ্ভব হইয়াছে, ভারত সন্তর্পণে সেগুলি হইতে দূরে থাকিয়া জোট-নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছে এবং সাম্যবাদী ও সাম্যবাদ-বিরোধী সকল দেশের সহিতই শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কি কোরিয়ায়, কি মিশরে, কি কঙ্গোয়, কি ভিয়েৎনামে যেখানেই শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে তাহার ডাক পড়িয়াছে, ভারত তাহার সীমিত শক্তি সত্ত্বেও সেখানেই অগ্রসর হইয়াছে। ভারত শান্তি ও জোট-নিরপেক্ষতার নীতি যেমন অনুসরণ করিয়াছে, তেমনি সকল পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামে সহায়তা করিবার নীতিকেও গ্রহণ করিয়াছে। স্বাধীনতা, শান্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি যাহাতে শক্তিশালী হইতে পারে, সেজন্য ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চশীলের নীতি প্রচার করেন। এই নীতি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহকে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে। ভারত রাষ্ট্রসংঘের সহিত রাষ্ট্রসংঘের সকল কল্যাণমূলক কার্যেই পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারত স্বাধীনতালাভের পর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে যে সাফল্য ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, তাহা তাহার প্রতিবেশী চীনকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তাই বান্দুং সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী ও সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও, চীন ভারতের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে ও চালাইতেছে। কিন্তু ভারত তাহাতেও তাহার শান্তি ও সহাবস্থানের নীতি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কম্যুনিস্ট চীনের সহিত যুদ্ধকালেও ভারত একই সঙ্গে কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট শক্তিসমূহের সহিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। পাকিস্তান তাহার উদ্ভবের কাল হইতেই ভারতের সহিত নানাভাবে শত্রুতাচরণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ভারত

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

পাকিস্তানের সহিত শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। তাহার এই চেষ্টাকে দুর্বলতা মনে করিয়া পাকিস্তান ভারতের উপর আক্রমণ করিতেও দ্বিধা করে নাই। ফলে, দেশের প্রতিরক্ষা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার সমস্যাও আজ ভারতের সম্মুখে রহিয়াছে।

স্বাধীন ভারতের তাই প্রধান লক্ষ্যগুলি হইল—কৃষির উন্নতিসাধন ও খাদ্য সম্পর্কে আত্মনির্ভরতা অর্জন, দেশের কল-কারখানা ও শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতিসাধন, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালীকরণ, বৈদেশিক নীতিতে জোট-নিরপেক্ষতা, শান্তিরক্ষা ও মৈত্রী বন্ধন স্থাপন। ভারত শত বাধা-বিপত্তি ও তাহার সীমিত অর্থসামর্থ্য সত্ত্বেও এই সকল লক্ষ্য পূরণের দিকে দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে।

প্রশ্নাবলী

1. **Briefly describe the growth of political consciousness in India.** [ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. **Briefly describe the national struggle of India and its achievement of Independence.** [ভারতের জাতীয় সংগ্রাম ও স্বাধীনতালাভ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

3. **What are the main tasks ahead of the independent India ?** [স্বাধীন ভারতের সম্মুখে আশু সমস্যাগুলি কি ?]
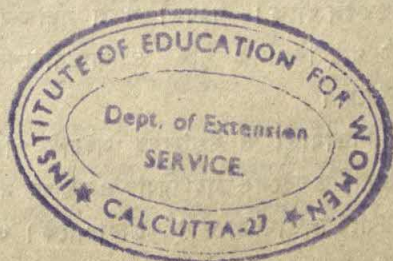
তৃতীয় খণ্ড

[নাগরিকতা ও সরকার]

প্রথম অধ্যায়

পরিবারে ও স্থানীয় সমাজে জীবনযাত্রা

মানুষের পরনির্ভরশীলতা।—মানুষের মতো পরনির্ভরশীল প্রাণী পৃথিবীতে আর নাই। জীব-জগতের অনেক প্রাণীই জন্মলাভের পর হইতেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করে। আবার অনেক প্রাণী সামান্য কিছুদিন মাত্র তাহাদের শাবকদের লালন-পালন করে, তারপর শাবকগুলি স্বাবলম্বী হইয়া উঠে। কিন্তু মনুষ্য-শিশুর স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে বিশ-পঁচিশ বৎসর সময় লাগে। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের উপর এই সময়টা তাহাদিগকে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, সকল কিছুর জন্যই নির্ভরশীল হইতে হয়। শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের উপর তাহার নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে, স্বাবলম্বী হইয়া উঠে, তখন তাহাকে তাহার স্থানীয় সমাজের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয়। মানুষের এই একান্ত পরনির্ভরশীলতা হইতেই মানুষের পরিবার ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন।—সাধারণতঃ পিতামাতা ও সন্তানদের লইয়া পরিবার (family) গড়িয়া উঠে। পরিবারই হইল সভ্য সমাজের ভিত্তি। অতি আদিম সমাজে পরিবারের গুরুত্ব অপেক্ষা দলের গুরুত্ব অধিকতর ছিল। তাহার দৃষ্টান্ত আমরা আন্দামানী সমাজে পাইয়াছি। কিন্তু ঐ আদিম সমাজেও পরিবারের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ, সেখানে শিশু জন্মলাভের পর হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পিতামাতার উপরই নির্ভরশীল থাকে। পরবর্তী সকল সমাজ-ব্যবস্থাতেই পরিবারের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। এই পরিবারগুলির বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলে অনেকক্ষেত্রে পল্লীগুলি গঠিত হইয়াছে।

পরিবারের গুরুত্ব

পিতামাতা ও সন্তানদের লইয়াই পরিবারগুলি গঠিত হয়। পরিবারগুলি সম্প্রসারিত হইলেও তাহা বিবাহ ও রক্তগত সম্পর্কের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ পরিবারে পিতামাতা ও পুত্রকন্যারা থাকে। এই পরিবার সম্প্রসারিত হইলে পিতামহ-পিতামহী, পিতামাতা, কাকা-জ্যেঠা, ভাই-ভগিনী, খুড়তুত-জ্যেঠতুত ভাই-ভগিনী, নাতী-নাতনী প্রভৃতি লইয়া গঠিত হয়। এগুলিকে সাধারণতঃ যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার বলা হইয়া থাকে। অনেকক্ষেত্রে

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিবার

আত্মীয়-স্বজনও যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহা ছাড়া, পরিবারের সহিত ঝি-চাকর, পাচক-পাচিকা, পরিচারক-পরিচারিকারা প্রভৃতিও যুক্ত থাকে। ফলে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ নানাপ্রকারের পরিবারের উদ্ভব হয়। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যৌথ বৃহৎ পরিবারের সংখ্যাই অধিক। কৃষক, জোতদার, জমিদার—যাহারাই ভূমির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল, তাহাদের মধ্যেই এই যৌথ-পরিবারভুক্তির প্রবণতা অধিক। তাই গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশী দেখা যায়।

যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন

কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরিতেছে। জমিগুলি বংশ-পরম্পরায় উত্তরাধিকার-সূত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ায় জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং জমির পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার ফলেও ভূম্যধিকারীদের জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, গ্রামাঞ্চলেও যৌথ একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শহরাঞ্চলে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়-বাণিজ্য ও চাকুরির উপর নির্ভরশীল, চাকুরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যব্যপদেশে প্রায়ই একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে হয়। ইহার ফলে শহরাঞ্চলে যৌথ পরিবারের তুলনায় স্বতন্ত্র পরিবারেরই প্রাধান্য অধিক ছিল। বর্তমানে এই প্রাধান্য আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই এখন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতি প্রবণতাই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যৌথ বৃহৎ পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া টুক্রা টুক্রা হইয়া যাইতেছে। যৌথ পরিবারের গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিলে কতকগুলি বিষয় সহজেই চোখে পড়ে।

যৌথ পরিবারের গুণাগুণ

যৌথ পরিবারে অনেকে একত্র থাকায় সামাজিকতার শিক্ষায় মানুষ শৈশব হইতেই শিক্ষিত হইয়া উঠে, অপরের জন্য স্বার্থত্যাগের শিক্ষার সুযোগও ক্ষুদ্র পরিবারের তুলনায় যৌথ পরিবারে অধিক। এখানে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সামাজিক রীতি-নীতির শিক্ষাও যেমন বেশী হয়, তেমনি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে স্নেহের বন্ধনও দৃঢ়তর হইয়া উঠে। বহু অনাথ দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনও যৌথ পরিবারে আশ্রয় পায়, অনেকের উপর তাহাদের প্রতিপালনের দায় পড়ায় কাহারও পক্ষে তাহা দুর্বহ হইয়া উঠে না। কিন্তু ক্ষুদ্র পরিবারগুলিতে অনাথ দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে আশ্রয়-দান দুষ্কর ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যপক্ষে, যৌথ পরিবারে সংসারের কর্তার উপর সংসার-পরিচালনার দায়িত্ব থাকায়, পরিবারে অনেকের মধ্যে পরজীবী আলস্য ও পরনির্ভরশীলতার অভ্যাস গড়িয়া উঠে। সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে না থাকায় অনেকের মধ্যে কর্মোদ্যম থাকে না।

যাহাই হউক, যৌথ বা ক্ষুদ্র পরিবার উভয়ই মানব-সমাজের বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। পরিবারই শিশুর প্রথম আশ্রয় ও প্রথম বিদ্যালয়। পরিবারে শিশুরা পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই লাভ করে। পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাই তাহারা পায়। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাহাদের অনুকরণ-শক্তিও অসাধারণ। এই অনুকরণপ্রিয়তা ও অনুকরণ-শক্তির মধ্য দিয়াই শিশুরা মাতৃক্রোড় হইতেই শিক্ষালাভ করিতে শুরু করে। পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাহা দেখে, তাহাই অনুকরণ করে এবং অনুকরণের দ্বারা আয়ত্ত করে। এইভাবে পরিবারগুলিতে মানব-শিশুরা কেবল অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় পায় না, তাহারা তাহাদের জীবনের প্রাথমিক শিক্ষাও লাভ করে। এখানেই শিশু অপরের সহিত ভাগ করিয়া লইবার প্রথম শিক্ষা পায় এবং সে পরবর্তী জীবনে নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী হইতে পারে। পারিবারিক জীবনে যাহারা এই ধরনের সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারা পরবর্তী জীবনে স্বার্থপর হইয়া উঠে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। পারিবারিক জীবনেই শিশু সামাজিক রীতি-নীতি ও চালচলন শিখে। শিশুদের কেবল সামাজিক নহে, অর্থনৈতিক শিক্ষাও বহুলাংশে পরিবারে হইয়া থাকে। কৃষক-পরিবারে শিশুকাল হইতেই কৃষক-সন্তানরা তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে কৃষিকার্য সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং একটু বড় হইলে পিতামাতার সহিত কৃষিকার্যে অংশগ্রহণও করে। কেবল কৃষক নহে, অন্যান্য পেশার পরিবারগুলিতেও ঐভাবে শিশুকাল হইতে সন্তানরা নিজ নিজ ভাবী পেশা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। যে সকল পরিবারে রাজনৈতিক চেতনা অধিক সেখানে লক্ষ্য করা যায়, অতি অল্প বয়স হইতেই সন্তানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, এককথায় বলা চলে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—সকল প্রকার চেতনা ও প্রবণতা মানুষ শিশুকাল হইতেই তাহার পারিবারিক জীবন হইতে সংগ্রহ করে। পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী ও নিকট-আত্মীয়-স্বজনের চরিত্রগত প্রভাবও বিশেষভাবে মানব-সন্তানদের উপর পতিত হয়। পারিবারিক জীবনে সৎ, অসৎ, ভালো, মন্দ, যেমন দৃষ্টান্ত দেখে, মানুষ শিশুকাল হইতেই তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এই পারিবারিক জীবনের দোষ-ত্রুটির ফলেই মানুষ পরবর্তী জীবনে সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, নানাবিধ ভ্রান্তপথে চালিত হইয়া নিজের ও সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধন করে। পারিবারিক পরিবেশে শিশু ও বালক-বালিকারা যে শিক্ষা পায় বা দৃষ্টান্ত দেখে, পরবর্তী জীবনে বহু পড়াশুনা, নীতিশিক্ষা ও

মানব-সমাজে পরিবারের গুরুত্ব

উপদেশ-পরামর্শ সত্ত্বেও তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তাই সমাজ-জীবনে মানুষের পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক।

পল্লী ও স্থানীয় অঞ্চল।—পরিবারের গণ্ডি পার হইয়া মানুষ যে বিস্তৃততর পরিবেশের মধ্যে তাহার শৈশব ও কৈশোর কাটায়, তাহা তাহার পল্লী বা পাড়া। গ্রামাঞ্চলে পল্লীগুলি অনেক সময় কয়েক পুরুষ ধরিয়া একই পরিবারের সম্প্রসারণ ও বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়। অনেক সময় একই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক লইয়াও পল্লীগুলি গড়িয়া উঠে। কর্ম বা পেশার ভিত্তিতেও অনেক সময় পল্লীগুলি গঠিত হয়। শহরাঞ্চলে অবশ্য বহু শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ও পেশার লোক লইয়া এক-একটি পল্লী গড়িয়া উঠে। যেভাবেই পল্লীগুলি গড়িয়া উঠুক না কেন, পল্লীর স্থানীয় প্রভাব মানুষের জীবনে শিশুকাল হইতে পড়িতে বাধ্য। সামাজিক জীবনে শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, পাল-পার্বণ, উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে পল্লীবাসীদের মধ্যে নিবিড় বন্ধন গড়িয়া উঠে। মানুষ বাল্যকালে তাহার পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া পল্লীর বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, পল্লীর বালক-বালিকাদের সহিত খেলাধূলা করে, পল্লীর সুযোগ-সুবিধার অংশ লাভ করে, পল্লীর আমোদ-প্রমোদে যোগদান করে, বয়োজ্যেষ্ঠ পল্লীবাসীদের স্নেহ-সহানুভূতি-শুভেচ্ছার স্পর্শ পায়। পল্লীর পরিবেশ তাহাকে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগের মনোবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। পল্লীর পরিবেশে তাহার মানসিক বিকাশ নানাদিক হইতে পূর্ণতর হয়।

পল্লীর প্রভাব

আঞ্চলিক প্রভাব

পল্লীর পরেই মানুষ যে বিস্তৃততর পরিবেশের মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত করে, তাহা হইল তাহার স্থানীয় অঞ্চল। মানুষ তাহার পরিবার ও পল্লীর পরিবেশে যে শিক্ষালাভ করে, তাহা বিস্তৃততর ও পূর্ণতর আকার লাভ করে তাহার আঞ্চলিক পরিবেশের মধ্যে। স্কুল-কলেজ, খেলাধূলা, সভা-সমিতি, সংঘ, ক্লাব, পাল-পার্বণ, পূজা-উৎসব, সিনেমা-থিয়েটার, আমোদ-প্রমোদ, স্বাস্থ্যরক্ষা, রীতি-নীতি, পেশা, রাজনীতি, নানা দিক দিয়া আঞ্চলিক পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করে। অঞ্চলগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মধ্য দিয়াই মানুষের সমাজগত ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সম্ভবপর হয়। যে অঞ্চল যত বেশী সমৃদ্ধ, যত বেশী পথঘাট, যানবাহন, স্কুল-কলেজ, চিকিৎসালয় প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত, সেই অঞ্চলের মানুষরাও মানসিক দিক হইতে ততই উন্নত। মানসিক বিকাশে আঞ্চলিক প্রভাব যে কতখানি কার্যকর, ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

সামাজিক সংঘবদ্ধতার বিভিন্ন সূত্র।—মানুষ তাহার পরিবারে পিতামাতা, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব-পরিজন প্রভৃতির সহিত স্নেহ-মমতার বন্ধনেই

আবদ্ধ থাকে। পরিবারের বাহিরে পল্লী ও স্থানীয় অঞ্চলেও স্নেহ-মমতার বন্ধন ছাড়াও, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, আদান-প্রদান, সহযোগিতা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির নানা সূত্রে বন্ধন স্থাপিত হইয়া থাকে। এইগুলি ছাড়াও, ধর্ম, আদর্শ, ভাবধারা প্রভৃতির ভিত্তিতেও পরস্পরের সহিত দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আজকাল ধর্মকে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক হিংসাদ্বেষের দ্বারা কলুষিত করা হইলেও, ধর্মের বন্ধন সামাজিক বন্ধনগুলির মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। মানুষ তাহার পরিবার ও পল্লীর বাহিরে ধর্মের বন্ধনে একই সূত্রে আবদ্ধ থাকে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, সকলেই আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রতি স্বাভাবিকভাবে প্রীতি ও মমতাবোধ করে। এই প্রীতি ও মমতাবোধ অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসার পথে চালিত না হইলে, সমাজের মঙ্গলই করিয়া থাকে। ধর্ম মানুষকে শৈশব হইতে পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিচার করিবার শক্তি দেয়, মানুষকে সৎ, নিঃস্বার্থ, নিস্পৃহ ও পরোপকারী করিয়া তুলে। ধর্মের মতো বিভিন্ন আদর্শ ও ভাবধারাও মানুষকে সংঘবদ্ধ করিতে সাহায্য করে। একই আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মানুষ যত সহজে সংঘবদ্ধ হইতে পারে, নিকটতম আত্মীয়ও তাহা হইতে পারে না। ফলে, মানব-সমাজে আদর্শ ও ভাবধারার ভিত্তিতে বহু সংঘ, সভা, সমিতি প্রভৃতি গড়িয়া উঠে। কেবল আদর্শ ও ভাবধারাই নহে, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির জন্য মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, নানাপ্রকার ক্লাব ও দল গড়িয়া তুলে। সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নানাপ্রকার সংঘ ও দল সকল সভ্য সমাজেই দেখা যায়। এই সকল সংঘ, দল বা সভা-সমিতিতে বিভিন্ন পরিবার ও পল্লীর লোক যেমন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মিলিত হয়, তেমনি আবার একই পরিবার বা পল্লীর বিভিন্ন ব্যক্তিও বিভিন্ন সংঘে, দলে বা সভা-সমিতিতে যোগ দেয়। এই সকল সংঘ, দল ও সভা-সমিতি মানুষকে কেবল দলবদ্ধ হইতেই সাহায্য করে না, তাহাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ-সাধনেও সাহায্য করে। পারিবারিক ও পল্লী জীবনে মানুষ ঐক্য, সহযোগিতা, ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, পরমতসহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, উদারতা প্রভৃতি যে সকল মহৎ শিক্ষা লাভ করে, সংঘ, দল ও সভা-সমিতির মাধ্যমে তাহা আরও পূর্ণতর রূপ লাভ করে।

ধর্ম, আদর্শ, ভাবধারা প্রভৃতির প্রভাব

সংঘ, দল, সভা-সমিতি প্রভৃতির উপযোগিতা

সৎ ও সুন্দর জীবনের উপাদানসমূহ।—সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন, সেগুলির মধ্যে একতা, সহযোগিতা, পরোপকারিতা, আত্মত্যাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সততা, সত্যভাষণ, ন্যায়পরায়ণতা, সম্প্রীতি এবং কর্মোদ্যমই প্রধান। মানুষ কেহ একা বাস করিতে পারে না। অনেকের

সহিত তাহাকে বাস করিতে হয়। সুতরাং অনেকের সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী তাহার থাকা চাই। মানুষ কেহ কোন কাজই একা সম্পন্ন করিতে পারে না। প্রত্যেক বিষয়েই তাহাকে কিছু-না-কিছু পরিমাণে পরনির্ভরশীল হইতে হয়; সুতরাং সমাজে বাস করিতে হইলে সহযোগিতারও প্রয়োজন। যে মানুষ নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, তাহার জন্য অপরেও কেহ ব্যস্ত হয় না। তাই মানুষের অপরের কথাও চিন্তা করিতে হয়, অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অপরের বিপদে প্রয়োজন হইলে নিজেকে বিপন্নও করিতে হয়। নিজেকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য চাই মানুষের উপযুক্ত শিক্ষা, উপযুক্ত স্বাস্থ্য এবং পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা। অপরের পরিশ্রম-জাত দ্রব্যাদি মানুষের ব্যবহার করিবার প্রকৃত অধিকার তখনই জন্মায়, যখন মানুষ নিজের শ্রমের দ্বারা ও কর্মের দ্বারা অপরের পরিশ্রম-জাত দ্রব্যের বিনিময়ে নিজে কিছু দিতে সমর্থ হয়। ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সততা ও সত্যভাষণও একান্তই প্রয়োজন। মানুষ অসাধুতা ও মিথ্যাচারের দ্বারা কেবল অপরকে প্রতারিত বা অপরের অনিষ্টসাধনই করে না, নিজের বিবেকের নিকট নিজেকেও ছোট করে এবং তাহা তাহার মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হইয়া উঠে। পরমতসহিষ্ণুতাও সমাজে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপনের পক্ষে অপরিহার্য। নিয়মানুবর্তিতাও সমাজ-জীবনের পক্ষে কম আবশ্যক নহে। নিয়মানুবর্তিতাই মানুষকে সামাজিক বিধি-নিষেধ এবং আইন-কানুন রক্ষা করিতে শিক্ষা দেয়। সমাজে নিয়ম-কানুন না মানিয়া চলিলে প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়ে, জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ব্যক্তি সমাজের অংশমাত্র এবং সমাজের স্বার্থে নিজের স্বার্থ রক্ষা পায়, সমাজের কল্যাণে নিজের কল্যাণ হয়—এই ধারণা ও আদর্শও প্রত্যেক মানুষের থাকা চাই।

প্রশ্নাবলী

1. Trace the influence of family, locality and local institutions on our life. [আমাদের জীবনে পরিবার, স্থানীয় অঞ্চল এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

2. Enumerate some forces that unite us in a society. [সমাজে আমাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করে এমন কতিপয় সূত্রের উল্লেখ কর।]

3. What is Good Life? How can we lead a good life? [সৎ ও সুন্দর জীবন কি? আমরা কিভাবে সৎ ও সুন্দর জীবন যাপন করিতে পারি?]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য

ভূমিকা।—জনস্বাস্থ্য বলিতে সমাজের অধিবাসীদের দৈহিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যকেই বুঝায়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে পরিপূর্ণ ও সুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে যেমন নীরোগ ও বলিষ্ঠ দেহের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নীরোগ ও বলিষ্ঠ মনের। তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় মনকেও সুস্থ ও সবল রাখিবার। শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য চাই উপযুক্ত খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থানাদির ব্যবস্থা এবং রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার। মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য চাই উপযুক্ত চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ও শিক্ষা। এই সকল বিষয়ে মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সমষ্টিগত চেষ্টার। সমষ্টিগত চেষ্টা বলিতে সরকারের চেষ্টাকেও বুঝায়। ফলে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব ব্যক্তি, সমষ্টি ও সরকারের উপর বর্তায়। তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি কর্তব্য ও অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার ও কর্তব্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একের যাহা কর্তব্য, অন্যের তাহা অধিকার। অন্য কাহারও জিনিস চুরি না করা বা জোর করিয়া কাড়িয়া না লওয়া যেমন একের কর্তব্য, তেমনি উহাই অপরের ক্ষেত্রে আবার নিজের ধনসম্পদ্ রক্ষার অধিকার। সেইজন্য নাগরিক গুণ ও কর্তব্য সম্পর্কে সকলেরই সাধারণ ধারণা থাকা উচিত।

নাগরিক গুণ ও কর্তব্য।—রাষ্ট্রের বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসীদেরই সাধারণতঃ নাগরিক বলা হইয়া থাকে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকেরই কতকগুলি কর্তব্য আছে। প্রত্যেক নাগরিকেরই এ-বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। নাগরিক গুণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল—পরার্থপরতা, নিজের সুখ-সুবিধার অপেক্ষা অপরের ইষ্টানিষ্ট অধিক চিন্তা করা। প্রকৃতপক্ষে, এইরূপ অপরের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিবার মধ্য দিয়া মানুষ প্রকারান্তরে নিজেরই উপকার করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, তোমার বসন্তরোগ হইয়াছে। বসন্তরোগ খুবই সংক্রামক। বসন্তরোগীকে সতর্কভাবে থাকিতে হয়—যাহাতে তাহার নিকট হইতে ঐ রোগ অপরের দেহে সংক্রমিত হইতে না পারে। কিন্তু তুমি যদি অপরের কথা চিন্তা না করিয়া নিজের সুবিধার জন্য মশারির বাহিরে থাক, শুষ্ক মামড়িগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া না ফেল, সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াও, অন্যান্য লোকে যেখানে আসিতে পারে এমন

নাগরিক গুণ ও নীতিগত কর্তব্য

স্থান ব্যবহার কর, তাহা হইলে অপরের দেহে রোগ-বিস্তারের সুযোগ করিয়া দাও এবং অপরের অনিষ্ট কর। কিন্তু তুমি যদি অপরের কথা চিন্তা করিয়া সতর্কতা অবলম্বন কর, তাহা হইলে অপরের পক্ষে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। আপাতঃদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা পরার্থপরতা বা অপরের হিতচিন্তা বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নিজেরও হিতচিন্তা। ধর, তুমি অসতর্ক হইবার ফলে অপরে রোগাক্রান্ত হইল। সে-ও যদি অসতর্ক হয়, তবে ঐ রোগ তোমার পিতামাতা, ভাই-ভগিনী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজনকেও আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু তুমি গোড়ায় সতর্ক হইলে রোগের বিস্তার এড়ানো সম্ভব হয় এবং তোমার প্রিয়জনও রোগের সংক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। সুতরাং অপরের বা সমষ্টির স্বার্থরক্ষার দ্বারাই যে নিজের স্বার্থ রক্ষিত হইয়া থাকে, এই বোধ থাকাটা নাগরিক গুণাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নাগরিক গুণাবলীর মধ্যে রোগীর সেবাশুশ্রূষা, রোগ-বিস্তারের প্রতিরোধে নানাভাবে সতর্ক থাকা ও সাহায্য করাও উল্লেখযোগ্য। কোন গৃহে কলেরা হইয়াছে, তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইতেছে না, তাহার সাহায্যে তুমি দ্রুত আগাইয়া আসিলে তাহার যেমন উপকার হয়, রোগ-বিস্তার নিরোধ করিয়া তুমি ও তোমার আত্মীয়-স্বজনেরও তেমনি উপকার করিতে পার। এইগুলি প্রত্যেক নাগরিকেরই নীতিগত কর্তব্য। এজন্য কেহ তোমার উপর জোর করিতে পারে না, তোমার নীতিজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধিই এই কর্তব্যসাধনে তোমাকে প্রণোদিত করিতে পারে। কিন্তু আইনগত কতকগুলি কর্তব্যও আছে, যাহা পালন না করিলে আইনের চক্ষে নাগরিকগণ দণ্ডনীয় হয়। এই সকল আইনগত কর্তব্যের কতকগুলি দৃষ্টান্ত হইল—যেমন, টিকা লওয়া, পানীয় জল দূষিত না করা, যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ না করা ও থুতু-কফ না ফেলা ইত্যাদি। এককথায়, জন-সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকার যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, সেগুলি ভঙ্গ না করা।

আইনগত কর্তব্য

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা।—জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নাগরিকগণের যেমন কতকগুলি নীতিগত ও আইনগত কর্তব্য পালন করিতে হয়, তেমনি সরকারেরও জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অগ্রণী হইয়া কতিপয় ব্যবস্থা করিতে হয়। সরকারের করণীয় এই সকল কর্তব্যকে জনসাধারণের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকারও বলা চলে। স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যাপারটি যতখানি ব্যক্তিগত ও পরিবারগত, ততখানি সমষ্টিগত। মানুষের স্বাস্থ্যহানি বহু কারণেই ঘটিয়া থাকে। এই সকল কারণের মধ্যে এমন অনেকগুলি রহিয়াছে, যাহা ব্যক্তিগত বা পরিবারগত চেষ্টায়—এমন কি জনসাধারণের চেষ্টাতেও সম্ভব নহে। সে-সকল ক্ষেত্রে সরকারকে অগ্রসর হইতেই হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার

ক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তাহা আধুনিক কালের সকল সরকারই অনুধাবন করিয়াছেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয়, উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং সহজেই রোগ-সংক্রমণ হয়। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক কর্মঠ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য তিন হইতে চারি হাজার ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সকলের পক্ষে এই খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় না। কেবল তাহাই নহে, আমাদের দেশের শতকরা 80 জন লোক যদিও কৃষিজীবী এবং কৃষিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যদিও প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে, তবুও আমাদের দেশে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং খাদ্য-সরবরাহের জন্য সরকারকে অগ্রণী হইতে হয়। সরকার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিয়া দেশের ঘাট্‌তি এলাকায় সরবরাহ করিয়া থাকেন। দেশের জন্য প্রয়োজনীয় এই খাদ্য-সংগ্রহ ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা অঞ্চলগত চেষ্টায় সম্ভব নহে। সুতরাং জনস্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ও দায়িত্ব হইল প্রয়োজনীয় খাদ্যের সরবরাহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা রাখা। দেশে উৎপন্ন ও বিদেশ হইতে আমদানি-কৃত খাদ্যের পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও, অনেক সময় মূল্যবৃদ্ধি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের ফলে জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য হইতে বঞ্চিত হয়। দেশে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিয়া, অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত পর্যুদস্ত করিয়া এবং দেশে খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া, অপচয় রোধ করিয়া এবং দুঃস্থ পরিবারগুলিকে খাদ্য দান করিয়া সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন। এখন সরকার হইতে প্রতি বৎসর প্রায় 40 লক্ষ শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য ও দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়া থাকে। খাদ্য সকল সময় স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী অবস্থাতেও পাওয়া যায় না। আজকাল প্রায়ই খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। ভেজাল নিবারণের জন্যও সরকারের সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ কর্তব্য। 1954 খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যে ভেজাল নিবারণ আইন অনুসারে ভেজালযুক্ত খাদ্য উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয়ের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে।

খাদ্য ও সরকার

উপযুক্ত খাদ্যের ন্যায় বিশুদ্ধ পানীয় সংগ্রহও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। দূষিত জল বহু মারাত্মক রোগের জীবাণু বহন করে। ব্যক্তিগত ও পরিবারগত প্রচেষ্টায় কিছু লোক বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও, সকলের পক্ষে বিশুদ্ধ

জল সংগ্রহ সম্ভব হয় না। কিন্তু সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সরকারের কর্তব্য। শহরে পরিস্রুত জল ও নলকূপ বসাইয়া এবং গ্রামাঞ্চলে নলকূপ বসাইয়া, গভীর কূপ খনন করিয়া, সংরক্ষিত পুষ্করিণীর ব্যবস্থা করিয়া সরকার এই কর্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন। পানীয় জল-সরবরাহের জন্য 1950 খ্রীষ্টাব্দে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 488টি নলকূপ ছিল, সেখানে 1962 খ্রীষ্টাব্দে 2,181টি নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সরকার বিশুদ্ধ জল সরবরাহ-ব্যবস্থা নানাভাবে করিলেও, বিশুদ্ধ জল ব্যবহারের পূর্বেও নানাভাবে দূষিত হইতে পারে। তাই বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করিবার পরও তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তি ও পরিবারকে সতর্ক হইতে হয়।

পানীয় জল

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশেরও একান্ত প্রয়োজন। অপরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাসহীন বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস করা যে স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটায়, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই উপযুক্ত বাসস্থান-নির্বাচন, উপযুক্ত বাসগৃহ-নির্মাণ এবং পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলা জনস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। শহরের বস্তিগুলি মোটেই স্বাস্থ্যকর নহে। শহরের বস্তি অঞ্চলের বাহিরেও এমন অনেক গৃহ আছে, যেগুলি আদৌ স্বাস্থ্যকর নহে। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ গৃহই অস্বাস্থ্যকর। ইহার প্রধান কারণ, মানুষের দারিদ্র্য। সরকার স্বাস্থ্যকর গৃহ-নির্মাণের জন্য অনেকক্ষেত্রে ঋণও দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দেশব্যাপী বাসগৃহের সমস্যা মিটানো সম্ভব নহে। তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ বাসগৃহগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই বাসগৃহগুলির নিকটে খানা, ডোবা, নালা-নর্দমা, দূষিত জলাশয় ও বন-জঙ্গলাদি থাকে। ঐ সকল খানা-ডোবা বুজাইয়া ফেলা, নালা-নর্দমাগুলি পরিষ্কার রাখা, জলাশয়গুলির সংস্কার করিয়া পরিষ্কার রাখা, বন-জঙ্গল সাফ করা প্রভৃতি একান্তই প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে মলমূত্র-ত্যাগের ব্যবস্থাও অতীব অস্বাস্থ্যকর। গ্রামবাসীদের এ-সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মশা-মাছি, কীট ও অন্যান্য জীবাণু নাশ করিবার জন্য ঔষধাদি ব্যবহার করা দরকার। সরকারও এ-বিষয়ে নানা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারা গ্রাম পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা এবং সমষ্টি-উন্নয়ন বিভাগগুলি দ্বারা এ-বিষয়ে তৎপর রহিয়াছেন।

বাসস্থান

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদও প্রয়োজন। পোশাক-পরিচ্ছদ কেবল শীত নিবারণ করে না, উহা জীবাণু-নিবারণেও সাহায্য করে। আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অনেকক্ষেত্রে শীত নিবারণের উপযোগী পোশাকেরও অভাব।

অনেক সময় সরকার বস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি দুঃস্থ লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু জনসাধারণের উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদের যেমন অভাব দেখা যায়, তেমনি অভাব দেখা যায়, পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসের অভাবে। পোশাক-পরিচ্ছদ না ব্যবহার করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হয় অপরিচ্ছন্ন নোংরা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত রীতি-নীতিগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের শিক্ষা। এই শিক্ষা না থাকিলে সকল চেষ্টাই পণ্ড হইতে বাধ্য। আমাদের দেশে খাদ্যাভাব আছে সত্য। কিন্তু আমরা যদি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোন্ খাদ্য কি পরিমাণে খাওয়া চাই, তাহা জানি বা মনে রাখি, তবে অনেক অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। দুধ, ছানা, মাছ, মাংস, ডিম, চিনি প্রভৃতি হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু দরিদ্র দেশে সকলের পক্ষে ঐ সকল খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব নহে। এমন অনেক শাক-সব্‌জি বা ফল আছে, যাহা দিয়া অল্পমূল্যেও ঐ পরিমাণ ক্যালরি সংগ্রহ করা যায়। কোন্ শাক-সব্‌জি বা ফল এই বিষয়ে কি প্রকার উপযোগী, তাহা জানিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। কোন্ রোগ কিভাবে হয়, কোন্ কোন্ কীট-পতঙ্গ সংক্রামক রোগের জীবাণু বহন করে, কিভাবে জল দূষিত হয়, কিভাবে পানীয় জলকে জীবাণুমুক্ত রাখা সম্ভব, কিভাবে খাদ্য রন্ধন করিলে খাদ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি বিষয়ও আমরা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের দ্বারা জানিতে পারি। রোগ-প্রতিষেধের জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে, তাহাও আমরা শিক্ষালাভের দ্বারা জানিতে পারি। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিক্ষা একান্তই প্রয়োজন। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষের সতর্কতা বৃদ্ধি পায়, ফলে সহজেই রোগ-ব্যাধি হ্রাস পায়। এ বিষয়ে নাগরিকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সরকারী ব্যবস্থার। রোগ-সংক্রমণ কিভাবে ঘটে, রোগ-সংক্রমণের হাত হইতে কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করিয়া তুলিবার জন্য সরকার ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ

শিক্ষা

খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা পরোক্ষভাবে রোগ-প্রতিরোধ সম্ভব হয়। কিন্তু রোগ-প্রতিরোধের জন্য সরকার বহু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া, ঘুংড়িকাশি প্রভৃতির প্রতিরোধের জন্য টিকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সরকার টিকা দেওয়ার অভিযান চালাইয়া দেশকে বহুবিধ মারাত্মক

রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে নাগরিকগণেরও উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। অনেকে টিকা লইতে চান না। ইহা দ্বারা তিনি কেবল নিজেকে বিপন্ন করেন না, ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পল্লী, গ্রাম ও শহরকেও বিপন্ন করেন। সরকার তাই অনেকক্ষেত্রে টিকা লওয়া বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

কিন্তু রোগ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিলেই সরকারের কর্তব্য ফুরায় না। রোগ হইলে যাহাতে তাহার সুচিকিৎসা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্তব্য। এজন্য সরকার দেশে বহুসংখ্যায় চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, প্রসূতিসদন, শিশুমঙ্গল-কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রমিকগণ যাহাতে বিনা মূল্যে তাহার ও তাহার পরিবারের জন্য চিকিৎসার সুযোগ পাইতে পারে, সেজন্য সরকার শ্রমিকদের জন্য হেল্‌থ্‌ ইন্‌স্যুরেন্স স্কীম প্রবর্তন করিয়াছেন। এই স্কীম বা পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের দেশে বিশ লক্ষ আঠারো হাজার শ্রমিক চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছে। এই পরিকল্পনার ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে। 1950-51 খ্রীষ্টাব্দে দেশে আট হাজার ছয়শত হাসপাতাল এবং এক লক্ষ তের হাজার বেড ছিল। 1960-61 খ্রীষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া বারো হাজার ছয়শত হাসপাতাল ও এক লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত বেড হইয়াছে। হাসপাতাল ও বেডের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গে 1950 খ্রীষ্টাব্দে যেখানে 1,284টি চিকিৎসা-কেন্দ্র ছিল, 1962 খ্রীষ্টাব্দে সেখানে 2,200টি চিকিৎসা-কেন্দ্র হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বহু ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকের দলও পাঠানো হইয়া থাকে। কেবল ডাক্তার বা হাসপাতাল থাকিলেই রোগের প্রতিকার হয় না। সেজন্য চাই উন্নতধরনের ঔষধ। দেশে অনেক অসাধু ঔষধ-উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এবং অসাধু ব্যবসায়ী ঔষধ ভেজাল ও জাল করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছে। সরকার ঐ সকল দুষ্কৃতকারীকে দমনের জন্য ড্রাগ্‌স্‌ অ্যাক্ট, ড্রাগ্‌স্‌ রুল প্রভৃতি পাস করিয়াছেন। বিদেশ হইতে আনীত ঔষধগুলির উৎকর্ষ ও গুণাগুণ নির্ণয় ও বিচার করিবার বিষয়েও সরকার তৎপর আছেন।

প্রতিকার-ব্যবস্থা

কিন্তু চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ও উৎকৃষ্ট ঔষধাদি থাকিলেই রোগ নিরাময় হয় না। উপযুক্ত চিকিৎসকেরও প্রয়োজন। দেশে সুশিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও সরকার চেষ্টা করিতেছেন। এখন দেশে 79টি মেডিকেল কলেজ, 13টি দন্ত-চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার কলেজ এবং 11টি অন্যান্য এলোপ্যাথিক শিক্ষায়তন আছে। 1955 খ্রীষ্টাব্দে যেখানে 3,660 জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হইত, সেখানে 1962 খ্রীষ্টাব্দে দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসর

বহুসংখ্যক ডাক্তার এই সকল শিক্ষায়তন হইতে পাস করিয়া বাহির হইতেছেন। 1950 খ্রীষ্টাব্দে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে 10,336 জন এলোপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন, সেখানে 1962 খ্রীষ্টাব্দে 21,938 জন এলোপ্যাথ রেজিস্টার্ড ডাক্তার ছিলেন। বিগত কয়েক বৎসরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে বহু হাতুড়ে ডাক্তার রহিয়াছেন। দরিদ্র গ্রামাঞ্চলে তাঁহাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই সরকার তাঁহাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জনস্বাস্থ্যের অবস্থা।—দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। বৃটিশ আমলে মহামারী দেশে প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। প্লেগ রোগে অসংখ্য লোক মরিত। প্রতি বৎসর কলেরা ও বসন্তের মহামারী কোথাও না কোথাও ভয়ঙ্কর আকারে আত্ম-প্রকাশ করিত।

অবস্থার উন্নতি

ম্যালেরিয়া ছিল গ্রামবাসীদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সরকারের চেষ্টায় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে ঐ সকল রোগের প্রকোপ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। 1950 খ্রীষ্টাব্দে হাজারে মৃত্যুর হার ছিল 16·7, 1962 খ্রীষ্টাব্দে উহা হইয়াছে 6·6। 1950 খ্রীষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে 129·8, 1962 খ্রীষ্টাব্দে উহা হইয়াছে 61·7। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি যে পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, উপরের হিসাব হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। তথাপি এ-কথা স্মরণীয় যে, এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় 25 লক্ষ লোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। এখন এদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় 15 লক্ষ এবং ক্যানসার রোগে প্রতি বৎসর এদেশে প্রায় দুই লক্ষ লোক মারা যায়।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের। জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া স্বাস্থ্য-মন্ত্রক (Ministry for Health) রহিয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যে জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ ও মহামারী নিবারণের জন্য একটি করিয়া জনস্বাস্থ্যাধিকার (Directorate of Public Health) রহিয়াছে। রাজ্যের পৌরসভা, সমষ্টি-উন্নয়ন বিভাগ ও পঞ্চায়েতগুলি জনস্বাস্থ্য রক্ষার কাজে নিযুক্ত আছে। রাজ্যগুলিকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারেও একটি স্বাস্থ্য-মন্ত্রক রহিয়াছে। রাজ্যের সহিত জনস্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে এই মন্ত্রক বিশেষভাবে যোগাযোগ রাখেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করেন। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব এই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রকের। সারা ভারতের জনস্বাস্থ্য রক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন 'ডিরেক্টর-জেনারেল অব পাবলিক হেল্‌থ্' ও একজন 'পাবলিক হেল্‌থ্ কমিশনার' আছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে

যে সকল সংস্থা কাজ করিতেছে, সেগুলির মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO —World Health Organisation), সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ শিশুরক্ষা জরুরী তহবিল (UNICEF), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1948 খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ভারত বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার সদস্য। বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা ভারতের জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থা।—মনের সহিত দেহের ও দেহের সহিত মনের যোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষারও প্রয়োজন রহিয়াছে। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্বাগ্রে চাই—চিত্ত-বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা। খেলাধূলা কেবল মানসিক স্বাস্থ্যই রক্ষা করে না, উহা শরীরকে সবল ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলে, উহা হজমশক্তি বৃদ্ধি করে এবং মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে। যে সকল খেলায় দৈহিক পরিশ্রম হয় না, সেগুলি মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষায় সাহায্য করে; মানুষকে নানাপ্রকার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার হাত হইতে বাঁচায় এবং মনকে প্রফুল্ল রাখে। খেলাধূলার উপযোগিতা আজ সর্বত্রই স্বীকৃত। দেশে খেলাধূলার ব্যবস্থার জন্য সরকার প্রচুর টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। দেশে সরকারী সাহায্যে ক্লাব ও খেলার মাঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্লাবগুলি কেবল খেলাধূলাতে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেগুলি চিত্তবিনোদনের অন্যান্য নানা ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। এগুলির মধ্যে সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি প্রধান। সরকার দেশে ছোট-বড় অসংখ্য পাঠাগার-স্থাপনেও সাহায্য করিয়াছেন। চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজে বেতার ও চলচ্চিত্র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

খেলাধূলা, ক্লাব, পাঠাগার

এখন ভারতের বিভিন্ন অংশে 31টি বেতার-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এগুলি হইতে অসংখ্য প্রকার অনুষ্ঠান প্রচারিত হইয়া থাকে। পূর্বে বৈদ্যুতিক শক্তির সুযোগযুক্ত শহরেই বেতার-গ্রাহক যন্ত্রগুলি সীমাবদ্ধ ছিল। এখন ট্র্যান্‌জিস্টার উদ্ভাবিত হওয়ায়, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং ভারতের কোটি কোটি মানুষ বেতার-অনুষ্ঠানগুলি শুনিবার সুযোগ পাইতেছে। বর্তমানে ভারতে 26 লক্ষেরও অধিক লাইসেন্স-প্রাপ্ত বেতার-যন্ত্র রহিয়াছে।

বেতার

চলচ্চিত্রগুলিও চিত্তবিনোদনের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। কেবল শহরে নহে, গ্রামাঞ্চলেও বহু চলচ্চিত্র-প্রদর্শন গৃহ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন ভাষায় তিনশতেরও বেশী পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলা হয়। তাহা ছাড়াও, অসংখ্য ক্ষুদ্র কথিকাচিত্র ও সংবাদচিত্র প্রভৃতিও তোলা হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে বহু ছবি এদেশে প্রদর্শনের জন্য আনা

চলচ্চিত্র

হয়। দেশে পেশাদারী ও সৌখিন রঙ্গমঞ্চের সংখ্যাও কম নহে। সৌখিন নাট্যাভিনয় দেশে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় প্রতিটি ক্লাব ও প্রতিটি অফিস ও সংস্থা আজকাল সৌখিন নাট্যাভিনয় করিয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলে সরকার সৌখিন অভিনয়ের জন্য অনেক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চও নির্মাণ করিবার জন্য সাহায্য দিয়াছেন। দেশের সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়, যাত্রাভিনয়, লোকগীতি প্রভৃতিকে বিশেষভাবে সরকার উৎসাহ দিয়া থাকেন। দেশের এই সকল শিল্পকলার উন্নতির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। শিল্পীদের উৎসাহদানের জন্য সরকার সঙ্গীত-নাটক আকাদমী, সাহিত্য আকাদমী, ললিতকলা আকাদমী, জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্থা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের লোক-রঞ্জন-বিভাগ সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় প্রভৃতি দ্বারা গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই বিভাগ যাত্রাগান, কথকতা, তর্জা প্রভৃতির উন্নতিকল্পেও সাহায্য দেন। চিত্তবিনোদনের উপর সরকার কতখানি গুরুত্ব দেন, তাহার প্রমাণ প্রতি বৎসর বহু শিল্পীকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে। খেলাধূলায় উৎসাহদানের জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু ক্রীড়াসংস্থাকে ভারতে আমন্ত্রণ করা হয়, লক্ষ লক্ষ লোক ঐ সকল খেলা দেখিবার সুযোগ পান। যাঁহারা পান না, তাঁহাদের জন্য সরকার নিয়মিতভাবে ক্রীড়ার ধারাবিবরণী বেতারে প্রচার করেন। চলচ্চিত্রেও ঐ সকল খেলার আংশিক বিবরণ দেখানো হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সরকার সে-বিষয়ে যথেষ্টরূপে সচেতন। 1954 খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালোরে যে অল্‌-ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট্‌ ফর্‌ হেল্‌থ্‌ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সরকারকে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়েও পরামর্শ দিয়া থাকেন।

নাট্যাভিনয়

সরকারী উদ্যোগ ও উৎসাহ

শিক্ষা।—মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও যেমন, দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও তেমনি শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে হইলে শিক্ষা অপরিহার্য। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিক্ষা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক দেশেই আজ ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতেও চেষ্টার ত্রুটি নাই। রাজ্য সরকারের হস্তে শিক্ষার দায়িত্ব রহিয়াছে। এজন্য প্রত্যেক রাজ্যেই রহিয়াছে শিক্ষা-মন্ত্রক এবং শিক্ষাধিকার। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য কেন্দ্রেও শিক্ষা-মন্ত্রক রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রক রাজ্যগুলির সহিত যোগাযোগ রাখেন এবং শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য দেন। সরকার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও, এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত অনগ্রসর রহিয়াছে। ভারতে প্রতি হাজারে শিক্ষিত

পুরুষের সংখ্যা 344 এবং শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা 129, অর্থাৎ শতকরা যথাক্রমে 34·4 ও 12·9। শহরাঞ্চলেই শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারের কাজ শহরের তুলনায় অনেক পিছনে রহিয়াছে। মানসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক—সব দিক দিয়াই শিক্ষা-বিস্তারের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ শিক্ষার বিস্তার ছাড়া বিন্দুমাত্রও সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শিক্ষার অপরিহার্যতা সকলেই উপলব্ধি করেন। আজকাল কৃষিতেও যে সকল বৈজ্ঞানিক রীতি প্রবর্তিত হইতেছে, তাহা সফল করিবার জন্য শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন। শিক্ষা এবং বিশেষতঃ কারিগরী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার না হইলে শ্রমশিল্পের উন্নতিও সম্ভব নহে। দেশ-বিদেশে বাণিজ্য চালাইবার জন্য, দেশের নানাবিধ অর্থনৈতিক লেনদেন সংঘটন ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্যও চাই শিক্ষা। ভারত গণতন্ত্রী দেশ; সর্বসাধারণের সুবিবেচিত ভোটের মাধ্যমেই এখানে শাসনতন্ত্র গঠিত ও পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সকলেরই কিছু-না-কিছু শিক্ষালাভ অপরিহার্য। অশিক্ষিত জনগণের দ্বারা গঠিত গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ডেমোক্রাসি না হইয়া মবোক্রাসিতে (Mobocracy) পরিণত হয়।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিবার জন্য উহাকে কতকগুলি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে—যেমন, প্রাথমিক (বুনিয়াদী), মাধ্যমিক (উচ্চ বুনিয়াদী), উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক, কলেজী ও বিশ্ববিদ্যালীয়। ইহা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে—যেমন কৃষি, কারিগরী, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিত্রকলা, সঙ্গীত, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। 1961-62 খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 3,51,799; মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 20,884; কলা ও বিজ্ঞান কলেজের সংখ্যা 1,138; বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কলেজের সংখ্যা 968; বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা 47; গবেষণা-প্রতিষ্ঠান 42। 1950-51 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিভিন্ন রূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ছিল 2,86,860; 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে 6,85,938। 1950-51 খ্রীষ্টাব্দে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল 2,55,43,000; 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে উহা বাড়িয়া হইয়াছে 5,39,01,000। 1950-51 খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হইয়াছিল 1143800000 টাকা; 1961-62 খ্রীষ্টাব্দে উহা বাড়িয়া হইয়াছে 3919400000 টাকা।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ

রাষ্ট্রসংঘও অনগ্রসর দেশসমূহ হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের এবং শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউনেস্কো (UNESCO) শাখা এ-বিষয়ে তৎপর আছেন। এই শাখা বিভিন্ন দেশকে শিক্ষা-বিস্তার খাতে সাহায্য দিয়া থাকেন।

প্রশ্নাবলী

1. Trace the importance of Public Health in a modern society. [আধুনিক সমাজে জনস্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

2. What are the virtues and duties of a good citizen in reference to Public Health ? [জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সুনাগরিকের গুণাবলী ও কর্তব্যাবলী কি ?]

3. What are the main duties of the Government in Public Health ? [জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্যাবলী কি ?]

4. Briefly describe the importance of recreation and amusement in a community life and provisions and amenities available for it. [সমষ্টি-জীবনে চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ এবং উহার জন্য অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাদি বর্ণনা কর।]

5. What is the importance of education in a modern society ? What progress has India made in spreading education in society ? [আধুনিক সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব কি ? সমাজে শিক্ষা-বিস্তারে ভারত কতখানি অগ্রসর হইয়াছে ?]

তৃতীয় অধ্যায়

জনসাধারণ ও সরকার

শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার।—সকল দেশেরই একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাসকারী লোকদের ঐ দেশের অধিবাসী বা প্রজা বলা হয়। বহু লোক একত্র বাস করায়, তাহাদের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানি বাধা স্বাভাবিক। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানি দমন করিয়া শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই সরকারের কর্তব্য। অধিবাসিগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির দ্বারাই রাজ্যের বা রাষ্ট্রের উন্নতি হইতে পারে। তাই সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও সরকারের কর্তব্য। কে বা কাহারা দেশের শাসন-ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করে, সেই অনুসারে বিভিন্ন দেশের শাসন-ব্যবস্থা বা সরকারকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে হয় রাজতন্ত্র (Monarchy), নয় প্রজাতন্ত্র (Republic) প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং কিছুকাল রোমে প্রজাতন্ত্র প্রাধান্যলাভ করিলেও, অধিকাংশ দেশেই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্রগুলি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রাজতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা দেয়। গ্রীস দেশেও প্রজাতন্ত্র প্রচলনের পূর্বে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

গ্রীস দেশে যখন প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও গ্রীস দেশের কোন কোন অঞ্চলে, যেমন স্পার্টায়, রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজা যাহাতে খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারেন, সেজন্য স্পার্টায় একই সঙ্গে দুইজন রাজা রাজত্ব করিতেন। গ্রীস দেশে গণতন্ত্রের পতনের পর রাজতন্ত্রই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন কালে যে সকল প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল, সেগুলি একে একে লোপ পাইয়াছিল এবং রাজতন্ত্রই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। রোমে গোড়ার দিকে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও, রাজাদের কুশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া রোমবাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু পরে জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর রোমে পুনরায় শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাই বলিতে হয়, প্রাচীন কালে রাজতন্ত্রই সর্বত্র প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল এবং প্রজাতন্ত্র লোপ পাইয়াছিল। রাজতন্ত্রে রাজাই দেশের শাসন-ব্যবস্থায় সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছাই ছিল আইন। তিনিই বিচার ও সামরিক ব্যাপারে ছিলেন সর্বময় কর্তা। রাজারা যোগ্য, বুদ্ধিমান, ন্যায়বান ও সুশাসক হইলে প্রজারা সুখে থাকিত। রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বা উত্তরাধিকারী রাজা হইতেন। কিন্তু তাঁহারাও যে যোগ্য ও সুশাসক হইবেন, এমন কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে, রাজতন্ত্রে প্রায়ই কুশাসকগণের আবির্ভাব ঘটিত এবং প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকিত না, দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত। তাই প্রাচীন কালে রাজতন্ত্র প্রাধান্যলাভ করিলেও পরে তাহার উপযোগিতা হ্রাস পায় এবং পুনরায় দেশে দেশে প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে।

প্রাচীন কালের শাসন-ব্যবস্থা

রাজতন্ত্রের প্রাধান্য

রাজতন্ত্রের ত্রুটি

অনেক সময় দেশের অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারাও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাকে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) ও ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) বলা হয়। অনেক সময় আবার কোনও প্রতিভাশালী জননায়ক আপন বুদ্ধি ও শক্তিবলে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় সর্বময় কর্তৃত্বলাভ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই শাসন-ব্যবস্থা চালিত হয়। জার্মানির এডলফ্ হিটলার, ইতালির বেনিটো মুসোলিনি, স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই প্রকার শাসকের দৃষ্টান্ত। এই ধরনের শাসককে বলা হয় একনায়ক বা স্বৈরশাসক (Dictator) এবং ইহাদের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র (Dictatorship)। রাজতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, একনায়কগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে নহে, নিজ প্রতিভাবলে শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করেন। রাজতন্ত্রে যেমন উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজা

অভিজাততন্ত্র, বণিকতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র

হওয়া যায়, একনায়কতন্ত্রে তেমনটি হয় না। রাজতন্ত্রের মতোই একনায়কতন্ত্রও এখন জনপ্রিয় নহে। তাই বহু দেশেই একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রে উপনীত হইবার সোপান-রূপে দেখা হয়। এ-বিষয়ে ব্রহ্মের জেনারেল নে উইন এবং আরব সংযুক্ত রাষ্ট্রের জেনারেল নাসেরের শাসন-ব্যবস্থার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা হইল গণতন্ত্র (Democracy)। ইহাতে দেশের জনসাধারণ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং এই প্রতিনিধিরাই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। গণতন্ত্র আবার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এবং পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে পারে। প্রাচীন কালে ছোট ছোট রাজ্যে—যেমন গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিতে—নাগরিকগণ সকলে সমবেত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে ভোটদানের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতেন। গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিতে ইহা সম্ভব ছিল। কারণ, প্রথমতঃ রাজ্য-গুলি খুবই ছোট ছিল এবং রাজ্যের সকল অধিবাসীর—যেমন ক্রীতদাসদের—নাগরিক অধিকার ছিল না। কিন্তু এখনকার রাষ্ট্রগুলি গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের মতো ক্ষুদ্র নহে। তাই এগুলিতে নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ ভোটে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নহে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিতে নাগরিকগণ ভোট দিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং এই সকল প্রতিনিধি দ্বারাই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া থাকে। অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশের সকল নাগরিকই প্রতিনিধি-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের গণতন্ত্রকে পূর্ণ গণতন্ত্র বলা চলে। ভারতে সকল নাগরিকের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তাই ভারতে প্রচলিত গণতন্ত্রকে পূর্ণ গণতন্ত্র বলা চলে। অন্যপক্ষে, বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লেখাপড়া, অর্থ প্রভৃতির যোগ্যতা দ্বারা নাগরিকগণ ভোটাধিকার পায়; ফলে, ঐ সকল রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল শাসন-ব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না; কারণ, সর্বসাধারণের হস্তে ইহাতে রাজনৈতিক অধিকার থাকে না, দেশের মাত্র কিছুসংখ্যক লোকই শাসন-ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করে। এগুলিতে জনসাধারণের মঙ্গলের ঊর্ধ্বে কায়েমি স্বার্থই প্রাধান্য পায়। অনেক রাষ্ট্রে আবার একনায়কতন্ত্র নিজেকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য গণতন্ত্র বলিয়া প্রচার করে। পাকিস্তানের মৌল গণতন্ত্র (Basic democracy) এবং ইন্দোনেশিয়ার পরিচালিত গণতন্ত্র (Guided democracy) ইহার দৃষ্টান্ত।

গণতন্ত্র

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

পূর্ণ ও সীমায়িত গণতন্ত্র

আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে অনেকক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের সহিত আপস করা হইয়াছে। এই সকল রাষ্ট্রে রাজার বা রানীর প্রকৃত কোনও ক্ষমতা নাই, কিন্তু রাজা বা

রানীর নামেই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা। এখানে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই রাজা বা রানীর নামে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা তাই প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র

ইহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও (Constitutional monarchy) বলা হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে, অনেক গণতান্ত্রিক দেশে রাজতন্ত্রের কোনরূপ অস্তিত্ব নাই। এখানে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের নামেই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এই ধরনের গণতন্ত্রকে বলা হয় প্রজাতন্ত্র (Republic)। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এইরূপ প্রজাতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানী, তাঁহার মন্ত্রিসভা ও আইনসভা থাকে। প্রজাতন্ত্রে থাকে রাষ্ট্রপতি, তাঁহার মন্ত্রিসভা ও আইনসভা। উভয় ক্ষেত্রেই মন্ত্রিসভা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের লইয়া গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা ও আইনসভা এবং রাজ্যসমূহে রাজ্যপাল, মন্ত্রিসভা ও আইনসভা থাকে।

প্রজাতন্ত্রগুলি আবার দুই প্রকার হইতে পারে। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ বহু পৃথক রাজ্যের বা অংশের সমবায়ে গঠিত হইয়া থাকে। এই সকল রাজ্যের বা অংশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক সরকার থাকে। সেই সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য থাকে একটি কেন্দ্রীয় সরকার। এই ধরনের রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র (Federation) বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধিকার ও

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট থাকে। রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যের নাগরিকগণের প্রতিনিধিগণই এই শাসন-ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করেন। অন্যপক্ষে, সকল রাজ্যের নাগরিকগণের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় সরকারে কর্তৃত্ব করেন। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পরিচালনা করিয়া থাকেন। বহু বিষয়ে রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রয়োজনমতো রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য দেন ও সেগুলির তত্ত্বাবধান করেন।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন-পদ্ধতি।—গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কয়েক বৎসর অন্তর জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নির্বাচন হইয়া থাকে। আধুনিক রাজ্যগুলি প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্রের মতো ক্ষুদ্র নহে। তাই, রাষ্ট্রকে বহু নির্বাচন-ক্ষেত্রে (constituency) বিভক্ত করা হয়। যে সকল নাগরিকের নির্বাচন-ক্ষেত্রে আসিয়া ভোটদানের অধিকার আছে, তাঁহাদিগকে নির্বাচক বা ভোটার (voter) এবং সমষ্টিগতভাবে তাঁহাদিগকে নির্বাচকমণ্ডলী (electorate) বলে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

জন্য একই নির্বাচন-ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী থাকেন। এইরূপ নির্বাচকমণ্ডলীকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (Separate electorate) বলা হয়। বৃটিশ আমলের শেষের দিকে ভারতবর্ষে ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলিতে (constituencies) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (Separate electorate) থাকিত। কিন্তু স্বাধীন ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী নাই। তবে উন্নত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য এখনও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা আছে।

নির্বাচক, নির্বাচন-ক্ষেত্র ও নির্বাচকমণ্ডলী

প্রত্যেক নির্বাচন-ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী বহুসংখ্যক নির্বাচক (voter) ও একাধিক নির্বাচন-প্রার্থী (candidate) থাকেন। নির্বাচকগণ তাঁহাদের ভোট নিজের মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে প্রদান করেন। যে প্রার্থী সর্বাধিক-সংখ্যক নির্বাচক বা ভোটারের সমর্থন লাভ করেন—অর্থাৎ সর্বাধিক-সংখ্যক ভোট পান, তিনি নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হন। নির্বাচন দুই প্রকার হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। অনেক সময় ভোটদাতারা নিজেরা ভোট দিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। ইহাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন (direct election) বলা হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে (indirect election) ভোটদাতারা কিছুসংখ্যক নির্বাচক-প্রতিনিধি (elector) নির্বাচন করেন। অতঃপর এই সকল নির্বাচক-প্রতিনিধি জনসাধারণের প্রতিনিধিকে নির্বাচন করিয়া থাকেন। আধুনিক নির্বাচনে ব্যালট কাগজ ও ব্যালট বাক্সের সাহায্যে গোপনে ভোটগ্রহণ হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করায় প্রার্থীরা জানিতে পারেন না যে, কোন্ ভোটার কোন্ প্রার্থীকে ভোট দিতেছেন। এইরূপ গোপনে ভোট গ্রহণ করায় যে প্রার্থী ভোট পান না, তিনি ভোটদাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে বা বিরূপ আচরণ করিতে পারেন না। ভারতের মতো যে সকল দেশে ভোটদাতাগণের অনেকেই নিরক্ষর বা পড়িতে জানেন না, সে-সকল ক্ষেত্রে প্রার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। নিরক্ষর ভোটাররা তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থীকে প্রতীক-চিহ্ন দেখিয়া চিনিতে পারেন এবং সেইমতো ভোট দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রার্থীর জন্য পৃথক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হয়। বাক্সগুলি পাশাপাশি গোপন স্থানে সাজানো থাকে এবং প্রত্যেক বাক্সের উপর প্রার্থীর নাম ও প্রতীক-চিহ্ন দেওয়া থাকে। ভোটার তাঁহার ভোটপত্র বা ব্যালট পেপারটি তাঁহার মনোনীত প্রার্থীর নামাঙ্কিত বাক্সে ফেলিয়া দেন। আবার অনেকক্ষেত্রে সকল প্রার্থীর জন্য একটিমাত্র ব্যালট বাক্স প্রকাশ্য স্থানে থাকে। এক্ষেত্রে ভোটপত্রে বিভিন্ন প্রার্থীর নাম ও তাঁহাদের প্রতীক-চিহ্ন দেওয়া থাকে। ভোটার গোপনে তাঁহার

ভোটদান-পদ্ধতি

মনোনীত প্রার্থীর নামের পাশে গোপনে চিহ্ন দিয়া ভোটপত্রটিকে ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে ঢুকাইয়া দেন। পৃথক পৃথক প্রার্থীর জন্য পৃথক পৃথক ব্যালট বাক্সের ব্যবস্থায় নানারূপ দুর্নীতি ও কারচুপি ঘটিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। তাই বর্তমানে একটি ব্যালট বাক্স-ই চালু করা হইতেছে। ভোটদানের সময়ে নানারূপ দুর্নীতি ঘটিতে পারে। অনেক সময় এক ব্যক্তি নিজের নাম ভাঁড়াইয়া অপরের নামে ভোট দিয়া যাইতে পারে। তাই কোনও ব্যক্তি যাহাতে দুইবার ভোট দিতে না পারে, সেজন্য ভোটদানকালে ভোটারদের হস্তে মুছিয়া-তোলা-যায়-না এমন কালি দিয়া দাগ দেওয়া হয়। ভোটদানকালে যাহাতে প্রার্থীরা দুর্নীতির আশ্রয় লইতে না পারেন, এইজন্য এই সকল সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

যে সকল প্রার্থী সর্বাধিক ভোট পাইয়া নির্বাচিত হন, তাঁহাদের লইয়াই কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইনসভাগুলি এবং স্বায়ত্ত শাসনশীল সংস্থাগুলি গঠিত হয়। অনেক দেশে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি পদাধিকারীরাও প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার।—রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক (citizen) নহে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও সকল অধিবাসীকে নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হইত না। ক্রীতদাসগণ ও বিদেশীগণ নাগরিক ছিলেন না। আধুনিক গণতন্ত্রেও সকল অধিবাসীকে নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসিগণ নাগরিক নহে। দেশের অধিবাসী নরনারীগণ প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও, নাগরিক বলিয়া গণ্য হন না। কোনও বিদেশী দেশে দীর্ঘকাল বাস করিলেও, নাগরিক বলিয়া গণ্য হন না। যদি নিজের দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া তিনি যে দেশে বাস করেন, সেই দেশের নাগরিক হইবার জন্য আবেদন করেন, তবেই তিনি নাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। অনেক সময় গুরুতর অপরাধের ফলেও রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহার নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সমগ্র রাষ্ট্রের মধ্যে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে সকল অধিকার ভোগ করেন, সেগুলির মধ্যে প্রধান হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, সংস্থা বা সংঘ গঠনের ও সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা। নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে এই বুঝায় যে, প্রত্যেক নাগরিক তাহার ধনপ্রাণ সম্পর্কে নিরাপত্তা-ভোগের অধিকারী, বিনা কারণে তাহাকে আটক করা বা তাহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করা দণ্ডনীয়। ব্যক্তির নিজ বিবেক অনুসারে চলিবার অধিকারও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তর্গত। অবশ্য, সমাজের বা রাষ্ট্রের অনিষ্ট হইতে পারে এমন কোনও কাজ করিলে, নাগরিকের এই অধিকার স্বীকার করা সম্ভব হয় না।

নাগরিকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল তাহার বাক্-স্বাধীনতা। নাগরিক নিজ নিজ মতামত নিরাপদে ও অবাধে প্রকাশ করিতে পারে। তবে সমাজের বা রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতে পারে, এমন কোনও মতামত কোনও নাগরিক প্রকাশ করিতে বা প্রচার করিতে পারে না। নাগরিকগণের প্রাত্যহিক জীবনে, সমাজে ও সভা-সমিতিতে যেমন প্রত্যেক নাগরিকের মত-প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে, তেমনি সংবাদপত্রের মাধ্যমেও নাগরিক তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতামত অন্যান্য অসংখ্য লোককে প্রভাবিত করে। এই মতামত যদি যুক্তিসহ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর না হয়, তবে তাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হইতে পারে। তাই সংবাদপত্রে ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে যাঁহারা মতামত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সর্বদা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় এমন মতামত প্রকাশ হইতে বিরত থাকা উচিত। আধুনিক যুগে সংবাদপত্র প্রচারের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের দ্বারা সহজেই সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণকর জনমত গড়িয়া তোলা যায়। গণতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার মত-প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। তাই জনমতও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যে জনমত সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর ও উপযোগী, শেষ পর্যন্ত তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনমতের মূল্য অত্যধিক। জনমতই নাগরিককে তাঁহাদের যোগ্য প্রতিনিধি-নির্বাচনে সহায়তা করে এবং এই সকল প্রতিনিধি দ্বারা শাসন-ব্যবস্থায় জনমত প্রতিফলিত হয়। জনমত সরকারের ও শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির বিচার ও সমালোচনা করে। ফলে, সরকার ঠিক পথে পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। সংবাদপত্র জনমত প্রকাশ করে ও জনমত গঠন করে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল সংবাদপত্রের দায়িত্ব-জ্ঞান। সংবাদপত্র ইচ্ছা করিলে জনসাধারণকে বিপথে চালিত করিতে পারে। অনেক সময় সংবাদপত্রের অপপ্রচারের ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়। সুতরাং সংবাদপত্রকে নিজের স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক হইতে হয়। সংবাদপত্র নিজের স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করিলে, অনেক সময় তাহার অধিকার সঙ্কোচ ও হরণ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বাক্-স্বাধীনতা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও কর্তব্য

মানুষের সংঘবদ্ধ হইবার প্রবণতা ও অধিকার সহজাত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার আছে। মানুষ নানা কারণে সংঘবদ্ধ হইতে পারে; সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মত ও আদর্শের

লোকরা প্রায়ই বিভিন্ন সংঘে বা দলে মিলিত হয়। রাজনৈতিক কারণে যে সকল সংস্থা গঠিত হয়, সেগুলি মত ও আদর্শ অনুসারে পৃথক পৃথক দল বা পার্টির সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই সকল দল ভিন্ন ভিন্ন মত ও আদর্শ পোষণ করে এবং সেই মত ও আদর্শ অনুসারে জনমত গড়িয়া তোলে এবং নিজেদিগকে ও সমর্থকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তোলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দলের মত ও আদর্শ সর্বাধিক সমর্থন লাভ করে, তাহাই শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করে। যে সকল রাজনৈতিক দল শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে না, শাসন-কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী, মত ও আদর্শের সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকার তাহাদের থাকে। এজন্য তাহারা সভা-সমিতি করে, সংবাদপত্র প্রকাশ করে, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা বিতরণ করে, প্রাচীরপত্র লাগায়। রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তাহাদের সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করিবার ক্ষমতাও অসামান্য। তাই রাজনৈতিক দলগুলির নিজেদিগকে সংযত ও সতর্ক করা উচিত। রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজকর্মের জন্য অনেক সময় রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা সঙ্কোচ বা হরণ করিবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও বণিক-সংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি বহু সংস্থা দেশে বর্তমান থাকে। আজকাল শ্রমিক সংস্থাগুলিকে কেবল অর্থনৈতিক সংগঠনই বলা চলে না, সেগুলি প্রায়ই রাজনৈতিক সংগঠনের সহিত সহযোগিতা করে এবং রাজনৈতিক দলের সমর্থনে কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্থাও দেশে থাকে। সেগুলির গুরুত্বও গণতান্ত্রিক দেশে অল্প নহে।

সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা

কিন্তু নাগরিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল তাঁহার ভোটদানের অধিকার। ভোটদানের দ্বারাই নাগরিক তাঁহার ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ মতামত প্রকাশ করেন, তাঁহার মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করিয়া রাষ্ট্রের ও স্বায়ত্ত শাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। অনেক নাগরিক ভোটদানের এই অধিকারকে প্রয়োগ করেন না—নির্বাচনের সময়ই অনেক নাগরিক ভোটদানে বিরত থাকেন। গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের অবহেলা ক্ষতিকর। নাগরিক যে মত ও আদর্শে বিশ্বাস করেন, সেই মত ও আদর্শের অনুসারী প্রার্থী একটিমাত্র ভোটের অভাবে অনেকক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। এইভাবে নাগরিকগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবহেলার জন্য অনেক অযোগ্য লোক শাসন-ব্যবস্থায় ও স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্থায় ঢুকিয়া পড়ে। নাগরিকগণ অনেক সময় ব্যক্তিগত সামান্য স্বার্থের জন্য মত ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়া অযোগ্য

ভোটাধিকার

ব্যক্তিকে ভোট দেন। ফলে, অযোগ্য ব্যক্তিরা অনেক সময় অধিকসংখ্যক ভোট লাভ করিয়া জয়লাভ করে। ইহাতে শাসন-ব্যবস্থা ও স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্থার পরিচালনে অযোগ্যতা ও অনেক সময় বিপর্যয় দেখা দেয়। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য নিজ নিজ ভোটাধিকার বিবেকবুদ্ধি অনুসারে প্রয়োগ করা।

কেবল ভোটাধিকার প্রয়োগ নহে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই রাজনৈতিক চেতনা ও দায়িত্ব থাকা উচিত। তাঁহাদের উচিত অন্যান্যদের সহিত সমসাময়িক সকল সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা, পরস্পরের আলোচনার ভিত্তিতে জনমত গড়িয়া তোলা। অনেকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে চান। ইহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য। রাজনীতির অর্থ এই নহে যে, দলাদলি করা বা জোট পাকানো। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক চেতনা প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যেই জাগ্রত হওয়া চাই। নহিলে জনসাধারণের ঔদাসীন্যের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সহজেই প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন নানাভাবে বিপন্ন হয়। অনেকে কর্মব্যস্ততার অজুহাতে জনহিতকর সংস্থা ও রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ হইতে দূরে থাকে। ইহাতে কিছুসংখ্যক লোক জনহিতকর সংস্থা ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহারের সুযোগ পায়। কিন্তু নাগরিকগণ যদি তাঁহাদের কর্মব্যস্ততার অবকাশে সামান্য সময়ও জনহিতকর সংস্থাসমূহ ও রাজনৈতিক সংস্থার জন্য ব্যয় করেন, তবে দেশের শাসন-ব্যবস্থা এবং স্বায়ত্ত শাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত হইতে পারে। অযোগ্য ও স্বার্থপর ব্যক্তিরা বিভিন্ন সংস্থায় প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পায় না।

রাজনৈতিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক জীবন।—আধুনিক সমাজে মানুষের রাজনৈতিক জীবন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য মানুষকে অনেকক্ষেত্রে বহু দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-লাঞ্ছনা, কারাগার এবং এমন কি মৃত্যুরও সম্মুখীন হইতে হয়। ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল, তখন তাহার স্বাধীনতার জন্য সহস্র সহস্র লোক কারাবরণ করিয়াছেন, ধনসম্পত্তি, জীবন তুচ্ছ করিয়াছেন। যাঁহারা হেলায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন, সমাজে সহজেই প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া সুখে-শান্তিতে থাকিতে পারিতেন, তাঁহারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের প্রতি মুহূর্তকে বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজও পৃথিবীতে বহু দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁহাদের দেশের পরাধীনতা হইতে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। যে সকল দেশ স্বাধীন হইয়াছে, সে সকল দেশেও রাজনৈতিক কার্যকলাপের অবসান

ঘটে নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে। বহু স্বাধীন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। যে সকল দেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল দেশেও নব নব আদর্শ ও কর্মপন্থার জন্য অবিরাম রাজনৈতিক প্রচার ও কার্যকলাপ চলিতেছে। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে শাসন-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য অবিরাম রাজনৈতিক আন্দোলন চালনা অপরিহার্য। কারণ, প্রতিনিয়ত দেশে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সকল সমস্যা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণকে—নাগরিকগণকে—সর্বদা অবহিত থাকিতে হয়। নাগরিকগণ ঐ সকল সমস্যা সম্পর্কে যেরূপ জনমত গড়িয়া তুলেন, শাসন-ব্যবস্থায় তাহারই প্রতিফলন ঘটে। প্রয়োজনবোধ করিলে জনসাধরাণ সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শাসন-ব্যবস্থাকে একদল রাজনীতিজ্ঞের হস্ত হইতে অপর একদল রাজনীতিজ্ঞের হস্তে—এক পার্টির হস্ত হইতে অন্য পার্টির হস্তে—সমর্পণ করিতে পারেন। আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই—কি পুঁজিবাদী দেশসমূহে, কি সমাজবাদী দেশসমূহে—সর্বত্রই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে রাজনীতি নাগরিকগণের জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছে। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যানবাহন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি-সাধনের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে। আবার সরকারগুলি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং ঐ সকল বিষয়ের উন্নতি ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান জনসাধারণের উপরই পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। তাই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ও অগ্রগতির জন্য জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় সতত উদ্‌বুদ্ধ থাকিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক সমাজে মানুষকে রাজনৈতিক প্রাণী (a political being) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাজনৈতিক দল ও তাহার গুরুত্ব।—আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক দলগুলির গুরুত্ব অসাধারণ। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন মত, আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নাগরিকগণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া সংঘবদ্ধ করে। রাজনৈতিক দলগুলির মতবাদ, আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং কর্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়। অনেক সময় তাহারা সমাজের বিশেষ শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের স্বার্থেই গঠিত হয়। এইরূপে দেশে দেশে বহু প্রকার রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। ইংলণ্ডে যেমন রক্ষণশীল দল, শ্রমিক দল, উদারনৈতিক দল, কম্যুনিস্ট পার্টি, যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাট দল, রিপাবলিকান্ দল, ভারতে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি, জনসংঘ প্রভৃতি এইরূপ দলের দৃষ্টান্ত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি কম্যুনিস্ট

দেশে একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি-ই রহিয়াছে। ঐ সকল দেশে পার্টি-বিরোধী কোন কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। কিন্তু ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন পার্টিকে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। তবে কোন রাজনৈতিক দল যদি দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার সৃষ্টি করে বা দেশদ্রোহ-মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তবে সেই পার্টির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয় বা পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মূল্য যথেষ্ট। এই সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে সর্বদাই দেশের জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল ও সতর্ক রাখে; ফলে, ক্ষমতাসীন দল কোনও অন্যায়, ভ্রান্ত বা অনিষ্টকর কার্যে লিপ্ত হইতে সাহস করে না। কোনও রাজনৈতিক দল শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, বিরোধী দলগুলির সমালোচনা ও প্রচারের ফলে তাহা জনপ্রিয়তা হারায় এবং তখন অন্য কোনও দল জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক আদর্শ।—আদর্শ গণতন্ত্র হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষায় "জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের সরকার"—Government of the people, for the people, by the people. জনগণের কল্যাণ-সাধনের জন্য জনসাধারণই—অর্থাৎ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই—এই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকেন। জনগণ বা জনসাধারণ বলিতে দেশের অধিকাংশ লোককেই—অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই—বুঝায়। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে দল অধিকাংশ লোকের সমর্থন লাভ করে, সেই দল শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। অন্যপক্ষে, যে দল অধিকাংশ লোকের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়, সে দল শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। এই অবস্থায় যে দল শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় অংশ-গ্রহণের সুযোগ পাইল না, তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত, আদর্শ ও কার্যাদির যতই সমালোচনা করুক না কেন, তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন ও সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে—ইহাই হইল গণতান্ত্রিক আদর্শ। অন্যপক্ষে, ক্ষমতাসীন দল যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে যে অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী দলগুলির উপর জুলুম করিবে বা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলিবে—তাহাও গণতান্ত্রিক আদর্শ নহে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভায়, সরকারে বা অন্যান্য সংস্থায় কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছেন বলিয়া সংখ্যালঘু দলগুলির মতামতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবেন, ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। কারণ, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংখ্যালঘুরাও

দেশের নাগরিকগণের একাংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং পরমতসহিষ্ণুতাকেই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিতে হইবে। দেশের সংবিধান মানিয়া লইয়া শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার ও যুক্তিতর্কের দ্বারা নিজ নিজ দলের মত, আদর্শ ও কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই জনপ্রিয়তার ভিত্তিতেই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে হইবে। অন্য কোনও পন্থার আশ্রয় লওয়া গণতন্ত্র-সম্মত নহে।

দৈনন্দিন জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ।—আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, আমরা এখনও গণতান্ত্রিক আচরণে অভ্যস্ত হইতে পারি নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিরা অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এবং ধনী লোকরা দরিদ্র লোকদিগকে প্রায়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে এ-কথা সকল সময়ে স্মরণ রাখা উচিত যে, একজন শিক্ষিত নাগরিক ও একজন অশিক্ষিত নাগরিক উভয়েই একটিমাত্র ভোটের অধিকারী, একজন ধনী ব্যক্তি ও একজন দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিক উভয়েরই রাজনৈতিক অধিকার একই—একটিমাত্র ভোট। দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও অশিক্ষিত জনসাধারণের সংখ্যা দেশে অধিক হওয়ায়, পরোক্ষে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করিবার অধিকার তাঁহাদেরই বেশী। এই সাধারণ কথাটুকু মনে রাখিলে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আচরণে অনেকখানি সতর্ক হইতে পারিব এবং কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে আমরা তাহাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে শিখিব। জনসাধারণও ক্রমেই তাঁহাদের এই অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হইতেছেন। ফলে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ-বিধিও দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the different forms of Government. [বিভিন্ন ধরনের শাসন-ব্যবস্থা বর্ণনা কর।]

2 What form of Government prevails in modern society ? [বর্তমান সমাজে কোন্ প্রকার শাসন-ব্যবস্থার প্রাধান্য সর্বাধিক ?]

3. Is the constitutional monarchy of Britain a democracy ? How does it differ from a Republic ? [বৃটেনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কি গণতন্ত্র ? উহার সহিত প্রজাতন্ত্রের পার্থক্য কি ?]

4. What do you know about the rights of a citizen ? What right do you think to be the most important ? [নাগরিকের অধিকারসমূহ সম্পর্কে কি জান ? তুমি নাগরিকের কোন্ অধিকারটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে কর ?]

5. Describe the importance of political life in a modern society. [আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

6. What is the democratic ideal ? What should be the every-day conduct in a democratic society ? [গণতান্ত্রিক আদর্শ বলিতে কি বুঝ ? গণতান্ত্রিক সমাজে দৈনন্দিন আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত ?]

চতুর্থ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংগঠন

সূচনা—ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হস্তে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা কেবল স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত জড়িত। এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থার জন্য কতিপয় স্থানীয় সংস্থা রহিয়াছে। এই সকল সংস্থা স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত। তাই এই সকল সংস্থাকে স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্থা বলা হইয়া থাকে। ভারতের স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়—পৌর ও গ্রামীণ। শহরাঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসন পরিচালনার জন্য রহিয়াছে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা। সুবৃহৎ শহরগুলিতে যে সকল পৌরসভা রহিয়াছে, সেগুলিকে বলা হয় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা সংক্ষেপে কর্পোরেশন। যে সব অঞ্চলে সেনানিবাস রহিয়াছে, সেই সব অঞ্চলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা সেনানিবাস সংঘ থাকে। বৃহৎ শহরের উন্নতির জন্য ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এবং বন্দরগুলি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পোর্ট ট্রাস্ট থাকে। গ্রামাঞ্চলে রহিয়াছে গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ্ ও জেলা পরিষদ্ নামে সংস্থাসমূহ।

কলিকাতা কর্পোরেশন।—1923 খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সাহায্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের পত্তন করেন। এই আইনের বলেই কলিকাতা কর্পোরেশন অনেকটা স্বায়ত্ত শাসনমূলক অধিকার পায় এবং লণ্ডন শহরের অনুকরণে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অল্ডারম্যান প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়। কর্পোরেশনে একজন প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং প্রধান কর্মকর্তা হন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। পরে 1923 খ্রীষ্টাব্দের আইন অনেকাংশে সংশোধিত হয়। স্বাধীনতালাভের পর 1951 খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশন পুনর্গঠিত হয়। 1952 ও 1955 খ্রীষ্টাব্দে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা হইয়াছিল। কিন্তু 1964 খ্রীষ্টাব্দে ঐ আইন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। 1964 খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা কলিকাতাকে 100টি পল্লীতে (ward) বিভক্ত করা হইয়াছে। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতি পল্লী হইতে একজন করিয়া "কাউন্সিলর" নিযুক্ত হন। ঐ 100 জন কাউন্সিলর 5 জন অল্ডারম্যান নিযুক্ত করেন। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে একজন সদস্য হন।

100 জন কাউন্সিলর, 5 জন অল্ডারম্যান ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান—এই 106 জন সদস্য নিজেদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ 4 বৎসরের জন্য এবং মেয়র ও ডেপুটি মেয়র 1 বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে "কমিশনার" বলা হয়। কমিশনার প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহার কার্যকাল 5 বৎসর। হেল্‌থ্‌ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কর্মকর্তাগণকে কর্পোরেশন-ই নিযুক্ত করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন

শহরের জল-সরবরাহ, গৃহ-নির্মাণ ও পূর্তকার্য, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কর নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য কতিপয় স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) রহিয়াছে। বর্তমানে নয়টি স্থায়ী কমিটি রহিয়াছে—(1) জল-সরবরাহ কমিটি, (2) নির্মাণ কমিটি, (3) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, (4) ওয়ার্কস্‌ কমিটি, (5) বাজার কমিটি, (6) শিক্ষা কমিটি, (7) জনস্বাস্থ্য কমিটি, (8) কর ও অর্থ কমিটি এবং (9) হিসাবরক্ষণ কমিটি। এইসব স্থায়ী কমিটি 9 হইতে 12 জন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। কোনও সদস্য একাধিক কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। প্রত্যেক বৎসরের গোড়ায় এইসব স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। কতিপয় পল্লী লইয়া এক-একটি "বরো কমিটি" (Borough Committee) গঠন করা হইয়াছে। ঐ সকল পল্লীর কাউন্সিলরগণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া 'বরো কমিটি'গুলি গঠিত হয়। বরো কমিটিগুলির প্রধান কাজ হইল নাগরিকগণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সাধন করা এবং জনসাধারণের মধ্যে কর্পোরেশনের কাজকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।

স্থায়ী কমিটি ও বরো কমিটি

কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে ত্রিশ লক্ষাধিক লোক বাস করে। সুতরাং এই কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্যাবলীর মধ্যে পানীয় জল-সরবরাহ, পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, নগর-পরিকল্পনা ও গৃহ-নির্মাণ, ময়লা ও আবর্জনা দূরীকরণ, শ্মশান, হাট-বাজার ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন, পার্ক, উদ্যান ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, মহামারী নিবারণ, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠাগার স্থাপন, জন্ম-মৃত্যুর হিসাবরক্ষা প্রভৃতিই প্রধান। এই সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়া থাকে। কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত জমি ও গৃহের মালিকদের নিকট হইতে সংগৃহীত কর, ব্যবসায়-বাণিজ্য

কর্পোরেশনের প্রধান করণীয়

হইতে সংগৃহীত কর, গৃহপালিত পশুর উপর ধার্য কর, যানবাহনের উপর ধার্য কর, বাজার ও কর্পোরেশনের নিজস্ব জমি ও গৃহাদি হইতে লব্ধ আয় প্রভৃতি হইতে কর্পোরেশন এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় 9 কোটি টাকারও অধিক। কিন্তু এই অর্থেও কর্পোরেশনের প্রয়োজন সকল সময় মিটে না। তাই কর্পোরেশনকে মধ্যে মধ্যে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইতে হয়। প্রয়োজন হইলে কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষে জনসাধারণের নিকট হইতেও ঋণ লইতে পারে।

সাধারণ শহরের পৌরসভা।—ছোট ছোট শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা রহিয়াছে। এই সকল মিউনিসিপ্যালিটি 1932 খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে গঠিত ও পরিচালিত। পরে অবশ্য ঐ আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। পৌরসভাগুলি শহরের ভোটদাতাগণের দ্বারা নির্বাচিত 9 হইতে 30 জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। এই সকল প্রতিনিধি অর্থাৎ পৌরসভার সদস্যগণকে "কমিশনার" বলা হয়। কমিশনারগণ সকলেই 4 বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি বা "চেয়ারম্যান" এবং একজনকে সহ-সভাপতি বা "ভাইস্-চেয়ারম্যান" নির্বাচন করেন। কমিশনারগণ সকলেই অবৈতনিকভাবে কাজ করেন। কমিশনারগণ ছাড়া, পৌরসভায় বহু বেতনভোগী কর্মচারী থাকেন—যেমন, পৌরসভার সেক্রেটারী, ইঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ার, হেল্‌থ্ অফিসার, স্যানিটারি ইন্‌স্‌পেক্টর প্রভৃতি। যে সকল পৌরসভার আয় লক্ষাধিক টাকা, তাহারা ইচ্ছা করিলে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারে। পৌরসভার কার্যকাল সরকার ইচ্ছা করিলে এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। 1955 খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে রাজ্য সরকার দুর্নীতি ও অযোগ্যতা দূরীকরণের জন্য পৌরসভা বাতিল করিয়া দিয়া, পৌরসভার পরিচালনের জন্য একজন প্রশাসক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, জেলা-শাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণ পৌরসভার কাজকর্ম ও অবস্থাদি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারেন।

পৌরসভার সংগঠন ও কার্যকাল

প্রত্যেক পৌরসভাকে শহরের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কতিপয় অবশ্য-করণীয় কর্তব্য পালন করিতে হয়। এই সকল অবশ্য-করণীয় কর্তব্যের মধ্যে পথঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্করণ, রাস্তা, পায়খানা প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থাকরণ, পানীয় জলের সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ ব্যবস্থা, জল-নিকাশ ও নর্দমাদির সুব্যবস্থা, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি নিরোধ, ভেজাল

পৌরসভার কর্তব্য

নিবারণ, প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থা, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতির নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠাগার স্থাপন, বাজার প্রতিষ্ঠা, বস্তি উন্নয়ন প্রভৃতি প্রধান। পৌরসভার অর্থসামর্থ্য অনুসারে এগুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয়কে আবার অগ্রাধিকার দিতে হয়। স্বভাবতঃই এই সকল কার্যের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়া থাকে।

পৌরসভার আয়

পৌরসভা এই অর্থ নানাভাবে সংগ্রহ করে। পৌরসভার অন্তর্গত জমি ও গৃহের উপর ধার্য কর, জল-সরবরাহের দরুন ধার্য কর, যানবাহন, আলো বাবদ ধার্য কর, ময়লা অপসারণ বাবদ ধার্য কর, যানবাহন ও গবাদি পশুর উপর ধার্য কর, ব্যবসায় ও বৃত্তির উপর ধার্য কর, আমোদ-প্রমোদের উপর ধার্য কর, খেয়া ও সেতু ব্যবহারের জন্য দেয় কর, পৌরসভার নিজস্ব সম্পত্তির আয়, পৌরসভার নিজস্ব হাট-বাজার হইতে আয় প্রভৃতি হইতে অর্থ সংগৃহীত হয়। শ্মশান ও গোরস্থান হইতে অনেক পৌরসভার কিছু আয় হয়। উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য রাজ্য সরকার পৌরসভাগুলিকে অর্থসাহায্য দিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে পৌরসভাগুলি রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। সরকারের অনুমোদনক্রমে পৌরসভা জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণও সংগ্রহ করিতে পারে।

গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন।—শহরাঞ্চল ছাড়া, গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। বৃটিশ আমলে 1885 খ্রীষ্টাব্দে স্বায়ত্ত শাসন আইন অনুসারে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ড, তালুক বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ডগুলি প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরে ঐ আইনের বহু সংশোধন হইলেও মূলতঃ ঐ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতে ঐ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া "পঞ্চায়েত রাজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বে গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হইত। বর্তমান ব্যবস্থায় তাহা প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। এই "পঞ্চায়েত রাজ" পশ্চিমবঙ্গেও প্রবর্তিত হইয়াছে। 1957 খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছিল। 1963 খ্রীষ্টাব্দে জেলা পরিষদ্ আইন পাস হইয়াছে। এই আইন অনুসারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কতিপয় স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে। যেমন—গ্রাম-স্তরে গ্রাম সভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত; অঞ্চল-স্তরে অঞ্চল পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েত; ব্লক-স্তরে আঞ্চলিক পরিষদ্ এবং জেলা-স্তরে জেলা পরিষদ্।

গ্রাম সভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত।—1957 খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে গ্রাম সভা গঠিত হইয়াছে। গ্রামগুলি খুব ছোট

হইলে, একাধিক গ্রামকে একটি গ্রাম বলিয়া ধরিয়া একটি গ্রাম সভা গঠিত হইয়াছে। অপরপক্ষে, গ্রামগুলি খুব বড় হইলে তাহাতে একাধিক গ্রাম সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নরনারী—অর্থাৎ বিধানসভার ভোটার তালিকাভুক্ত সকল নরনারীকে লইয়া গ্রাম সভাগুলি গঠিত। এই গ্রাম সভাই—অর্থাৎ গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী—গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য-সংখ্যা গ্রামবাসীর সংখ্যার অনুপাতে 9 হইতে 15 পর্যন্ত হইতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণের বয়স কমপক্ষে 25 হওয়া চাই। গ্রামগুলিকে কতিপয় পল্লীতে ভাগ করিয়া প্রতি পল্লী হইতে এক বা একাধিক সদস্য

গ্রাম সভা
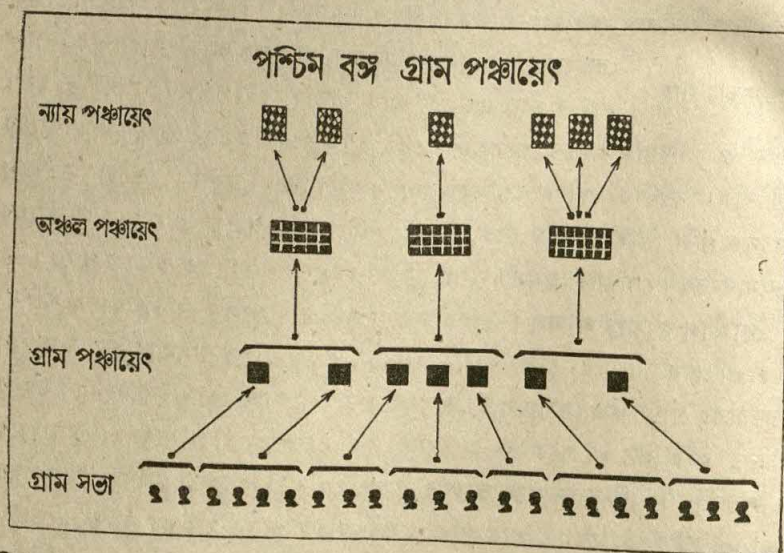
নির্বাচন করা হইয়া থাকে। প্রয়োজনবোধে সরকার এক-তৃতীয়াংশ সহযোগী সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। তবে এই সকল সদস্যের পঞ্চায়েত সভায় ভোটদানের বা অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইবার অধিকার থাকিবে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে "অধ্যক্ষ" ও একজনকে "উপাধ্যক্ষ" নির্বাচন করিবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন চারি বৎসর অন্তর হইবে। গ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট ইত্যাদির নির্মাণ ও মেরামত, পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার, পানীয় জলের সরবরাহ, গ্রামের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষা, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতির সংরক্ষণ, কৃষির উন্নতিসাধন প্রভৃতি নানা করণীয় রহিয়াছে গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীনেই কাজ করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যের

গ্রাম পঞ্চায়েত

কর্তব্য

জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অঞ্চল পঞ্চায়েত মঞ্জুর করিয়া থাকে। গ্রাম সভার নিকট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যের বাৎসরিক বিবরণ পেশ করিতে হয়। গ্রাম সভা ইচ্ছা করিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবেশন তলব করিতেও পারে।

অঞ্চল পঞ্চায়েত।—কতকগুলি গ্রাম সভা লইয়া এক-একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়। সাধারণতঃ গ্রাম সভাগুলির 250 জন সদস্য-পিছু অঞ্চল পঞ্চায়েতের একজন সদস্য থাকেন। অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে "প্রধান" ও একজনকে "উপ-প্রধান" নির্বাচন করেন। অঞ্চল পঞ্চায়েতে একজন, বেতনভোগী সচিব থাকেন।

গঠন

অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর অঞ্চল-এলাকায় বিভিন্ন কর ধার্যকরণ, নিজস্ব বাজেট পাস এবং গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের যে অর্থব্যয় হইবে তাহা মঞ্জুর করিবার অধিকার রহিয়াছে। জমি ও বাড়ীর মালিকের উপর সম্পত্তির মূল্যানুপাতে কর ধার্য হইবে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় ও বৃত্তির উপর কর ধার্য হইবে। এই কর হইতেই প্রধানতঃ উভয় পঞ্চায়েতের ব্যয় নির্বাহ হইবে।

আয়

পঞ্চায়েত অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ-নিবারণ ও প্রহরার জন্য চৌকিদার ও দফাদার নিযুক্ত করিবেন। তবে তাহারা সরকারের কর্মচারীরূপেই গণ্য হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েত তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রয়োজন হইলে ঐ বাবদ সরকার অঞ্চল পঞ্চায়েতকে অর্থসাহায্য করিবেন। সরকার-নিযুক্ত একজন কর্মচারী অঞ্চল পঞ্চায়েতের বাজেট মঞ্জুর ও সম্পত্তি পরিদর্শন করিবেন এবং কার্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তিনি পঞ্চায়েতের কোনও নির্দেশ বা প্রস্তাব প্রয়োজন হইলে বাতিলও করিতে পারিবেন।

ন্যায় পঞ্চায়েত।—অঞ্চল পঞ্চায়েত তাঁহার এলাকার অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সভাগুলি হইতে 5 জন লোককে লইয়া ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করিবেন। ইঁহারা গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্য হইলে চলিবে না। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে 'বিচারক' বলা হইবে। ইঁহারা অঞ্চলের ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে পারিবেন। একশত টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তির বিরোধ সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিচারের অধিকার তাঁহাদের থাকিবে। অপরাধের জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন। অধিকাংশ বিচারক অনুপস্থিত থাকিলে বিচার হইবে না। বিচারকগণ একমত না হইলে অধিকাংশের মতই সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

আঞ্চলিক পরিষদ্‌।—প্রতি ব্লকে একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ্‌ রহিয়াছে। এই পরিষদ্‌ অঞ্চলের প্রধানগণ, গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের অধ্যক্ষগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ, ঐ অঞ্চলের বিধানসভা, বিধান পরিষদ্‌ ও লোকসভার মন্ত্রী নহেন এমন সদস্যগণ, সরকার-মনোনীত দুইজন মহিলা ও দুইজন তপশীলভুক্ত সদস্য এবং সমস্ত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন সমাজসেবী বা বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত। ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার এই পরিষদের সহযোগী সদস্য এবং সেক্রেটারী, তবে তাঁহার ভোটাধিকার থাকিবে না। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন "সভাপতি" ও একজন "সহ-সভাপতি" নির্বাচন করিবেন।

সংগঠন

কৃষি, পশুপালন ও কুটীরশিল্পের উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণদান-ব্যবস্থা, স্থানীয় জল-সরবরাহ, সেচ, হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় স্থাপন, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, জনকল্যাণ, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব ও আর্থিক সাহায্যদানের অধিকার আঞ্চলিক পরিষদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। আঞ্চলিক পরিষদ্‌ গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েতকে আর্থিক সাহায্য দিবে; ব্লকের অন্তর্গত অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণে সাহায্য করিবে। আঞ্চলিক পরিষদের একটি স্থায়ী তহবিল থাকিবে। জেলা পরিষদ্‌, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার-কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য হইতে এই তহবিল গঠিত হইবে। আঞ্চলিক পরিষদ্‌ অঞ্চলের যানবাহন ও হাট-বাজারের জন্য লাইসেন্সের মাশুল, জলকর, আলোক-কর, খেয়া-কর প্রভৃতি হইতেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে। প্রয়োজন হইলে ঋণও সংগ্রহ করিতে পারিবে।

কর্তব্য

আয়

আঞ্চলিক কমিটিতে 7টি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) থাকিবে। ইহা ছাড়াও, রাজ্য সরকারের আদেশ বা অনুমোদন সাপেক্ষ আঞ্চলিক পরিষদ্‌ প্রয়োজনমতো আরও কমিটি গঠন করিতে পারে। কেহ দুইটির বেশী স্থায়ী কমিটির সদস্য হইতে পারিবে না।

স্থায়ী কমিটি

জেলা পরিষদ্‌।—1963 খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ্‌ আইন অনুসারে জেলাগুলিতে জেলা পরিষদ্‌সমূহ গঠিত হইয়াছে। আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ, সরকার-মনোনীত একজন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রতি মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের অধ্যক্ষগণের দ্বারা নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের দুইজন করিয়া অধ্যক্ষ লইয়া জেলা পরিষদ্‌ গঠিত। জেলা পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে মহিলা-সদস্যের সংখ্যা দুইজনের অপেক্ষা কম থাকিলে,

উর্ধ্বপক্ষে সরকার-মনোনীত দুইজন মহিলা জেলা পরিষদের সদস্য হইবেন। জেলা পঞ্চায়েত অফিসার জেলা পরিষদের সহযোগী সদস্য এবং উহার সম্পাদক। কিন্তু তাঁহার কোনও ভোটাধিকার নাই। নির্বাচিত সদস্যদের কার্যকাল চারি বৎসর হইবে। জেলা পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে "চেয়ারম্যান" এবং একাধিক "ভাইস্-চেয়ারম্যান" নির্বাচন করিবেন। চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যানগণের কার্যকালও চারি বৎসর হইবে। জেলা পরিষদের কার্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হইবে। জেলা পরিষদের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য 7টি স্থায়ী কমিটি

সংগঠন
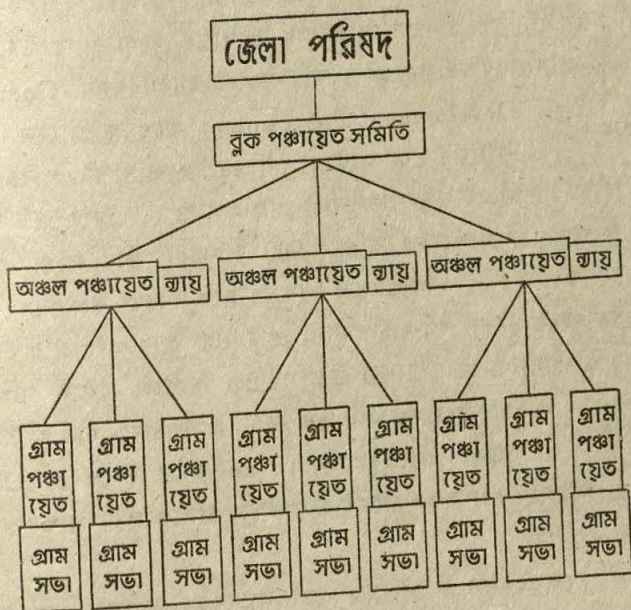
থাকিবে। এই কমিটিগুলি হইল—অর্থ ও সংস্থা কমিটি, বাস্তু কমিটি (Public Works), জনস্বাস্থ্য কমিটি, কৃষি ও সেচ কমিটি, শিল্প ও সমবায় কমিটি, জনকল্যাণ কমিটি এবং প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি। জেলা শিক্ষা-পরিষদ্‌ই প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির কাজ করিবে। রাজ্য সরকারের অনুমোদন লইয়া জেলা পরিষদ্ প্রয়োজনমতো আরও কমিটি বা কমিটিসমূহ গঠন করিতে পারিবে।

জেলা পরিষদ্ কৃষি, পশুপালন, শিল্প, সমবায়, গ্রামীণ ঋণদান, পানীয় জল-সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, ছাত্রকল্যাণ, জনকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়নমূলক বিবিধ পরিকল্পনা

ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সেজন্য আর্থিক সাহায্য দিবে। উহা আঞ্চলিক পরিষদ্‌সমূহকে অর্থসাহায্য দিবে। জেলার অন্তর্গত পৌরসভাগুলিকে জল-সরবরাহ ও রোগ-সংক্রমণ নিরোধের ব্যবস্থার জন্য অর্থসাহায্য দিতে পারিবে। জেলা পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে। ঐ তহবিলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ, পথকর হইতে প্রাপ্ত আয়, জেলা পরিষদ্ কর্তৃক ধার্য বিবিধ কর, উপশুল্ক, মাশুল প্রভৃতি বাবদ প্রাপ্ত টাকা, জেলা পরিষদের উপর বর্তাইয়াছে এমন সম্পত্তির আয়, জরিমানা প্রভৃতি বাবদ টাকা জমা হইবে।

কর্তব্য

আয়

সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা।—ভারত গ্রামপ্রধান দেশ, ভারতের শতকরা 80 জন অধিবাসী গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামের উন্নতিতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে। তাই গ্রামগুলির উন্নতিকল্পেই সরকার সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Programme) গ্রহণ করিয়াছেন। 1952 খ্রীষ্টাব্দের 2রা অক্টোবর তারিখে, মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র জন্মদিনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু হয়। প্রথমে 55টি নির্বাচিত অঞ্চলে পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। প্রায় 500 বর্গ-মাইল স্থান লইয়া এক-একটি অঞ্চল গঠন করা হয়। অঞ্চলগুলিকে পুনরায় ব্লকে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ব্লকে দেড়শত হইতে দুইশত বর্গ-মাইল স্থান, প্রায় 100 গ্রাম এবং প্রায় 60 হইতে 70 হাজার অধিবাসী থাকে। 1952 খ্রীষ্টাব্দের 2রা অক্টোবর হইতে পশ্চিমবঙ্গেও সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। এজন্য প্রথমে মাত্র আটটি অঞ্চল বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। এখন সমগ্র দেশকে 5,222টি ব্লকে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সকল ব্লকেই উন্নয়ন-কার্য চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ 341টি ব্লকে বিভক্ত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য

ব্লক গঠন

প্রত্যেক ব্লকে একজন করিয়া ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার বা সংক্ষেপে বি. ডি. ও. আছেন। বি. ডি. ও.-কে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ও সাহায্য করিবার জন্য কৃষি, পশুপালন, পশু-চিকিৎসা, সমবায়, গ্রামীণ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্মচারী আছেন। বি. ডি. ও.-র অধীনে গ্রাম-সেবক ও গ্রাম-সেবিকা নামে একদল কর্মচারী আছেন। বি. ডি. ও. এবং তাঁহার বিভাগের সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ রক্ষাই এই সকল কর্মচারীর প্রধান কাজ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায়, প্রতি ব্লকে এখন একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ্ আছে। বি. ডি. ও. এই আঞ্চলিক পরিষদের সহযোগী সদস্য ও সম্পাদক।

সংগঠন

করণীয় ও ব্যয়ের পরিমাণ
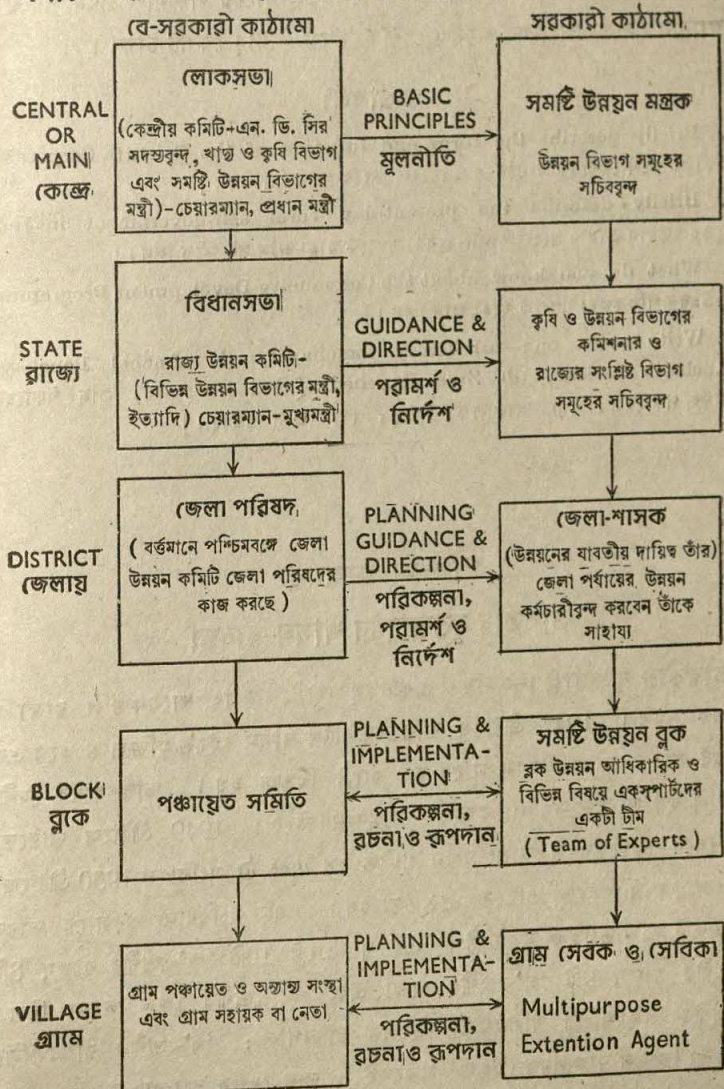
কৃষি, পশুপালন, গ্রামীণ শিল্প, সেচ, ভূমি-উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল-সরবরাহ, সমাজ-শিক্ষা, পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। এই সকল বিষয়ে সরকারই অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য 235 কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে—334 কোটি টাকা।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the form and function of the Calcutta Corporation. [কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. Briefly describe the present-day rural self-government in India. [ভারতের বর্তমান গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।]

3. What do you know about the Community Development Programme ? [সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।]

4. Write notes on :—(*a*) Gram Panchayet, (*b*) Anchal Panchayet, (c) Anchalik Parisad, (*d*) Zilla Parished. [টীকা লিখ :—(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত ; (খ) অঞ্চল পঞ্চায়েত ; (গ) আঞ্চলিক পরিষদ্ ; (ঘ) জেলা পরিষদ্।]

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র।—ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, অর্থাৎ অনেকগুলি রাজ্য ও অঞ্চলের সমষ্টি। 1947 খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করে এবং ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি হয় ভারতে নয় পাকিস্তানে যোগদান করে। 1949 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গণ-পরিষদে ভারতের নূতন সংবিধান গৃহীত হয় এবং ঐ সংবিধান 1950 খ্রীষ্টাব্দের 26শে জানুয়ারি হইতে ভারতে প্রবর্তিত হয়। এই সংবিধান অনুসারে ভারত হইল একটি প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রে 10টি 'ক'-শ্রেণীর রাজ্য, 8টি 'খ'-শ্রেণীর রাজ্য, 9টি 'গ'-শ্রেণীর রাজ্য এবং 'ঘ'-শ্রেণীর কিছু অঞ্চল ছিল। 'ক'-শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনকর্তা ছিলেন রাজ্যপাল ; 'খ'-শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনকর্তা ছিলেন রাজপ্রমুখ (ইঁহারা সকলেই প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের রাজা) ; 'গ'-শ্রেণীর রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন উপরাজ্যপাল বা চীফ কমিশনার এবং 'ঘ'-শ্রেণীর অঞ্চলগুলি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার-শাসিত। কিন্তু 1956 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে পুনর্গঠন হয়, তদনুসারে ভারতে 14টি রাজ্য ও 6টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল থাকে। কিন্তু পরে বোম্বাই রাজ্যটি দ্বিধা-বিভক্ত

রাজ্য ও অঞ্চলসমূহ

হইয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং নাগা অঞ্চলকে লইয়া নাগাভূমি নামে একটি রাজ্য গঠিত হয়। ফলে রাজ্যের সংখ্যা এখন 16। কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলির সহিত পরে তিনটি অঞ্চল যুক্ত হওয়ায় এখন অঞ্চলের সংখ্যা হইয়াছে 9। রাজ্যগুলি হইল—অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাভূমি, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, রাজস্থান। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি হইল—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ; গোয়া, দমন ও দিউ; ত্রিপুরা; দাদরা ও নগর হাভেলি; দিল্লী; পন্দিচেরী; মণিপুর; লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ; হিমাচল প্রদেশ। কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে বর্তমানে ত্রিপুরা, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ এবং গোয়া, দমন ও দিউতে নির্বাচনের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দুই প্রকার সরকার থাকে—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বা প্রাদেশিক। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি পরস্পরের সহযোগিতায় দেশ শাসন করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও দুই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা রহিয়াছে—(1) কেন্দ্রীয় এবং (2) রাজ্য। দেশের শাসনকার্যের কতিপয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে, কতিপয় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হস্তে এবং কতিপয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ের হস্তেই মিলিতভাবে থাকে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীন বিষয়সমূহ।—সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার পালন করিয়া থাকেন। এইগুলিকে ইউনিয়ন-তালিকাভুক্ত বিষয় বলা হয়। ইউনিয়ন-তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহের মোট সংখ্যা 97। সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল—দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি; ভারতের নাগরিকতা; আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা; রেলপথ, বিমান-পথ ও জাতীয় সড়কসমূহ; ডাক, তার, টেলিফোন, বেতার ইত্যাদি; মুদ্রা-প্রচলন ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক ঋণ; বৈদেশিক বাণিজ্য; খনি ও ভারী শিল্প; কৃষি ও খাদ্য; বীমা; লোকগণনা; সাধারণ নির্বাচন; শিক্ষা; পুনর্বাসন; ব্যবসায়-বাণিজ্য; উন্নয়ন ও সমবায়; জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। রাজ্য সরকার যে সকল বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেন, সেগুলিকে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় বলা হইয়া থাকে। রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা 66। এগুলির মধ্যে প্রধান হইল—রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা, জন-নিরাপত্তা, পুলিশ ও জেল; রাজস্ব; কৃষি, সেচ, খাদ্য ইত্যাদি; স্থানীয় বিচার-ব্যবস্থা (হাইকোর্ট বাদে); স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন; বন; মৎস্য; জনস্বাস্থ্য; শিক্ষা; পুনর্বাসন ইত্যাদি। যে সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যুগ্মভাবে দায়িত্ব পালন করেন, সেগুলির

ইউনিয়ন-তালিকাভুক্ত বিষয়

সংখ্যা 74। সেগুলির মধ্যে প্রধান হইল—ফৌজদারী আইন ও কার্যবিধি; কৃষি; খাদ্য; শিক্ষা; শ্রমিক কল্যাণ ও কল-কারখানা; সংবাদপত্র; মূল্য-নিয়ন্ত্রণ; বিদ্যুৎ-সরবরাহ ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও আইনের সহিত রাজ্য সরকারের আইনের বিরোধিতা বা অসঙ্গতি ঘটিলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনই প্রযোজ্য হয়। কোন কোন বিশেষ অবস্থায়—যেমন আপৎকালে—কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন পাস করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের মতের অনৈক্য বা বিরোধিতা দেখা দিলে সুপ্রীম কোর্ট তাহার মীমাংসা করেন।

রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা।—কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা এবং সংসদ। রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের তুলনায় তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কার্যতঃ প্রধান মন্ত্রীই প্রধান ব্যক্তি। এই প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভাকে সংসদই সংখ্যাধিক ভোটে নির্বাচন করেন এবং প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সংসদের নিকট দায়ী থাকেন, অর্থাৎ সংসদ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সংসদই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংস্থা।

সংসদ।—কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসভাকে সংসদ বলা হয়। সংসদে দুইটি পরিষদ্ আছে—ঊর্ধ্বতন পরিষদ্‌টি রাজ্যসভা ও নিম্নতন পরিষদ্‌টি লোকসভা নামে পরিচিত। দুইটি পরিষদের মধ্যে লোকসভাই অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর প্রত্যক্ষ ভোটে ইহার প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্য-সংখ্যা অনূ্যন 500। জম্মু ও কাশ্মীর এবং নাগাভূমির প্রতিনিধিগণ রাজ্য আইনসভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হন। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি হইতে অনধিক 25 জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। 1970 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সংসদে নাই, তবে তিনি দুইজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। বর্তমান লোকসভার সদস্য-সংখ্যা 521। লোকসভা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। লোকসভার সদস্য হইতে হইলে ভারতের নাগরিক এবং অনূ্যন 25 বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। লোকসভার অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করেন, তাঁহাকে "স্পীকার" বলা হয়। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে 'ডেপুটি স্পীকার' অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

লোকসভার সংগঠন

রাজ্যসভার সদস্যগণ রাজ্যসমূহ ও অঞ্চলসমূহ হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে 12 জনকে সদস্যরূপে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণকে
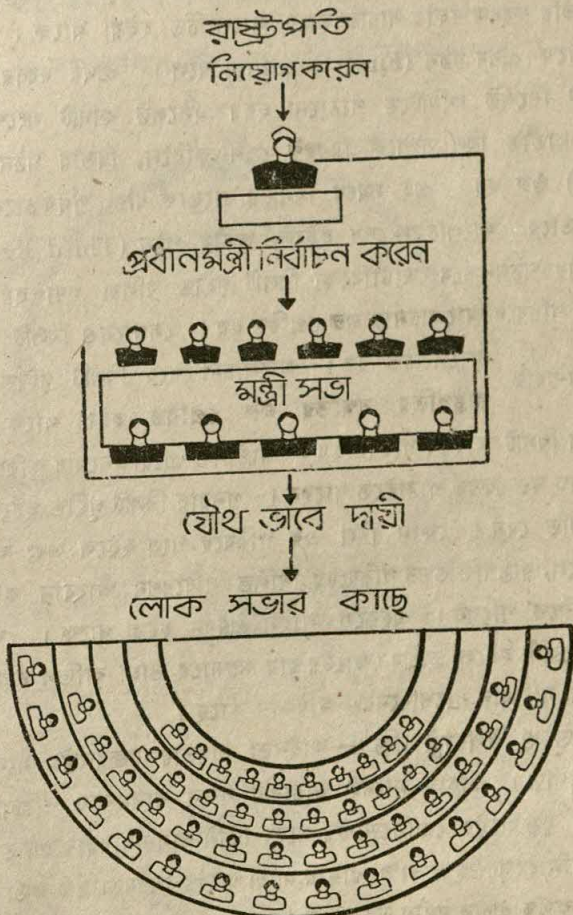
রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচিত করে। লোকসভার পরমায়ু পাঁচ বৎসর, কিন্তু রাজ্যসভা স্থায়ী সংস্থা। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের শূন্য স্থানগুলি নূতন সদস্যের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইলে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং বয়স অন্ততঃ 30 বৎসর হওয়া চাই। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

রাজ্যসভার সংগঠন

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংসদ সাধারণতঃ আইন পাস করিয়া থাকেন। তবে যুগ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কেও সংসদের আইন পাসের অধিকার আছে। আইন পাস করিতে হইলে লোকসভায় বা রাজ্যসভায় বিলটি উত্থাপিত করিতে হয়। অর্থ-সংক্রান্ত বিল লোকসভাতেই প্রথমে উত্থাপন করিতে হইবে। বিলটি লোকসভায় বা রাজ্যসভায় কয়েক দফায় সাধারণভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। প্রথম দফার আলোচনাকে প্রথম পঠন (First Reading) বলে। প্রথম দফার আলোচনার পর বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। সিলেক্ট কমিটি সংশোধন সহ বা সংশোধন ব্যতীত বিল সম্পর্কে বিবরণী পেশ করিলে, দ্বিতীয় পঠন (Second Reading) শুরু হয়। এই সময়ে বিলটির প্রত্যেক ধারা পৃথকভাবে আলোচিত হয়। এইভাবে আলোচনা শেষ হইলে, তৃতীয় পঠন (Third Reading) শুরু হয়। তৃতীয় পঠন-শেষে ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত বলিয়া গণ্য হয়। অতঃপর বিলটি অন্য পরিষদে আলোচনার জন্য প্রেরিত হয়। সেখানেও বিলটি অনুরূপভাবে আলোচিত হয়। আলোচনা-শেষে বিলটি গৃহীত হইলে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধ করিলে বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। পুনরায় বিলটি গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতি উহাতে সম্মতি দেন। কোন বিল এক পরিষদে পাস হইলে এবং অন্য পরিষদে পাস না হইলে, রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের মিলিত অধিবেশন আহ্বান করিয়া উহার সমাধান করিতে পারেন। এইরূপে আইন প্রণয়ন হইয়া থাকে। কোন আইন সংবিধান-বিরোধী হইলে, সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে তাহা বাতিল হইতে পারে। তবে সংসদের সংবিধান সংশোধনেরও অধিকার আছে।

আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি।—আইনতঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হইলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁহার নামেই ভারতের সকল শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মতো তিনি শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত পরিচালক নহেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর মতো রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক কর্তা। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন-কর্তৃত্ব প্রধান মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। ভারতের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না। লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটেই তিনি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর। রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা। তাহা ছাড়া, তিনি অন্যান্য ভাতাও পান। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক কর্তা হইলেও, তিনিই লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিয়ুক্ত করেন

রাষ্ট্রপতি

এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমতো অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির বিনা সম্মতিতে কোনও আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। তিনি সংসদ আহ্বান করিতে, স্থগিত রাখিতে বা প্রয়োজনবোধে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সংসদের অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে, তখন প্রয়োজন হইলে তিনি অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। জরুরী

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন
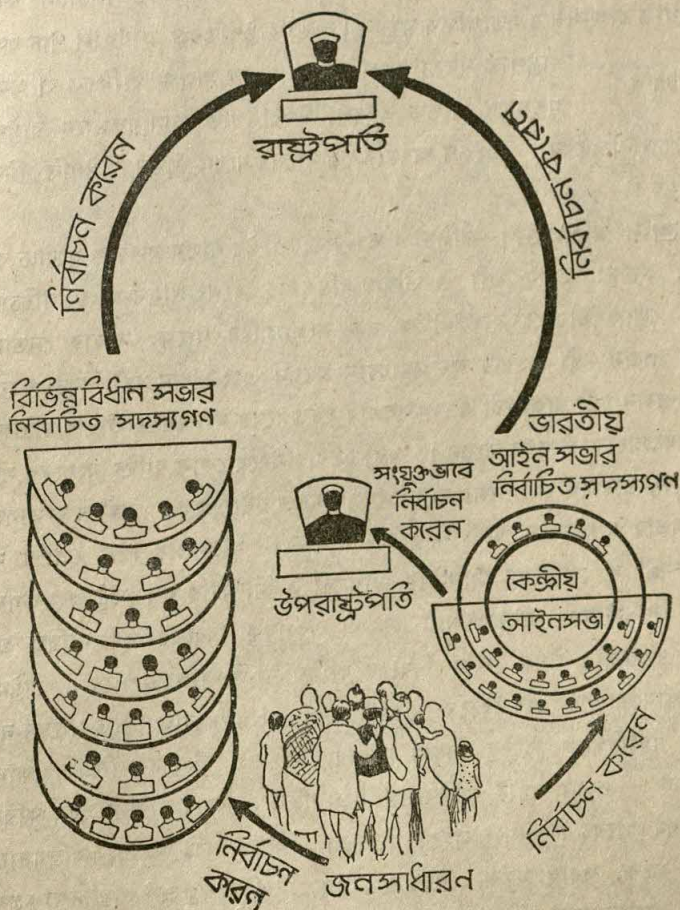
অবস্থায় তিনি নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারও স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনি রাজ্যপাল নিয়োগ করেন এবং তদ্দ্বারা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সংবিধান লঙ্ঘন করিলে বা কোন জটিল অবস্থার উদ্ভব হইলে, তিনি

রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হন। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রাণদণ্ড মকুব করিতে পারেন। ভারতের এটর্নি-জেনারেল ও অডিটর-জেনারেলকে তিনিই নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী বৎসরের বাজেট তাঁহার অনুমোদনক্রমেই সংসদে উত্থাপন করিতে পারেন।

রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যগণ একজন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। উপরাষ্ট্রপতিরও কার্যকাল পাঁচ বৎসর।

উপরাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে বা অত্যন্ত অসুস্থ থাকিলে বা অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, উপরাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন। এইরূপ অবস্থায় ছয় মাসের মধ্যেই নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।—রাষ্ট্রপতি আইনতঃ রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ব্যক্তি হইলেও, কার্যতঃ প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভাই দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। লোকসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে, তাহার নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী হওয়ার জন্য আহ্বান করেন এবং প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। অতঃপর প্রধান মন্ত্রী রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণকে নির্বাচন করেন। মন্ত্রী হইবার সময়ে কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য না থাকিলে, তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যেই সংসদ-সদস্য হইতে হয়। মন্ত্রীরা রাজ্যসভার ও লোকসভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন। মন্ত্রিসভায় তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকেন—মন্ত্রী বা কেবিনেট্ মিনিস্টার, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা মিনিস্টার অব স্টেট্ এবং উপমন্ত্রী বা ডেপুটি মিনিস্টার। প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক বিষয়ের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর কোন বিষয়ের দায়িত্ব না-ও থাকিতে পারে। রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁহার ইচ্ছামতো মন্ত্রিসভার বৈঠকে (Cabinet meeting) যোগ দিতে পারেন না। উপমন্ত্রীরা মন্ত্রীদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেন। ইঁহাদের নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নাই। প্রধান মন্ত্রীই মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ দপ্তরের ভার না-ও লইতে পারেন। বিভিন্ন বিষয় অনুসারে মন্ত্রিসভাকে বৈদেশিক মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, দেশরক্ষা মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক, শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রক, স্বাস্থ্য মন্ত্রক, শিক্ষা মন্ত্রক, পুনর্বাসন মন্ত্রক, রেল মন্ত্রক, আইন মন্ত্রক প্রভৃতি বিভিন্ন মন্ত্রকে ভাগ করা হইয়াছে। মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা কোন কারণে মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রকাশ করিলে, মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
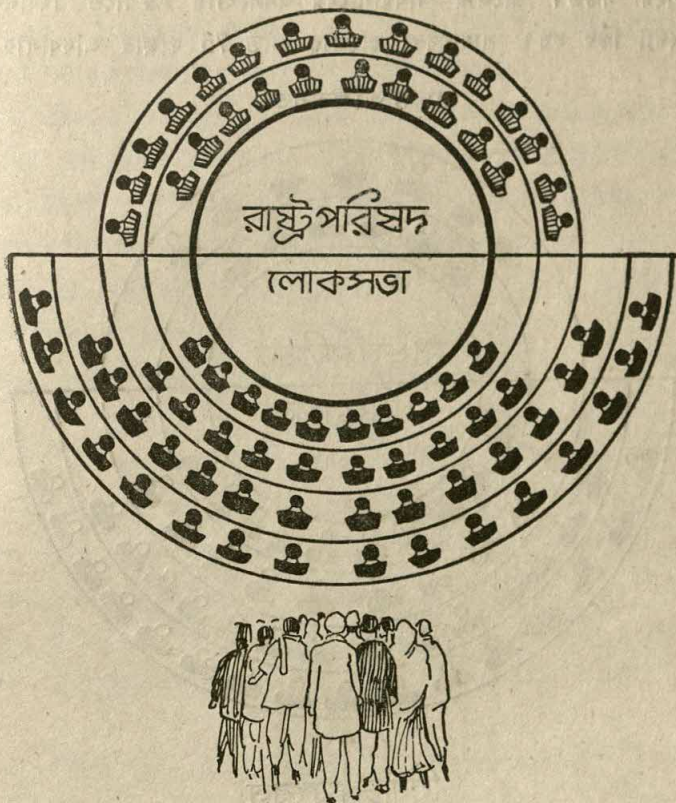
জনসাধারণ

রাজ্য সরকার।—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের গঠন প্রায় একইরূপ। কেন্দ্রে যেমন রাষ্ট্রপতি থাকেন, তেমনি রাজ্যে থাকেন রাজ্যপাল। কেবল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে রাজ্যপালের পরিবর্তে একজন সদর-ই-রিয়াসত আছেন। কেন্দ্রের সংসদের ন্যায় রাজ্যেও এক বা দুই পরিষদ-বিশিষ্ট আইনসভা আছে। এক পরিষদ-বিশিষ্ট রাজ্য আইনসভা বিধানসভা নামে পরিচিত। যেখানে দুইটি পরিষদ্ আছে, সেখানে নিম্নতন পরিষদ্‌টি বিধানসভা এবং উর্ধ্বতন পরিষদ্‌টি বিধান পরিষদ্ নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও মহীশূরে দুই-পরিষদ্-বিশিষ্ট আইনসভা আছে। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজ্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

রাজ্য আইনসভা।—রাজ্যের বিধানসভাগুলি অন্যূন 60 ও অনধিক 500 সদস্য লইয়া গঠিত। রাজ্যের অধিবাসীদের জনসংখ্যার অনুপাতে বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা স্থির হয়। সাধারণতঃ রাজ্যের প্রতি 75 হাজার অধিবাসীর জন্য
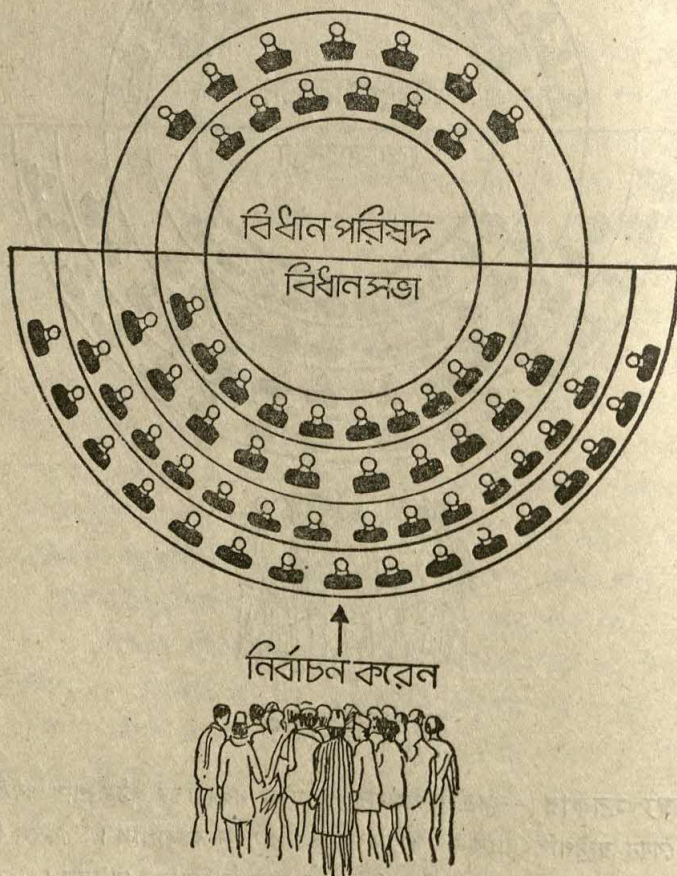
একজনের অধিক প্রতিনিধি থাকে না। বিধানসভার সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক (অর্থাৎ 21 বা ততোধিক বয়স্ক) নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হন। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে সামান্য-সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা 284। তন্মধ্যে 280 জন

বিধানসভা

নির্বাচিত এবং 4 জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত। বিধানসভার অধ্যক্ষকে "স্পীকার" এবং উপাধ্যক্ষকে "ডেপুটি স্পীকার" বলে। ইঁহারা বিধানসভার প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধানসভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। আপৎকালীন ঘোষণাবলে সংসদ বিধানসভার কার্যকাল এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারেন।

বিধান পরিষদের সদস্য-সংখ্যা 40-এর কম এবং বিধানসভার সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইতে পারিবে না। বিধান পরিষদের সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক, এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন স্বায়ত্ত শাসনশীল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, এক-দ্বাদশাংশ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকগণ কর্তৃক এবং এক-দ্বাদশাংশ তিন বৎসর হইল গ্র্যাজুয়েট্ হইয়াছেন এমন ব্যক্তিগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট অংশ রাজ্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতিতে বিখ্যাত হইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাজ্যপাল মনোনীত করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের বর্তমান সদস্য-সংখ্যা 74। ইঁহাদের মধ্যে 27 জন বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক, 27 জন রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডসমূহ কর্তৃক, 5 জন শিক্ষকগণ কর্তৃক, 6 জন গ্র্যাজুয়েট্গণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং 9 জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার মতো বিধান পরিষদ্-ও স্থায়ী সংস্থা। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করেন এবং নূতন সদস্যগণ ঐ সকল শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। বিধান পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন "চেয়ারম্যান" ও একজন "ডেপুটি চেয়ারম্যান" নির্বাচন করেন।

বিধান পরিষদ্

রাজ্য আইনসভাগুলি রাজ্য-তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। কোনও বিলকে আইনে পরিণত করিবার জন্য বিধানসভার (দুই-পরিষদ্-বিশিষ্ট হইলে বিধানসভা ও বিধান পরিষদের) অনুমোদন এবং রাজ্যপালের সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন-পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ।

আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি

রাজ্যপাল।—কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি যেমন, সেইরূপ আইনতঃ প্রত্যেক রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি হইলেন রাজ্যপাল। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসনকার্য মুখ্য মন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজ্যপাল রাজ্যের প্রধান এই কারণে যে, তাঁহার সম্মতি ছাড়া কোনও বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না; তিনিই বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্য মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন; তিনি রাজ্যের জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যে-কোনও

বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাক্রমে তিনি রাজ্য আইনসভা বাতিল করিয়া স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। রাজ্যপালের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব কার্যকর করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। রাজ্যপালের কার্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর। তাঁহার বেতন মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। তিনি বিবিধ ভাতাও পাইয়া থাকেন। রাজ্যপালের বয়স অন্ততঃপক্ষে 35 বৎসর হওয়া চাই এবং তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে।

রাজ্য মন্ত্রিসভা

রাজ্যপাল
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক
নিযুক্ত হন
পাঁচ বৎসর
কার্য কাল
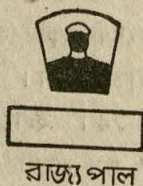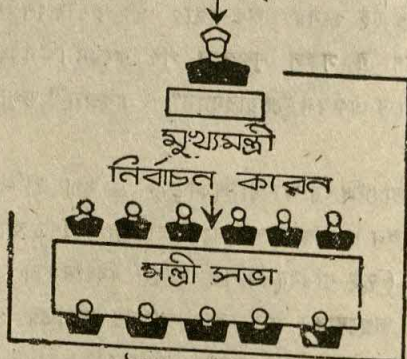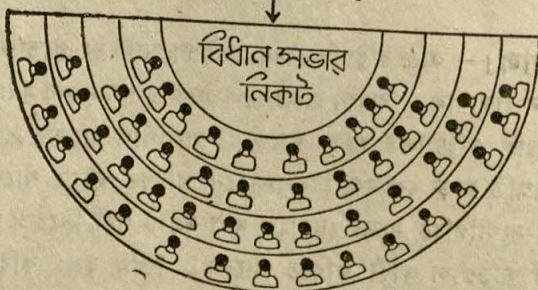
রাজ্য মন্ত্রিসভা।—রাজ্যের মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। রাজ্যের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন এবং মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করেন; অতঃপর তিনি মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শমতো অন্যান্য মন্ত্রীদেরও নিয়োগ করেন। কেন্দ্রের মতো রাজ্য মন্ত্রিসভাতেও তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকেন—মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। মন্ত্রীদের উপর এক বা একাধিক দপ্তরের ভার থাকে। রাষ্ট্রমন্ত্রীরা আহূত না হইলে কেবিনেট্ মিটিংয়ে যোগ দিতে পারেন না। উপমন্ত্রিগণের অধিকার আরও সীমাবদ্ধ। তাঁহারা বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনায় সহায়তা করেন। মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও বিধানসভার নিকট দায়ী থাকেন। বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভার কার্যে সন্তুষ্ট না হইলে, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে পারেন। এইরূপ অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে, মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মতো রাজ্য মন্ত্রিসভাতেও নানা দপ্তর থাকে—যেমন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, রাজস্ব, কৃষি, সেচ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমবায়, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, পুনর্বাসন, শ্রম, বন, মৎস্য ইত্যাদি।

গঠন ও দায়িত্ব

মহাকরণ।—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কার্যাদি সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভাকে সাহায্য করিবার জন্য—প্রতি মন্ত্রক বা দপ্তরের সেক্রেটারী, তাঁহার সহকারিগণ এবং তাঁহাদের অধীনে অসংখ্য কর্মচারী আছেন। কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত ইঁহারা সংযুক্ত নহেন। যখন যে-কোনও রাজনৈতিক দল শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হউক না কেন, ইঁহারা তাহাদিগকে সমানভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। প্রকৃতপক্ষে, ইঁহাদের সাহায্য ছাড়া কোন দপ্তরের কাজকর্ম চালনা প্রায় অসম্ভব। ইঁহারা মন্ত্রীদিগকে বিভিন্ন বিষয় ও তথ্য সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল রাখেন, প্রয়োজনমতো মন্ত্রীদের সাহায্য করেন এবং মন্ত্রীদের নির্দেশগুলিকে কার্যে রূপায়িত করেন। শাসন-ব্যবস্থায় এই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মহাকরণগুলির গুরুত্ব অসাধারণ। ইঁহাদের এই গুরুত্ব হইতেই "আমলাতন্ত্র" কথাটির উদ্ভব হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা।—ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় হইল সুপ্রীম কোর্ট। সমগ্র ভারত রাষ্ট্র-ই ইহার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক 13 জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। তাঁহারা 65 বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর বা হাইকোর্টের উকিলরূপে

অন্ততঃ দশ বৎসর কাজ করিতে হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতি বলা হয়। সুপ্রীম কোর্টের অধিকারের একটি মৌল বিভাগ (original side) এবং একটি আপীল বিভাগ (appellate side) আছে।

সুপ্রীম কোর্ট

মৌল বিভাগে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনরূপ মতদ্বৈধ ঘটিলে তাহার নিষ্পত্তি

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা
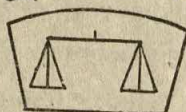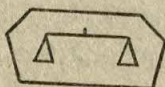
করেন। আপীল বিভাগে সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্টসমূহের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিলে তাহার পুনর্বিচার করিতে পারেন। কোন নাগরিক তাঁহার অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদন করিলে, সুপ্রীম কোর্ট তাহার বিচার করেন।

সংবিধান সংক্রান্ত কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের মতামত চাহিলে, সুপ্রীম কোর্ট তাহা প্রদান করেন।

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট আছে। রাজ্যে হাইকোর্ট-ই সর্বোচ্চ আদালত। প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও কতিপয় বিচারপতি থাকেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের পরামর্শানুসারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যপাল ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি 60 বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। তাঁহাকে ঐ পদে নিয়োগের জন্য ভারতের নাগরিক হইতে হয়। তাঁহার নিম্নতন আদালতের জজরূপে বা হাইকোর্টের উকিলরূপে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। হাইকোর্ট রাজ্যের নিম্নতন আদালতগুলির রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার করে। হাইকোর্ট রাজ্যের মধ্যে সরকারসহ যে-কোন ব্যক্তি বা সংস্থার উপর আদেশ জারী করিতে পারে। রাজ্যের সমস্ত আদালতের তত্ত্বাবধান করিবার অধিকারও হাইকোর্টের আছে।

হাইকোর্ট

রাজ্যের জেলাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া জেলা আদালত আছে। ইহাই জেলার সর্বোচ্চ আদালত। জেলায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সর্বোচ্চ বিচারক হইলেন জেলা-জজ। ফৌজদারী মামলায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সহকারী বা অতিরিক্ত দায়রা জজগণও থাকেন। জেলা-জজ ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে করেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ প্রাথমিক তদন্তের পর কোনও ফৌজদারী মামলা বিচারার্থে প্রেরণ করিলেও, জেলা-জজ তাহার বিচার করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা-জজের নিকট আপীল করা চলে। জেলা-জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিতে হয়। জেলা-জজ আসামীকে প্রাণদণ্ড দিলে হাইকোর্টের সম্মতি লাগে। জেলা-জজের অধীনে শহরে বিভিন্ন স্তরের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত রহিয়াছে। সেগুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট্, সাব-জজ, মুনসেফ প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকেন। গ্রামাঞ্চলে ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত রহিয়াছে।

জেলা আদালত

দৈনন্দিন প্রশাসন-ব্যবস্থা।—দেশের প্রশাসন মন্ত্রিসভা পরিচালনা করিলেও, শাসন-বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য সরকারের মহাকরণ ও সেক্রেটারিয়েট্ আছে। তাহার অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ও মহকুমায় স্থানীয় সরকারী দপ্তরগুলি আছে। প্রশাসনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক রাজ্যকে কতিপয় জেলায় বিভক্ত

করা হইয়াছে। জেলা প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি হইলেন জেলা-শাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্। তিনি জেলার কালেক্টর-ও। জেলার রাজস্ব-সংগ্রহের অধিকর্তাও তিনিই। জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও জেলা-শাসকের। এ-বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁহাকে সাহায্য করেন। জেলার প্রত্যেক মহকুমায় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে থাকেন মহকুমা-শাসক বা এস্. ডি. ও. (Sub-divisional Officer)। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য থাকেন মহকুমা পুলিশ অফিসার বা এস্. ডি. পি. ও. (Sub-divisional Police Officer)। শাসনকার্যে ও বিচার-বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ ও সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌গণ আছেন। প্রতিটি মহকুমা কতিপয় থানায় বিভক্ত। থানায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য থাকেন দারোগা। গ্রামাঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য আছেন অঞ্চল পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি।

রাজ্যের কয়েকটি জেলা লইয়া এক-একটি বিভাগ গঠিত। বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হইলেন কমিশনার। জেলা-শাসকগণ তাঁহার অধীনেই কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গে এখন তিনটি বিভাগ আছে—বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও জলপাইগুড়ি বিভাগ।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the structure of India Union. [ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. Briefly describe the democratic form of government existing in the states in India. [ভারতের রাজ্যগুলিতে যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা আছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

3. Briefly describe the democratic form of the Union Government in India. [ভারতের কেন্দ্রে যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

4. Briefly describe the judicial system of India. [ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতের সহিত বহির্বিশ্বের সম্পর্ক

ভূমিকা।—স্বাধীন ভারত বহির্বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্তমান যুগে কোন দেশ পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বসবাস করিতে পারে না। দ্রুতগতি যানবাহন, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি পৃথিবীর দূরতম অংশকেও অতিশয় নিকট করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, পৃথিবীর এক অংশের ভাগ্যের সহিত অন্য অংশের ভাগ্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াছে। পৃথিবীর এক অংশের ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসংবাদ হইতে যুদ্ধ ও অশান্তির উদ্ভব হইলে, তাহা আজ যে-কোন মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। তাই পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই পরস্পরের সহিত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ও পারস্পরিক সাহায্যের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ভারত কেবল এই নীতি প্রয়োজনবোধে নহে, আদর্শরূপেও গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের মূলনীতি হইল তাই স্বাধীনতা, শান্তি, সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনের ভিত্তিতে সুন্দর ভারত ও সুন্দর পৃথিবী গড়িয়া তোলা।

রাজনৈতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ।—ভারত বিশ্বের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য সকল দেশে দূতাবাস স্থাপন করিয়াছে এবং নিজের দেশে সকল দেশের দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে। এমন কি, যে দেশ তাহাকে নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করিয়াছে, যেমন চীন ও পাকিস্তান, তাহাদের সহিতও সে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই। বিভিন্ন দেশের সহিত প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন যাহাতে দৃঢ়তর হয়, সেজন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ প্রায়ই বিভিন্ন দেশে সফর করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণকে ও তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে ভারতে সফরের জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানান ও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করেন।

বহির্বিশ্বের সহিত
যোগাযোগ বৃদ্ধি

বর্তমান পৃথিবী আজ প্রধান দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে। এই দুইটি শিবির হইল কম্যুনিস্ট শিবির এবং কম্যুনিজ্‌ম্‌-বিরোধী শিবির। কম্যুনিস্ট শিবিরে পৃথিবীর কম্যুনিস্ট বা কম্যুনিজ্‌মে বিশ্বাসী দেশগুলি রহিয়াছে। এই শিবিরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড, পূর্ব-জার্মানি, উত্তর-কোরিয়া, উত্তর-ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশ রহিয়াছে। অপরপক্ষে, কম্যুনিজ্‌ম্‌-বিরোধী দেশসমূহের মধ্যে রহিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানি, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশসমূহ। তাহারা কম্যুনিজ্‌মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বিনাশের জন্ম নানারূপ চুক্তি সম্পন্ন করিয়া নানাবিধ সংস্থা স্থাপন করিয়াছে। এই দুই জোটের একটিতে যোগ দেওয়ার অর্থ হইল পৃথিবীর অন্য জোটভুক্ত দেশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া। তাই ভারত এই দুই শিবির বা জোটের কোনটিতেই যোগ না দিয়া, উভয় জোটের দেশসমূহের সহিত মৈত্রীবন্ধন গড়িয়া তুলিবার নীতিকেই গ্রহণ করিয়াছে। ফলে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যেমন সে বন্ধুত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, তেমনি সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও বন্ধুত্ব গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারত এই নীতিতে বিশ্বাস করে যে, কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী দেশগুলি পরস্পরের সহিত বিবাদ এড়াইয়া শান্তিতে পাশাপাশি বাস করিতে পারে এবং পৃথিবীকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে পারে। কেবল কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী নহে, বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী এবং বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্র রহিয়াছে, এমন দেশগুলির মধ্যেও শান্তি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে এবং অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত। তাই পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারত একনায়কতন্ত্রী আরব যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রহ্মদেশের সহিত সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের এই নীতিই জোটনিরপেক্ষতা, সহাবস্থান এবং শান্তির নীতি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

জোটনিরপেক্ষতা ও সহাবস্থানের নীতি

ভারত স্বাধীনতার নীতিতেও বিশ্বাসী। ভারত তাহার স্বাধীনতা ও স্বাধীন নীতি রক্ষার ক্ষেত্রে যেমন অনমনীয় ভাব পোষণ করিয়া থাকে, তেমনি সে যেখানেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম বা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সেখানেই তাহার অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছে, সম্ভব হইলে সাহায্য করিয়াছে। যখনই কোনও পরাধীন দেশ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে, তখনই ভারত তাহাকে স্বীকৃতি দিয়াছে।

স্বাধীনতার নীতি

ভারত বিশ্বে যুদ্ধোন্মাদনা হ্রাস করিবার জন্য সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। সে উৎসাহভরে সর্বতোভাবে নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে, পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের চেষ্টায় তৎপর হইয়াছে, পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের জন্য মস্কো চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। বিশ্বে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে রাষ্ট্রসংঘের সহিত অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘ যেখানেই শান্তিস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে, ভারত সেখানেই স্বেচ্ছাসেবক, সৈন্য এবং বিশিষ্ট কূটনীতিকদের প্রেরণ করিয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধে, মিশরের সহিত ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিরোধে, কঙ্গোর রাজনৈতিক গোলযোগে, লাওসে, ভিয়েৎনামে—

শান্তির নীতি

সর্বত্রই সে শান্তিস্থাপনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং বিশ্বের জনসাধারণের নিকট অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। কোন কোন দেশ ভারতের এই অবিচল শান্তির নীতিকে দুর্বলতা মনে করিয়াছে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া চীন ও পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু অস্ত্রের উত্তর অস্ত্রে দিয়া ভারত প্রমাণ করিয়াছে যে, শান্তির নীতি বলিষ্ঠের নীতি—দুর্বলের নহে। চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পরও ভারত রাষ্ট্রসংঘে চীনকে সদস্যরূপে গ্রহণের জন্য প্রবলভাবে সংগ্রাম করিয়াছে।

তাই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হইল—স্বাধীনতা, শান্তি, মৈত্রী, ন্যায়, সাম্য, সহাবস্থান ও সহযোগিতা। ভারতের এই পররাষ্ট্রনীতির প্রবর্তক ছিলেন ভারতের অবিস্মরণীয় নেতা জওহরলাল নেহরু। এই নীতি যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ গ্রহণ করে, সেজন্য তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও উদ্যোগে 1955 খ্রীষ্টাব্দে এশিয়া ও আফ্রিকার 29টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং-এ একটি সম্মেলন হয়। নেহরুর চেষ্টায় এই সম্মেলনে পাঁচটি আদর্শ নীতি বা "পঞ্চশীল" গৃহীত হয়। এই পঞ্চশীল হইল—(1) প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সত্তা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে; (2) কাহাকেও কেহ আক্রমণ করিবে না; (3) কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর কোন দেশ হস্তক্ষেপ করিবে না; (4) প্রত্যেককে সমান ভাবিতে হইবে ও সাহায্য দিতে হইবে; (5) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। এই পঞ্চশীল পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জন করে। 1955 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন একটি যুক্ত ইস্তাহারে পঞ্চশীল সমর্থন করেন। যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইহার প্রশংসা করেন ও সমর্থন জানান। নেহরু-প্রবর্তিত ভারতের এই বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রীও ইহার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা।

বান্দুং ও পঞ্চশীল

অর্থনৈতিক সম্পর্ক।—স্বাধীন ভারত বহির্বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন কালে ভারত বহির্বাণিজ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিত এবং তাহার আমদানির তুলনায় রপ্তানি সর্বদাই অধিক হইত। কিন্তু বৃটিশ শোষণের ফলে ভারতের সে সুদিন এখন নাই। ভারতকে তাহার রপ্তানির তুলনায় অধিক আমদানি করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, দেশের শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও তাহাকে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতে

হইতেছে। কিন্তু নিজের স্বার্থের ভিত্তিতেই ভারত তাহার বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গড়িয়া তুলে নাই—ভারত এই সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে পারস্পরিক সাহায্য ও আদান-প্রদানের ভিত্তিতে। ভারত পৃথিবীর বহু দেশে বাণিজ্যিক দূতাবাস এবং বাণিজ্যিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পূর্ব-জার্মানি, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান প্রভৃতি বহু দেশের সহিত অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভারত রাষ্ট্রসংঘের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছে। ভারত আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিলের (International Monetary Fund) সদস্য। ঐ তহবিল হইতে ভারত 1962 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 274 কোটি টাকা-মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা লইয়াছে। ভারত ইতিমধ্যেই উহার 243 কোটি টাকা ঋণ শোধ করিয়াছে। ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কেরও (International Bank for Reconstruction and Development) প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। 1962 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত ঐ ব্যাঙ্ক হইতে 389 কোটি টাকা ঋণ লইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) অন্যতম উৎসাহী সদস্য। ভারতীয় শ্রীবি. আর্. সেন 1967 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উহার ডিরেক্টর-জেনারেল পদে আছেন। ঐ সংস্থার পঙ্গপাল নিবারণ পরিকল্পনার তহবিলে ভারত 1 লক্ষ 41 হাজার টাকা দান করিয়াছে। কৃষি-সংস্থার কর্মসূচী অনুসারে ভারত ইরানকে 170 টন মিছরি ও 100 টন চিনি দান করিয়াছে। ভারত রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (ILO) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘের যে কমিশন (ECAFE) রহিয়াছে, ভারত তাহারও সদস্য। ভারত রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনেরও সদস্য। বিশ্বের বহু দেশ ও সংস্থা ভারতকে অর্থ, যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। ভারত-ও এশিয়া ও আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলির সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সকল দেশে যুগ্মভাবে কল-কারখানা স্থাপনের বিষয়েও উদ্যোগী হইয়াছে।

পারস্পরিক সাহায্য ও আদান-প্রদানই মূলনীতি

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।—ভারত বহির্জগতের সহিত তাহার সাংস্কৃতিক সম্পর্কও নিবিড়ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলির সহিত অনেক স্থলে সাংস্কৃতিক দপ্তর রহিয়াছে। ভারতে যে সকল বৈদেশিক দূতাবাস রহিয়াছে, সেগুলির অনেকগুলির সহিত সাংস্কৃতিক দপ্তর রহিয়াছে। এই সকল দপ্তর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা (বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী) মন্ত্রক একটি

'বহিঃসম্পর্ক বিভাগ' স্থাপন করিয়াছে। এই বিভাগের কাজ হইল বহির্বিশ্বের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করিয়া তোলা। এই বিভাগ ভারত ও বিদেশের মধ্যে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য শ্রেণীর গুণী ব্যক্তিদের বহু প্রতিনিধিদল বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়াছে ও করিতেছে। এইরূপ প্রতিনিধি-দলগুলির আনাগোনা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভাগ ভারত হইতে পুস্তক, চিত্র ও অন্যান্য শিল্পবস্তু বিদেশে পাঠাইতেছে এবং বিদেশ হইতে পুস্তক, চিত্র ও দর্শনীয় শিল্পবস্তু ভারতে আনিতেছে। এই বিভাগ বিদেশীয় গ্রন্থাদির অনুবাদের ব্যবস্থা করিতেছে। বিদেশী ছাত্রদের জন্য আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসাদি স্থাপন করিতেছে, অন্যান্য দেশে ভারত-তত্ত্বের জন্য বিভাগ খুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং পৃথিবীর বহু দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীসহ ভারতীয় সাহিত্যিকদের বহু গ্রন্থ অনূদিত হইতেছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, তুরস্ক, গ্রীস প্রভৃতি বহু দেশের সহিত ভারত সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। আধুনিক যুগে চলচ্চিত্র সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ভারতে বিদেশী চলচ্চিত্র প্রচুর পরিমাণে দেখানো হয় এবং বহু চলচ্চিত্র-উৎসব প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়া থাকে। বহু ভারতীয় চলচ্চিত্র এখন বিদেশে প্রদর্শিত হইতেছে এবং বহু আন্তর্জাতিক সম্মান ও পুরস্কারও লাভ করিয়াছে। বেতারও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের অন্যতম প্রবল হাতিয়ার। ভারত বেতার মারফত 17টি বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া বহির্বিশ্বের সহিত সাংস্কৃতিক যোগা-যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভারতেও বেতার-যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়াছে। ফলে, জনসাধারণও বৈদেশিক সংস্কৃতিসমূহের সহিত যোগাযোগের সুযোগ পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক খেলাধূলার ক্ষেত্রেও ভারত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদের বিভিন্ন দল যেমন বহির্বিশ্বে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ দিতেছে, তেমনি বিদেশের বহু দলও ভারতে আসিয়া প্রায়ই ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কাজে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংগঠনের (UNESCO) বাজেটে ভারত তাহার দেয় টাকা নিয়মিত দিয়া আসিতেছে। 1963 খ্রীষ্টাব্দে এই খাতে ভারত ষোল লক্ষাধিক টাকা দিয়াছে।

আদান-প্রদানের ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

রাষ্ট্রসংঘ।—1939 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই বিশ্বে স্থায়িভাবে শান্তিরক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, এমন একটি বিশ্বসংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি চিন্তা করিতে থাকে। উহারই ফলশ্রুতিরূপে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা ঘটে। 1945 খ্রীষ্টাব্দের 25শে এপ্রিল হইতে 26শে জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যান্ ফ্রান্সিস্কোতে 50টি রাষ্ট্রের যে সম্মেলন হয়, তাহাতেই রাষ্ট্রসংঘের সনন্দ (Charter) রচিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সনন্দে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—(1) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকরণ; (2) বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীসাধন; (3) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা-সমূহ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্তকরণ। আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র-সংঘের (United Nations Organisation, সংক্ষেপে U. N. O.) প্রতিষ্ঠা হয় 1945 খ্রীষ্টাব্দের 24শে অক্টোবর তারিখে। পরে ক্রমে ইহাতে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রও যোগ দিতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার অনুগামী রাষ্ট্রদের প্রতিবন্ধকতার কারণে কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। ফরমোজার কুওমিন্টাং সরকারকেই সমগ্র চীনের প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতসহ বহু দেশ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া কম্যুনিস্ট চীনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিয়াছে। এখন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-সংখ্যা 117। ভারত-ও রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম সদস্য।

রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রসংঘ 6টি মূল বিভাগে বিভক্ত—(1) সাধারণ পরিষদ্, (2) নিরাপত্তা পরিষদ্, (3) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্, (4) অছি পরিষদ্, (5) আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং (6) সেক্রেটারিয়েট্। সাধারণ পরিষদ্ রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই পরিষদে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সংখ্যা ও ভোট সমান। সাধারণতঃ বৎসরে একবার এই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হয়। এই পরিষদে বিশ্বের বিবিধ সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ্‌টি 11টি রাষ্ট্রের সদস্য লইয়া গঠিত। ইহাতে স্থায়ী পাঁচজন সদস্য আছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও কুওমিন্টাং চীন। অবশিষ্ট আসনসমূহে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পর্যায়ক্রমে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যগণের অর্ধাংশ—অর্থাৎ তিনটি রাষ্ট্র—প্রতি বৎসর পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের স্থলে তিনটি রাষ্ট্র নূতন সদস্য-পদ প্রাপ্ত হন। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী

সাধারণ পরিষদ্

নিরাপত্তা পরিষদ্

সদস্যদের প্রত্যেকের ভেটো প্রয়োগের অর্থাৎ প্রস্তাব নাকচ করিবার অধিকার আছে। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদে কোনও প্রস্তাব স্থায়ী সদস্যগণের সকলের মনঃপূত হইলে এবং সংখ্যাধিক্যে সমর্থিত হইলে তবেই গৃহীত হইতে পারে। বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব মূলতঃ এই সংস্থার উপরই রহিয়াছে। বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে নিরাপত্তা পরিষদ্ সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান এবং ঐ সকল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কর্তব্য। মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সুপারিশ করাও এই পরিষদের কাজ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রভৃতির সংহতি-সাধনও এই পরিষদের অন্যতম কর্তব্য।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্

অছি পরিষদের কর্তব্য হইল—যে সকল দেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হয় নাই, সেই সব দেশের তত্ত্বাবধান করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক আদালতও রহিয়াছে। নেদারল্যাণ্ডের 'দি হেগে' এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিচারালয়ের 15 জন বিচারপতি পৃথক পৃথকভাবে নিরাপত্তা পরিষদ্ ও সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক মনোনীত হন।

অছি পরিষদ্

আন্তর্জাতিক আদালত

রাষ্ট্রসংঘের কর্ম-পরিচালনার জন্য রহিয়াছে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারিয়েট্ বা মহাকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানহাট্টান দ্বীপে 18 একর জমির উপর উনচল্লিশ-তলবিশিষ্ট একটি বিশাল অট্টালিকায় রাষ্ট্রসংঘের সভাগৃহ ও মহাকরণ অবস্থিত।

মহাকরণ

রাষ্ট্রসংঘের আদর্শকে কার্যকরী করিবার জন্য আরও বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (Food and Agriculture Organisation, সংক্ষেপে FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation, সংক্ষেপে ILO), রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা-সংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, সংক্ষেপে UNESCO), বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা (World Health Organisation, সংক্ষেপে WHO), রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু আপৎ তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund, সংক্ষেপে UNICEF), রাষ্ট্রসংঘ কারিগরি সাহায্য সূচী (United Nations Technical Assistance Programme, সংক্ষেপে UNTAP) প্রভৃতি সংস্থা উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the political, economic and cultural relations of India with the outside world. [বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. Describe the constitution and functions of the U. N. O. [রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।]

সমাপ্ত